ভালোবাসা চিরকালীন

আশাপূর্ণা দেবী

সেরা
প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

"সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড" ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৯ এর পক্ষে থেকে শ্রীশিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং
এম, এম, টেডার্স, ৩/২, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ থেকে শ্রী অশোক
মিত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী : সুরজিৎ অধিকারী।

উৎসর্গ

জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে যিনি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, যিনি শিখিয়েছেন ভালবাসায় হয়না---পৃথিবীতে এমন কঠিন কিছু নেই, তিনি আমার স্বর্গীয় বাবা। তারই পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমার এই ভালবাসার উপন্যাস।

আমার কাছে মানুষের ভালোবাসার থেকে বড় আর কিছু নেই। জীবনে এর থেকে বড় কোন সম্পদ আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি মনে করি না শুধু, বিশ্বাস করি মানব সভ্যতাই গড়ে উঠেছে মানুষের ভালবাসার মধ্য দিয়ে, তার মধ্যে আবার নর-নারীর ভালবাসার থেকে মহৎ আর কিছু নেই।

ধূসর বিকালের গোধূলি লাল আভায় বিস্তারিত সবুজ মাঠের উপরে তার আলোকছটা এক মায়াবী কল্পনায় আমাকে নিয়ে যায় সেই অতীত বেলা ভূমে যেখানে আমার সঙ্গে নিত্য পথ চলতো আমার ভালবাসা, আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা, আমার ঘৃণা, আমার দ্বন্দ্ব, আমার দুর্বলতা, আমার ভীরুতা, আমার প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তি।

হিসাবের খাতা উল্টিয়ে দেখি কোন হিসাবই মেলেনি। হিসাব মেলেনি তাদেরও যারা স্বপ্ন ও বাস্তবকে নিয়ে হিসাব মিলাতে চেয়েছিল। কেন তাদের হিসাব মেলেনি? জীবনের চোবাবালিতে কেন তাদের পথ হারাতে হল? সে দুর্গম রহস্যের সমাধান হয়তো কোনদিনই হবে না। আর এটাই তো জীবন। তাই বলে হিসাব যে একেবারেই মেলেনি কথাটা কি এত জোর দিয়ে বলা যাবে? তারা তো বেঁচে আছে - কখনো সমুদ্রে, কখনো পাহাড়ে, আবার কখনো বা এই সমতলের ধানের শিষে ভোরের শিশিরের সুরভিতে।

ভোরের শিউলিতে খুঁজে ফিরি তার পরশ, শিশিরে পেতে চাই তার স্পর্শ, ভোরের বাতাস কখনোবা নিয়ে এসেছে তার ঘ্রাণ, সন্ধ্যার কুহেলিতে দেখেছি তার অবয়ব, অথচ তাকে পাইনি, যে আমার অধরা আর অনাঘ্রাতা, আমার স্বপ্নকে ভেঙে করেছে চুরমার। কেন এমন হল, কেন জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারলাম না তাকে?

কে আমি কোন অধিকারে তার নাগাল পেতে চাই? জীবনে যে জল রঙের ছবিই আঁকতে পারল না তার সাধ হয় কি করে অমূর্তকে মূর্ত করার। ধরতে পারে কেবল মাত্র সেই যার সে অধিকার আছে। আমার তো সে অধিকার নেই। তবু না মেলা অংককে বার বার মিলাবার ব্যর্থ প্রয়াসে ভাবি জীবনের সব কিছুই কি মিথ্যে? হিসাব যে মিলাতে চেয়েছিলাম, তার কি কোন মূল্য নেই? নিজের জীবনের হিসাব মিলানোটাই কি সব? যাদের অংক মিলে গেছে তাদের জন্য কি থাকবেনা আমার কোন অভিনন্দন?

আবার ভাবি, যে স্মৃতির মেখলা পরে এই ধূসর বিকাল আমার চোখে মায়াঞ্জন হয়ে এঁকে চলেছে, পথ চলা শেষে তাদের অস্বীকার করব কি করে! আমার পৃথিবীর শব্দ ভান্ডার হলোই বা স্বল্প, অন্য পৃথিবী থেকে ধার করে নেবো না হয় কিছু নতুন শব্দ। সেই শব্দেই লিখে যাব পৃথিবীর আর এক ইতিহাস।

স্বপ্নকে যদি কোন মায়াবী আলোয় বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়, হয়তো যন্ত্রণা বাড়তে পারে, আঘাতে বিবর্ণ হতে পারে মানবিক অনুভূতিগুলো। তাতে কি? যে খুঁজে পেতে চায় অপ্রাপণীয়াকে তাকে তো যে কোন ভাবে জয় করতেই হবে বাধাগুলো।

আমি পারিনি বলে আর কেউ যে পারবেনা, তাতো নয়। প্রান্তিক রায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে হেরে গেছে বলে রেহানাকেও হারতে হবে, সে দিব্যি তো কেউ দেয়নি।

রেহানা দূরের তারা হয়ে বাঁচতে চায়, সাধ্য কি তাকে মর্তের মাটিতে ফিরিয়ে আনার। অথচ একদিন, এই রেহানাই শুধু নয় তার সঙ্গে অশ্রুকণা, তপতী ও আরো কেউ কেউ হারতে চেয়েছিল। কিন্তু কি হ'ল জীবন ইতিহাসের দৃশ্যগুলিতে? জনমানসে আলোড়ন তুলে তারা শুধু আমার দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে গেল। আজ বুঝতে পারি, তাদের সে জোরটুকু ছিল না, যে জোরে দূরকে করা যায় নিকট। যার সে জোর থাকে, জীবন-তো তাকেই নিয়ে আবর্তিত হয়। আর সে জন্যই তাদের প্রতীকী উপস্থিতি, দুয়ারে যতই আঘাত হানুক, ভীরু মন তাতে সাড়া দেবে কেন?

ব্যর্থ বাঁশির সুর দুয়ারে আঘাত হেনে ফিরে যায়, প্রতিধ্বনিত হয় সেই ব্যাকুলতা, স্মৃতির পাতায় তাকেই অক্ষয় করে রাখার যে অনুভূতি, আজো এই গোধূলি আকাশ কোনে খুঁজে ফিরি শেষ হয়েও শেষ না হওয়া সেই সুরের মূর্ছনা।

প্রান্তিক রায় বেদনার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। ভালবাসা নামক রূপক পৃথিবীতে তাদের বিচরণ অবাধ। মায়াবী আলোয় ফিরে পায় হারানো সুরের রেশ। সমুদ্র তাদের টানে জীবনের এক ঘেয়েমীকে মুক্তি দিতে, পাহাড় জাগায় উদ্যমতা। আবার এই সমতলের বিষন্নতায় নতুনের স্বপ্ন দেখে জীবনের পাতায় পাতায়। তাইতো শেষ কথা বলার সময় আসেনি এখনো।

অশ্রুকণার জন্য একটা আলাদা অনুভূতি জাগে মনের মধ্যে। জানিনা এই অনুভূতির কোন আলাদা নাম আছে কিনা। যদি থাকেও তবু সে নামের সাথে আমার কোন পরিচয় নেই। অশ্রুকণাকে ভাল লাগে কারণ, অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সে তার সাবলীল উপস্থিতি আর সমবেদনা দিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে অনেকবার। কিন্তু অশ্রুকণার এই যে নিতান্ত অসহায় এক গাঁয়ের ছেলেকে উপযাচক হয়ে সমবেদনা জানানো, পছন্দ নয় কলেজের অনেকের। ছেলেরা কতটা প্রতিক্রিয়াশীল জানা না গেলেও মেয়েরা যে সুযোগ পেলেই আমাকে অপদস্ত করতে পিছপা নয় সে অভিজ্ঞতা এই সামান্য দিনে বেশ কয়েকবার হয়ে গেছে। তাই তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

কিন্তু আমি প্রান্তিক দূর থেকে এতদিন দেখে এসেছি অশ্রুকণাকে। ভীরুতা আমাকে বাধা দিয়েছে কাছে যেতে, তাইতো এড়িয়ে চলছি প্রতিমুহূর্তে। এই কো-এডুকেশান কলেজে পড়তে এসে, গ্রামের লাজুকতা যে তখনো ছাড়তে পারেনি তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব ঐ সব দূর আকাশের তারাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার। তবু এরই ফাঁকে অশ্রুকণার উপযাচক হয়ে কাছে আসার নৈকট্য আমাকে ভাল লাগার এক মরুদ্যানে পৌঁছে দেয়। কিন্তু তাতে কি? মরুদ্যানের স্নিগ্ধতা যারা কেড়ে নিতে চায় তারাতো সক্রিয়। তাদের অবাধ বিচরণকে

ঠেকাবে কে? তাইতো আবারও একদিন মুখোমুখি হয়ে যেতে হয় তমালীর, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। এই যে গাঁয়ের ছেলে কোথায় চললে একা একা? তমালীর সঙ্গে ঝাঁক বেধে আসা অনুতপা, মুক্তি, শিপ্রারা খিল খিল করে হেসে ওঠে। ওদের ঐ প্রাণোচ্ছলতা আমাকে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। পারিনা চোখ তুলে তাকাতে। কিন্তু যাদের প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বসিত জোয়ার, তারা তা মানবে কেন? যেকোন ভাবেই হোক আনন্দকে তো জয় করতে হবে। তাই আমার অসহায়তা, ভীরুতা, লাজুকতাকে তারা মূল্য দেবে কেন? এরপর অপমানের শুল আরো তীব্রভাবে হেনে শিপ্রা বলে, কিগো ভাই কানাই কোন রাধিকার খোঁজে চলেছো এই পথে একলা একলা? মুক্তি বলে, আমরা রাধিকা না হতে পারি, কিন্তু তার সহচরীতো বটে। ভালবাসার ঐ চোখ দুটি তুলে তাকাও না একবার, বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে ওঠে সবাই এক সাথে। তাতেই ক্ষান্ত না হয়ে কেউ কেউ আমার হাতে একটা চিমটি কাটে, কেউ জামা ধরে টানে, কেউবা আমার বই খাতার সস্তাদামের ব্যাগটা টেনে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। আমার রাগ হয় খুব, কিন্তু কোন ভাবেই তা প্রকাশ করতে পারিনা। গাঁয়ের ছেলে সত্যি। তাই বলে তার কথা উল্লেখ করে অপমান করতে হবে? এটাই বুঝি শহরের ভদ্রতা। ওদের ওই অরুচিকর কথার উত্তরে শুধু আস্তে আস্তে বললাম, কেন এই ভাবে আপনারা আমায় বিরক্ত করছেন, আমার তাড়া আছে পথ ছাড়ুন।

তমালী বলে ওঠে দেখ দেখ, আমাদের কিছুতেই ও বন্ধু বলে মানবেনা। ক্লাশের বন্ধুদের কেমন আপনি করে বলছে দেখ। মুক্তি বললো, ওকে ঐ পুকুরের জলে ডোবানো দরকার, যদি তাতে ওর নতুন জন্ম হয়। তমালী বলে নারে, তাতে আবার শ্রীরাধিকার মান হতে পারে। ওকে নিয়ে ডোবার অধিকারতো তার। তার চেয়ে ছেড়ে দে, আমরা শ্রীরাধিকাকে বলি। এই যে ভাই অশ্রুকণা তোমার কানু অপেক্ষা করছে ঐ পুকুর পাড়ে কৃষ্ণচূড়ার নীচে। আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে একসাথে। তারপর হাসতে হাসতে দল বেঁধে চলে যায় ওরা। মনে মনে ভাবি কি রকম ফাজিল মেয়ে সব। লজ্জা-সরমও নেই।

কিন্তু আমি এখন কি করব। ওটুকু সময়ের মধ্যে যা যা করার সবই করেছে ওরা। টানাটানিতে জামার একটা অংশ ছিঁড়ে গেছে। সেলাই না করে ওটা পরে আর কলেজে আসা যাবেনা। বইগুলো যে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কে জানে? খুঁজে দেখতে হবে। টানা হ্যাঁচড়ায় হাতের কবজিতে ব্যাথা এখনো টনটন করছে। যে ভাবে চুল ধরে টানাটানি করেছে, তাতে মাথা নাড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। কি অপরাধ আমার? কলেজে আসি, আবার ফিরে যাই আপন মনে। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যখন আড্ডা মারে, আমি তাতে যোগ দিইনা। ভালে লাগেনা তাই! কিন্তু এটাও তো সত্য, ওরাতো কোনদিন ডাকেনি আমাকে। হ্যাঁ একদিন বলেছিল বটে, কলেজের প্রায় ১০/১২টি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কলেজ ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছিল, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছিল তাই পকেটের পয়সা গুনে নিয়ে সামান্য কিছু খাওয়ার জন্য ক্যান্টিনে ঢুকেছিলাম। ক্যান্টিনের বিশুদা, পুরো নাম জানিনা ঐ নামে সবাই ডাকে - আমাকে বলল কি খাবে প্রান্তিক? — আমি বললাম, ৫০ পয়সা আছে তাতে যা হয় দাও। আমি বিশুদাকে দিতে বলে, পিছনের একটা ফাঁকা সিট দেখে এগিয়ে চলেছি। কলেজ বন্ধুদের

মধ্যে একজন, নাম মনে হয় বিমল, আমাকে বলল, আরে প্রান্তিকবাবু যে এসো এসো, আজ তোমার ঘাড় ভেঙে আমাদের চা খাওয়া হবে। বলেই তমালী শিপ্রাদের বলল, একটু সরে বসতো তোরা, প্রান্তিকবাবুকে বসতে দে। আমি বললাম, না ভাই আপনারা আরাম করে বসুন। আমি পিছনের সিটে বসব। তমালী ফোঁড়ন কেটে ওঠে কেন ভাই আমাদের সঙ্গে বসলে কি আপনার জাত যাবে? শিপ্রা বলল, না ভাই আপনাকে খাওয়াতে হবে না, আমরাই খাওয়াব। বসুন না, আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা না হয় খেলেনই। আমি বললাম, আমি চা খাইনা। একথা বলেই ওদের কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে পিছনে গিয়ে বসলাম। বিশুদা একটু পরেই ২ খানা হাতে করা রুটি এবং খানিকটা ছোলার ডাল দিয়ে গেল। আমি কোন ভাবে খেয়ে উঠে পড়লাম। শুনতে পাচ্ছি তখনো আমাকে নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু উপায়ই বা কি।

তখনো সন্ধ্যে হয়নি। একটা খাতা খুঁজেই পাওয়া গেলনা। ওতে আমার বেশ কিছু জরুরী নোটস্ ছিল। এত খারাপ লাগছে যে, বাড়ী ফিরতেও আর ইচ্ছে করছেনা। চুপচাপ বসে আছি শান বাধানো পুকুর ঘাটের বেদীতে। ভাবছি সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে আস্তে আস্তে চলে যাব।

এরইমধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন। একা একা পথ চলতে ভয় হয়। গ্রামের স্কুলে যখন পড়তাম হেডমাষ্টার মশাই ভীষণ ভালবাসতেন। আমি মোটামুটি লেখা পড়ায় খুব একটা খারাপ ছিলাম না বলে গ্রামের সকলে আমাকে ভালবাসতেন।

তখন ১১ ক্লাসে উচ্চমাধ্যমিক ছিল। টেষ্টে ভাল নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে হেডস্যার বললেন; তাঁর এক ছাত্রী থাকে কলকাতায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে। ওদের কোন সন্তান নেই। তোমার কথা বলেছি ওদের। তুমি কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হও। ওরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে, তোমার কোন আপত্তি নেই তো। হেডস্যারের ছাত্রী মানে গ্রামের সম্পর্কে আমাদের নীলাঞ্জনা পিসি, মাঝে মাঝে গ্রামের উৎসবে আসেন গ্রামের বাড়ীতে। মাঝে মাঝে ডেকে কথাও বলেন। কিন্তু তবু যেন মনে হয় কত দূরের মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন জুনিয়ার একাউন্টস অফিসার নীলাঞ্জনা পিসি, পিসির বর পরিমলদাও ভাল চাকরি করেন। তবে প্রাইভেট ফার্ম। ওদের একটাই দুঃখ, কোন সন্তান হয়নি। আমার বয়সটা ঠিক ওদের সন্তানের বয়সের মতো নয়।

কলকাতায় হেডস্যারই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন নীলাঞ্জনা পিসির কাছে। আসার কথা ব্যক্ত করে নীলাঞ্জনা পিসিকে বললেন যে, তোমার যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহলে বল। পিসি বললেন, আমাদেরতো কোন অসুবিধা নেই, বরং ও থাকলে আমাদের কিছু সুরাহাই হবে।

সারাদিনের ক্লান্তির পরে আমরা যখন ফিরি, জীবনের সবকিছু একঘেয়েমি বলে মনে হয়। ও থাকলে অন্তত কিছুটা হলেও একঘেয়েমির ছন্দপতন হতে পারে। উত্তরে হেডস্যার বললেন একটা কথা বলব নীলু? - বলুন। আজকাল তো চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত, তোমরা চেষ্টা করছনা কেন? চেষ্টা করা হয়েছে স্যার, কিন্তু ঈশ্বর যা চায়নি তা কি

জোর করে পাওয়া যায়? তারপর বললেন তা হলে অরফ্যান হোম থেকে তো দত্তক নিতে পার? না স্যার, দত্তকের কথা ভাবিনি কখনো। আরো দু-এক জন যে বলেনি তা নয়, কিন্তু বিষয়টি আমাদের বিবেচনার মধ্যে নেই স্যার। আর তাছাড়া দোষ যখন আমার, তখন পরিমলকে আমি কেন আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়াব। বুঝতে পারলাম না তুমি কি বলতে চাইছো? নীলাঞ্জনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তারপর ধীরে ধীরে বলে যে, আমি ওকে আবার বিয়ে করতে বলেছি। অবাক হয়ে হেডস্যার বলেন, সেকি কথা নীলু! তুমি এর পরিনাম জানো? জানি স্যার। একদিন হয়তো ওর ঘরে আমার আর জায়গা হবে না। কিন্তু ওতো সুখী হবে, পূর্ণ হবে ওর পিতৃত্ব।

হেডস্যার নিশীথরঞ্জন সরকার এর আর কি উত্তর দেবেন। তবু তার মনে হয় নীলাঞ্জনার এ এক হঠকারি সিদ্ধান্ত। ও কোন ভাবেই ঠিক করছেনা। তাই আর ও প্রসঙ্গ না বাড়িয়ে আমার প্রসঙ্গে বললেন, তা হলে তোমাদের এখানে প্রান্তিককে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না! কেন স্যার? তোমাদের মানসিক এই অবস্থার মধ্যে ও একটা বোঝা হয়ে উঠবে। নীলাঞ্জনা পিসি বলল, আপনি ঠিক বলছেন না স্যার। প্রান্তিক আপনার স্কুলের কৃতী ছাত্র এটা যেমন ঠিক, তেমনি ওতো আমারও গ্রামের ছেলে, সম্পর্কে আমার ভাইপো। হয় তো এই কলকাতা শহরে এ সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এতদিনেও গ্রামের বন্ধন যখন কাটাতে পারিনি তখন এ সত্যকে অস্বীকার করব কি করে? না স্যার ওর কোন অসুবিধাই হবেনা। আমি পরিমলকে বলেছি ও হাসি মুখে মেনে নিয়েছে। ওর আসার সময় হয়ে গেছে, আপনি আরেকটু অপেক্ষা করুন। হেডস্যার বললেন, কিন্তু নীলু। আমার যে সময় নেই একদমও। আমাকে উঠতেই হবে। নীলাঞ্জনা আর কি করবে? হেডস্যার যাওয়ার আগে বললেন, তোমরা আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। আশীর্বাদ করে হেডস্যার চলে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম। তা আমিও এখানে আছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে পিসি ও পিশেমশাইর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংএর কোন অভাব আছে বলে আমার কখনো মনে হয়নি। বলতে গেলে ওনারা আমাকে ওদের পরিবারের একজন হিসাবে হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। ওবাড়ীতে আমাকে কোন কড়া অনুশাসনেও রাখা হয়নি বরং বাস ভাড়া এবং সামান্য টিফিনের পয়সা আমাকে নিয়মিত দিতে কোনদিন ভুল করেন না। আমার সারাদিন যা ব্যয় হয় তারপর বাকী পয়সা ওনাদের ফিরিয়ে দিই। ওরা ফিরিয়ে নিতে চান না। তবু আমি তা ফিরিয়ে দিই। সুতরাং আমার কাছে অতিরিক্ত ব্যয় করার মত পয়সা থাকে না।

আজ ওরা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন। আমায় পয়সা দিতে সম্ভবত ভুলে গেছেন। সুতরাং কোন টিফিনই খাওয়া হয়নি। তারপর আসার সময় যেমন হেঁটে এসেছি, যেতেও হবে হেঁটে, পথ অনেকটা। তাই একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলছিলাম। অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে পুকুরের ঘাটে বেদীর ওপরে বসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

অন্ধকার নেমে এসেছে। বাইরের পৃথিবীকে, তা আরো ঘন কালো যবনিকায় ঢেকে দিয়েছে, উপরন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে ২/১টি মশার কামড়ও টের পাচ্ছি। ঘুম ভেঙে যায়। এ পথ নির্জন। পুকুরের জলে ভাল করে চোখমুখ ধুয়ে, হাটতে আরম্ভ করি। কিন্তু পা চলতে

চাইছেনা। অথচ এতটা পথতো হাটতেই হবে। সামনের ঐ বাড়ীতে হয়তো রেহানা থাকে। রেহানা রহমান। সারা কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ওর সঙ্গেই আমার ২/১টি কথা হয়। আসলে কলেজে আমরা একই ক্লাসে পড়ি। আমাকে কিছু নোট দিয়ে ও সাহায্য করেছিল, দূর্ভাগ্য সে খাতাটিই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ওর সঙ্গে কলেজ করিডোরে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, আমি ক্লাসরুম খুঁজছিলাম। ইতস্ততঃ করছি দেখে ও আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি তো প্রান্তিক রায়? আমি হ্যাঁ বলাতে, ও বলেছিল, আমাকে চিনতে পারছেন না তাইনা? তারপর নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, আমি রেহানা রহমান। যেদিন কলেজে ভর্তি হন সেদিন আপনাকে দেখেছিলাম। ভর্ত্তির ফর্ম থেকে আপনার নামটাও জেনে নিই, সেই সময়। কিছু মনে করবেন না, সহপাঠীদের সঙ্গে আমি কিন্তু বেশীক্ষণ আপনি করে কথা বলতে পারিনা। তুমি বললে আপত্তি করবেন না তো! সরল আর সহজ স্বীকারোক্তি, ভীষণ ভালই লেগেছিল কারণ তাতে কোন অহংকার নেই। তাই আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। আমাদের গ্রামের স্কুলেও গুটি কয়েক ছাত্র-ছাত্রী ওদের সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল। ছেলেরা আমাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করলেও মেয়েরা একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতো। হয়তো কোন ধর্মীয় সঙ্কোচ তাদের এভাবে চলতে বাধ্য করতো। কিন্তু রেহানার সাবলীলতায় সে ভুল যেন ভেঙে গেল আমার। বললাম না আপত্তি কিছু নেই। ও বলল, কিন্তু একটা শর্ত আছে, আমাকেও কিন্তু আপনি বলা চলবেনা। বললাম, চেষ্টা করব। ও প্রতি উত্তরে মৃদু হাসল শুধু। একেবারে প্রথমেই যে তাকে তুমি বলতে পেরেছিলাম তা কিন্তু নয়। তবে ধীরে ধীরে একদিন সেই জড়তা ভেঙে গিয়েছিল এবং রেহানাকে তুমি বলতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা হতো কালে ভদ্রে এবং খুব সামান্য। মনে মনে ভাবতাম রেহানাও তো শহরের মেয়ে, তবুও ওদের সঙ্গে কত পার্থক্য। মনে পড়ে সপ্তাহ দুয়েক আগে এই পথেই ফিরছিলাম। রেহানা একটা বাড়ীর বারান্দা থেকে আমাকে ডাকলো। এই যে প্রান্তিক! আমি তাকিয়ে দেখি একটা বাড়ীর বারান্দা থেকে রেহানা ডাকছে। খুব হাসিখুশী, গোধূলির রক্তিমাভায় ভীষণ সুন্দর লাগছিল ওকে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ও বারান্দা থেকে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এটা আমাদের বাড়ী, চলনা! কিন্তু! কিন্তু কি? তারপর কি মনে হতে হেসে ফেলল, ও আমি তোমাদের স্বধর্মের লোক নই বলে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে? না ঠিক তা নয়। তবে অত ইতস্তত করছ কেন? চলনা ভিতরে। ব'লে হাত ধরে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল। আমার কোন প্রতিবাদই সে শুনল না।

বাড়ীতে ওর একটা আলাদা পড়ার ঘর আছে। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু ঘরগুলো ভীষণ ছিমছাম এবং সুন্দর ভাবে সাজানো। ও আমাকে ওর পড়ার ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। একটু পরে এক ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বললেন আমি রেহানার মা! ও বলছিল তুমি নাকি ভিতরে আসতে চাও নি। কিন্তু কেন? কিসের সঙ্কোচ? আমি আর কি বলব। আমি উঠে ওঁনাকে প্রণাম করলাম, কোন বাধা দিলেন না। ওনার প্রশ্নের উত্তরে বললাম ঠিক তা নয়, আসলে আমার খুব তাড়া আছে। কেন?

জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। আমি বললাম আপনি হয়তো জানেন না। আমি গ্রামের সম্পর্কে এক পিসিমার কাছে থাকি, বলেছিলেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে তাই আর কি? ভদ্রমহিলা পাশের একটা চেয়ারে বসে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন বোসনা। আমি বসলাম। ভদ্রমহিলা বলে চললেন, তোমার কথা শুনেছি রেহানার কাছে। তুমি তোমার এক আত্মীয়ার বাড়ীতে থাক তাও বলেছে আমায়। প্রায় দিনই তোমার কথা বলে। আমার কথা? অবাক হয়ে বলি, কিন্তু ওর সঙ্গেতো কলেজে আমার কোন কথাই হয় না বলতে গেলে। আমার কথা রোজ কি করে বলবে? ভদ্রমহিলা বললেন ও সেই কথাই বলে, যে তোমার সঙ্গে রোজ দেখা হয় অথচ তুমি ওকে এড়িয়ে চল, কোন কথাই বলতে চাওনা। আমি ওকে বলেছিলাম, একদিন ছেলেটাকে নিয়ে আয়না আমাদের বাড়ীতে। ভদ্রমহিলার কথা শুনতে শুনতে আমার বিস্ময় যেন আর কাটেনা। আমাদের কথা বলার মাঝে রেহানা একটা প্লেটে কিছু খাবার এবং চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু আমি যে কেন ওর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিনা কে জানে? ভদ্রমহিলা বললেন, তোমরা কথা বল, আমি দেখি সেলিনা এখনো আসছেনা কেন? সেলিনা, রেহানার ছোট বোন, আগামীবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

আমি চুপচাপ বসে আছি দেখে রেহানা বলল, তুমি কি কথা বলবেনা বলে ঠিক করেছ নাকি? চমকে উঠে তাকালাম ওর দিকে। না ঠিক তা নয় আসলে আমি একটা কথা ভাবছিলাম। কি? আমি জানতে চাইলাম তুমি কি রোজ কলেজে যা যা ঘটে সব বাড়ীতে এসে বল? — কেন? না, এমনিই জিজ্ঞেসা করছি। — তবু? মানে মাসিমার তো আমাকে চেনার কথা নয়। তাই ভাবলাম, তুমি না বললে জানবেন কি করে।

ও তাই বল, খিল খিল করে হেসে উঠলো রেহানা আর আমি স্পষ্ট সোজাসুজি তাকলাম ওর দিকে। ওকি লজ্জা পেল? কি জানি। বলল অমন করে তাকিয়ে আছো কেন? নারীর স্বাভাবিক লজ্জায় খানিকটা যেন নুয়ে আসে রেহানা।

লাল রোদ্দুর ফিকে হয়ে ধূসর আঁধার নামার অপেক্ষায়। রেহানার মা আফরোজ বেগম, তাঁর ঘর থেকে চিৎকার করে বলেছন সেলিনাতো এখনো ফিরলনা, একবার দেখবি রাস্তার মোড়ে গিয়ে? রেহানা বলল কি যে তুমি ব্যস্ত হও রোজ রোজ, ও কবে আর এত সকালে ফেরে? না ফিরলে চিন্তা হয় না। এত চিন্তা করার কি আছে? তোমার মেয়েতো একাই কেবল ফেরেনা তা নয়, ওদের ক্লাসের অনেকেই ফেরেনা। — কেন ফেরেনা কেন? আফরোজ বেগমের কণ্ঠে উদ্‌বিগ্নতার ছোঁয়া। — ফিরবে কি করে মা। ওরা ক্লাস শেষ হলে এক জায়গায় পড়তে যায় তাইতো দেরি হয়। ৭টার মধ্যে না ফিরলে আমি যাব যেখানে ওরা পড়ে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল — কই কি যেন বলছিলে? না কিছু না, ব'লে চায়ের কাপটা মুখে তুলে নিলাম। আলদা প্লেটের খাবারগুলোও একটু একটু করে খেয়ে নিলাম। তারপর বললাম, আজ তাহলে উঠি রেহানা। আচ্ছা বলে উঠে দাঁড়ায় রেহানা। তারপর বলে, তুমি তো এই পথেই হেঁটে গিয়ে বাস ধর তাইনা? — হ্যাঁ? তাহলে তো যে কোনদিন আসতে পারো? হ্যাঁ তা পারি। তাহলে কাল আসবে বল? চেষ্টা করব। ও আর কিছু বললনা। আমিও বেরিয়ে আসি ওদের বাড়ী থেকে।

অনেক কথাই ওকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলামনা কোন কথাই বলতে। পরের দিন থেকে পারত পক্ষে, ওই রাস্তাটি এড়িয়ে চলেছি। এটা কি ভিতরের কোন ভয়, না আশঙ্কা। তা না হলে ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে কম দূরত্বের সোজা পথ ছেড়ে বেশী দূরত্বের ঘুরপথে বাস স্টপজে যাবো কেন? রেহানা বুঝতে পারলেও আমাকে কোন প্রশ্ন করে অস্বস্তিতে ফেলতে চায়নি হয়তো। আজ আবার অন্যমনস্ক ভাবে এই রাস্তায় এসে পড়েছি। সব বাড়ীর আলো জ্বলে উঠেছে। একটু আগে সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

রেহানার ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে সামনের মেয়েটির দিকে তাঁকিয়ে কি যেন বলছে আর হাসছে। এ সময় ওদের বাড়ী গেলে কিছু মনে করবে নাতো! তবু বেল দিলাম। আমাকে বোধ হয় সামনে বসা মেয়েটি আগেই দেখেছে কারণ তা না হলে বেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলতো না। মেয়েটি কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! নীরবে বোধহয় জানতে চাইছে আমি কে। বললাম, আমি প্রান্তিক, রেহানা আছে? রেহানাও কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বললঁ, কিঁ ব্যাপার প্রান্তিক, তোমার শরীর খারাপ? এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন? কলেজতো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এসো এসো ভিতরে এসো। এক নাগাড়ে এতগুলো প্রশ্ন করায় আমি খানিকটা বিভ্রান্ত। আমার অবচেতন মনে হয়তো রেহানার কথা বারবার মনে হয়েছে। আবার একথাও ঠিক যে সচেতন ভাবে আমি রেহানার কথা ভেবে ওদের বাড়ী আসিনি। তাই খানিকটা ইতস্তত করে বললাম, না আজ থাক রেহানা, আজ আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলাম তোমার কাছে। বেশতো বলনা কি প্রয়োজন? এত লজ্জা করছ কেন? বলল রেহানা। আমি ইতস্তত করছি দেখে সঙ্গের মেয়েটি বলল, — আপা, আমি থাকলে বোধহয় উনি কিছু বলবেন না। আমি বরং চলে যাচ্ছি। ও হাসতে হাসতে চলে গেল ভিতরের দিকে। রেহানা নিজেই বলল, আমার বোন সেলিনা। তুমি ওর কথায় কিছু মনে করোনা। ও ঐ রকমই। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সারদিনই হৈ হুল্লোড় আর আনন্দে মেতে আছে। তারপর বলল বলনা কি বলবে? আসলে আমি আমার ম্যানিব্যাগটা ফেলে এসেছি, তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম যে, অনেক দেরি হয়ে গেল। পিসিমা হয়তো ভাবছেন। ও আর কোন প্রশ্ন করল না। জানতেও চাইলনা কিসের ঝামেলা। শুধু বলল, তুমি ভিতরে এসো। আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ভিতরে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। আমি বরং এখানে অপেক্ষা করছি। রেহানা ভিতরে গিয়ে আবার ফিরে এলো, তারপর পাঁচটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল, আশাকরি এতে হয়ে যাবে। আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। শুনতে পেলাম সেলিনার কথা রেহানাকে বলছে, বেচারা! তারপর বলল তুইকি জানিস আপা, কড়ি দিয়ে কিনলাম এর সতী, দীপুকে কি বলেছিল? কি? তাও জানিসনা। তবে শোন, সতী বলেছিল, আমি জানি তুমি আমার কাছে কিছু চাইবে কিন্তু সে যে টাকা ...। রেহানা ধমক দিয়ে বলে ইয়ার্কি করিসনা সেলিনা ওর কানে গেলে ও কি ভাববে বলতো।

সেলিনা উত্তরে কি বলেছিল ভাল করে শোনা গেলনা, তাছাড়া ওদের কথা শুনবার সময়ও আমার নেই। এরপর বাড়ীতে যখন পৌঁছালাম, তার অনেক আগেই পিসি এবং পিসেমশাই অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। পিসি বললেন, এত দেরি হল যে, কোথায় গিয়েছিলে? আমি আর কি বলব। খিদেতে পেট জ্বলছে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অপমানের জ্বালা। কোন কথাই বলতে ভাল লাগছেনা, শুনতে তো নয়ই। তবু অন্যের বাড়ী। উত্তরতো একটা দিতেই হবে। বললাম কলেজে ছুটির পরে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম, দেরি হয়ে গেছে। পিসি বললেন এতদেরি করবেনা। চিন্তা হয় না? যা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে এস।

ডাইনিং টেবিলে পিসেমশাই পরিমল বাবু আসেননি। পিসি আর আমি অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত নিজেরা টিফিন খেয়ে উঠে পড়েছি। একবার মনে হয়েছিল আজকের সব ঘটনা খুলে বলি পিসিকে। কিন্তু কেন যেন বলতে পারলামনা। হয়তো লজ্জায় বা ভয়েও হতে পারে।

নিজের টেবিলে পড়তে বসেছি। শুনতে পাচ্ছি পিসেমশাই বলছেন, শেষ পর্যন্ত তুমি কি ঠিক করলে? কিসের? বা সব ভুলে গেলে? তোমাকে তো কয়েকদিন ধরে বলছি। বেশী দেরি করলে সব ভুল হয়ে যাবে। বুঝলাম দেরি করলে ভুল হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটি কি? পিসেমশাই বললেন একটা বাচ্চাকে দত্তক নেওয়ার। কিছুক্ষণ চুপচাপ উভয়ে, তারপর ধীরে ধীরে পিসি বললেন, আমার মত নেই। দত্তক যাকেই নাওনা কেন তাতে তোমার রক্তের অধিকার থাকবেনা, আর যেখানে তোমার রক্তের অধিকার থাকছেনা, তাকে আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাহলে তুমি কি চাও? আমি যা চাইব তাই তুমি করবে? চেষ্টা করব। তাহলে তুমি আরেকবার বিয়ে কর। নীলু, তোমাকে বার বার বলেছি এ অসম্ভব। কেন তুমি বোঝনা কেন? বুঝি যে না, তা নয়। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি পরিমল। আমি যে তোমায় পিতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করছি, তারজন্য আমার মনের যে অবস্থা তা তুমি বোঝনা। তুমি কি আমায় একটুও বিশ্বাস করতে পারছনা? এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় নীলু। বাস্তবতার প্রশ্ন। তারপর বললেন আমি না হয় মেনেই নিলাম, তুমি সব কিছু মেনে নেবে। কোন প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু যে আসবে সে যদি তোমাকে মেনে না নেয়? তাতেও আমার দুঃখ থাকবেনা, যদি সে তোমাকে অন্তত ভালবাসে। কিন্তু তার ভালবাসার খেসারত দিতে গিয়ে যদি তোমাকে হারাতে হয়? তাতেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না। আমি হাসিমুখে তোমার জীবন থেকে সরে যাবো। পরিমল বাবু বললেন জীবনটাকি এত সহজ ভাবে চলে নীলু? আর তা ছাড়া তুমি তোমার নিজের কথা ভাবছো। আমার কথা এক দম ভাবছো না। আমার মন যদি তোমাকে হারানো সহ্য করতে না পারে। আগে আগে এসব কথা ভাবছ কেন? আমি যদি তাকে আমার ছোট বোনের মত ভালবাসি, সে কেন আমাকে অস্বীকার করবে? আর যদি করেও সেদিনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করব। তুমি না করোনা লক্ষ্মীটি। এ যেন এক নতুন আবিস্কার আমার কাছে। মনে হয় পিসি যেন আত্মত্যাগে এক মহীয়সী নারী।

কেটে যায় আরো বেশ কিছু দিন। একদিন পরিমলবাবু তাঁর এক অফিস সহকর্মীকে

নিয়ে বাড়ীতে আসেন। সেদিন আমার কলেজ যাওয়া হয়নি। শরীরটা ভালো ছিল না। পিসি অফিস থেকে ফেরেননি। পরিমলবাবু বললেন, তুমি আজ কলেজে যাওনি প্রান্তিক। না, শরীরটা ভালো নেই। ও ঠিক আছে। তারপর সঙ্গের ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার অফিস সহকর্মী, মিনতি সেন, আর এর নাম প্রান্তিক, নীলাঞ্জনার ভাইপো, আমাদের এখানে থেকে পড়াশুনা করে, খুব ভালো ছেলে। মিনতি সেন তাকালেন আমার দিকে। কি ভাবলেন, তা তিনিই জানেন। পরিমলবাবু বললেন, চল ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি। মিনতি সেন মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেন, এখানেই বসিনা। তারপর জানতে চাইলেন তা তোমার গিন্নি কখন আসবেন? সাতটা নাগাদ। সাতটা নাগাদ! সে তো অনেক দেরি। না, এতক্ষণ দেরি করা সম্ভব হবে না। আমি বরং আরেক দিন আসব। আমি বুঝতে পারছিনা এসময় পরিমলবাবু মিনতি সেনকে নিয়ে বাড়ীতে এলেন কেন? এসময় তো কারো বাড়ীতে থাকার কথা নয়। পরিমলবাবু বললেন, আমার যে তোমার সাথে কিছু কথা আছে মিনতি? প্রান্তিক এখানে বসে পড়াশোনা করছে। ওর পড়াশোনার ডিস্টার্ব হবে, তার থেকে চল ভিতরে গিয়ে বসা যাক। প্রান্তিক এখানে পড়াশোনা করছে এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মিনতি আর কোন রকম দ্বিধা না করে পরিমলবাবুর পিছু পিছু ভিতরের ঘরের দিকে পা বাড়ান।

আমার মনে হলো আমার কলেজে না যাওয়াটা বোধ হয় পিসেমশাই ভাবতে পারেননি। সুতরাং যে কোন অজুহাতে বেরিয়ে পড়াই উচিৎ। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? সকালে পিসি, কলেজে যাওয়ার খরচ দিয়ে গেছেন। সিনেমায় যাওয়া যেতে পারে। যদিও না বলে কোথাও যাওয়াটা পিসির পছন্দ নয়। তবু বেরিয়ে পড়ি আমি। যাওয়ার আগে পিসেমশাইকে বলে যাই, আমি একটু বেরুচ্ছি। কোথায়? আমার এক বন্ধু কিছু কলেজ নোট দেবে বলেছিলো, ওখানেই যাব। কখন ফিরবে? তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ভিতর থেকে মিনতি সেন বেরিয়ে এসে বললেন, আপনি কোনদিকে যাবেন? বললাম, কলেজ স্ট্রীটের দিকে। একটু দাঁড়ান আমিও যাব। তারপর পরিমলবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ আমি আসি পরিমল। তোমার বাড়ীতো চিনেই গেলাম, এরপর একদিন একলাই চলে আসব।

বুঝতে পারছি এই ফাঁকা ঘরে অস্বস্থি বোধ করছেন মিনতি সেন। তবু বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করে যাননা। পিসির সঙ্গে দেখা করে যান। উনি বললেন, সে আরেকদিন হবে ভাই। আপনি একটু দাঁড়ান, উনি ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আমার সাথে, পরিমলবাবুর কোন অনুরোধকে গুরুত্ব না দিয়েই।

রাস্তায় এসে বললেন, আপনি কলেজ স্ট্রীট কোথায় যাবেন? আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম। আমাকে তুমিই বলবেন। বেশ তাই হবে। ওখানে তুমি কোথায় যাবে? হিন্দু হোস্টেলে যাব। বেশ যেও, আপাতত চলো না সামনের ওই রেস্টুরেন্টটায়, বেশ খিদে পেয়েছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে উনি বললেন লজ্জা করছে? না ঠিক তা নয়? তাহলে? বেশ চলুন।

সামনের জলযোগ রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটা কেবিনে আমরা আমাদের জায়গা করে

নিলাম। উনি বললেন কি খাবে? আমার একদম খিদে পায়নি। আপনি যা খাবেন খান, আমি আপনাকে সঙ্গ দিচ্ছি।

উনি দুটো মোগলাই পরটা এবং দু কাপ কফির অর্ডার দিলেন। কাটা চামচ দিয়ে মোগলাই টুকরো করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, নীলাঞ্জনা তোমার কেমন পিসি? সত্যি কথাই বললাম, আমাদের একই গ্রামে বাড়ী সেই সম্পর্কে পিসি, — তাহলে নিজের নয়? না। এখানে তোমার আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই? ঠিক জানি না, তবে প্রথম থেকেই তো এখানে আছি, অসুবিধাতো কিছু নেই।

উনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন, এত কৌতূহল বোধ হয় ঠিক হচ্ছেনা। তাই বললেন, তুমি কিছু মনে করো না ভাই, আসলে চুপচাপ বসেতো খাওয়া যায় না, তাই কিছু বলা দরকার বলেই বলা। আমি বললাম, না আমি কিছু মনে করছিনা, আপনি যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

উনি বললেন, আমার সম্পর্কে তোমার জানতে ইচ্ছে করেনা কে আমি? কেন এসেছিলাম আর কেনই বা তোমার সঙ্গে চলে এলাম।

হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তে দেখি অশ্রুকণা ও অনুতপা। একটাও কেবিন খালি নেই তাই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের ডাকতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। মিনতি সেন বললেন ওরা কারা? আমার কলেজ বন্ধু। ডাকনা ওদের। এই কেবিনেতো চারজনের সিট, আমরা তো দুজন। কেন ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে?

কিন্তু ডাকতে আর ওদের হল না। আমাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে আমাদের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি বললাম ভিতরে এসো। তারপর মিনতি সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আমার পিসি মিনতি সেন। আর ওরা অশ্রুকণা এবং অনুতপা। মিনতি সেন বললেন বা সুন্দর নাম তো তোমাদের অশ্রুকণা, আর অনুতপা। ওরাও হাসতে হাসতে বলে, আপনার বিচারটা বড্ড এক পেশে পিসি ওর নামটাও কি রোমান্টিক তাইনা? কি সুন্দর নাম প্রান্তিক রায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো এবং ভিতরে এসে বসল। মিনতি সেন বেল বাজিয়ে আরো ২টো মোগলাই এবং কফির অর্ডার দিলেন।

আস্তে আস্তে জানা গেল অনুতপা এবং মিনতি সেন দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ার দিকে থাকেন। তারা এক সময় উঠে পড়লো। আমি কাছেই থাকি, অশ্রুকণাকে ওখানে থেকে বাসে বরানগরের দিকে যেতে হবে। তখনো সন্ধ্যে হতে ঢের বাকি। অশ্রুকণা জিজ্ঞাস করলো, আজ কলেজ যাওনি কেন? তুমি কি করে জানলে আমি কলেজ যাইনি? বা এতে জানাজানির কি আছে? তুমি যাওনি এতো আর মিথ্যে নয়। না ঠিক তা বলছিনা, তোমার খোঁজ করছিলাম, তাই জানতে পারলাম। আমার খোঁজ করছিলে? কেন? এমনি। যা এমনি এমনি কেউ কাউকে খোঁজ করে নাকি? বলে হাসতে থাকি আমি।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অশ্রুকণা বলল, তোমার পিসি কিন্তু সুন্দর! — সুন্দর না সুন্দরী?

দুটোই! — তার মানে? সুন্দর তার মন, আর সুন্দরী তিনি রূপে? বিয়ে করেননি কেন? বলছিলেন, কোথায় যেন চাকরি করেন, কোথায় চাকরি করেন? — এক মার্চেন্ট ফার্মে। তারপর বললাম আচ্ছা অশ্রু...ও আমাকে বাধা দিয়ে বলল না না অশ্রু নয়, আমায় তুমি কণা বলেই ডেকো! তারপর বলল চল বেরিয়ে পড়ি। উত্তরে বললাম বেশ চল। তারপর লাজুক হেসে বললাম, কণা তুমিও কিন্তু খুব সুন্দর। ও শুধু বলল ধ্যাৎ, বাসস্টান্ডে এসে ওকে বাসে তুলে দিলাম। বাসটা ফাঁকাই ছিল। উঠেই বসতে পেরেছিলো। বলল, কাল কলেজে আসছো তো! হ্যাঁ যাবো। বাসটা ছেড়ে দিল।

কে এই মিনতি সেন? কেন এসেছিলেন তিনি? আর এলেন যখন, তখন আবার আমার সঙ্গে চলে এলেন কেন? তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মিনতি সেন সত্যি সুন্দরী। আর তার সৌন্দর্যে আছে অন্যকে আপন করে নেওয়ার এক মাদক আকর্ষণ। পরিমলবাবু বলেছেন, তিনি তার সহকর্মী। তাই-কি? কি জানি। পরিমলবাবুকে যেন এখন আর ততটা বিশ্বস্ত মনে হয় না।

আমাকে একা পেয়ে নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, কাল তোমার পিসেমশাইয়ের এক অফিস কলিগ এসেছিলেন। আর এসেই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। উনি কে? আমি অবাক হয়ে তাকাই পিসির দিকে। বললাম, বললেন তো একই অফিসে কাজ করেন। তা তোমার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন যে বড়! তুমি নিশ্চয়ই আগে চিনতে! সন্দেহ তার কণ্ঠে। একে? এই কি সেই নীলাঞ্জনা পিসি যিনি তার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন, শুধু একটা নতুন শিশুর জন্য। আমি বললাম, আমার সঙ্গে আগে কোন পরিচয় ছিল না। তবে আমার কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাওয়ার কথা শুনে বললেন, উনিও যাবেন। আমি অবশ্য দেরি করে তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, পরে একদিন আসবেন।

পিসি আর বেশী কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন এলেনই যদি একটু দেরি করতে পারলেন না।

অনুমান করতে পারি মিনতি সেনকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এতে আমার পিসিকে খুব একটা দোষী মনে হয় না। কারণ পরিমলবাবুর যদি মনে কোন ইচ্ছে থেকেও থাকে তা স্পষ্ট করে বলতে পারতেন। তা না করে তিনি যেমন গোপনে তাকে নিয়ে এলেন এবং মিনতি সেনও আসতে রাজী হয়ে গেলেন তা ঠিক স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না।

দিনকয়েক পরে নীলাঞ্জনা পিসি একদিন মিনতি সেনকে অফিসে ফোন করেন। মিনতি সেন সেদিন অফিসে আসেননি। এবং কবে আসবেন তা জানাতে পারেননি। সন্দেহ ঘনীভূত হয়। কারণ গতকালই পরিমলবাবু ৭ দিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেছেন।

রাতে পিসি জানতে চাইলেন আমি মিনতি সেনের বাড়ী চিনি কিনা বা তার ঠিকানা জানি কি না? বললাম বাড়ী চিনিনা, তবে ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারি। কিভাবে? আমাদের এক সহপাঠি ওদের ওদিকে থাকে আর মিনতি সেনকেও চেনে। কি নাম?

অনুতপা। একদিন নিয়ে আসবে ওকে? পিসি যেন একটা ফয়সালা চান এ ঘটনার।

পরের দিন কলেজে গিয়ে জানলাম, অনুতপা কলেজে আসেনি। কিন্তু অনুতপাকে আমি খুঁজছি এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অনেক আজে বাজে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। এরই মাঝে অশ্রুকণা এগিয়ে এসে বলল তুমি ওকে খুঁজছিলে কেন?

আলোচনা এমন একটা বিশ্রী আর কদর্য্যরূপ নিয়েছে যে, আমার কারো কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। বললাম, প্রয়োজন আছে তাই। আমার কণ্ঠে উষ্মা প্রকট হয়ে ওঠে। অশ্রুকণা কিন্তু রাগল না। বলল তোমার এই গেঁয়ো গোঁয়ারতুমি আমার একদম ভালো লাগে না প্রান্তিক। আমি বিশ্বাস করি অনুতপাকে তোমার সত্যি কোন দরকার আছে। আমাকে বলা যায় না কি দরকার। সত্যিকারের সহমর্মীর মতো জানতে চায় অশ্রুকণা।

না, এর মধ্যে তো কোন কৌতূহল নেই, নেই কোন কুটিলতা। বললাম, ওকে একবার আমার পিসির প্রয়োজন তাই। এবার অবাক চোখে তাকালো অশ্রুকণা। বলল, কে? মিনতি সেন? আমি বেফাস বলে ফেললাম, তুমি ওকে চেন নাকি? বা তুমিই তো সেদিন পরিচয় করিয়ে দিলে উনি তোমার পিসিমা, অনুতপাদের ওদিকেই তো থাকে না। অনুতপা কয়েকদিন ধরেই কলেজে আসছে না। জ্বর হয়েছে। যাবে নাকি? আমি যাচ্ছি ওকে দেখতে।

কি যেন ছিল অশ্রুকণার এই আবেদনে। আমি না করতে পারলাম না।

ওদের ওখানে যখন পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অনুতপা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি আমরা ওদের ওখানে যেতে পারি। ওর জ্বর কমেছে। কাল স্নান করেছে। শরীর বেশ কাহিল, খুবই ক্লান্ত লাগছিল ওকে দেখে। ওর বাবা অফিস থেকে ফেরেননি। দাদা কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি নিয়ে বাইরে থাকেন। বাড়ীতে শুধু ওর মা আছেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় অনুতপা। বলে আমার যে কি ভাল লাগছে তোমরা এসেছো বলে। কদিন বাড়ীতে থেকে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি। মনে মনে শুধু ভেবেছি তোমরা কেউ এলে ভাল লাগতো। তোমাদের কাউকে যে সংবাদ দেব সে উপায়ও নেই। তা তোমরা জানলে কি করে? অশ্রুকণা বলে আজই সংবাদ পেলাম। প্রশান্ত বলেছে। প্রশান্ত? নামটা অশ্রুকণার মুখে শুনে অবাক হয় অনুতপা। প্রশান্তকে তো চেনার কথা নয় অশ্রুকণার। তবু সেটা আচরণে প্রকাশ না করে বললো, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়? কি একটা কাজে আজ কলেজে গিয়েছিলো। হঠাৎ মনে হল তোর সংবাদ ও জানতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করাতে বললো, তোর বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনুতপা বলে, অথচ দেখ, আমার বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর এ সংবাদ রাখে অথচ একবার আসতে পারেনা। এরা সব এই রকমই। অনুতপার মা আমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসেন। বলেন, তোমরা কলেজ থেকে আসছ এই মিষ্টিটা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের জন্য খাবার করছি। আমরা না না করে উঠলাম। কিন্তু উনি তখন আর ওখানে নেই।

অশ্রুকণা বলল, আমরা যদি আগে জানতে পারতাম অবশ্যিই আসতাম। যাকগে

সে কথা। এ কদিনে কি কেউ আসেনি? অনুতপা বলে, একবোরে কেউ আসেনি বলা ঠিক হবে না, প্রান্তিকের পিসি মিনতি সেন এসেছেন একদিন অন্তর একদিন। অফিস থেকে ফেরার পথে যেদিনই এসেছেন, ফল ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। বসতেন বেশ কিছুক্ষণ। অনেক গল্প করে আবার ফিরে যেতেন। আমি অবাক হয়ে তাকাই অনুতপার দিকে। অশ্রুকণা বলে, কি এত গল্প করেন উনি? তার কলেজ জীবনের কথা। সেদিন ছেলেরা কি ভাবে ওনাদের পিছনে লাগতেন এইসব আর কি? তোদের বাড়ীর কাছে থাকেন বুঝি! এইতো মোড়টা ঘুরলে ২৫/২ নং বাড়ীতে। মিনতি পিসি যে এত ভালো, পরিচয় না হলে বুঝতেই পারতাম না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, সত্যি প্রান্তিক তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ তোমার পিসির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। উনি শেষ কবে এসেছিলেন, জিজ্ঞাসা করে অশ্রুকণা। এই তো কালকেই এসেছিলেন। তার মানে আজ আর আসবেনা। তারপব আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, চল না প্রান্তিক আমরা তোমার পিসির ওখান থেকে ঘুরে আসি। আমি বললাম আজ থাক কণা, বাড়ীতে চিন্তা করবে। মনে মনে হিসাব মিলিয়ে নিয়েছি পরিমলবাবুর সঙ্গে মিনতি সেন যাননি। অনুতপা বলল, সে কি কথা প্রান্তিক, আমাদের এখানে এসে না গেলে উনি জানতে পারলে দুঃখ পাবেন। হয়তো মনে মনে আমাকেই দায়ী করবেন যে আমিই তোমাকে যেতে দিইনি।

অগত্যা যেতে হয়। সত্যি খুব কাছেই মিনতি সেনদের বাড়ী। ছোট্ট বাড়ী। কিন্তু বেশ সাজানো গুছানো। আমরা বেল দিতেই এক বুড়ো মতো ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। জানিনা ভদ্রলোক মিনতি সেনের কে হন। কিন্তু ঠিক পিছনে পিছনে মিনতি সেন আমাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোককে বললেন, বাবা, তুমি আবার উঠে এলে কেন? আমি তো আছি, যাও তুমি ভিতরে যাও। তারপরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন — প্রান্তিক ভালো আছো তো? পাশে অশ্রুকণাকে দেখে বললেন, তুমিও ভালো আছো তো অশ্রু? ও এগিয়ে গিয়ে মিনতি সেনকে প্রণাম করতে গেলে মিনতি সেন বাধা দিয়ে বললেন, এসব কি করছ? বা গুরুজনদের প্রণাম করব না?

আমরা ভিতরে গিয়ে বসলাম। মিনতি সেনকে জিজ্ঞাসা করলাম কাল অফিসে যাননি? না কেন বলো তো। এমনি? এমনি এমনি তো কিছু হয় না প্রান্তিক? তারপর বললেন কাল কি আমাকে খুঁজতে আমার অফিসে গিয়েছিলে? না তবে নীলাঞ্জনা পিসি আপনাকে কাল অফিসে ফোন করেছিলেন। কেন? তাতো জানিনা। খুব দরকার বুঝি? তারপর অবশ্য বললেন, আমাকে তো আগে কখনো ফোন করেনি। ঠিক আছে আমি কাল অফিসে যাব। যদি খুব দরকার থাকে আমাকে ফোন করতে বলো। তারপর অশ্রুকণার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন তোমরা আমার কাছে এসেছো না অন্য কোথাও গিয়েছিলে? অশ্রুকণা বলল, আসলে কদিন ধরে অনুতপা কলেজে যাচ্ছেনা তো, তাই প্রান্তিককে বললাম, তোমার পিসি তো ঐ দিকেই থাকেন, চলনা, অনুতপাকেও দেখা হবে, আবার তোমার পিসির বাড়ী থেকেও ঘুরে আসা যাবে।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম মিনতি সেনের ভাসাভাসা দুটি চোখকে।

বললেন খুব ভালো করেছো। আমি একদিন অন্তর একদিন ওদের বাড়ীতে গেছি। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কলেজ বন্ধুরা কেমন? এতদিন কলেজ যাচ্ছনা, অথচ কেউ তো তোমাকে দেখতে এলনা। আমাদের সময়ে আমরা এত অবাধ মেলা মেশা করতে পারতাম না ঠিকই কিন্তু কেউ আমরা হঠাৎ অনুপস্থিতি হয়ে গেলে কেউ না কেউ ঠিকানা খুঁজে খুঁজে উপস্থিত হয়ে যেতাম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম প্রান্তিককে সংবাদ দেব?

অনুতপা বারণ করেছিল, তাই আর তোমাদের সংবাদ দেওয়া হয়নি। এবার তো আমার বাড়ী চেনা হয়ে গেছে মাঝে মাঝে এস কিন্তু। এটা ওটা কথা বলতে বলতে মিনতি সেন আমাদের জন্য খাবার তৈরি করলেন, কফি দিলেন, অনেক অনুরোধে মিষ্টিও খেতে হল। যতক্ষণ ওবাড়ীতে ছিলাম মিনতি সেন বেশীক্ষণ অশ্রুকণার সঙ্গেই কথা বললেন আমার সঙ্গে সামান্য ২/১ টি কথা ছাড়া প্রায় এড়িয়েই চললেন। জানিনা কেন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, তবে পরে ভেবেছি, মিনতি সেনের এই ব্যবহারের পিছনে একটা কারণ ছিল, এবং তা যথেষ্ট যুক্তি গ্রাহ্য।

পথে বেরিয়ে এসে অশ্রুকণা বলল, তোমার পিসি এত সুন্দর যে আমার কি মনে হয় জান? — কি? আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাই ওর দিকে। ও বলে, আমি যদি ছেলে হতাম, নির্ঘাৎ ওর প্রেমে পড়ে যেতাম। আমি হাসতে হাসতে বললাম, ভাগ্যিস মিনতি সেন আমার পিসি, কিন্তু তা না হয়ে যদি মিনতি সেন আমার কাকু হতেন তবে নির্ঘাৎ কপালে দুঃখ ছিল। ধ্যাৎ বলে চোখে যে কটাক্ষ হেনে তাকালো আমার দিকে, তাতেই আমার অবস্থা কাহিল। আমি আর কোন কথা বলতে পারলামনা। বাস স্ট্যান্ডে দাড়িয়ে আছি। আমাদের নর্থের বাস আর আসছে না। আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে। বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। অশ্রুকণা বলল, না বাস আর আজ আসবে না, চল বরং ট্রেনেই ফিরে যাই। অগত্যা আমরা আবার হাটতে হাটতে রেল স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। অশ্রুকণা বলল, আমার কি মনে হচ্ছে যান? — কি? যদি আমাদের এই পথ চলা আর শেষ না হতো। আমি হেসে উঠলাম। হাসলে যে! না ভাবছি তোমার এই স্বপ্নের খেয়া কোথায় গিয়ে শেষ হবে। ওকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হল, তাই জানতে চাইলাম, তোমার কি হয়েছে বলতো কণা? ও আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে গুন গুন করে গেয়ে উঠলো আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ, গানটা ভারি সুন্দর, বাধা দিতে পারলামনা। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এমন জনারণ্যের মাঝে যে এমন গাইতে পারে, না জানি সুর তার হৃদয়ের কোন উৎস থেকে উৎসারিত হয়। কিন্তু পথ যে সামান্য। আর সামান্য পথ বলেই হয়তো পথ শেষ না হওয়ার এই আকুলতা। প্লাটফরর্মে ঢুকতেই শিয়ালদহ গামী ট্রেন এসে দাঁড়ালো। টিকিট কাটার কোন অবকাশই হয় না। বিনা টিকেটেই ট্রেনে উঠে পড়ি।

বাড়ীতে যখন ফিরেছি তখন রাত ১০টা বাজে। নীলাঞ্জনা পিসি এঘর ওঘর করছেন। আমাকে দেখে আশ্বস্ত হলেন ঠিকই, কিন্তু ক্ষেপে গেলেন তার থেকে বেশী। বললেন এমন ইচ্ছেমত যদি চলতে চাও তাহলে যেখানে খুশী যেতে পারো। প্রান্তিক আমার এখানে তোমার থাকার দরকার নেই। ভেবে দেখেছো কিছু একটা হয়ে গেলে গ্রামের বাড়ীতে কি জবাব

দেব?

অত্যন্ত কঠিন আঘাত সন্দেহ নেই, তবু কিছু বলতে পারলামনা। কারণ আমার বার বার মনে হয়েছে আমাকে আঘাত দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। আমার জন্য যে তার সীমাহীন দুশ্চিন্তা তাই ফুটে উঠেছে তার দেওয়া আঘাতের মধ্য দিয়ে। আমি চুপ করে তার বকুনিকে মেনে নিলাম।

খাওয়ার টেবিলে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? আমি বললাম তোমাকে জানতেই হবে? বা আমাকে জানতে হবে না, এত রাত পর্যন্ত তুমি কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ? একটা কিছু হয়ে গেলে তো আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি সত্যি কথা বলব কিনা ভাবছি, উনি আবার বললেন কি হল, জবাব দিচ্ছনা কেন? আমি বললাম তোমাকে বলব কিনা তাই ভাবছি। এমনকি গোপন কথা যা আমাকে বলা যাবে না। আমি পিসিকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, আমি তো বড় হয়েছি পিসি। কিছু গোপনতা তো আমার থাকতেই পারে। পিসি কি বুঝলেন কে জানে। বললেন, লুকিয়ে লুকিয়ে জল খাওয়া হচ্ছে? ওসব চলবেনা আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

নারী মনের কৌতূহল, সব বয়সেই তা একই রকম। ঈশ্বর বোধ হয় এই সীমাহীন কৌতূহল দিয়েই তাদের পাঠিয়েছেন। আস্তে আস্তে আমার বিছানায় এসে বসলেন উনি। আমি নিবিষ্ট মনে বইয়ের পাতায় ডুবে গেলাম। যদিও জানি একটা লাইনও আমার মাথায় ঢুকছেনা। আড়চোখে একবার তাকালাম পিসির দিকে। পিসি সুন্দরী। প্রায় ১০ বছরের বিবাহিতা জীবনে শরীরের কোথাও এতটুকু টোল খায়নি। পাশাপাশি মিনতি সেন। কে বেশী সুন্দরী। অশ্রুকণার কথায়, যদি সে ছেলে হতো তাহলে সে মিনতি সেনের প্রেমে পড়ে যেতো। আসলে এই কথা বলে সে কি বোঝাতে চাইছে, সেকি চাইছে আমি যেন মিনতি সেনের সঙ্গে আর না মিশি? কেন যে ছাই মিনতি সেন আমার পিসি এই পরিচয় দিতে গেলাম ওদের কাছে। আমি তো বলতেই পারতাম আমার পিসির বন্ধু বা অন্য কিছু। কিন্তু এখন যা হয়েছে তাতো আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

পিসি বললেন, বই পড়ছ না পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছো? বললাম পড়ছি তো। ছাই পড়ছো। তার চেযে শুয়ে পড়। বললাম ঘুম আসছেনা। কথা লুফে নিয়ে পিসি বললেন সারাদিন এই রকম টোটো করে ঘুরলে কি আর ঘুম আসবে? না আসলে কি করব? শুয়ে শুয়ে ভেড়া গোন দেখবে এক সময় ঠিক ঘুম এসে যাবে। আমি বললাম, তুমি ঘুমাচ্ছনা কেন? আমারও ঘুম আসছেনা। — কেন তোমার ঘুম আসছেনা কেন? তুমিতো আর সারাদিন আমার মতো টোটো করে ঘোরনি। পিসি বললেন আমার যে কেন ঘুম আসছেনা সে তুমি বুঝবে না প্রান্তিক। আমার মত অবস্থায় পড়লে হয়তো বুঝতে পারতে। বড় অসহায় মনে হয় পিসির কণ্ঠস্বর। উত্তরে বললাম না তা হয়তো ঠিক বুঝব না, পিসি, তবে খানিকটা অনুমান করতে পারি। — কি অনুমান করতে পারো? বললাম, তোমার অসহায়তা, তোমার নিঃসঙ্গতা, তোমার আশা ও কামনার দোদুল্যমানতা। কিন্তু পিসি মিথ্যে দুশ্চিন্তা করে কিছু লাভ হয়কি? তুমি যা ভাবছ তা হয়তো সত্যি নয়, অথচ মিথ্যে ভেবেই তুমি হয়তো তোমারই

ক্ষতি করছ। সব কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ কর, দেখবে কোথাও কোন অসুবিধা নেই। মনেও শান্তি পাবে।

অবাক হয়ে তাকান নীলাঞ্জনা পিসি আমার দিকে। আমি যে এমন কথা বলতে পারি তা উনি ভাবতেই পারেননি। উনি কাত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন এবার উঠে বসলেন। বললেন, তুমি কাউকে ভালোবাস প্রান্তিক। বললাম হ্যাঁ? কাকে? আমার পরিচিত যারা, সকলকে। আমি তা জানতে চাইনি প্রান্তিক, আমি শুধু জানতে চাইছি এই সকলের মধ্যে আলাদা করে কাউকে ভীষণ আপন করে ভালবাস কি না। হঠাৎ পিসির এ ধরনের প্রশ্নে অবাক হয়ে যাই।

কি বলব। আমার জীবনে তখনো আসেনি ভালোবাসার কোন আলাদা আকাঙ্খা। স্পষ্ট করে ছুঁয়ে যায়নি হৃদয়কে কেউ। বুঝতে পারি অশ্রুকণা বা রেহানা একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখে আমাকে। আলাদা করে কথা বলতে আনন্দ পায়। কিন্তু তাকে ভালোবাসা বলে কিনা জানিনা। অন্তত আমি নিজে ওদের কাউকে আলাদা করে ভাবিনি এখনো। তাই পিসিকে ভড়কে দিতে বললাম, আমার এই ছোট্ট জীবনে একজনকে আমি ভীষণ ভাবে ভালোবাসি পিসি, যদি তাকে ভালোবাসা বলে। কাকে জানতে চান নীলাঞ্জনা। আমি বলে চললাম যেন আমাকে বলার নেশায় পেয়েছে এমনি ভাবে। তার কথা আমি প্রতি মুহূর্তে ভাবি, তার হাসি আমাকে হাসায়, তার কান্না আমাকে কাঁদায়। তার দুশ্চিন্তা আমার কাছে বোঝার মত মনে হয়। তার নিঃসঙ্গতাকে পারলে কানায় কানায় ভরে দিতে ইচ্ছে হয়। তার চপলতায় আমি চঞ্চল হই। তাকে বুঝতে চাই, কিন্তু বুঝতে পারিনা। তাকে ধরতে চাই, যদিও ধরা ছোয়ার বাইরে তার অবস্থান। কখনো তাকে মনে হয় বন্ধু, কখনো বা শুভাকাঙ্খী, কখনো বা আপন মনে কথা বলি তার সাথে, সান্ত্বনা দিতে চাই তার সব হারানো ব্যথার জায়গায়, তবু তাকে দূরের বলে মনে হয়। কখনো মনে হয়না, নিজেকে তার যোগ্য বলে। নীলাঞ্জনা পিসি অবাক আর বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকান আমার দিকে। মনে হয় তার মনে কিসের যেন এক ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমার এমন গুছিয়ে কথা বলাতে অবাক হন ভীষণ। জানতে চাইলেন কে সেই ভাগ্যবতী যে তোমার এতটা সময় চুরি করে নিয়েছে তোমার জীবন থেকে। কণ্ঠে কি হতাশা না কৌতূহল? আমার ভীষণ মজা লাগছে পিসির এই অসম কৌতুহলের জন্যে। তাকিয়ে দেখি তার বুকের ওঠা নামা। চোখের পরে চোখ রেখে বললাম, সত্যি তোমাকে জানতে হবে পিসি? অভিমানী কণ্ঠে বললেন, যদি বিশ্বাস করতে না পার নাইবা বললে। আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন, তার মানে আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না। তা তুমি আমায় বিশ্বাস না করলেও আমি জানি কে তোমার শুধু মনটাই নয় জীবনটাই ধরে নাড়া দিয়েছে। আমার কৌতুহল আরো বেড়ে যায়। বলি বলতো কে? পিসি হাসতে হাসতে বলল রেহানা। এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। রেহানা বা অশ্রুকণার নাম পিসি শুনে থাকতে পারেন, তাই বলে তাদের মধ্যে রেহানা আমার জীবনে জড়িয়ে আছে, এমন কোন ঘটনা ঘটেছে বলেতো মনে করতে পারছিনা। আমি বললাম এ তোমার অলীক কল্পনা পিসি। তাছাড়া রেহানা নামের মেয়েটিকে তুমি দেখওনি। তার কোন

কথা তোমার সাথে কোন দিন বলেছি বলেও তো মনে হয়না। আমার মুখের কথা লুফে নিয়ে পিসি বললেন, সেই জন্যইতো আমার মনে হয় — রেহানা আছে তোমার জীবনব্যাপী। আর এমন নিবিড় তোমাদের সম্পর্ক যে, গোপনতার সেই মধুরতা তুমি কাউকে প্রকাশ করতে চাওনা। না হলে তুমি তোমার কলেজের কত ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধুর কথা বল, কিন্তু কোনদিনই রেহানার নাম ভুলেও উচ্চারণ করো না, কিন্তু কেন? সেকি তোমার একান্ত একার বলে? হাসতে থাকেন নীলাঞ্জনা পিসি ভাসা ভাসা চোখ দুটি কৌতূকে উজ্জ্বল।

আমি হাতড়িয়ে দেখি কথাটা হয়তো সত্যি। আসলে রেহানার সাথে আমার সম্পর্ক কেমন জানিনে। কথাও বেশী হয় না নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া। বললাম, বেশ তোমার কথাই সত্যি, আমি তার কথা তোমাকে বলিনা, অবশ্যি বলার কিছু নেই বলেই বলিনা, কিন্তু তুমি তার নাম জানলে কি করে। হাসছেন পিসি। এই সঘন রাতের আলো আধারিতে পিসি যেন মায়া লোকের অপ্সরির মত। হাসলে এত সুন্দর দেখায় পিসিকে। নিকষকালো ঘণ এলায়িত চুল, দুই ভ্রূর মাঝে সবুজ টিপ, দেহের কোন অংশেই নেই বাহুল্য মেদ, সঙ্গে সুউন্নত পীন পয়োধর, এক নেশা জাগানো আকর্ষণ যেন, অথচ কেবল ভালোলাগা ছাড়া সে আকর্ষণের অন্য কোন ভূমিকা নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় মিনতি সেনের কথা, মিনতি সেন সম্পর্কে নীলাঞ্জনা পিসি যা ভাবেন তা সত্যি কিনা জানিনা। অন্তত আজ পর্যন্ত মিনতি সেনের কোন আচরণে এমন কিছু ধরা পড়েনি, যাতে অন্য কিছু ভাবা যায়, শুধু এক অপরাহ্নে পরিমল বাবুর সাথে তার অকারণ আগমন ছাড়া। যদিও প্রশ্নটা থেকেই যায়, শূন্য বাড়ী জেনেও তিনি কেন এসেছিলেন পরিমলবাবুর সাথে?

অকারণ কৌতূক যেন উপছে পড়ছে নীলাঞ্জনা পিসির চোখ দিয়ে। বললেন, কি দেখছ ওমন করে আমার দিকে তাকিয়ে। ভেবে দেখলাম চোখ যদি হঠাৎ নামিয়ে নিই, ভুল মানে হতে পারে। বললাম তেমনি চোখের পর চোখ রেখে, পিসি তুমি এত সুন্দর না, আগে কোন দিন ভাল করে দেখিনি তোমায়।

নীলাঞ্জনা পিসি নারী। নারীর স্বাভাবিক ধর্ম তার লজ্জা, তাকে তিনি অস্বীকার করবেন কি করে? তাছাড়া কোন নারীকে যদি কোন পুরুষ, সে যে বয়সেরই হোকনা কেন, সুন্দর বলে, তাহলে একটা গোপন অনুভূতি তার হবেই। কিন্তু আমার এ স্তুতিতে মনে হয় তার চিন্তা অন্য খাতে বইতে আরম্ভ করে। বললেন প্রান্তিক, আমার সুন্দরের বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি অনেক আগে। হয়তো তুমি আমার মাঝে অন্য কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছো, তাই এত ভালো লেগে গেছে। কি ঠিক কিনা? আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, না পিসি না। কি না? তুমি যা ভাবছো তা মোটেই নয়। তবে কি সত্যিই তুমি রেহানাকে ভালোবাসনা? না পিসি না। তাহলে তুমি কাকে ভালবাস? আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, তোমাকে পিসি — তোমাকে, শুধু তোমাকে আর কাউকে নয়।

উনি তাকালেন আমার দিকে। আমি মাথা নীচু করলাম, পিসি বোধ হয় এমন একটা উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উঠে পড়লেন। আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। তার এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। আমার উত্তরে তিনি আঘাত পেয়েছেন কিনা জানিনা। কিন্তু পিসির ঐ ভাবে চলে যাওয়া আমার একদম ভালো লাগেনি। চেয়ারে সেই ভাবে বসে আছিতো বসেই আছি। চোখে ঘুম নেই। আবোল তাবোল অনেক কথা ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হয় এক সময়।

সকালে উঠে পিসি দেখেন যে আমি সেই ভাবে বসে আছি একই জায়গায়। ঘুম জড়ানো চোখে আমার পিছনে এসে দাঁড়ান তিনি। তার পর আমার মাথার চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে বললেন, তুমি কাল রাত থেকে সেই একই ভাবে বসে আছো? ঘুমাও নি কেন? না কোন রাগ নয়, কোন বিদ্বেষও নয়। কোন এক সহমর্মীর আপন করার অনুভূতি যেন। আর তাতেই আমার ভিতরেব ক্ষোভ যেন গলে যেতে লাগলো। কিন্তু আমি নড়ার কোন লক্ষণ দেখালামনা। এবার তিনি আমার মাথাটা ঘুরিয়ে আমার মুখটা তার কবোষ্ণ বুকের পরে রেখে বললেন, আমার উপর রাগ করেছো প্রান্তিক! ছি, এতবড় ছেলের চোখে জল।

আর সত্যি সত্যি আমার দুচোখের জলে তার বুকের আঁচল ভিজে যেতে থাকে। কি-ন্তু তিনি আমার চোখের জল মোছাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। তারপর এক সময় বললেন, তুমিতো আমায় ভালোবাস প্রান্তিক, তাই না! — কিন্তু তুমিতো আমায় ভালবাসনা। কে বলেছে? — তাহলে ওভাবে তুমি পালিয়ে গেলে কেন?

পিসি আস্তে আস্তে বললেন, আমার কথা শুনতে তোমার ভালোলাগবে? — তোমার সব কথা আমার ভালোলাগে, মনে হয় সর্বক্ষণ কেবল তুমি আমার সাথেই কথা বল। সঙ্গে সঙ্গে পিসি আমার কথা শেষ না হতেই বললেন, তাই ভয় হয় প্রান্তিক, আর আজ কেন পালিয়ে গেছি এখনি হয়তো তা বুঝতে পারবেনা, কিন্তু জীবনেব অভিজ্ঞতা যখন আর একটু বাড়বে তখন বুঝতে পারবে, আমার পালিয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না। এত বিষন্ন আর অবসন্ন লাগছে পিসিকে যে তার জন্য ভীষণ দুঃখ হয় আমার।

উত্তরে বললাম, সে আমি জানি পিসি। জান? — হ্যাঁ জানি। এরপরেও জানতে চাও তোমাকে ভালবাসি কিনা। হ্যাঁ আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। পিসি তার বুক থেকে আমার মাথাটি তুলে দিয়ে বললেন, ছেলে মানুষি করো না। সব প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি দেওয়া যায় না। তার চেয়ে আজ কলেজে গিয়ে রেহানাকে বলবে, আমি তাকে একবার দেখতে চাই। — কেন? বাঃ তোমার বন্ধুরা কেমন আমি দেখব না, দেখতে ইচ্ছে হতে পারে না? — রেহানাতো আমার একমাত্র বন্ধু নয়। জানি। — তাহলে? তাহলেও ওর যদি আমাদের এখানে আসতে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে একবার আসতে বলবে। একথা বলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন দেখে আমি আবারও ডাকলাম, পিসি। কি? আমি কিন্তু আমার উত্তর পাইনি। পিসি এগিয়ে এলেন। আমার পাশে। তারপর আস্তে আস্তে আমার মুখটা তুলে নিলেন ধীরে ধীরে তার মুখের কাছে। তারপর কাঁপা কাঁপা ওষ্ঠাধরে একটা চুম্বন একে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন। কিন্তু কই আমার মধ্যে তো কোন শিহরণ

জাগল না। বুঝতে পারিনি আমি, পিসির কাছে আমি এটাই চেয়েছিলাম কিনা। আমার চাওয়ার বিনিময়ে তিনি যা দিলেন তা আমার ভালবাসার প্রতিদান না তার স্নেহ উপহার তাও বুঝতে পারলাম না। বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি, পালিয়ে গেছেন। অপেক্ষা করলে, আমি কি করতাম তা আমি নিজেই জানিনা। আমার শিরায় শিরায় যে কম্পন শিহরণ জাগার কথা — কোথায় সেই শিহরণ! আমার বিশ বছরের যৌবনে নারীর প্রথম যৌবন স্পর্শ। হোকনা সে যৌবন আমার ধরা ছোয়ার বাইরে। হোকনা পিসি আমার গুরুজন। তবু নারীতো। যে নারীর যৌবন আজো তার দেহের কানায় কানায় জোয়ারের জলে উচ্ছলিত। এক অলস মধ্যাহ্নে তাই আমার মনে হয়, এমনি করেই হারিয়ে যাই আমরা — আমাদের যৌবন বিক্রি হয়ে যায় ফেরি ঘাটে। তাই কি? পিসির ভালবাসাকে কি আমি ফেরিঘাটের সঙ্গে তুলনা করতে পারি? না পারিনা। অপ্রাপ্তি যে প্রাপ্তির থেকেও অনেক মূল্যবান।

পরিমলবাবু তার কাছে পিতৃত্বের দাবী করেন, কিন্তু তা দেওয়ার ক্ষমতা নেই পিসির। তাই বলে কোন দত্তক নিয়ে তিনি যেমন তার মাতৃত্বের স্বাদ মেটাতে চাননা তেমনি ঐ একই উপায়ে তিনি পরিমলবাবুকে পিতৃত্ব দেওয়ারও ঘোর বিরোধী। তিনি চান, পরিমল বাবু আবার বিয়ে করুক। আর সেই নবাগতার সন্তান মেটাক তার পিতৃত্বের আকাঙ্খা।

জানি আমি, কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। নীলাঞ্জনা পিসিকে যতটুকু বুঝেছি বা জেনেছি তাতে মনে হয় তিনি এখন কি চান তা বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন না। আর একথা শুধু পিসি কেন, আমরা কেউ কি জানি, আমরা কি চাই? অথচ নীলাঞ্জনা পিসি একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন পরিমলবাবুকে। সবে কলেজে ঢুকেছেন নীলাঞ্জনা পিসি। আর সেই সময় উচু ক্লাসের পরিমলবাবুর নজরে পড়ে যান তিনি। শুনেছি নীলাঞ্জনা পিসির রূপে মুগ্ধ হয়ে আরো অনেক ছেলে তার প্রেমে পড়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পিসি কারো দিকে ফিরেও তাকাননি। বলা চলে পরিমলবাবুই তার জীবনের প্রথম পুরুষ এবং একমাত্র পুরুষ হিসাবে প্রথম দিন থেকে মেনে নিয়ে তার ঘরে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ পরিমলবাবু তা জানতেন। তাই নীলাঞ্জনাকে লাভ করা যেমন তার জয়ের একটা অঙ্গ, তেমনি কৃতজ্ঞতাবশত অন্য কোন নারীর কথা এতদিন তিনি মনেও আনেন নি। অবশ্য এসব আমার শোনা কথা, কিছু অনুমান মাত্র।

মিনতি সেনই বোধ হয় তার প্রথম ছন্দপতন। অবশ্য তাও ঠিক আমি ভালো করে জানিনা। পিসিকে নিয়ে তার একাকী আর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিনি কখনো। সেদিন যা কিছু বলেছিলাম, কথার পর কথা সাজিয়ে তার একটা কাব্যিক রূপ দিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু পিসি যে এমন একটা কিছু করবেন তা কখনো ভাবিনি। হয়তো এটা ভাবার কোন বিষয় নয় বলেই।

আমার উথাল পাতাল চিন্তাকে প্রতিহত করে কে যেন বলল, তুমি এখানে বসে আছো প্রান্তিক আর আমি তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাকিয়ে দেখি রেহানা। বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাই ওর দিকে। বেশ কয়েকদিন পরে দেখা রেহানার সাথে। ও কয়েকদিন কলেজে আসেনি। যদিও ওদের বাড়ীতে যাওয়া যেতো কিন্তু ইচ্ছে করেনি। সহজ

ভাবে বললাম, খুব দরকার আমাকে? কেন খুঁজছিলে? আমার উত্তরটা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু কোথায় যেন রেহানার অভিমানে আঘাত লাগে। বলে, দরকার না হলে বুঝি তোমাকে খোঁজা যায় না। তারপর বলল, না প্রান্তিক তোমার সাথে আমার কোন দরকার নেই। একথা বলেই ও সামনের দিকে পা বাড়ায়।

আর, ও চলে যাচ্ছে দেখে, আমি ওকে পিছু ডেকে বললাম একি রেহানা, তুমি চলে যাচ্ছ যে! বিশ্বাস কর আমি কোন কিছু মানে করে একথা বলিনি। তবু চলে যাচ্ছে দেখে বললাম, আরে শোন শোন! কিন্তু কে কার কথা শোনে, ও দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। একবার মনে হল দৌড়ে গিয়ে ধরি ওকে। তারপর কি ভেবে যেন থেমে গেলাম। রেহানা যেমন এসেছিল, তেমনি ভাবেই চলে গেল। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে।

যে জটিলতার জালে আমি ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে পড়ছি নিজেরই ভুলে, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। অথচ আমার একথা যে কাউকে বলার নয়। আর এদিকে সাতদিন কেন ১০ দিন হয়ে গেছে পরিমলবাবু ফেরেননি। আজ তার চিঠি এসেছে, তার আরো মাস খানেক দেরি হবে। কোম্পানীর একটা বিরাট প্রজেক্ট-এ তাকে আটকে পড়তে হয়েছে, তাই নীলাঞ্জনা যেন সাবধানে থাকে। আমার পড়াশোনার যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে অবশ্য বিশেষ নজর দিতে বলেছেন। চিঠিটা পোষ্টকার্ডের। ডাক বাক্সে দেখে পিসিকে না জানিয়ে পড়ে ফেলেছি। অথচ অন্যের চিঠি যে পড়া উচিৎ নয় বুঝেও কৌতূহল দমন করতে না পেরে পড়ে ফেলি চিঠিটা। পিসিকে না জানিয়ে। কিন্তু আমার যা অবাক আর বিস্ময়ের ব্যাপার তা হচ্ছে পরিমলবাবুর এ কেমন চিঠি? প্রথম কথা স্বামী লিখছেন স্ত্রীকে চিঠি, তাও পোষ্টকার্ডে, দ্বিতীয়ত স্বামী স্ত্রীর চিঠির মধ্যে থাকবেনা এমন কিছু যা মনকে ছুঁয়ে যায়। এ আবার হয় নাকি, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত চিঠিতো আর ব্যবসায়িক চিঠি নয় যে তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা শব্দও ব্যয় করা যাবে না। চতুর্থত একবারও জানতে চাইবেন না স্বামী যে তার স্ত্রী কেমন আছেন? বা তিনি নিজেইবা কেমন আছেন? এ চিঠিতেও পরিমলবাবু একবারের জন্যও পিসি কেমন আছে জানতে চাননি। শুধুমাত্র একটা সংবাদ যে তার ফিরতে আরো মাস খানেক দেরি হবে। তা হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে স্বামীর চিঠিতে ধরা পড়বেনা স্ত্রীর জন্য কোন উদ্বিগ্নতা। চিঠিটা পড়ার পর ডাক বাক্সে আবারও তেমনি ভাবে রেখে এসেছি আমি। রাতে বাড়ী ফেরার পরে হয়তো সে চিঠি দেখবেন পিসি। পড়ে তিনি কি ভাববেন? কি ভাবে নেবেন জানিনা। হঠাৎই মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় পিসির সঙ্গে পরিমল বাবুর দুরত্বটা অনেকটাই বেড়ে গেছে।

কয়েকদিন ধরে আমার কিছুই ভালো লাগছেনা। পিসির কাছে কেন যেন স্বাভাবিক হতে পারছিনা। খারাপ জেনেও অকারণ এড়িয়ে চলছিলাম। কেন এড়িয়ে চলছি তারও কোন উত্তর জানা নেই।

পরের দিন আবারও পিসি জিজ্ঞেসা করেছিলেন, রেহানাকে বলেছিলে আমার কথা? দায় সারা উত্তর দিয়েছিলাম, কলেজে আসেনি। পিসি আর কথা বাড়াননি।

এদিকে রেহানা ঐ ভাবে চলে যাওয়ার পরে অনেক ভেবেছি, কেন তার এই অভিমান। পরের ক্লাসটা অফ। তিনটে থেকে ক্লাস আছে ডি এন বি এর। একবার মনে হল যাবো না ক্লাসে, তারপর অবশ্য ভেবে দেখলাম ক্লাসটা ফাঁকি দেওয়া ঠিক হবে না। রেহানার সাথে দেখা হওয়াটাও ভীষণ দরকার। এভাবে সবাই আমাকে ভুল বুঝবে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে, লাল কৃষ্ণচূড়ার নীচে একাকী পেয়ে গেলাম রেহানাকে। জানি ও আমাকে এড়িয়ে যাবে। তাই দ্রুত তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, ও ভাবে চলে এলে কেন? এমন ভাবে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যে ওর চলে যাওয়ার বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। বলল, পথ ছাড় প্রান্তিক, আমার কাজ আছে। কাজ আমারও আছে, কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে কেন আমাকে ওভাবে অপমান করলে? অপমান আমি করলাম না তুমি করলে? তারপর বলল যাকগে, আমি কথা বাড়াতে চাইনে, তুমি পথ ছাড়, অনেকে এদিকে তাকিয়ে আছে। থাকুক। আমাকে উত্তরটা জানতেই হবে। কোন উত্তরই আমার কাছে পাবেনা, তুমি পথ ছাড়, না হলে সত্যিই কিন্তু তুমি অপমানিত হবে। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবেনা। তার কণ্ঠের দৃঢ়তায় আমি অবাক হয়ে যাই।

এ কোন রেহানা? এতো আমার পরিচিত রেহানা নয়? আমি পথ ছেড়ে দিলাম। না দিনটা আমার একদম খারাপ যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কালুদার চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম, এটা কলেজ থেকে একটু দূরে। বললাম কালুদা পকেটে পয়সা নেই, কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে। কালুদা বললেন, কি খাবে বল। — যা হয় দাও, তার সঙ্গে এক কাপ চা, কাল দাম দিয়ে দেব।

চায়ের দোকানে আর কোন খরিদ্দার নেই। কাগজটা পড়েই আছে। কাগজটার প্রতিটি লাইন পড়ে শেষ করলাম। তারপর উঠে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম শিয়ালদা, সেখান থেকে ঢাকুরিয়া ট্রেনে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। কেন এখানে এলাম জানিনা। অনুতপাদের বাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু ওর সঙ্গেতো আজ কলেজে দেখা হয়েছে। তাহলে কি অজুহাতে ওদের বাড়ী যাব। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার ফিরে এলাম শিয়ালদায় তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী।

পিসি আজ অফিস থেকে আগেই ফিরেছেন। ডাক বাক্সে চিঠিটা নেই। তার মানে পিসি চিঠিটা নিয়ে নিয়েছেন। উনি বসে আছেন বারান্দায়। আমি যে এসেছি সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পিসির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বললেন কি চাই? তোমার শরীর খারাপ এভাবে বসে আছ? আর কিছু বলার আছে? না। তাহলে যাও এখন। দেখ ডাইনিং টেবিলে খাবার ঢাকা আছে। আজকাল কোথায় যাও কলেজ তো শেষ হয়েছে সেই ৪টেয়। আর এখন ৭টা, এত সময় কোথায় ছিলে? এভাবে যদি নিজের ইচ্ছেমত চলো, তা হলে মাষ্টার মশাইকে বলতে হবে, তোমাকে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে পড়ে যায় আগেও একদিন ঠিক এরকম কথাই বলেছিলেন পিসি। ফিরতে দেরি হওয়ার জন্য বুঝতে পারছি অন্য কোন রাগ আমার পরে ঝাড়ছেন।

উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না বলে আস্তে আস্তে চলে এলাম।

রাতে খাবার টেবিলে বললাম পিসি, মাষ্টারমশাইকে কিছুই বলতে হবে না, আমি নিজেই চলে যাবো। আমাকে নিয়ে তোমার অসুবিধা হচ্ছে একথা তুমি আমাকে বলতেই পারতে। কেন যে না বলে এই কষ্ট পাচ্ছ? কোথায় যাবে? মিনতি সেনের বাড়ীতে? আমি চমকে উঠে বললাম এতুমি কি বলছ পিসি? অবাক হচ্ছ যে বড়। তারপর বললেন তুমি যাওনি মিনতি সেনের বাড়ীতে? বুঝতে পারছি যে ভাবেই হোক মিনতি সেনের বাড়ী যাওয়ার সংবাদ পিসি পেয়েছেন। আস্তে আস্তে বললাম হ্যাঁ গিয়েছিলাম। অথচ আমাকে বলনি কেন? আমি তোমাকে না করতাম? কোন বিশ্বাস নেই আমার উপর?

আমি আরো ধীরে এবং মৃদুস্বরে বললাম, বলতে চেয়েছিলাম পিসি, কিন্তু তুমি যে আমার সব কেমন এলোমেলো করে দিলে। তুমি আমাকে এমন সব উল্টো পাল্টা কথা বলতে আরম্ভ করলে যে মিনতি সেনের কথা আর বলাই হল না। যাতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তেমন ভাবেই বললাম কথাগুলো।

পিসি চুপ করে শুনলেন সব। তারপর বললেন, থাক আর বলতে হবে না, তোমাদের পুরুষ জাতটাকে চিনতে আর বাকী নেই আমার। একথার আমি আর কি উত্তর দেব? বুঝতে পারছি মনের মধ্যে ঝড় বইছে নীলাঞ্জনা পিসির। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। তারপর আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কপালে কার কোমল স্পর্শে চোখ মেলে দেখি পিসি। বললাম, একি পিসি তোমার চোখে জল? তুমি ঘুমাওনি?

সামনের চেয়াটায় বসে পড়ে বললেন, আমার কথায় খুব আঘাত পেয়েছ না? কিন্তু বিশ্বাস কর প্রান্তিক আমি তোমায় আঘাত দেওয়ার জন্য কিছুই বলিনি। আসলে নিজেই বিভিন্ন ব্যাপারে এমন ক্ষতবিক্ষত যে তোমাকে কি বলতে কি বলেছি, তার জন্য তুমি কিছু মনে করোনা। আমি উঠে বসলাম। তারপর বললাম, আমি জানি পিসি, আমি কিছুই মনে করিনি। তুমি জান? কি জান তুমি? থাক না। না তোমাকে বলতেই হবে। আমি বললাম, তুমি সব ব্যাপারে এত জোর কর কেন বলত। তারপর বললাম দেখ পিসি আমি যা জানি, মানে যা আমি মনে করি, তা কি সব সময় বলা যায়? যায় না বুঝি? ম্লান হেসে নীলাঞ্জনা পিসি বললেন তা হলে সেদিন কেন বললে আমায় তুমি ভালোবাস? আর আমি তোমায় ভালোবাসি কি না তা আমার মুখ দিয়ে শোনার জন্য জেদাজেদিই বা করলে কেন বল? তবুও তো তুমি বলোনি আমায় তুমি ভালোবাস কিনা। আর কি ভাবে বলব প্রান্তিক ওতেও যদি তুমি তোমার উত্তর না পেয়ে থাক, তবে থাক না তা চির অন্ধকারে, কিছুই তোমাকে জানতে হবে না। উঠে পড়লেন, পিসি। আমি অবাক হয়ে ভাবি কি বলতে চান পিসি? তিনি কি আমার মধ্যে অন্য কিছু আশা করেন? না আমার কোন আচরণ তাকে এমন ভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে? নিজের আচরণের জন্য নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়।

রোজকার মত আজও পিসি বেরিয়ে যান অফিসে। আমিও কলেজে যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি। কিছুই ভালো লাগছেনা। মিনতি সেনের কথা ঠিক ঠিক মত বলতে হবে পিসিকে।

কিন্তু মিনতি সেনের আমি কতটুকু জানি? যা সামান্য জানি তাতে তাকে অন্যরকম ভাববার কোন কারণ নেই। মিনতি সেন বলেছিলেন, আমি যেন পরের দিন পিসিকে বলি। তাকে ফোন করতে। কিন্তু সুযোগের অভাবে বলা হয়নি। সত্যি সত্যিই এতবার এত কথা হয়েছে তারমধ্যে কি এই সামান্য কথাটা বলা যেতনা? আসলে পিসি যদি অন্য কিছু ভাবেন, তাই বলিনি তাকে। বুঝতে পারি এটা অন্যায়। সত্যকে গোপন করার একটা যন্ত্রণা আমকে কুরে কুরে খায়।

গত দিনে রেহানার সঙ্গে ব্যবহারটা কেমন বেসুরো হয়ে গেছে। অথচ কিছুতেই বুঝতে পারছিনা রেহানার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার কি করেছি। ওর সঙ্গে আমার মুখোমুখি হতে হবে। এই আশঙ্কায় কলেজে যেতে ইচ্ছে করছেনা। কিন্তু যাব কোথায়? এই কলকাতায় আমার পরিচিতির সংখ্যা এত কম যে, কোথাও গিয়ে সময় কাটাবার মত জায়গা নেই। এক মিনতি সেনের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে তার অফিসে গিয়ে। যদিও কোন দিন সেখানে যাইনি।

বেরিয়ে পড়লাম, কলেজে যাবনা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি। তাই আর বাস নয়, কলকাতার এগলি ওগলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন এন্টালী মার্কেটের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাকে প্রান্তিক ভাই। কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়ে কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আবারও যখন এক পা দুপা করে এগিয়ে চলেছি শুনতে পাই সেই কণ্ঠস্বর, প্রান্তিক ভাই।

আমি পিছনে সামনে ডাইনে বায়ে সব দিকে তাকিয়েও পরিচিত কোন মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। আর তাছাড়া প্রান্তিক ভাই এই ভাবে আমাকে কেউ ডাকে কিনা তাও তো জানিনা। তাইতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদি সত্যি সত্যি আমাকে কেউ ডেকে থাকে তাহলে সে নিজেই কাছে আসবে।

বাব্বাঃ, কোন দিকে হুস নেই? কাকে খুঁজছেন প্রান্তিক ভাই? হাফাতে হাফাতে আর উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো সেলিনা। রেহানার বোন, আমি অবাক হয়ে বললাম তুমি এখানে? কোত্থেকে? অবাক হচ্ছেন তো। জানি আমাকে আপনি খুঁজছেন না, কিন্তু খুঁজছেন কাকে? আবার সেই অমলিন হাসি, সীমাহীন কৌতুক দুটি চোখে। আমি ঠাট্টা করতে ছাড়লাম না। বললাম, তুমি যখন সিওর জান তোমায় আমি খুঁজছিনা, তাহলে একথাও তোমার জানার কথা, কাকে আমি খুঁজছি। ঠোট উলটে সেলিনা বলল, ইস বয়ে গেছে আমার সে কথা জানতে। তারপর বলল আসলে প্রান্তিক ভাই ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াবেন না?

আমি অবাক হয়ে তাকাই ওর দিকে। নিজের খিদে পেলে দোকানে বলেছি, না হলে এই কলকাতায় শুধু পিসিকে। পরিচিত কাউকে নিজের খিদের কথা বলা যায় কিনা ভাবিনি কখনো। আর এই সেলিনা ওর সঙ্গে বুঝি আমার একদিন বা দুদিন দেখা হয়েছে। আর কথাও হয়েছে অতি সামান্য। সঙ্গে ধর্মীয় ব্যবধানতো আছে? আর এই সব কিছুকে উপেক্ষা করে এই যে আবদার তা আমাকে অবাক না করে পারেনা, মনে মনে ভাবি আহারে যদি

আমার অনেক টাকা থাকতো, তাহলে ও যা যা খেতে চাইতো দাতা কর্ণের মতো সর্বস্ব উজাড় করে দিতাম। কিন্তু আমার পকেটে যে মাত্র ৫ টাকা সম্বল। ভীষণ খিদে তে রুটি তরকারি আর বড় জোর দু কাপ চা খাওয়া যেতে পারে।

ও আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, কি ভাবছেন প্রান্তিক ভাই, মেয়েটাতো আচ্ছা, বিধর্মী হয়ে লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমায় লজ্জায় ফেলতে চাইছে, তাইতো? আমি বললাম, তোমার কথা ঠিক নয় সেলিনা। আমি ধর্ম দিয়ে কাউকে বিচার করি না। ধর্ম মানুষের নিজস্ব আচরণ মাত্র। তাহলে কি দিয়ে বিচার করেন? সে কথা বলতে তো সময় লাগবে। তার চেয়ে চলনা সামনের ঐ রেস্টুরেন্টটায়। ওখানে খেতে খেতে বলব। সেলিনা বলল না প্রান্তিক ভাই ওখানে যাব না। ওই রেস্টুরেন্টটা ভালো না। তার চেয়ে বরং হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদার দিকে চলুন। ওখানে প্রাচীর কাছে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। মানুষের ভিড়ও বেশী থাকে না আবার আলাদা কেবিনেরও ব্যবস্থা আছে। খেতে খেতে আপনার কথা শুনব চলুন। আমি ইতস্তত করছি দেখে বলল, কি হল ভয় পাচ্ছেন? না না ভয় পাব কেন? তাহলে? না কিছুনা চল। অবশ্য একথা বলা ছাড়া আমার উপায়ও ছিল না।

নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে আমরা মুখোমুখি বসেছি। সত্যি রেস্টুরেন্টটা বেশ ফাঁকা। যে ২/৪ জন আসছেন তারা তাদের নিজেদের মতো করে খেয়ে দেয়ে চলে যাচ্ছেন। ঔৎসুক্য বা কৌতূহল কোনটাই যেন তাদের থাকতে নেই। আমি বললাম কি খাবে বল? আপনার যা ইচ্ছে। আমি দেখলাম লজ্জা করে লাভ নেই। তাই বললাম দেখ সেলিনা, একটা কথা তোমাকে আগে বলে নেওয়া ভাল। আমার পকেটে কিন্তু মাত্র ৫ টাকা আছে। ওটাই আমাকে পথ খরচা দেওয়া হয়। যা কিছু খেতে হবে ওতেই। ও হাসতে হাসতে বলল, তাহলে ফিরবেন কি করে? কেন হাঁটতে হাঁটতে । তোমার যদি তাতে আপত্তি হয় তাহলে ৪ টাকার মধ্যে খেতে হবে। ও বলল, বেশ আমরা হাঁটতে হাঁটতেই ফিরব।

এরপর আর কথা চলে না। আমি ৫ টাকার মধ্যে যে রকম হয় সে রকম অর্ডার দিলাম। তার সঙ্গে ২ কাপ চা। কিছুক্ষণ চুপচাপ আছি। এরই মধ্যে সেলিনাকে একটু একটু করে বেশ ভালোই লেগে গেল। কত সাবলীল আড়ষ্টতাহীন। ভীষণ প্রাণোচ্ছল। ও বলল কি ভাবছেন প্রান্তিক ভাই? না কিছুনা। তা তোমার স্কুল কি ছুটি হয়ে গেছে? না স্কুল এখন বন্ধ। তাহলে ? স্কুলেই এসে ছিলাম, একটু কাজ ছিল। হঠাৎ দেখি আপনি আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন । তখন ডাকলে না কেন? আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে একটু সময় লেগেছিল। যখন বুঝতে পারলাম আপনিই তখন আপনি বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেছেন। দ্রুত পায়ে আপনাকে ধরবার চেষ্টা করছি, আর প্রান্তিক ভাই, প্রান্তিক ভাই, বলে চিৎকার করে চলেছি। কি করে বুঝবো আপনি কারো ধ্যানে এমন নিবিষ্ট যে, চার পাশের কাউকে ভ্রূক্ষেপই করতে চাননা। আবার সেই হাসি, উজ্জ্বল হাসির চমকে তার সারা শরীরে যেন সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ছে।

মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি এমন করে কি রেহানা হাসতে পারে? পারেকি এমন করে ভালোলাগার রক্তে দোলা দিতে। আমি বললাম, তোমার মতো অবস্থা হলে

আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু আসল কথা তা নয় সেলিনা। তবে আসল কথাটা কি ? আমি বললাম থাক ওসব কথা, তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে বলো? ও অধৈর্য্য হয়ে বলল, দূর প্রান্তিক ভাই, এই পড়াশুনা ছাড়া কি আমরা আর কোন কথা বলতে পারিনা। আমি বললাম, আচ্ছা তুমিই বল আমি শুনি। আমি বলব? শুনতে ভালো লাগবে আপনার। এমন কি বলবে যা আমার ভালো লাগবে না? তারপর অবশ্য বললাম তুমিই বল তোমার কথা শুনতে আমার ভালোই লাগবে। বললাম আমি।

ও বড় বড় চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। তারপর নীচু হয়ে খেতে খেতে বলল, জানেন, কাল মা কতকিছু রান্না করেছিলো, আমার জন্মদিন উপলক্ষে। এক সময় মা জানতে চাইলেন, কাউকে বলবি। আমি মাকে বললাম, কোনদিনতো কাউকে বলা হয় না, আজ আবার কাকে বলব। জানেন প্রান্তিক ভাই, আমাদের তো কোন·ভাই নেই, আর সেই যে একদিন আপনি গিয়ে মাকে কি মায়ায় বেঁধেছেন। তাই হয়তো বললেন, রেহানা, ছেলেটা শুনেছি পিসিব কাছে থাকে, মা তো নেই। অবশ্য আমি ওর মা নই, তবু একবার কলেজ থেকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে আসিস তো। কেন যে এই পোড়া মনটা তার কথা ভাবে কে জানে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মার দুটো চোখ ছলছল করছে। রেহানা মাকে বলল, এই তোমার দোষ মা। সবাইকে আপন করে নেওয়া। তারপর বলল তুমি আসতে বলছো, কিন্তু যদি ও না আসে। যদি আমাদের বিধর্মী ভেবে যে কোন অজুহাতে এড়িয়ে চলে। আমার কিন্তু রেহানার এই অজুহাতটা একদমই ভাল লাগেনি। বলল সেলিনা।

মা আর কোন কথা বলেন না। কিন্তু মায়ের জন্য আমার মনটা এমন করে উঠলো যে, মনে হল মা শুধু একা কাঁদছেন না আমিও কাঁদছি। আমি রেহানাকে বললাম, আপা, তোমার সাথে কি দেখা হবে না প্রান্তিক ভাইয়ের। ও চিরদিনই একটু কম কথা বলে। মেপে কথা বলে। আমার মতো উচ্ছল নয়। আমার মতো আনন্দ বা দুঃখ অবলীলায় প্রকাশ করতে পারে না। তাই অনেকে ওকে দাম্ভিক বলে, আবার উন্নাসিক বলে। আসলে ওর মনটা শিশুর মত সরল। বাবা ওকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু বছর খানেক আগে এক বাস দুঃর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়। আমরা হঠাৎ বড় অসহায় হয়ে পড়ি। ডালিম নামে একটি ছেলে, প্রেসিডেন্সিতে আপার থেকে সিনিয়র ক্লাসে পড়তেন। তিনিই সংবাদটি নিয়ে আসেন। তারপর, ধীরে ধীরে একদিন সব শোকের যেমন অবসান হয়, আমাদের ও হয়েছিল! ডালিম ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গাঢ়তর হয়েছিল, রেহানা মনে হয় আস্তে আস্তে ওকে ভালবেসেও ফেলে। কিন্তু বড় চাপাতো। তাই তার ভালোবাসার কোন প্রকাশ ছিল না। আমাদের দুই বোনের সামনে একদিন মা বলেছিলেন, রেহানা ওকে কি তোর পছন্দ? আমরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকালাম। রেহানা অন্য ঘরে পালিয়ে বাঁচতে চাইল। আমি বললাম, তুমি কি ডালিম ভাইয়ের সাথে রেহানার বিয়ে দিতে চাও? জানতে চাইলাম তাহলে ওর পড়াশুনার কি হবে? তাছাড়া রেহানা বা তোমার পছন্দেতো সব হবে না। ডালিম ভাইয়েরও একটা নিজস্ব পছন্দ আছে। আছেন তার অভিভাবকেরা। আর তারা যদি রাজি না হন, কেন অপমানিত হতে যাবে। মা বললেন আমি ডালিমের সাথে কথা

বলেছি ও রেহানার মত জানতে চেয়েছে তা ছাড়া ও আরো একটা কথা বলেছে যে রেহানা রাজী থাকলে ও অপেক্ষা করবে যতদিন না ও প্রতিষ্ঠিত হয়, ওর শিক্ষা শেষ না হয়।

আমি বললাম, এ তোমার ঠিক হচ্ছে না মা। কি দরকার এই ভাবে জড়িয়ে পড়ার। আমাদের পড়াশুনা করতে দাও। আমরা নিজেরা দাঁড়াতে পারলে তোমার আর কোন চিন্তা থাকবে না। মা বলেছিলেন না থাকবে না ঠিক। কিন্তু আমাদের সমাজে কটা মেয়েকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়? আমি মা কে বললাম, সবটাই সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ নেই মা! আমাদের দাঁড়াবার ইচ্ছেটাও জোরদার নয়। তারপর জোর দিয়ে বললাম না মা, ও চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও। মা বললেন ডালিম আসলে কি বলব? বলবে ও এখনো ছেলে মানুষ। ও সময় চাইছে। এত কথা বলার পরে আমার একটা কথা মনে হল, না, আমার মনে হয এতটা বলা ঠিক হয়নি। কারণ মা তো আমার জন্য ডালিমকে পছন্দ করেননি। তিনি পছন্দ করেছেন রেহানার জন্য। আর ওর মনে যদি অন্য কোন ভাবনা থাকে। তাই বলার পরে বেশ অনুশোচনা হয আমার।

কিন্তু প্রান্তিক ভাই! সেই ডালিম ভাই কি করলেন জানেন? বললাম কি? যে ডালিম ভাই রোজ একবার আসতেন তার দেখা নেই ৩/৪ দিন। পরে একদিন খুঁজে খুঁজে আমার স্কুলে এসে উপস্থিত। গেটে দাঁড়িযে আছেন ছুটির অপেক্ষায়। আমি বেরিয়েই দেখি ডালিম ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম ডালিম ভাই আপনি? কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি? উনি বললেন না। তাহলে আমাদের ওখানে যান না কেন? কোন কথা না বলে উনি হাটতে লাগলেন। আমিও হাঁটতে লাগলাম ওঁর পিছন পিছন। বললাম জানেন, এ কদিন আমরা সব সময় আপনার কথা ভেবেছি। ও তাই বুঝি। একেবারে নিরাসক্ত উত্তর। বললাম, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? হঠাৎ ও পিছন ফিরে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমি চমকে উঠে বললাম কিছু বলবেন? ও বলল তুমি ভাবতে আমার কথা? বাঃ আমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে। ও তেমনি ভাবে বলল আমি স্পষ্ট করে জানতে চাইছি তোমার কথা। তুমি ভাবতে কিনা? আমি সরল মনে বললাম হ্যাঁ, আমিও ভাবতাম ডালিম ভাই। কতদিন আপনি আসেননা। সত্যি, বলে ও আমার হাতটা চেপে ধরল। আমি অবাক হয়ে বললাম, ছিঃ ডালিম ভাই এসব কি করছেন, হাত ছাড়ুন। কণ্ঠে যেন কি ছিল, ও আমার হাত ছেড়ে দিল কিন্তু তার পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজ আমার হাতে জোর করে গুজে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিঠিটা যে রেহানার নয়, সেটুকু বুদ্ধি তখন আমার হয়েছে প্রান্তিক ভাই। একবার ভেবেছিলাম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিই চিঠিটা। কিন্তু ঐ যে কৌতূহল, নারী মনের যা স্বাভাবিক স্বভাব আর কেবল নারীমনই বা বলি কেন যৌবনের এতো স্বাভাবিক কৌতূহল। চিঠিটাকে লুকিয়ে ফেললাম আমার ব্লাউজের মধ্যে। একবার ভেবেছিলাম রাস্তায় কোথাও বসে পড়ি। তারপর ভাবলাম না থাক। বাড়ী গিয়েই পড়ব।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম ওর কথা, যেন নিরাপদ আশ্রয় স্থল ভেবে সব কথা বলা যায় আমাকে। তারপর সেলিনা বলল শুনবেন ও কি লিখেছিল? আমি বেশী কৌতূহল

না দেখিয়ে বললাম, তোমার যদি মনে হয় এরপরের কথাও বলা যায় তাহলে বল। কেন আপনার কি কোন কৌতূহল নেই? বললাম, দেখ সেলিনা, কৌতূহল থাকা ভালো, কিন্তু অকারণ কৌতূহল ভালো না। আমি বিশ্বাস করি, যেটুকু বলার প্রয়োজন বলে তুমি মনে করবে তা তুমি বলবে। আসলে কারো মনের কথা জানার অধিকার কি জোর করে কিছু শোনা যায়? হঠাৎ সেলিনা বলল, এখানে ভালো চিকেন পকোড়া হয়, অর্ডার দিননা প্রান্তিক ভাই! শুধু বসে বসে গল্প করলে ওরা কিছু ভাবতে পারে। বাধ্য হয়ে আমাকে অর্ডার দিতে হয়।

সেলিনা বলে চলে, বাড়ী ফিরে বাথরুমে গিয়ে ডালিম ভাইয়ের চিঠিটা পড়ি। তাজ্জব ব্যাপার প্রান্তিক ভাই ও লিখেছে ও আমাকেই চায় রেহানাকে নয়। কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে ও আমাদের দুজনের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের যে বর্ণনা দিয়েছে তা শুনলে লজ্জায় কানে আঙুল দিতে হবে। আরো যে সব কথা লিখছে তা আমি বলতে পারব না। একবার ভেবে ছিলাম রেহানাকে দেখাব চিঠিটা ও বুঝুক কেমন পুরুষকে ও ওর মনের মানুষ করতে চেয়েছে, ঘৃণায় রাগে আমার সমস্ত শরীরটা যেন রিরি করতে থাকে। ভাবলাম ওকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। তারপর মনে হল দূর এ সব করে কী হবে। আসলে তো ও কোন মেয়ের রাগ প্রকাশেরও যোগ্য নয়। তাইতো কাউকে কিছু বলা হল না। না রেহানা না মা। কিন্তু কাউকে কিছু না বললেনও ওর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ আমার মনের মধ্যে পুঞ্জিভূত হতে থাকে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

তারপর একদিন আসে ডালিম। রেহানাকে ওর সামনে একলা রেখে জানালায় চোখ রাখি। কিন্তু অনুভব করতে পারি, ওর দুটি উৎসুক চোখ সেলিনাকে খুঁজে ফিরছে। রেহানা চা করতে ভিতরে গেলে আমি তার চিঠিটা নিয়ে এসে দাঁড়াই তার সামনে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর দুটি চোখ। আস্তে আস্তে ও বলে, আমার চিঠির উত্তর দিলে না কেন। সেলিনা বলল আপনি আর আসেন কই। আমি তো উত্তর লিখে বসে আছি আপনার জন্য। ও বলে, এইতো আমি এসেছি, এবার দাও। আর তার সঙ্গে সেই জিনিষটা। আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই কি? ওই তো যা আমি চেয়েছি। আমি বললাম এই দিনের বেলায়? তাহলে রাত্রে আসব? আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম না তার আর দরকার নেই, আপনি আসুন আমি এখনি দেব। কিভাবে? তা তো আপনার জেনে দরকার নেই। আমি দেব আপনি নেবেন এইতো।

ওর শরীরে এক অদম্য দ্যোদূল্যমনতা দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, আগে থেকে এমন কাঁপতে আরম্ভ করলে নেবেনে কি করে? সব যে ঝরে পড়ে যাবে। ও বলল, কিছুই ঝরে পরবেনা তোমার দেওয়া দান আমি দু হাত পেতে নেবো। তাই বুঝি, আমি হাসতে লাগলাম। ও তখন আমার বুকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

রেহানা এসে দাঁড়ালো পাশে। আমি ওকে জোরে এক ধাক্কা দিলাম। আর তাতে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল ও। তারপর বললাম, ডালিম ভাই আমি রেহানা নই। আমি সেলিনা। নিয়মিত বক্সিং করি।

রেহানা এই হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ডালিমকে ধরতে গেলে আমি চিৎকার করে বলি, একদম ছুবিনা ওকে। ও একটা নরকের কীট। ও ভেবেছে কি? তারপর ডালিম ভাই-এর কাছে গিয়ে তুলে দিয়ে বললাম, যান এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান। আর কোন দিন আসবেন না এখানে। আর মনে রাখবেন, আমি সেলিনা রহমান। এবারের ক্লাব প্রতিযোগিতায় বক্সিংএ প্রথম হয়েছি। আমি একাই যথেষ্ট আমাদের দু বোনকে রক্ষা.করার জন্য। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেহানা তখনো। আর ডালিম তখন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেছে। ও চলে গেলে আমি রেহানাকে আমার বুকের উপর টেনে নিয়ে বললাম আমাকে ক্ষমা করিস আপা। আসলে ও একটা শয়তান, বলে ডালিমের লেখা চিঠিটা তার হাতে তুলে দিলাম। রেহানা এক নিমেষে চিঠিটা পড়ে ফেলে কান্নায় ভেঙে পড়লো আমার বুকের পরে। আমি জানি প্রান্তিক ভাই সেদিন ও কত বড় আঘাত পেয়েছিল। যার জন্য থরে থরে সাজিয়ে ছিল ভালবাসার ডালি তার যে এমন পরিণতি হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাছাড়া সহ্য করবার শক্তিতো সবার এক নয়। সেলিনার কথা শুনে আমার মনের মধ্যে যে কী হচ্ছিল সে শুধু আমিই জানি। মানুষের মনের মধ্যে এমন শয়তানও বাস করে, ভাবতেও অবাক লাগে। প্রেসিডেন্সির ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ডালিম, তার মনটা এমন কুৎসিৎ! ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা এসব কিছুই নয়? সত্যি শুধু শারীরিক ঐশ্বর্য্য।

সেলিনা বলে চলে, তারপর থেকে নিজেকে ও আরো গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু বলেছিলাম, মাকে আঘাত দিবি? যা না একবার কলেজে, প্রান্তিক ভাইকে বলনা একবার আসতে।

ফিরে এলে মা জানতে চাইলেন, এলো না ছেলেটা? সংক্ষিপ্ত উত্তরে রেহানা বলেছিল, না দেখা হয়নি। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল এমন কিছু ঘটেছে যা সে বলতে চায়না। তারপর বলল বলবেন প্রান্তিক ভাই, কি হয়েছিল এমন, কেন এলেন না আপনি?

আমার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। রেহানা যে এত অভিমানী তা জানব কি করে? অথচ সত্যি কথাটাও বলতে পারছিনা, তাতে হয়তো রেহানাকে ছোট্ট করা হবে। সেলিনা বলল, এত কি ভাবছেন প্রান্তিক ভাই? রেহানার সাথে ভুল বোঝাবুঝি কিছু হয়েছে?

আমি সেলিনাকে যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ও যে ডালিমকে বলেছে, আমি রেহানা নই আমি সেলিনা। আমাদের দু বোনকে রক্ষা করার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। সেলিনার উপর বিশ্বাস যেন আমার বাড়তে থাকে। আমি সেলিনাকে বললাম, তুমিতো যথেষ্ট বুদ্ধিমতি, রেহানাকে তুমি ভালভাবেই জান। তাহলে তার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? হচ্ছেনা কারণ ওটা বিশ্বাস যোগ্য কথা নয় তাই। তাছাড়া আমি ওকে এত জানি যে ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হওয়া সম্ভব নয়। তা ওর চোখ দেখে বুঝতে পারি। কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে প্রান্তিক ভাই আপনি যে রেহানার থেকেও এক কাঠি উপরে এ সত্য আমার জানা ছিল না।

তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বলল চলুন যাওয়া যাক। আমি বললাম, হ্যাঁ তাই চল। আমিও উঠে পড়লাম। ও আমাকে কোন দাম দিতে দিল না। বেশি জোরও করতে পারলামনা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাল ওর জন্মদিন ছিল। কিন্তু কালকের দিনটা তো আর ফিরে আসবেনা। তাই বললাম, তোমার জন্মদিনটা আমার মনে থাকবে সেলিনা। আগামী জন্মদিনে আমি নিশ্চয়ই যাব। ও হাসতে হাসতে বলল, সত্যি আপনি পাগল আছেন প্রান্তিক ভাই! আগামী জন্মদিন মানেতো আরো এক বছর পরে। ততদিনে দেখবেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। তার থেকে চুপি চুপি একটা কথা বলি, কাউকে বলবেন না কিন্তু। কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখে। আমি তখনো কিছু না বলে চুপ করে আছি দেখে ও বলল, আসছে রবিবারের পরের রবিবার রেহানার জন্মদিন। ও কিন্তু ওর জন্মদিনের জন্য কোন আয়োজন মাকে করতে দেবেনা। মা কত সাধ্য সাধনা করেও একটা জন্মদিনের পোষাকও পরাতে পারবেনা তাকে। সেদিন সে উপোস করবে। খাবে তার পরের দিন, যাতে জন্মদিনে কিছু না খেতে হয়। আমি অবাক হয়ে বললাম, এমন কথা তো শুনিনি কখনো। সত্যি অবাক হচ্ছি তোমার কথা শুনে। তুমি সত্যি বলছ তো। সেলিনা বলল, এতক্ষণ কি তবে সব আমি মিথ্যে কথা বলেছি। যাকগে গোপন কথাটি বলে দিলাম। এবার যা ভালো বুঝবেন করবেন। আর একটা কথা, রেহানা খায়না বলে, ও দিন কিন্তু আমাদেরও উপোষ করতে হয়। না হলে দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খেতে হয়। তবে বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কিন্তু রেহানার জন্ম দিন ঘরোয়া ভাবে হলেও ভালো ভাবেই পালন করা হতো। জানতে চাই তবে এখন হয়না কেন? সেলিনা বলল আসলে ওর জন্মদিনেই বাবার এক্সিডেন্টটা হয়, আর তা ওকে এমন ভাবে আঘাত দেয় যে, ঐ দিনটাকে ও প্রানপণে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারপর আমাকে চমকে দিয়ে বললেন একি আপনি আবারও বসে পড়লেন যে। এরপরও বসতে গেলে আমার ক্ষমতায় কুলোবেনা। চলুন বলে হাসতে থাকে সেলিনা। সেলিনার যৌবন যেন উপচে পড়ছে।

রাস্তায় এসে সেলিনাকে বললাম, আমার একটা কাজ আছে। একটু দেরি হবে, তুমি বরং চলে যাও। সামান্য হেসে বললাম, তোমার গোপন কথাটা আমার মনে থাকবে, আর তোমার কথাও মনে থাকবে। আসি বাই বাই।

ও চলে গেল। আসলে আজতো আমার কোন কাজ নেই। কিন্তু এমন একটা সুন্দর আর জোরালো মনের সঙ্গে পথ চলতে বড়ই তৃপ্তি লাগছিল। ও চলে গেলে আমি তাই আরো খানিকটা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কখন যে কি কারনে শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছি বুঝতে পারছিনা।

আবারও সেই মিনতি সেন। বুঝতে পারিনা, কেন মিনতি সেনের মুখটা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর কেনইবা মিনতি সেন বার বার টানে আমায়, কি যে দুর্নিবার আকর্ষণ মিনতি সেন আমার কাছে তার কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তাইতো নিজের অজান্তেই সাউথ গামী ট্রেনে উঠে পড়ি আর নেমেও পড়ি ঢাকুরিয়া স্টেশনে। আর সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে মিনতি সেনের বাড়ী।

ষ্ট্রীট লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে বাইরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন মিনতি সেন। আটপৌরে পোষাক। চুল এলায়িত। তার মানে হয় অফিসে যাননি, না হলে অফিস থেকে ফিরে এসেছেন অনেক আগে। বেল দিতেই, উপর থেকে বললেন খোলা অছে। চলে এস, তার মানে আমাকে এর মাঝে কখন যেন দেখে নিয়েছেন এক ফাঁকে।

সিঁড়ির দরজাটা ভেজানো ছিল। আবার তেমনি ভেজিয়ে দিয়ে আমি উপরে চলে এলাম। আমাকে দেখে যে উনি অখুশী হন নি তা তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারি। বললেন, কোথায় এসেছিলে অনুতপাদের বাড়ীতে? ওকে নিয়ে এলেনা কেন? বললাম, না পিসি আমি সোজাসুজি আপনার এখানে চলে এসেছি। ভীষণ আনন্দিত হলেন মিনতি সেন। মুখে বললেন, শুধু আমার কথা মনে করে আমার কাছে এসেছো, কি যে ভালো লাগছে, বল কি খাবে?

আমি বললাম, বাড়ীতে যা আছে, আপনি কিন্তু দোকানে যেতে পারবেন না। তাই হবে। উনি উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি এবং টুকি টাকি আরো কিছু নিয়ে এলেন।

মিনতি সেনদের এই রাস্তা মুখী বারান্দাটা বেশ বড়। কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে এবং একটি টি টেবিল। উনি আমার হাতে খাবরের প্লেটটা তুলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা প্রান্তিক তুমি আমায় পিসি বলে ডাক কেন বলত। আমি বললাম, ঠিক কোন কিছু ভেবে বলিনা, তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে, তবে যা বলে ডাকতে বলবেন, তাই বলেই ডাকব। উনি হেসে ফেললেন, বললেন, তোমার মনটা এত সরল। তোমাদের মতন ছেলে মেয়েরা আছে বলেই এখনো পৃথিবীটাকে ভাললাগে। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন, ওই যে সেদিন তোমার সঙ্গে যে মেয়েটা এসেছিল, কি যেন নাম .. হ্যাঁ মনে পড়েছে অশ্রুকণা। তোমরা এক সাথে পড়? বললাম হ্যাঁ। মেয়েটি খুব ভালো তাইনা? আমি সন্দেহতুর হয়ে বললাম কেন বলুন তো। না এমনি, ওকে আমার ভীষণ আপনার মনে হয়েছিল। সেদিন জলযোগে তো ওর সঙ্গেই দেখা হয়ে ছিল তাই না প্রান্তিক? আমি সম্মতি সুচক ঘাড় নাড়ি।

তারপর খাওয়া শেষ করে বললাম এবার তা হলে উঠি। এই তো এলে। বেশী রাত হলে পিসি চিন্তা করবেন। তুমি যে বলেছিলে তোমার পিসি আমায় খুঁজছিলেন, কই তিনি তো ফোন করলেন না। হয়তো সময় পাননি, হয়তো বা যে জন্য খুঁজে ছিলেন তা মিটে গেছে। হবে হয়তো। তারপর একটু থেমে বললেন নীলাঞ্জনা তোমার কেমন পিসি। আমারই মতো কি? হঠাৎ এ প্রশ্নের কারণ কি, আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

কঠিন, অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। এর উত্তর আমি কিভাবে দেব। তিনি যদি সহজ ভাবে জানতে চাইতেন নীলাঞ্জনা আমার কেমন পিসি, উত্তর দেওয়া সহজ হতো। হয়তো সত্যি কথাই বলতাম, গ্রাম সম্পর্কে পিসি। কিন্তু ঐ যে আমার মতো কি। প্রশ্নটা জুড়ে দিয়ে আমার সবকিছু কেমন এলো মেলো করে দিলেন। কোন উত্তরই দেওয়া হয়না। চুপ করে আছি দেখে বললেন, বললে নাতো। আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বললাম আমাদের গ্রামের মেয়ে। গ্রাম সম্পর্কে আমার পিসি হয়। তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যি কারে দায়িত্ব নেওয়ার যার অধিকার আছে, রক্ত দিয়ে তার বিচার করা যায় না। এই যে বলতে গেলে আপনি তো

আমার কেউ নন। অথচ কেন যে আপনার কথা মনে হয় সব সময় বুঝতে পারিনা। সম্পর্ক দিয়ে কি এর বিচার করা যায়? তবে যদি আপনি আমায় অস্বীকার করতেন এড়িয়ে চলতেন, তখন হয়তো মনে হতো আপনিতো আমার কেউ না।

ওঘর থেকে কে যেন বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস মিনতি? পিসির বাবার কণ্ঠস্বর। বললেন, প্রান্তিক এসেছে। ওই যে কয়েক দিন আগে এসেছিল, তুমি উঠোনা আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসছি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা চোখে কম দেখেন, আর সব সময় ভাবেন আমার কি হবে?

মিনতি পিসি কেন এসব কথা বললেন জানিনা, আমি গিয়ে ওনাকে প্রণাম করে বললাম কেমন আছেন? অবাক হলেন যেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কিন্তু কোন রকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে বললেন, মিনতি ওকে খেতে দিয়েছিস? তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার নামতো প্রান্তিক ? মিনতি বলছিল। তা তুমি কি করছ? আমি বিজ্ঞান নিয়ে অর্নাসে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি। খুব ভালো খুব ভালো, বৃদ্ধ তারিফ করলেন আমাকে। তারপর বললেন, যাও মিনতির সঙ্গে কথা বল, আমার মতো বুড়োর সঙ্গে তোমার আর কতক্ষণ ভালোলাগবে। বললাম, আমার কিন্তু আপনাকে ভালোই লাগছে। তারপর ওনার বিছানার একেবারে কাছে এসে বললাম, আপনার মাথাটা একটু উঁচু করুনতো দাদু, আমি বালিশটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে দিচ্ছি, আপনি বসুন। কি সব সময় শুয়ে থাকেন।

তারপর আমি ওনার মতামতের অপেক্ষা না করে ওনার মাথাটা নিজের হাতে একটু উঁচু করে বালিশটাকে ঝেড়ে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে ওনাকে সাহায্য করে বসিয়ে দিলাম। তারপর নিজেই বিছানার অগোছালো চাদরটা তুলে নিয়ে, মাথার জট পাকানো চুল গুলোকে আঁচড়িয়ে দিলাম। খোঁচা খোঁচা দাড়ি তা আর চিরুনি দিয়ে ঠিক করা সম্ভব হয়না। গায়ের কোচকানো জামাটা খুলে ফেলে পাউডারের কৌটো থেকে কিছু পাউডার নিয়ে তার সারা গায়ে ছড়িয়ে দিলাম, পাশের আলনা থেকে একটা পরিস্কার জামা তুলে নিয়ে তার গায়ে গলিয়ে দিয়ে বললাম, এমন নোংরা হয়ে থাকেন কেন? দাঁড়িও কাটেননি। দেখবেন কয়েকদিন পরে ওখানে পোকা কিল বিল করছে। কালই নাপিত ডেকে জঙ্গল পরিস্কার করে ফেলবেন। আর রোজ না হলেও আমি পিসিকে বলে যাব, যেন একদিন অন্তর একদিন বিছানার চাদর বদলিয়ে দেন। এমন নোংরা ভাবে কি বাঁচার স্বপ্ন দেখা যায়? পিসি যে কি করে! বৃদ্ধ মন্মথনাথ সেন। অবাক হয়ে আমার কাজ দেখছিলেন আর মনে মনে কি যেন ভাবছিলেন। কেন যে এই কাজগুলো উপযাচক হয়ে করলাম জানিনা। হয়তো মিনতি সেনের জন্য, 'উনি আমার বাবা, উনি আমার একমাত্র আপনজন' কথাটা আমায় প্রভাবিত করে থাকবে। আপনজনের সিঁড়ি বেয়েই তো আরো আপন জনের কাছে পৌছানো সম্ভব। সে যাই হোক এই কাজগুলো করতে আমাকে যেমন কোন জেদ করতে হয়নি। তেমনি বৃদ্ধ মন্মথ সেনও কোনরকম বাধা দেননি। মিনতি সেন অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে করল তুমি? আমি নীরবে মাথা নাড়লাম এবং মিনতি সেনের হাত থেকে চায়ের প্লেটটা নিয়ে তার হাতে দিয়ে বললাম, দাদু চা খান, কিন্তু আপনার চশমা কোথায়? মিনতি সেন দেরাজ থেকে চশমা

জোড়া বের করে আমার হাতে দিলেন। আমি চশমাটা তার চোখে পরিয়ে দিয়ে বললাম দেখুন তো আগে আমাকে কখনো দেখেছেন কী না! কিন্তু আমার এত আগ্রহের কোন জবাব দিলেন না উনি। আমি এরপর দিনের কাগজটা খুঁজে পেতে তার হাতে দিয়ে বললাম, সারাদিন শুয়ে থাকেন কেন? কাগজ, বই, ম্যাগাজিন যা পাবেন তাই পড়বেন। এইবার চা খেতে খেতে কাগজটা পড়ে ফেলুন তো। আমি একটু পরে এসে জিজ্ঞাস করব কি পড়লেন। বলতে হবে কিন্তু। এতক্ষণে হেসে ফেললেন বৃদ্ধ। বললেন পড়া ধরবে তো! বেশ তাই হবে। কিন্তু দাদুভাই পাশ না ফেল তা কিন্তু বলতে হবে তোমায়। এই যে মুহূর্তে আপন জনের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো, তাতে মনটা ভীষণ ভাল হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি মিনতি সেনের দৃষ্টি হতে বিস্ময় যেন আর কাটতে চায় না। তার বিস্ময় আমার এই কাজের জন্য না, তার বাবার এই সহজ হয়ে ওটা। বুঝতে পারি না।

এরপর মিনতি সেনের সঙ্গে আবার সেই বাইরে এসে বসলাম আমি। চা খেতে খেতে বললাম, আপনার চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল পিসি। এই খাই, বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে আবার রেখে দিলেন।

বললাম, কি এত ভাবছেন। উনি ধীরে ধীরে বললেন, কি যে ভাবছি তা তোমাকে বোঝাবো কি ক্রের প্রান্তিক? এই যে দেখছ আমার বাবা, ব্যাঙ্কের একজন সিনিয়র রিটায়ার্ড অফিসার। আজ ১০ বছর হয়ে গেল চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। আমার বাবা যে কি আমুদে মানুষ ছিলেন তা তোমাকে বোঝাতে পারবনা। একদিন তিনি একটি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় পাকা করে এসে আমার মাকে বললেন, বুঝলে গিন্নী, আমি মিনতির বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে এলাম। মা জিজ্ঞাস করলেন একেবারে পাকা? ছেলেটি কে? বাবা কৌতুক করে বললেন, সে তোমাকে একেবারে আশীর্বাদের দিনই বলব। মা বললেন। তা হলে ওটুকুই বা আমার জন্য বাকী রাখলে কেন? সেকি হয় তুমি যে মা, আমার যে দাবী, তোমারও তো সেই একই দাবী। মা আর কথা বাড়াননি। ছেলের বাড়ী থেকে আশীর্বাদ করতে এলেন, সঙ্গে ছেলেও এলেন। আমার কোন মতামত নেন নি বাবা। আর তার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে তার সামনে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচারণ করতে আমাদের বুক দুর দুর করে কাঁপতো। কিন্তু ছেলেকে দেখে মা বেঁকে বসলেন। বাবাকে ভিতরের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন এ বিয়ে হবে না। বাবা বললেন কেন? মা বললেন, আমার সাফ কথা, আমি যখন বলেছি এ বিয়ে হবে না তখন হবে না।

আমার তখন মনের অবস্থা বুঝতে পারছ প্রান্তিক। বাবা মা ঝগড়া করে চলেছেন, অথচ আমার কথা কেউ ভাবছেন না। বাবা তখনো বলে চলেছেন, আমি মেয়ের বাবা, তোমার স্বামী, এ বাড়ীর অভিভাবক, আমি বলছি এ বিয়ে হবে। তোমার ওঘরে যাওয়ার দরকার নেই। বাবা চলে যেতে উদ্যত হয়েই মা বললেন শোন, তোমার জেদের কাছে আমি বারবার হার স্বীকার করেছি। তার একমাত্র কারণ তুমি বাড়ীর অভিভাবক। একমাত্র অর্থ উপার্জনকারী। আমি মা হয়েও কোন কথা বলার অধিকার নেই, কারণ আমার কোন আর্থিক ক্ষমতা নেই। আমিও তোমার উপর নির্ভরশীল। তাইতো তোমার মতের বিরুদ্ধে আমিই

মিনতিকে চাকরি করতে পাঠিয়েছি, যাতে সে স্বাবলম্বী হতে পারে আমার মত অসহায়তার শিকার না হতে হয়। আজও আবার সেই অর্থ ক্ষমতার দম্ভে নিজের ইচ্ছেটাই চাপিয়ে দিতে চাইছো। কিন্তু ভাল করে শোন, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি তুমি ওর বিয়ে দাও, তা হলে আমার মৃতদেহ মাড়িয়েই তোমাকে তা করতে হবে । আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। মিনতি সেন বললেন, আমিতো শিউরে উঠি, মায়ের হল কি! কিন্তু মায়ের এই জেদে বাবার জেদও আরো বেড়ে গেলো। তার মুখের উপর এই পরিবারের যে কেউ কথা বলতে পারে, তা ছিল তার কল্পনার অতীত। তার পৌরষত্বে আঘাত। তিনি তা মেনে নেবেন কেন? দম্ভভরে বললেন প্রয়োজনে তোমার মৃতদেহ মাড়িয়েই ওর বিয়ে হবে। আমি যাচ্ছি। যাওয়ার আগে তাই বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে গেলাম বেরিয়ে নাটক করবার চেষ্টা করোনা। বাড়ীতে অতিথি তাদের কোন অমর্যাদা হতে আমি দেব না।

তারপর জেদী পুরুষ আমার বাবা বাড়ীর কাজের লোকদের দ্বারা এমন নিঁখুত ভাবে অনুষ্ঠানটি শেষ করলেন যে, কারো কিছু বোঝার কোন উপায় রইল না।

দিনের শেষে অতিথিদের বিদায় দিয়ে ফিরে আসতে আসতে যে ৪/৫ ঘন্টা সময় কেটে গেছে তাতে যা হওয়ার তাই হয়ে গেছে। মা কি ভাবে অতগুলো ঘুমের ওষুধ জোগাড় করেছিলেন তা উনিই জানেন। যখন দরজা খুলে বাবা ভিতরে ঢুকলেন তখন সব শেষ, তবুও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো মাকে, কিন্তু যিনি সব কিছুর উর্দ্ধে চলে গেছেন, তার জন্য কেইবা কি করবে। মিনতি সেনের গলাটা বুঝি সামান্য কেঁপে যায়। বলে চলেন বাবার মতো পুরুষের এই বোধ হয় প্রথম পরাজয়। মা কোথাও কিছু লিখে যাননি। সুতরাং বাবাকে গ্রেপ্তার হতে হল। কিন্তু বাবার এক কথা আমি কিছুই জানিনা। বিচারক আমাদের কোন কথা শুনলেন না। বাবাকে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড দিল। ছেলেদের বাড়ীর থেকে ওরা অবশ্য এসেছিলেন। ছেলেটির নাম ছিল প্রতীম। শিবপুর কলেজ থেকে বি, ই, পাশ। ভালো কোম্পানীতে কাজ করেন। বাবার জেল হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাকে তাদের ঘরের বৌ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমিই রাজী হতে পারিনি।

এতক্ষনে থামলেন মিনতি সেন। মনে মনে ভাবছিলাম, কোন মানুষকে উপর থেকে দেখে বোঝা যায় না কার জীবনে কি ঝড় বয়ে চলেছে। মিনতি সেনেরও যেন আর কিছু বলার নেই

আমি ডাকলাম পিসি? চমকে উঠলেন মিনতি সেন। বললেন কিছু বলছ? জানতে চাইলাম কেন আপনার মা এই বিয়েতে একদম রাজী না হয়ে মৃত্যুকে বেছে নিলেন। জানতে পেরেছিলেন কোন দিন, কিসের জন্য তার এই জেদ? একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, না প্রান্তিক জানতে পারিনি। জানবার চেষ্টা করেছিলেন? যিনি কিছুই বলে যাননি সে চেষ্টা করব কি করে? আপনার বাবাও কিছু অনুমান করেননি? জানিনা ঠিক। যদি কিছু অনুমান করেও থাকেন আমাকে বলেননি কিছুই।

জেল থেকে ফিরে এসে ঐ যে বিছানা নিয়েছেন, ওখানেই তার দিন রাত কাটে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমার সঙ্গেও কথা বলেন না। কোন কিছু করতে গেলে, তিনি

সজোরে প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের কাজ তিনি নিজেই করেন। আজই প্রথম দেখলাম তোমাকে উনি কোন বাধা দেননি।

আমি বললাম, প্রতীমবাবু আপনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেননি? হ্যাঁ করেছিলেন। আমি যখন তার বাবা মাকে না করে দিয়েছিলাম। তখন তার একটা চিঠি পেয়ে ছিলাম আমার অফিস ঠিকানায়, লিখেছিলেন, সুচরিতাসু,

আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। বাবা মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানি আমাকেও ফিরিয়ে দেবেন তবু যদি জানতে পারতাম, আমার অপরাধ কোথায়? হয়তো বলবেন এ মিলন ঈশ্বর চাননি। ঘটনার গতি হয়তো তাতে বিশ্বাসের আলপনা আঁকতেও পারে। কিন্তু এক্সিডেন্টতো এক্সিডেন্টই। এটাও জানিনা তিনি কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি কোন অজুহাত খাড়া করছিনা, যদি সব কিছুকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন, আমাকে জানাবেন। আমি অপেক্ষা করব, ইশ্বর আপনাকে শান্তি দিন। কল্যাণাকাঙ্খী প্রতীম।

মনে মনে ভাবলাম, এতবড় মনের মানুষকে আমি খারাপ ভাববো কি করে? বললাম, আপনি উত্তর দিয়ে ছিলেন? না দেওয়া হয়নি। কেন দিলেন না? মায়ের কথা মনে করে। হয়তো ঠিক কথাই বলেছেন মিনতি সেন। যার জন্য তার মা মৃত্যু বরণ করলেন, তাকে কি করে জীবন সাথী হিসাবে বেছে নেবেন তিনি? তবু জিজ্ঞাসা করলাম প্রতীমবাবু কি পরে কোথাও বিয়ে করেছেন? জানিনা। তিনি এখন কোথায় আছেন? তাও জানিনা। বললাম, ওনার কোন অফিস ঠিকানাই আপনি জানেননা? কি করবে? কিছুই করব না পিসি, শুধু চোখের দেখা দেখে আসব। একটা জীবন তো ধ্বংস হয়ে গেল, আরেকটা জীবনও ধ্বংস হয়ে গেল কি না।

মিনতি সেন মৃদু হেসে বললেন কি দরকার প্রান্তিক? আমার পক্ষে যা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না, সেখানে আরেকজনের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি? লাভ কিছু নয় পিসি, কিন্তু একথা তো সত্য, জীবনে কোনদিন আপনি তাকে ভুলতে পারবেন না। আমি আপনাকে জোর করব না, শুধু ঠিকানাটা দিন। মিনতি সেন বেশ কয়েক বছর আগের অফিস ঠিকানাটা আমার হাতে এনে দিলেন। আমি উঠে পড়লাম। জানতে চাইলেন, আমি আবার কবে আসব। খুব তাড়াতাড়ি আসব, জানিনা কেন সব সময় আপনার কথা মনে পড়ে! আমি বেরিয়ে এলাম।

রেহানার সঙ্গে কলেজে কয়েকবারই দেখা হয়েছে, কিন্তু আমাকে এড়িয়ে গেছে প্রতি মুহূর্তে। আজ রবিবার। পিসিকে বললাম আমি একটু বেরোব পিসি। কোথায়? আমাদের এক কলেজ বন্ধুর জন্মদিন ওদের বাড়ী যাব। তোমাকে নেমন্তন্ন না বলে নি, তাইতো জেদ হয়েছে আমি যাব! পিসী আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে ২০ টাকা দিয়ে বললেন, জন্মদিনের গ্রীটিং কার্ড আর একটি ফুলের তোড়া নিয়ে যেও।

তোমার জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা লেখা গ্রীটিং কার্ড আর বিভিন্ন রংয়ের ফুলের সমাহারে সাজানো ফুলের তোড়া নিয়ে আমি যখন ওদের বাড়ী উপস্থিত হয়েছি তখনো দুপুর হয়নি। সেলিনা আমাকে ঘরে ডেকে নিল। তারপর ওর মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে

বলল, সেদিন উনি আসেননি মা আজ কিন্তু এসেছেন। রেহানার জন্মদিনে, কিছু খাওয়াবেনা? ওর মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম আমি।

একটু পরে সেলিনা রেহানাকে ডেকে নিয়ে আসে এ ঘরে। আমি আমার ঝোলা থেকে প্রথমে ফুলের তোড়াটা তার হাতে দিতেই ও প্রায় ছিটকে গিয়ে বলে এটাকি? আমি বললাম, আগে গ্রহণ কর তারপর বলছি। ও আমার হাত থেকে ফুলের তোড়াটি নেওয়ার পর আমি গ্রীটিংস কার্ডটা মেলে দিলাম ফুলের তোড়ার উপরে। তাতে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, কে তোমাকে বলল আজ আমার জন্মদিন? আমি হাসতে হাসতে বললাম অত অধৈর্য হয়ো না রেহানা? কে আবার বলবে? তোমার চোখ বলছে, তোমার চেহারা বলছে, সর্বোপরি তোমার এ্যাডমিশান রেজিষ্টার তাকে তুমি অস্বীকার করবে কি করে?

রেহানা আমার কথার কোন প্রতি উত্তর না দিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি ওকে বাধা দিতে গেলে সেলিনা ইশারায় না করল। তারপর বলল, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন প্রান্তিক ভাই। তারপর তার মাকে বলল, তোমরা না হয় উপোস করবে, কিন্তু প্রান্তিক ভাইকে কিছু খাওয়াবে না। আফরোজ বেগম বললেন এই যাই।

উনি চলে গেলে, সেলিনা বলল আপনি রেহানার ঘরে যান। আজ আপনার অগ্নি পরীক্ষা। মানে? মানে আবার কি, যার জন্মদিনে শুভেচ্ছার উপহার নিয়ে এসেছেন, সেকি উপোষ করে থাকবে নাকি! কিন্তু সেলিনা, কোন অধিকারে আমি তার ব্রত ভাঙব? যদি পারবেন না, তবে দম্ভ করে এলেন কেন? তারপর আরো কাছে এসে চুপিচুপি বলল, ভালোবাসার অধিকারে সব করা যায় প্রান্তিক ভাই! সেই অধিকারে আপনি তার ব্রত ভাঙবেন। কিন্তু একজনের ভালোবাসার অধিকারই কি সব। আরেক জনের দরকার নেই? সেলিনা বলল এইটুকু যদি না বুঝতে পারেন ভালোবাসার কথা বলবেন না জীবনে কখনো। বড় অদ্ভুত মেয়ে এই সেলিনা। বয়সে ছোট হলে হবে কি। জ্ঞানে বুদ্ধিতে আর অনুভূতিতে সবাইকে যেন টেক্কা দেয়। সেলিনা ওর মায়ের কাছে চলে গেলে, আমার পক্ষে আর কতক্ষণ একা একা এ ঘরে বসে থাকা সম্ভব? আমি আস্তে আস্তে যে ঘরে রেহানা আছে সে ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটা আকাশী রং-এর পর্দা ঝুলছে দরজায়। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে রেহানা বলল, চলে এস। আমি ভিতরে গিয়ে দেখি, একাকী বসে আছে, পাশে ফুলের তোড়া এবং তার উপর গ্রীটিংস কার্ড আমি নিজেই ওটা তুলে নিয়ে সামনের ড্রেসিং টেবিলের একপাশে যে টিপয় আছে তাতে সাজিয়ে রাখলাম। আর নীচে গ্রীটিংস কার্ডটা খুলে রাখলাম। খাট থেকে তাকালেই দেখা যায়। ও আমার দিকে তাকিয়ে অকারণ একটু হাসল। বললাম হাসলে যে। না, ভাবছিলাম, তুমি এত ভীরু কেন? বুঝলামনা। বুঝে কাজ নেই। ঐ গ্রীটিংস কার্ডটা নিয়ে এস। কেন? আরে আনইনা। আমি নিয়ে এলাম। তারপর খাটের লাগোয়া পড়ার টেবিলের দেরাজ থেকে সবুজ কালির কলমটা বের করে বললো, লেখ। আমি অবাক হয়ে বললাম কি লিখব? বারে! কাকে তুমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছ তার নাম লিখবে না? আর কে দিচ্ছে? সে জায়গাটাও কি ফাঁকা থাকবে নাকি? আমি পেনটা নিলাম ওর

হাত থেকে তারপর সুন্দর করে লিখলাম রেহানাকে আর শেষে লিখলাম প্রান্তিক। কেন যেন মনে হল আনন্দে ওর চোখ দুটি চক্‌চক করছে। তারপর নিজেই উঠে গিয়ে এমন সুন্দর করে ফুলের তোড়াটার নীচে রাখল যেন তা আরো সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হয়। তারপর আবার নিজের বিছানায় এসে বসল।

আমি বললাম, জন্মদিনে এমন একটা ময়লা শাড়ী পরে আছো কেন? ও বলল, তুমি হয়তো জাননা প্রান্তিক, আমার জীবনে জন্মদিন কোন নুতন বার্তা বয়ে নিয়ে আসেনা, তাই ভালো লাগেনা। বললাম, তোমার ভালো লাগাটাই কি সব, আমাদের ভালো লাগতে নেই? হয়তো আছে, কিন্তু তুমি আমাকে কতটুকু জান ? একটু হাসলাম। তারপরে বললাম, যতটুকু জানলে তোমাকে চেনা যায় ঠিক ততটুকুই জানি। চমকে উঠলো ও, বলল, মানে?

এমন সময় সেলিনা পর্দার বাইরে থেকে বলল, প্রান্তিক ভাই, মা চা দিতে বললেন, এ ঘরে নিয়ে আসব না ডাইনিংএ দেব। বললাম, আমি আসছি, এ ঘরে আনতে হবে না। সেলিনা চলে গেলে রেহানাকে বললাম, চল। ও বলল তুমি যাও। আমি বললাম সেকি করে হবে? আমি যাচ্ছি তুমি কিন্তু ৫ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। তারপর ওর দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। বলল কি দেখছ? কিছুনা। আমি যাচ্ছি। পর্দার কাছে গিয়েও আবার ফিরে এসে বললাম, ঠিক এই ভাবে এসোনা, অন্তত আমার কথা মেনে একটা নতুন শাড়ী পরে এস। আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলাম।

পাঁচ মিনিট নয়, অন্তত ১০ মিনিট পরে রেহানা এলো। রেখেছে আমার কথা। নতুন লাল শাড়ী, কপালে লাল টীপ, চোখে কাজল, সুন্দর করে এক বেনীতে বাঁধা চুল। ফুলের তোড়া থেকে তুলে নেওয়া একটা লাল গোলাপ বেনীর গোড়ায় গোজা। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের পাশে। সেলিনা একবার তাকিয়ে রান্নাঘরে চলে গিয়ে ওর মাকে ডেকে নিয়ে এলো। মা ওকে দেখে শুধু বলল রেহানা! আর কোন কথা বলতে পারলেন না। দু চোখ দিয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো আফরোজ বেগমের।

বললাম রেহানা ব'স। রেহানা বলল তুমিই ব'স আমি আসছি। ভিতরে গিয়ে সেলিনার হাত থেকে খাবারের রেকাবী আর চায়ের কাপ নিয়ে বলল, তুইও বোসগে সেলিনা। আমি এসব নিয়ে যাচ্ছি। সেলিনা কোন প্রতিবাদ না করে তার হাতে দিয়ে দিল সব। তারপর আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। রেহানা এরপর সেলিনা এবং তার মায়ের জন্য মিষ্টি এবং চা নিয়ে এসে মাকে বলল, তুমিও বোস মা। আফরোজ বেগম অবাক হয়ে দেখছিলেন রেহানাকে।

আমি বললাম, তুমি কেন বাকী থাকবে রেহানা তুমিও বোসনা। রেহানা বলল, আগে তো তোমরা খেয়ে নাও, তারপর দেখছি। লক্ষ করে দেখলাম, সেলিনা কোন কথা বলছেনা, শুধু আড় চোখে বার বার দেখছে রেহানাকে। রেহানা এত সুন্দর। কোন দিন ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি ও। সেলিনা বলল, বোস না আপা তুই কেন পরিবেশন করবি, আজতো আমার পরিবেশন করার দিন।

মানুষের মন কেমন করে যে আপন নিয়মে তার পথ করে নেয় তা বোধ হয় সে

নিজেও জানে না। রেহানার ভালোলাগা, মন্দ লাগা, তার রাগ মান অভিমান ভালবাসা ঘৃণা দ্বন্দ্ব কোন কিছুর পরে যেন তার স্থায়ী কোন অধিকার নেই। ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরের মত তা যেন বড় ক্ষণিকের কিন্তু ভারি সুন্দর। রাগলে যেমন কাউকে সুন্দর লাগে তেমনি ভালবাসা যখন চিক্‌চিক্ করে ওঠে তার চোখের মনিতে তখন তা এক অপূর্বতা পায় কাছের মানুষের সম্মোহনী দৃষ্টিতে।

ঐ লাল শাড়ী, যেন নব বধূর লাল বেনারসী। সব কিছু লাল আর লাল, তার শাড়ী, ব্লাউজ, কপালের টিপ, হাতের পলা, লাল তার বেনীতে গোজা উপহারী গোলাপ, ভাবতে অবাক লাগছে, অথচ বুঝতে পারছিনা কেন সে আজ এমনি লাল রঙে সেজেছে। আর ঐ যে এক টুকরো হাসি ও-তো যেন লজ্জায় লাল।

আমার সামনে বসে আছে শুধু সেলিনা। আফরোজ বেগম একটু খানি বসে নিজের চায়ের কাপ নিয়ে উঠে চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম একি আপনি কেন চলে যাচ্ছেন, বসুন না। উনি বললেন, তোমরা বস। আমি রেহানাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেলিনা বলল, কি প্রান্তিক ভাই, আপনি যে যুদ্ধ জিতে গেছেন, তবে আর আমি থাকি কেন? আমি বললাম, জিতিনি ভাই, তবে জেতার আশা আছে। এখনো আশা করছেন? কোন সেনাপতি কি হারতে ভালবাসে? দেখবেন কিন্তু যুদ্ধ জয় হয়ে গেলে সৈনিকদের আবার ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন আসল যুদ্ধ কিন্তু তারাই করে, আর কৃত্তিত্ব নেয় সেনাপতি নিজে। হাসতে হাসতে বললাম যুদ্ধজয়ের পরে ভাববো, এই যুদ্ধে তোমার কোন ফল্ট ছিল কি না। তারপর নির্ভর করবে তোমাকে সৈনিক হিসাবে বহাল করা যাবে কি না। ও বলল, এত দম্ভ কিন্তু ভালো নয় প্রান্তিক ভাই। আমিও চললাম। এবার না হয় ব'সে ব'সে ঠিক করুন সেলিনাকে বহাল রাখা যাবে কি না। হাসতে হাসতে সমস্ত শরীরে হিন্দোল ছড়িয়ে উঠে পড়লো সেলিনা। রেহানা এসে বলল, একি তুই চলে যাচ্ছিস যে, সেলিনা শুধু একটু হাসল, তারপর চলে গেল। আমি বললাম, তোমার চা কোথায়? আমি কিছু খাবোনা। কেন? এ আমার ব্রত। আমি জানি। জা-.? হ্যা জানি। কে বলেছে সেলিনা? সেলিনা ছাড়া কি জানবার আর কোন উপায় নেই? হয়তো আছে। তবে আমার বিশ্বাস সেলিনাই তোমাকে বলেছে এসব। কিন্তু তুমি আমাকে এ অনুরোধ করোনা প্রান্তিক। না করবো না। ঠিক আছে।

আমি সামনে খাবার নিয়ে চুপ চাপ বসে আছি। ও বলল চুপ করে থাকবে? কিছু খাবে না? বললাম তুমিই বল, এভাবে খাওয়া যায়? তোমার জন্মদিনে তুমি কিছু খাবেনা। আমার খেতে ভালো লাগবে? তার চেয়ে একটা কথা বলব? ও তাকায় আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল বল। বললাম আমি জানি রেহানা তোমার আঘাতটা কোথায়? আজতো আনন্দের দিন শুধু নয়, আজতো স্মৃতি তর্পনেরও দিন। নিজের জন্ম দিনের মুহূর্তটা তুমি ভুলে যেতে পারো। কিন্তু কি করে ভুলবে এদিন যে তোমার একান্ত প্রিয় জনের বিদায়ের দিনও। কিন্তু আজ যদি তুমি এমনি ভাবে চিরদিনের নিয়মটাকে উল্টিয়ে দিয়ে নতুন নিয়মের সৃষ্টি করো, তোমার বাবার সেটা ভালো লাগবে? তিনি কি দুঃখ পাবেননা? তার এই অকালে চলে যাওয়ার জন্য তো তুমি দায়ী নও। তবে কেন তাকে এই আঘাত দেবে? তিনি যদি

আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কি এমনি ব্রত গ্রহণ করতে?

ও আমাকে বাধা দিয়ে বলল, না না তুমি এমনি ভাবে বলো না। বললাম, আমি তো বলতে চাইনি রেহানা। তুমি যা করছ এটা নিয়ম নয়। এ তোমার আঘাতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জীবনে অনেক আঘাত আসবে, আসতে পারে আরো কঠিন আঘাত। সেদিন কি তুমি আরেক ব্রত গ্রহণ করে জীবনটাকে আরো দুর্বিসহ করে তুলবে? তার দ্বারা তুমি কাকে শাস্তি দেবে ? আর তা ছাড়া যেকোন আচরণ পালনের অধিকার যেমন তোমার আছে, তেমনি এটা দেখাও তোমার দায়িত্ব, তোমার সেই আচরণে অন্য কেউ যেন আঘাত না পায়? এখানে তোমার বোন আছে। তারও নিশ্চয় জন্মদিন পালন হয়। আমি জানি না তার জন্মদিনে কোন উৎসব হয় কি না। যদি না হয়, তবে তার জন্য কি তোমার নিজেকে দায়ী মনে হবেনা?

রেহানা চুপচাপ শুনছিল আমার কথা। কোন উত্তর দিচ্ছেনা দেখে আমি আবারও বললাম, অবশ্য এ আমারই ভুল, আমার আসাই ঠিক হয়নি। তুমি জান না রেহানা তোমার জন্মদিনে আসার জন্য আমি পিসিকে মিথ্যে কথা বলেছি?

আঁতকে উঠলো রেহানা মিথ্যে কথা বলেছো? মানে পিসি কি তোমাকে আসতে দিতে চাননি। না ঠিক তা নয়। আসলে আমার মনে হয়েছিল তোমার জন্মদিনে হয়তো আমাকে তুমি বলতে পার। কিন্তু আমার তো জানা ছিলনা, না বলার পিছনে আছে আরেক ইতিহাস। যা তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই পিসি যখন বললেন, তোমাকে কি নিমন্ত্রণ করেছে। বললাম না, তাই আরো জেদ বেড়ে গেছে এজন্যই আমাকে যেতেই হবে।

রেহানা বলল, তুমি এ ভাবে বলছ কেন? তুমিতো দেখতেই পাচ্ছ, জন্মদিন আমার জীবনে আরেক অন্ধকার স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে। আমার বাবা, তিনি আমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু কি যে হল, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা।

আমি বললাম, তুমি যা করছ সে শুধু তোমার বাবাকে অসম্মান নয়, অসম্মান করছ তুমি তোমার মা ও বোনকেও। তাহলে আমি কি করব। আমি আস্তে আস্তে বললাম মৃত্যু বেঁচে থাকে স্মৃতির মধ্যে, আর স্মৃতিকে জাগরিত করাই মৃত্যুকে শ্রদ্ধা জানানো। তারপর খানিক থেমে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললাম, আচ্ছা রেহানা তোমার বাবার কোন ছবি নেই? ও বলল কেন বলত! না তোমার ঘরে বা এ ঘরে তোমাদের দুই বোনের ছবি দেখছি, অথচ তোমার বাবা বা মায়ের কোন ছবি দেখছিনা। তাই আর কি। ও বলল, ছিল কিন্তু ছবিটা দেখলে কি যে হতো, কি যে যন্ত্রণায় আমি ছটফট করতাম, তাই তাকে সরিয়ে ফেলেছি।

হাসলাম আমি বললাম, ছবি সরিয়ে কি যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? তার চেয়ে ছবিটা এমন একটা জায়গায় টাঙিয়ে দাও যে বাড়ীর সকলের তা নজরে পড়ে। তারপর তোমার বাবার জন্মদিন, তোমার মা বাবার বিয়ের দিন, তোমার ও সেলিনার জন্মদিন ছাড়াও আরো যে সমস্ত দিন গুলো তোমাদের জীবনে স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমরা মনে করো, সেই সব দিনে তাজা ফুলের মালা পরিয়ে দাও ছবিতে। আর মনে মনে বলো, বাবা তুমি যেখানেই থাক চিন্তা করোনা, তোমার স্বপ্ন আমি পূরণ করবই। দেখবে আস্তে

আস্তে মনে এক অন্য ধরনের জোর পাবে। আর সেই ভয়ংকর স্মৃতির দিনটা মলিন হয়ে ভাস্বর হয়ে উঠবে সেই সব স্মৃতি গুলো যা তোমাদের আনন্দে ভরিয়ে রাখতো। তিনি বেঁচে থাকতে বিভিন্ন দিনে যা যা করতেন তোমরাও তাই করো, আর সেটাই হবে তাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা অর্পণ। এই ভাবে তার সমস্ত আনন্দকে এড়িয়ে গিয়ে তুমি কি তাকে অপমান করছো না?

রেহানা নীরবে আমার সব কথা শুনলো কোন রকম প্রতিবাদ না করে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু প্রান্তিক তুমি জাননা, আমার জন্মদিনে প্রথম মিষ্টিটা তিনি নিজে হাতে আমার মুখে তুলে দিতেন। আমি তা ভুলব কি করে। বললাম তোমার তো মা আছেন, তার হাত থেকে নিয়ে নাও তোমার প্রথম মিষ্টিটা। এই পৃথিবীতে কোন সন্তানের কাছে বাবাই সব নয়, মাকে তার অর্দ্ধেক অংশতো ছেড়ে দিতেই হবে। তোমার মায়ের আঘাতটা তুমি দেখবেনা?

তাহলে আমি কি করব তুমি বলে দাও প্রান্তিক? বলল রেহানা, আমি বললাম, আমি বলে দেওয়ার কে? কখন যেন সেলিনা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে বুঝতেও পারিনি। বলল, চা একেবারে জল হয়ে গেছে প্রান্তিক ভাই, মিষ্টিটাও সেই ভাবে পড়ে রয়েছে। দিন না সব বদলিয়ে নিয়ে আসি।

রেহানা বলল, তুই বোস সেলিনা। আমি নিয়ে আসছি এসব। ও হাসতে হাসতে বলল সেই ভাল। রেহানা ও সব নিয়ে চলে গেলে, চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলল সেলিনা। বললাম কিছু বলবে? বা একজনকে এত কথা বললেন আর আমার বেলায় ফাঁকি? তা হবেনা প্রান্তিক ভাই? আপনাকে আজ শাস্তি পেতেই হবে! হেসে বললাম কি শাস্তি। ও তেমনি চাঁপা কৌতুকে বলল, এ নাটকের শেষ দৃশ্যে আপনি কেমন অভিনয় কবেন, তা দেখতে হবে। মানে?

আমার দিকে কৌতূহলী চোখ তুলে বলল, ওই তো রেহানা আসছে ওর কাছে মানেটা বুঝবেন, আমি আসছি। আমি বললাম, না তুমি বস। আমি যখন অভিনয়ই করছি তখন সে অভিনয় ঠিকঠিক হচ্ছে কিনা তার জন্যতো দর্শক চাই, তুমিই না হয় আজকের দর্শক হও। আমার বয়ে গেছে, বলে চাপা কৌতুক ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো ও।

রেহানা বল্ল, ও চলে গেল যে। বললাম, কি করে বলব কেন চলে গেল। তুমি ওকে ডাকনা। থাক না, ও এমনিই আসবে, এবার খেয়ে নাও। আগে তুমি খাও। তারপর কি ভাবে ভেবে বললাম, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি। ও চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে বলল কোথায় যাচ্ছ। এই আসছি বলে রান্না ঘরের কাছে গিয়ে সেলিনাকে বললাম, মাসীমাকে নিয়ে একবার এ ঘবে এসোতো সেলিনা।

একটু পরে ওরা ঘরে এলে, আমি আফরোজ বেগমকে বললাম মাসীমা আজতো রেহানার জন্মদিন তাই না? উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম তা এই রকম নিরামিষ জন্মদিন হবে? মিষ্টি মুখ খাওয়া দাওয়া কিছু হবে না? সেলিনা বলল, আপনি যে এরকম পেটুক তাতো জানা ছিল না। আমি হাসতে হাসতে বললাম আসলে

পিসির বাড়ী থাকি কিনা। সব সময়তো ইচ্ছে মতো খাওয়া হয় না, তাই কোন আনন্দ উৎসবের বাড়ী গেলে পুষিয়ে নিই। সেলিনা তেমনি হাসতে হাসতে বলল, তাই বুঝি। তা সামনেই তো এক গাদা খাবার রয়েছে, ওখান থেকে তো ইচ্ছে মতো খেয়ে নিতে পারেন প্রান্তিক ভাই! পারি কিন্তু অসুবির্ধা হচ্ছে, নিয়ম! যার জন্মদিন তার বাবা বা মা, নাহলে সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি তিনি যার জন্য এই উৎসব তার মুখে প্রথম খাবার তুলে না দিলে খাই কি করে? অথচ সামনের এই ভাল ভাল খাবার দেখে জিভের জলও ধরে রাখা যাচ্ছে না। সেলিনা চোখ টিপে হাসছে।

আমি আফরোজ বেগমের দিকে তাকিয়ে বললাম, নিন মাসীমা, ওখান থেকে মিষ্টি তুলে নিয়ে আগে রেহানা, তারপর সেলিনাকে দিন। সেলিনা বলল, আর আপনাকে! আরে আমি তো আজকের অভিনেতা, মানে তোমার ভাষায় যদিও আমার মর্যাদা পাওয়া উচিৎ ছিল আজকের একমাত্র অতিথির। তা তোমার ভাষায় আমি যখন অভিনেতাই, তখন না হয় অভিনয় করতে করতেই খেয়ে নেবো। কিন্তু সেলিনা, শুধু মিষ্টিতে অতিথি আপ্যায়ন এ আমার একদম পছন্দ নয়।

রেহানা অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। তার যেন কেমন সন্দেহ হল। বলল, কি ব্যাপার প্রান্তিক এ সব অভিনয় টভিনয় কি সব বলছ? আমি বুঝতে পারছি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কথাটা রেহানার মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এর থেকে বেরোবো কি করে? বললাম, সেলিনা তখন কি বলল জান? কি? আমাকে নাকি দেখতে ঠিক অভিনেতার মতো।

হেসে উঠলো সেলিনা। আর সেই সঙ্গে আমরা সবাই। আফরোজ বেগম প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে দিলেন রেহানার মুখে, আর সঙ্গে সঙ্গে ও মাথা নীচু করে ওর মায়ের কাছ থেকে আর্শীবাদ নিলো। সেলিনাও মিষ্টি তুলে ওর মুখে দিল। রেহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল তুমি দেবেনা? আমি ইতস্তত করে বললাম, দিতেতো ইচ্ছে করছে, কিন্তু দিই কোন অধিকারে বলতো?

সেলিনা আবার তার কৌতুক ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এত কি ভাবছেন প্রান্তিক ভাই। আপনিতো অভিনেতা, সেই অভিনেতার অধিকারেই না হয় রেহানার ইচ্ছেটা পূরণ করুন। এক সঙ্গে আমরা আবার হেসে উঠলাম সবাই।

দিন যায় মাস যায় জীবন এগিয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। কেমন যেন মনে হয় আরো জটিল শৃঙ্খলে বাধা পড়ে যাচ্ছি প্রায় সব জায়গায়।

আকাশ সেদিন গোধুলি আবিরে রাঙা, হয়তো তখনি সন্ধ্যা নামবে পৃথিবীর অঙ্গনে, পাখীর কলকাকলিতে মুখর আকাশ। উঠতে হবে। অশ্রুকণা আপন মনে পরপর ঢিল ছুড়ে চলেছে সামনের বয়ে যাওয়া নদীর জলে। নদীর এ পাশটা নির্জন। সাধারণের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। এক ঘন্টা বেশী অতিবাহিত হয়ে গেছে নীরবে বসে আছি পাশাপাশি।

অথচ আজ যখন পরীক্ষার হলে ঢকতে যাচ্ছি, ও পাশ থেকে ডেকে বলল, প্রান্তিক

তোমার বইটা পড়া হয়ে গেছে, এ কয়দিন দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ভীষণ ভালো লাগলো বইটা। ওনি আরেকবার পড়বে, তারপর না হয় একদিন আলোচনা করা যাবে। বইটা দিয়ে এত দ্রুত ভিতরে ঢুকে গেল যে আমার কোন কথা শোনার অপেক্ষায় থাকলনা ও।

আমি বইটা আমার ঝোলা ব্যাগে, না দেখেই ঢুকিয়ে রাখলাম। মনে করতে পারছিনা কবে ওকে বইটা দিয়েছিলাম। আর বইটাই বা কি। হলে ঢোকার আগে বাথরুমে যেতে যেতে একবার খুলে দেখি ওর মধ্যে ভাজ করা একটা কাগজ। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুক পকেটে ভরে নিয়ে বইটা আবার আমার ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলাম। বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে বুক পকেট থেকে কাগজটা বের করে এক পলকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্রান্তিক, আজ কি পরীক্ষা শেষে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে? আমি অপেক্ষা করব নদীর পারে সেই নির্জন বটগাছটার নীচে। আসতে ভুলোনা কিন্তু কণা।

যৌবনের যে প্রান্তে উপনীত হয়েছি তাতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ইচ্ছে করে, কারো চিঠি পেতে বা কাউকে দিতে। দেওয়ার সাহস অর্জন করতে পারছিনা, ভীরু মন বার বার বাধা দিচ্ছে। যদি কেউ ভুল ভাবে। পেতে ইচ্ছে করে রেহানার চিঠি। কিন্তু কেন? আমি কি ওকে ভালোবাসি? জানিনা। সেরকম কোন গভীর শূণ্যতা তো মনের মাঝে উঁকি মারে না। প্রায়ই দেখা হয় ওর সাথে, মাঝে মাঝে ফেরার পথে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। কোন দিন সেলিনা থাকে কোন দিন থাকে না। যে দিন থাকে না সেদিন অস্বস্তি হয়। বুঝি আমি গেলে আফরোজ বেগম খুশী হন। তবু রোজ যেতে মন চায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, অনেক দিন যদি দেখা না হয় ওর সাথে, তা হলে ও নিশ্চয় চিঠি লিখে জানতে চাইতো আমি কি রাগ করেছি? কেন যাইনা ওদের বাড়ি? পারলে তাড়াতাড়ি একবার অবশ্যই যেন যাই আর কি কিছু লিখতো? জানিনা, সেরকম কোন ছবিতো কল্পনায়ও দেখছিনা, অথচ তার চিঠি পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু কেন? কেন? কে দেবে এ উত্তর আমায়?

পরীক্ষা শেষের একটু আগে বেরিয়ে গেছে অশ্রুকণা। ও হল থেকে বেরিয়ে যেতে তাকালাম ওর দিকে, ও তাকালো, তারপর নীরবে এবং দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা শেষ হলে অনেকের সাথে আমিও বেরোলাম। আমার ঠিক পিছনে রেহানা। তারপর একা পেয়ে বলল, অনেকদিন আসছোনা কিন্তু। আজ মা ভীষণ ভাবে তোমার কথা বলছিলেন। আসছো তো।

কি অদ্ভুত, ঠিক এমনি ভাষায় তার লেখা কাল্পনিক চিঠির কথা মনে পড়ে গেল। বললাম যাব, কিন্তু একটু দেরি হবে। কেন কোথাও যাবে? না একটু কাজ আছে। কোথায়? অসুবিধা না হলে আমিও যেতে পারি। কি যে বলি ওকে। বললাম, ওটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে রেহানা। তুমি যাও, একটু দেরি হবে। তবে আমি যাব। হঠাৎ ও বলে উঠলো কোন অভিসারিকা অপেক্ষা করছে বুঝি? বলে ভীষণ কৌতুকে হেসে উঠলো ও। আমিও হেসে উঠে, বললাম, তোমার একথা যদি সত্যি হতো রেহানা তবে, নিজেকে ভীষণ দামী বলে মনে হতো। ও তেমনি চোখের তারা নাচিয়ে বলল তাই বুঝি। চেষ্টা করে দেখব তোমার সাধ মেটে কিনা। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল

নিছক কৌতুক। কিন্তু সবটাই কি কৌতুক। অশ্রুকণার বই দেওয়া দেখেছে, আগে আগে চলে যাওয়াও দেখেছে। কিছু সন্দেহ উকি দেয় নিতো? আর তাছাড়া এত দিনের মেলামেশায় রেহানাকে এমন চপল মনে হয়নি কখনো।

অবশ্য বেশীক্ষণ ওর কথা ভাবার সময় পাইনি। এক সময় সেই পরিচিত বটগাছটার নীচে এসে উপস্থিত হলাম। কিছু আগেই ওখানে এসে অপেক্ষা করছে অশ্রুকণা। আমি চুপিচুপি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও যেন জানতই আমি ছাড়া আর কেউ নয়। তাই কোন হেলদোল নয়, নীরবে এক দিকে সরে বসল মাত্র। কিন্তু কোন কথা বললনা। আমি পকেট থেকে ওর লেখা চিঠিটা ওকে ফেরৎ দিয়ে বললাম, তুমি আসতে বলেছিলে। ও চিঠিটাতে একবার চোখ বুলিয়ে কুটি কুটি করে ছিড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। বললাম, একি করলে কণা? ওটাব ওপরতো তোমার কোন অধিকার নেই, বলল ভেবেছিলাম নেই, কিন্তু এখন দেখছি অধিকার জিনিষটা বড় কঠিন, তা হেলায় অর্জন করা যায় না।

বুঝতে পারলাম না অশ্রুকণার এই অভিমানের কারণ কি? ও নীরবে একের পর এক ঢিল ছুঁড়ে চলেছে নদীর জলে। বললাম কণা, ভীষণ খিঁদে পেয়েছে। চলো ওঠা যাক। ক্যান্টিনে খেতে খেতে তোমার কথা শুনব। ও বলল দরকার নেই আমার কথা শুনে। তোমার তো খিদে পেয়েছে, কি খাবে বল? মানে, আমি যা খেতে চাইব তাই তুমি খেতে দেবে? না তা হয়তো পারব না, তবে আমার কাছে যা আছে তা তোমাকে দিতে পারি।

বুঝতে পারছিনা অশ্রুকণা কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে কথা বলছে। এত কাটাকাটা কথাতো ও কোন দিন বলেনা। যাই হোক আমি অন্যরকম ব্যাখা না করে বললাম, তোমার সঙ্গে যা আছে তা খেতে আমার কোন আপত্তি নেই। আসলে খাওযার ব্যাপারে আমার কোন বাছ বিচারই নেই। খিদের সময পেট ভরার মতো যে কোন রকম খাবার পেলেই আমার চলে যায়। ও চুপ করে আছে। কোন কথা বলছেনা। বললাম, কি এত চুপ করে আছো যে? না ভাবছি? কি ভাবছো? ভাবছি তোমার জীবনের এই সহজাত সৌন্দর্য যদি আমি পেতাম! তোমার কোন কথাই বুঝতে পারছিনা আমি। ও বলল বুঝে তোমার কাজ নেই প্রান্তিক। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে বের করলো টিফিনের কৌটো। পরোটা আলুভাজা এবং সন্দেশ। কৌটো খুলে আমার হাতে দিয়ে দিল সবটাই। বললাম। তোমার টা? আমি খেয়েছি। মিথ্যে কথা। আমি মিথ্যে কথা বলিনা। এটাও মিথ্যে কথা। তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি?

আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। বললাম তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো? কেন বলতো? কি করেছো তুমি যে তোমার সাথে ঝগড়া করব। ও বলল, তাহলে আমার সঙ্গে তুমি ঝগড়াও করতে চাওনা। তাবপর ধীর গলায় বলল জানতাম প্রান্তিক, আমার কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে। অথচ এ কদিন আমি প্রতি মুহূর্ত তোমাকে এড়িয়ে চলেছি কেন জান? আমি আবারও অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। ও বলে চলল, কি জানি তুমি হয়তো আমাকে এড়িয়ে চলবে তাই। না হলে যে কথা মুখে বলতে পারতাম, তা চিঠিতে বলার দরকার হ'তো না। কণ্ঠভারি, দৃষ্টি উদাস, মন যেন বিষণ্ণ। বললম সত্যি আমি

কিছু জানি না কণা, কি হয়েছে তোমার? কি এমন করেছো যাতে তোমাকে এড়িয়ে চলার প্রয়োজন হবে আমার? না কিছুনা। তার মানে আমাকে তুমি বলতে চাওনা। থাক ওসব কথা, বল কেমন আছো?

আমি রেগে গিয়ে বললাম, এবার কিন্তু সত্যি এড়িয়ে চলার মতো কথা বলছ। কি হয়েছে তোমার? কি করেছো এমন? না কিছুনা। ও আস্তে বলল। কিছুনা বললে হবে কেন? না আমাকে তুমি বলতে চাওনা? ও বলল জানিনা, এবার খেয়ে নাও তো। আমারই বোঝা উচিৎ ছিল। তুমিতো টিফিন আনো না খিদেতো তোমার লাগতেই পারে। না আমি খাবনা। যতক্ষণ তুমি না বলবে ততক্ষণ আমি কিছুই খাবনা। ও বলল, মাথা গরম করোনা প্রান্তিক, আজ খেয়ে নাও। তোমাকে নিশ্চয়ই বলব, তবে আজ নয় আরেক দিন।

আমার যে কি হল জানিনা, ওর সমস্ত খাবারটা নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, তবে আমিও আরেক দিন খাব। ও অস্পষ্ট ভাবে উচ্চরণ করলো কি নিষ্ঠুর তুমি। কিন্তু আমি তা শুনেও শুনলাম না। ও আর কোন কথা বলল না। আমারও যেন কিছু বলার নেই। মনের মধ্যে একটা শুধু প্রশ্ন, আমি কি সত্যিই এত অভিমানী? দীর্ঘক্ষণ কেটে গেছে একই ভাবে। এখুনি আঁধার নামবে। বললাম, আজ তা হলে ওঠা যাক কণা। ও হ্যাঁ - না কিছুনা বলে তেমনি মাথা নীচু করে রইল। আমি এবার ওর মাথাটা নিজ হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম কি হল? কিন্তু একি! চোখের জলে ওর বুকের আঁচল পর্যন্ত ভিজে গেছে। অঝোরে কাঁদছে ও। কী হয়েছে ওর?

জানিনা একে ভালোবাসা বলে কী না। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুধু ওর কথা ভেবেছি। কি হয়েছে ওর? ওকে কি কেউ ঠকিয়েছে? না ও ঠকিয়েছে কাউকে। জানিনা, কিছুই জানিনা। মনটা এক অজানা দুশ্চিন্তায় ভারি হয়ে ওঠে।

তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। বাস স্ট্যান্ডে ওকে বললাম, আমি কি এগিয়ে দিয়ে আসব তোমাকে? না। আমার কিন্তু কোন অসুবিধা নেই। আমার আছে। ও ঠিক আছে।

রুটের বাস এসে দাঁড়াতেই, আমি ওকে তুলে দিয়ে নিজের বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ মনে হলো আমি তো রেহানাকে কথা দিয়েছিলাম। কি করে তা ভুলে গেলাম। একবার মনে হল থাক আজ আর যাবনা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তা কি করে হবে? আমিতো কথা দিয়েছি রেহানাকে। একটু দেরি হবে। কিন্তু আমি যাবই। ওর মা আফরোজ বেগম আমাকে সন্তানের মত ভালোবাসেন তাকে অপেক্ষায় রাখা কি ঠিক হবে? আর রেহানাই বা কী ভাববে? কিন্তু ওখানে যে এতটা দেরি হয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি।

যখন পিসির ওখানে ফিরেছি তখন রাত ১০টা। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি। পিসি না জানি কী না কী বলবেন। এমনিতেই দেরি হলে হাজারো কথা শুনিয়ে দেন। আর আজতো একেবারে রাত দশটা। কিন্তু এমন ভাবে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে গেল যে, আমার কোন উপায় ছিল না, ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে ফিরে দেখি পরিমলবাবু ফিরে এসেছেন। উনি জানতে চাইলেন কেমন আছো প্রান্তিক? পরীক্ষা কেমন হয়েছে? বললাম ভালো। আপনার শরীর কেমন? উনি বললেন ভালো, তারপর আমাকে জিজ্ঞাস করলেন তোমার

পিসি কি কোথাও গেছেন? বলে গেছেন কি কিছু তোমাকে? আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন উনি ফেরেন নি? না ফেরেননি, তাইতো তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তাছাড়া ওনার অফিস থেকে বেরুবার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি। বললাম আপনি আসবেন উনি জানেন? তাতো ঠিক জানিনা, তবে চিঠি একটা দিয়েছিলাম। পেয়েছে কীনা তাও জানিনা। বললাম তার মানে আপনার চা বা কফি কিছুই খাওয়া হয় নি। আমি দেখছি বলে তাড়াতাড়ি গ্যাস জ্বালিয়ে ওনার জন্য এক কাপ কফি বানালাম । একাজ গুলো অবশ্য সব এখানে এসে শিখে নিয়েছি। কলকাতা আর যাই হোক মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

উনি কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, কোথায় যেতে পারেন বলে মনে হয়। বললাম, তাতো ঠিক জানিনা পিসেমশাই। আপনি বরং ওনার অফিসে একবার যোগযোগ করে দেখুননা। নিস্পৃহ গলায় বললেন, এখন কি আর কাউকে পাওয়া যাবে? আমি চিন্তিত ভাবে বললাম, তাও ঠিক। কিন্তু কোথাও তো খোঁজ নিতে হবে। একবার থানায় খোঁজ নেবো? থানায় কেন? কোথাও কোন দুর্ঘটনা তো হতে পারে। হ্যাঁ তা পারে। তারপর বললেন দরকার নেই। তুমি একটা কাজ করতে পারবে? বলুন! মনে হয় হোটেল এখনো খোলা আছে। আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি বরং রাতের খাবরটা কিনে নিয়ে এসো।

মাঝে মাঝে যে রাতের খাবার হোটেল থেকে আনা হয় না তা নয়। তবে, সেটার পরিবেশ এবং পরিস্থিতি আলাদা রকম। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, পিসেমশাইয়ের দিকটাও দেখতে হবে। সারাদিন উনি কিছু খাননি, কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। বললাম, হোটেলে যেতে আসতে সময় লাগবে, তার চেয়ে আমি বরং আলু, ডিম সিদ্ধ ভাত করছি। ঘরে মাখন এবং দুধ আছে বেশী সময় লাগবেনা। উনি বললেন তা হয়তো লাগবেনা। কিন্তু কালতো তোমার পরীক্ষা আছে। পড়বে কখন? বললাম, না আমার পরীক্ষা আজই শেষ হয়ে গেছে। উনি আর কথা বাড়ালেন না, শুধু বললেন, তাহলে যা ভাল হয় কর। তার এই নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় যে ভীষণ ক্লান্ত, মায়া হয় মানুষটার জন্য।

ভাত বসিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলাম পিসি কোথায় যেতে পারেন। পরিমল বাবু বলছেন, তিনি আজ আসবেন তা তিনি আগেই জানিয়েছেন, তা হলে? হঠাৎ মনে হল দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে পিসিদের এক অফিস সহকর্মী থাকেন, একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে আদৌ তিনি অপিসে গিয়েছিলেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম, দীপংকর বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। অত রাতে আমাকে দেখে অবাকই হয়েছেন বুঝতে পারছি, আগেও ২/১ দিন আমি এ বাড়ীতে এসেছি বললেন কি ব্যপার প্রান্তিক, এত রাতে? আমি বললাম, পিসি এখনো বাড়ী ফেরেননি। আজ কি উনি অফিসে গিয়েছিলেন? উনি অবাক হয়ে বললেন, 'সেকি উনিতো অফিস থেকে আজ অনেক আগেই বেরিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম এত আগে যে? উত্তরে বললেন, পরিমলের আজ আসার কথা, অথচ একটু বরানগর যেতে হবে।' আমি অবাক হয়ে বললাম বরানগর? সেখানে কোথায় যাবেন কিছু জানেন? না ঠিক জানিনা, আমি জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর নিজেই জানতে চাইলেন ওখানেকি তোমাদের কোন আত্মীয় স্বজন নেই?

মনে মনে ভাবলাম এর কি উত্তর দেব? আমি যতদিন আছি ততদিন বরানগরের কারো কথা শুনিনি। অবশ্য কয়েকদিন ধরে অশ্রুকণাদের বাড়ী কোথায়? ওদের বাড়ীতে কে কে আছে? আমি ওদের বাড়ী গেছি কিনা এসব কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু সেখানে যাবেনই বা কেন। অশ্রুকণাদের ফোন আছে, ফোন করা যেতে পারে। কিন্তু ফোনটা কোথা থেকে করা যাবে? দীপঙ্করবাবু বললেন কি ভাবছ? বললাম না কিছুনা। কিন্তু ওখানে তো যাওয়ার কোন কারণ নেই, মানে আমাদের বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগও নেই। তবে কোন বিশেষ কারণে যেতে পারেন, কিন্তু এখনতো বাস ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ পিসেমশাই খুব চিন্তা করছেন। কি যে করি। আমি কি তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি? আমি বললাম, এখানে কি কোন ফোন পাওয়া যাবে? যেখানে যেতে পারেন বলে মনে হয়, সেখানে ফোন আছে, একবার ফোন করে দেখা যেতে পাবে। উনি বললেন, এসো আমাব সঙ্গে আমাদের বাড়ীতেই ফোন আছে। তুমি ফোন নাম্বার জানতো? আমি বললাম হ্যাঁ জানি। ডায়াল করলে ও পাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন বললেন হ্যালো? আমি প্রান্তিক বলছি। ও তুমি? কি ব্যাপার এতরাতে কোথা থেকে ফোন করছ? আমি কণা বলছি। অশ্রুকণার সঙ্গে কথা বলার মানসিকতা এই মুহূর্তে একদম নেই। তাই উচ্ছলতা প্রকাশ না করে সরাসরি বললাম, পিসি এখনও ফেরেনি, খুব চিন্তায় আছি। চিন্তা করোনা উনি এক্ষুনি পৌঁছে যাবেন। কাল কলেজে এসো - বাই। অশ্রুকণা ফোন ছেড়ে দিল। অশ্রুকণাও বাহুল্য কথা না বাড়িয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে লাইনটা কেটে দিল'। আমার মনে এক জটিল প্রশ্ন। পিসি কণাদের ওখানে কেন? কিন্তু এটা ঠিক, পিসির একটা নিদিষ্ট সংবাদ পেয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। মানে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। দীপঙ্করবাবু বললেন, খোঁজ পাওয়া গেল? হ্যাঁ, পিসি অশ্রুকণাদের বাড়ী গিয়েছিলেন, তবে একটু আগে বেরিয়ে এসেছেন। যাক নিশ্চিন্ত।

বাড়ীতে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর দেখি একটি ট্যাক্সি থেকে নামছেন পিসি? আমাকে উদ্বিগ্ন দেখে বললেন, কি ব্যাপার? আমার তখন কথা বলতে একদম ভালো লাগছেনা। বললাম, এত রাত পর্যন্ত তুমি বাড়ীর বাইরে, চিন্তা হয় না? চিন্তা কেন? আমি তো জানিয়ে গেছি, যে আমার আসতে রাত হবে, চিন্তা করোনা। কাকে বলে গেছো? কেন তোমার পড়ার টেবিলে আমি চিঠি লিখে চাপা দিয়ে গেছি তুমি পাওনি? হয়তো হবে। কিন্তু পড়ার টেবিলে যাওয়ার সময় পেলাম কোথায়।

কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে না গিয়ে বললাম, পিসেমশাই তোমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আজই আসছেন, তাহলে কি তোমার আজ কোথাও না গেলে হতো না? উনি ভীষণ রেগে মেগে বললেন, কি সব আজে বাজে কথা বলছ। আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। যাও ঘরে যাও। উনি এতটা রেগে আছেন কেন জানি না। কিন্তু এত কঠিন কথারও কোন প্রতিবাদ না করে আমি রান্না ঘরে এসে ঢুকলাম আর উনি আমার পিছন পিছন এসে ঢুকলেন সেখানে। গ্যাসে তখন ভাত প্রায় ফুঁটে এসেছে আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে খানিক পরে ভাতটা নামিয়ে নিলাম।

পিসি কোন প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে গেলেন। আমি টেবিলে

পেপার ওয়েটে চাপা দেওয়া পিসির লেখা কাগজটা তুলে নিলাম। 'প্রান্তিক, আমার একটু কাজ আছে। ফিরতে দেরি হবে। চিন্তা করো না। তোমার পিসেমশাইয়ের আসার কথা। আসবে কী না জানি না। ফ্রীজে মাছের ঝোল করা আছে। পারলে ভাতটা করে নিও - পিসি।'

নিজেকেই নিজের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করলো। একবারতো টেবিলটা দেখা উচিৎ ছিল। না, দেখছি আমার সাধারণ বুদ্ধিটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে আসতে গিয়ে শুনতে পাচ্ছি, পরিমলবাবু এবং পিসি কথা কাটাকাটি করছেন। একসময় মনে হলো, আমার ইনটারফেয়ার করা উচিৎ, কিন্তু তারপর মনে হলো না দরকার নেই। একসময় নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তা ঘটতেও যেমন সময় লাগে না মিটতেও তাই।

খানিক পরে আমি পিসেমশাইকে ডাকলাম। বললাম পিসেমশাই আসুন। খাবার দিয়েছি।

ছোট্ট সংসার, এসব কাজ গুলো শিখে নিতে হয়েছে। অবশ্য তার জন্য আমি পিসির কাছে কৃতজ্ঞ। পিসিও এলেন। বলতে গেলে নীরবেই রাতের খাওয়া শেষ হল।

রাতে কিছুতেই ঘুম আসছেনা। চিঠিতে লিখেছেন, পরিমলবাবুর আসার কথা, আবার আমাকে বললেন, উনিতো জানেন না। এসবের মানে কি? আবার আজই অশ্রুকণাদের বাড়ী যাওয়ার দরকার কি ছিল?

পরের দিন অশ্রুকণার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, খুব হাসিখুশী। ম্যাচিং করা শাড়ী ব্লাউজ চটি পরেছে কণা। তার সঙ্গে ম্যাচিং করা সবুজ টিপ। শ্যাম্পু করা চুলে এলো বেণী। ভীষণ ভালো আর সুন্দব দেখাচ্ছে অশ্রুকণাকে। ঠাট্টা করতে ছাড়লাম না, বললাম, আজকি তুমি ছেলেদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই অপরূপ সাজে সেজেছো কণা? ও ঠাট্টা করেই জবাব দিলো, মনে হচ্ছে তোমার মাথাটাই শুধু ঘোরেনি এখনো, ওটা যদি ঘুরতো তাহলে না হয় বুঝতাম তোমার কথার একটা মূল্য আছে। বললাম, তাই বুঝি? ও কিছু বললনা, শুধু হাসল, আমি বললাম, আজ কি তোমার কলেজে কোন কাজ আছে? কেন বলত। না এমনি বলছিলাম।

আমরা কলেজ থেকে একটু দূরে চায়ের দোকানে এসে বসলাম। ও বলল এখানে বসলে যে। বা! তুমিতো বলনি কোথায় যাবে? আমি না বললে বুঝি তোমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না? বললাম সে কথা ঠিক নয় কণা। আসলে তোমাকে একটু বুঝতে সময় দেবেতো? তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছিনা।

ও খামোকা বলল আচ্ছা তুমি কি কাউকে বোঝ? আমি অবাক হয়ে বললাম তার মানে? ও উত্তরে হঠাৎ বলল আচ্ছা, দেবযানীর ওই কথাটা তোমার মনে আছে? কোন কথাটা। ওই যে দেবযানী যেখানে বলছে, "কখনো কি এ হয় নাই মনে, তৃপ্ত চোখে আজি এরে দেখায় সুন্দর।" আমি হাসতে হাসতে বললাম, আগে চা খাই তারপর ভেবে দেখা

যাবে।

ও যেন চুপসে গেল। বললাম কি হলো? না কিছুনা। চাটা খেয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদায় এলাম। বললাম, এবার বল কোথায় যাবে? কোথাও না। মানে? তারপর অবশ্য জানতে চাইলাম ছবি দেখবে? না। তাহলে চলনা মিনতি সেনদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয় না। আমার ভালো লাগছেনা প্রান্তিক। তাহলে চলো আমরা ফিরেই যাই। হ্যাঁ তাই চলো। আমরা আবার ফিরলাম। চলতি বাসে উঠে পড়লো ও আমাকে কোন কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়েই। হতভম্বের মত শুধু বললাম, আমার যে অনেক কথা জানার ছিল কণা। সেই ক্ষণিকের অবসরে ও শুধু বলল, আমার কিছু জানাবার নেই। হু হু করে আমার সামনে দিয়ে বাসটা বেরিয়ে গেল।

এই ক্ষণিকের আনন্দ ও বিদায় দৃশ্যে বিষণ্নতায় ভরে গেল আমার মন। মাঝে মাঝে মনে হয় একে যেন চিনি, আবার কেন যেন মনে হয় ও অনেক দূর-দূরান্তের। আর একথা মনে হতেই কখনো যা হয়নি, তাই যেন হতে লাগলো আমার ভিতরটায়, যেন বুকের মাঝ খানটাতে হু হু করে এক নিঃসঙ্গতার সুর বেজে চলেছে অবিরাম। কেন বুঝতে পারছিনা ওকে আর ওই বা কেন এই আধো ধরা আধো ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে বার বার। আমিই বা কি চাই? আমিই বা নিজেকে এমন করে অপ্রকাশ্যতার ঘেরাটোপে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখছি কেন?

হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই শিয়ালদা স্টেশন। প্লাটফরমে ঢুকে পড়লাম। শুনতে পাচ্ছি ডানকুনির ট্রেন ছাড়বে এখনি। কে যেন জোর করে আমাকে ওই ট্রেনে তুলে দিলো। কিন্তু কোথায় যাব? বরানগরে ঢুকতেই নিজের খেয়ালে নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে। পথ চিনিনা। রিক্সায় উঠে পড়লাম এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম অশ্রুকণাদের বাড়ী। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এখানে কি আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় এসেছি, না কেউ আমায় জোর করে নিয়ে এসেছে?

মনে মনে ভাবলাম, তবে কি এতক্ষণেও আমি অশ্রুকণাকে ভুলতে পারিনি। না ওর ওই ভাবে চলে আসাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি বলেই মুখোমুখি বোঝা পড়ার তাগিদটাই আমাকে এখানে পৌঁছে দিল। জানিনা, কিছুই জানিনা আমি।

কলিং বেল টিপতেই বেরিয়ে এলেন শ্রীময়ীদেবী। অশ্রুকণার মা। আমাকে একা দেখে বললেন, তোমার সঙ্গে অশ্রুর দেখা হয়নি? বিস্ময় আর অবাক দৃষ্টিতে আমার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন তিনি । বললাম - হ্যাঁ হয়েছে। ও কোথায়? এখনও তো আসেনি। উনি আমাকে ভিতরে এসে বসতে বললেন। তারপর বললেন, ও যে বলে গেল তোমার সঙ্গে ব্যান্ডেল যাবে। যাওনি বুঝি?

কি যে উত্তর দেব বুঝতে পারছিনা। ও ব্যান্ডেল যাওয়ার কথা একবারও বলেনি আমাকে। তবুতো উত্তর একটা দিতে হবে, বললাম ওকে জিজ্ঞাস করাতে ও বলল, না আজ আর কোথাও যাবো না, বাড়ীতেই ফিরে যাবো। ভাল লাগছেনা। মায়ের উদ্বিগ্নতা নিয়ে শ্রীময়ীদেবী বললেন শরীরটা খারাপ হয়নিতো? বললাম, মনে হয় না। উনি বললেন

তুমি একটু বোস, আমি এখনি আসছি।

বাইরে আবার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। আমি দরজা খুলতেই ও অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি আস্তে বললাম, ব্যান্ডেলে যেতে চেয়েছিলে আমাকে বললে না কেন? আমি কিন্তু মাসীমাকে বলেছি, ভাল লাগছে না বলে ও আজ আর যেতে চায়নি। দেখ তুমি আবার অন্য রকম কিছু বলোনা। ও, আচ্ছা, বলে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম ভিতরে আসবেনা? ও ঢুকতে ঢুকতে বলল, আমার মন বলছিল তুমি আসবে। তারপর বলল আমার ও রকম ব্যবহারের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত প্রান্তিক।

শ্রীময়ীদেবী ওকে দেখে বললেন, কি হল শরীর খারাপ? না। তাহলে ব্যান্ডেলে যাবি বলেও গেলিনা কেন? উত্তরে বলল হঠাৎ মনে হল, যাবো না। বিরক্তি মিশিয়ে শ্রীময়ীদেবী বললেন তোর এই হঠাৎ হঠাৎ খেয়াল কবে বন্ধ করবি অশ্রু? আর তাছাড়া ওকে একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় গিয়েছিলি? একটু দরকার ছিল মা। শ্রীময়ীদেবী রাগত ভাবে বললেন সে তো বুঝলাম, কিন্তু তা কি পরে করলেও চলতো না। ছেলেটা কতক্ষণ বসে আছে বলতো? তারপর বললেন চা খাবি ? অশ্রুকণা বলল চা করেছো নাকি? উনি তেমনি ভাবে বলে চলেন, না করিনি, কি করে জানব কখন আসবি? যা শাড়ীটা ছেড়ে ফেল, আমি তোর চা টা ক'রে নিয়ে আসছি।

আমি বললাম, দরকার নেই মাসিমা। আপনি বরং একটা খালি কাপ নিয়ে আসুন। আমারটা ভাগ করে নিচ্ছি। অশ্রুকণা বলল, সেই ভাল। শ্রীময়ীদেবী আর কথা বাড়ালেন না। একটা খালি কাপ এনে রাখলেন টেবিলের উপরে।

আমাকে একা পেয়ে এক সময় অশ্রুকণা বলল, জান প্রান্তিক আমার না ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ, ভীষণ। হঠাৎ তোমার কি হলো এত ভালো লাগার। ও বলল, সে তুমি বুঝবে না প্রান্তিক। তারপর বলল একটু বোস আমি শাড়ীটা ছেড়ে আসছি।

পিসি ও পরিমলবাবুর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। গতদিন থেকে পিসি অন্য ঘরে নিজের বিছানা আলাদা করে নিয়েছেন। ঘরটা আমার পাশের ঘর।

আমার আর একমুহূর্ত্তও এবাড়ীতে ভালো লাগছেনা। পরিমলবাবু অফিসে চলে গেছেন। পিসির তখনো কোন তাড়া নেই। বললাম, অফিসে যাবে না? না। কেন? ছুটি নিয়েছো? না, যেতে ইচ্ছে করছেনা তাই। তুমিতো এমন হঠাৎ করে অফিস কামাই করো না। তা তোমাকে কি সব কথাই জানতে হবে? আমি বললাম, তুমি কিন্তু অকারণে রেগে যাচ্ছ। তারপর বললাম একটা কথা বলব? বল। বললাম, মনে হচ্ছে পিসি তুমি ঠিক করছ না। হঠাৎ উনি রেগে গিয়ে বললেন, আমার পক্ষে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা কি তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে? এও তোমার রাগের কথা পিসি। কিন্তু একটু স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করে দেখো, তুমি যা করছ তা ঠিক কীনা। কি ঠিক নয়। এই যে আলাদা ভাবে থাকা, এটাকি তুমি ঠিক করছ? পিসি বললেন এটা আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, এখানে তোমার নাক গলানো একেবারে অন্যায়। আমিও দমবার পাত্র নই। বললাম, হয়তো একদিন এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই, মানে? মানে কি

আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? মনে হচ্ছে তুমি অনেক বড় হয়ে গেছো। বড় যে হয়ে গেছি তা কি তুমি অস্বীকার করতে পার? পিসি বললেন, তুমি যতই বড় হও না কেন আমার কাছে তুমি সেই ছোট্ট আছ। আমি জোরের সঙ্গে বললাম। তোমার একথা মানিনা পিসি। তুমি কিছুতেই আমাকে আর আগের মত ছোট্টটি ভাব না। তা হলে কি ভাবি। কি ভাব সেটাতো তোমারই ভালো করে জানার কথা, আমি কি করে বলব। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই, একই বাড়ীতে এভাবে আলাদা থাকাটা আমার ভাল লাগছেনা। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। এভাবে যদি তোমবা থাকতে চাও তা হলে আমাকেও এখান থেকে চলে যেতে হবে।

পিসির কণ্ঠে উষ্মা। বললেন, তাতো যাবেই। পিসির প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে তোমার কাছে। আর থাকার প্রয়োজনটা কিসের। আমি বললাম এও তোমার ভুল পিসি। পিসি বললেন, কোন দিনই তোমাকে আর আমার দরকার হবে কীনা জানিনা। ভবিষ্যতই তা বলতে পারবে। আজ কিন্তু অন্তত নিজের স্বার্থের জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন। তাই যখন তখন ছেড়ে যাওয়ার কথা বলনা প্রান্তিক, তাতে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক তা আমি কি করে চাইব? তোমাকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে এ তোমাকে কে বলল? আমরা বলেছি কখনো? না বলনি, তবে তুমি যা করছ তাতে আমাকে একটা পক্ষ হতে বেশী সময় লাগবেনা। তাছাড়া পিসেমশাইয়ের দোষটা কি? পিসি বললেন, তুমিওতো পুরুষ ছেলে তাই আরেকটা পুরুষের দোষ দেখতে পাওনা, পাবেও না কোনদিন। তোমাদের কাছে তো মেয়েরাই সব অশান্তির মূলে। তারা মানিয়ে নিতে পারেনা, তারা অবুঝ, তারা স্বার্থপর। তারা নিজেরটা যেমন বোঝে, অন্যেরটা সে ভাবে বোঝেনা। এসব তো প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে। আর তাকে সযত্নে লালন করে চলেছে তোমাদের মত পুরুষেরাই। তাই তুমি বুঝবেনা। পিসি যে মানসিক ভাবে যন্ত্রনা বিদ্ধ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আমি আস্তে বললাম, আমার মনে হয় তোমার এ অনুমান ভুল। পিসি বললেন দেখ আমি মেয়ে। পুরুষের যে কোন পদক্ষেপ মেয়েদের চোখে যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তা আর কাবো চোখে হয় না। তাই তোমার কথা মানতে পারছিনা। আমি আরো জোরের সঙ্গে বললাম, এটাও তোমার সম্ভবত ভুল ধারণা পিসি, বরং তুমি যদি বলতে মেয়ে হিসাবে তুমি আরেকটা মেয়ের তাকানো, চাওয়া, তার প্রতিটি পদক্ষেপ, তার মন কি চায়, একটা মেয়ে হিসাবে তোমার তা অজানা নয়, তাহলে তারমধ্যে হয়তো খানিকটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি মেয়ে বলে কোন পুরুষের পদক্ষেপ তোমার নখদর্পনে তা আমি বিশ্বাস করিনা। তারপর হঠাৎ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে জানতে চাইলাম বলতো আমি কি চাই? আমিও তো একজন পুরুষ।

পিসি চমকে উঠে বলল তার মানে? কি বলতে চাও তুমি? আমাকে তুমি এত কাছ থেকে দেখছ, আমার প্রতিটি গতিবিধি তোমার নখদর্পণে শুধু নয়, তুমি তা নিজ অভিজ্ঞতায় তীক্ষ্ণভাবে বিচার করতে চাইছো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি বলতে পারবে আমি

কি চাই? আমার ভেতরটায় কিসের যন্ত্রণা?

পিসি বোধ হয় আমার কাছ থেকে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন আশা করেনি। কিন্তু তাই বলে দমবার পাত্রীও তিনি নন। বললেন তা আমি কি করে জানবো তুমি কি চাও? হয়তো চাও, আমি যা চাই তার বিপরীত কিছু। তারপর একটু থেমে বললেন, আর আমাকে বিরক্ত করো না। আমি ভীষণ ক্লান্ত প্রান্তিক।

আমি দমে গেলাম। এরপর কি ভাবে কি বলা যায় বুঝতে পারছিনা, তবু বললাম, না পিসি তা নয়, তুমি যা চাও হয়তো আমিও তাই চাই, শুধু আমরা কেউই জানিনা, সত্যি করে কি চাই আমরা। ঐ সব চাওয়া পাওয়া থাক পিসি। অনেকদিন গ্রামের বাড়ীতে যাইনা। ভাবছি একবার যাব, তুমি যাবে নাকি। তুমিও তো যাওনা অনেক দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিসি বললেন, যেতে তো ইচ্ছে করে প্রান্তিক, তবু যেন মন থেকে সাড়া পাইনা। কোথায় যেন আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। কাউকে আর আগের মতো বিশ্বাস করতে পারিনা। তুমি যখন এত কাছে থেকেও আমাকে বুঝতে পারছনা। বুঝতে পারছি কেউ আমাকে বুঝতে পারবেনা। অনেক ছোট তুমি। তবু পারবে কি বলতে, কি হলে আবার আমি নিজের মনে সেই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারব?

বুঝতে পারছি পিসির দুটি চোখ ছলছল করে উঠছে। এখন ওনার সত্যি একা থাকা দরকার। আর দরকার অন্তত একবার মিনতি সেনের সঙ্গে তাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। আর আমাকেও এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে চাইলে পিসি বললেন তুমি কোথায় যাচ্ছ প্রান্তিক? বললাম একবার মিনতি সেনদের বাড়ী যাব ওনার বাবা খুব অসুস্থ। আমাকে একবার যেতে বলেছেন। ভীষণ অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তোমাকে যেতে বলেছেন? তোমার সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয় বুঝি? বললাম না পিসি প্রায়ই দেখা হয় না, তবে মাঝে মাঝে হয়। কিভাবে? ওর অসুস্থ বাবা বলেছিলেন তুমি মাঝে মাঝে এসো দাদুভাই, তাই মাঝে মাঝে আমি নিজেই যাই। দাদুভাই কথাটা কানে যেতে কেমন যেন চমকে উঠলেন পিসি। খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা বুঝবার চেষ্টা করেন পিসি। তারপর সহজ ভাবে জানতে চাইলেন, সম্পর্কটা সুন্দর, কিন্তু বুঝতে পারছিনা প্রান্তিক মিনতি সেনের বাবা তোমার দাদুভাই হলেন কি করে? বললাম সে অনেক কথা পিসি। এক কথায়তো তার উত্তর দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে একদিন আসতে বলব মিনতি সেনকে। দেখবে তোমার মন কত হাল্কা হয়ে গেছে।

আমি উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে, যদি কিছু বলেন? কিন্তু না, আমার মনের আশা ব্যঞ্জক কিছুই বললেন না. পিসি। শুধু বললেন, বুঝতে পারছি প্রান্তিক আমি তোমার কাছে মূল্যহীন। আমার কোন দাম নেই তোমার কাছে। এখন ওই মিনতি সেন, ওঁর বাবা, এঁরাই তোমার সব, এরাই তোমার আপনজন। তাহলে আর দেরি করে কী লাভ? যাওনা তুমি মিনতি সেনদের ওখানে। হয়তো একদিন জানতে পারবো, তুমি এখন পাকাপাকি ভাবে ওখানেই আস্তানা গেঁড়েছো। আমাকে হয়তো চিনতেও পারবেনা। সেই চিরন্তন নারী,

ভিতরটা যার ঈর্ষার আগুনে জ্বলছে। বুঝতে পারছি নিজেকে শোধরাবার কোন চেষ্টাই নেই নীলাঞ্জনা পিসির। কিন্তু আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। আস্তে আস্তে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের পড়ার চেয়ারটায় এসে বসলাম। আমার ভিতরটাও বড্ড অশান্ত। কি যে বলতে চেয়ে ছিলাম, আর কি যে বললাম, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ হয়ে বসে থাকতে পারছিনা। আবার উঠলাম। তারপর পিসিকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার সেই পথ ভ্রান্ত পথিকের মতো পথ খুঁজে বেড়ানো আর পথে পথে ঘোরা। মিনতি সেনকে এক রকম বুঝেছি। আমার বোঝাটা ঠিক না বেঠিক সেটা পরের কথা। আর নীলাঞ্জনা পিসি, কিছুতেই বুঝতে পারছিনা তাকে। অথচ আমি তো কত কাছে তার। কিছুতেই তার তল পাওয়া যায়না।

কিন্তু একি, আমি রেহানাদের বাড়ীতে এলাম কি করে? এখানে তো আমার আসার কথা নয়। কখনই বা ঘর থেকে নেমেছি পথে, আর সেই পথইবা কী ভাবে নিয়ে এসেছে আমাকে এখানে, একি কোন ভোজবাজী? দিশাহারার মতো ভাবছি কলিং বেলটা বাজাবো কিনা, হঠাৎ জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে সেলিনা বলল প্রান্তিক ভাইনা? অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? শরীর খারাপ? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল সেলিনা।

ও যেন বিষন্ন হৃদয়ে এক ঝলক আনন্দ, প্রচন্ড গরমে যেন এক পশলা বৃষ্টি, সরোবরে ফুটন্ত পদ্ম, বাগানেব রক্ত গোলাপ, যেন বসন্তের দখিনা বাতাস। যা শুধু দেহের ক্লান্তি দূর করে না, মনের ক্লান্তিও শুষে নেয় আপন ক্ষমতায়।

আজ যদি না আসতেন, আর কোনদিন কথা বলতাম না আপনার সাথে। অবাক হয়ে বললাম কেন বলত? বা বলব কেন? দিদিই এখন আপনার সব। তারপর বলল পবপর ২ দিন এসেছেন একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করেননি। কেন একটু দেরি করলে কি আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? ভিতর থেকে আফরোজ বেগম বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিসরে সেলিনা। ও জোরে জোরে বলল, প্রান্তিক ভাই। জান মা, ও বোধ হয় জেনে গেছে রেহানা বাড়ী নেই, তাই ঢুকতেই চাইছিলেন না, আমরা যেন কেউ নই। রেহানাই সব। মা, এর বিচার তোমাকে করতেই হবে। সেলিনাকি এতই হেলা ফেলার? প্রান্তিক ভাইকে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে সেলিনা ছাড়া রেহানার কোন মূল্য নেই। অভিযোগ করতে করতে ও যে মুখ টিপে হাসছিল তা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো অভিযোগ। এক সঙ্গে শুনতে বেশ খারাপ লাগলেও এক ধরনের মজাও পাচ্ছিলাম। ভীষণ মজা। সত্যি সেলিনা যেন প্রচণ্ড দাবদাহে এক হঠাৎ ঝটিকা। মুহূর্তে সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। আফরোজ বেগম বললেন, কি কথার ছিরি তুই কি, সাধারণ ভদ্র ভাবেও কথা বলতে পারিসনা। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি কিছু মনে করোনা বাবা। ও এইরকমই, মায়ের সস্নেহ প্রশ্রয়।

আমি নিজেও জানি, সেলিনা ঐ রকম, আর মনটা যেন শ্বেতশুভ্র গোলাপ পাপড়ি। ভাল না লেগে উপায় নেই। বললাম, না মাসিমা আমি কিছু মনে করিনি। তাছাড়া সেলিনা

তো অভিযোগ করতেই পারে। এ বাড়ীতে আসব অথচ ওর সঙ্গে দেখা করবো না এ অবিচার ও মানবে কেন? তবে? এইবার পথে এসেছেন প্রান্তিক ভাই, বলল সেলিনা। কিন্তু তারপর হেসেই বলল, তাই বলে মন খারাপ করবেন না কিন্তু। আমি বললাম, কেন মন খারাপ করব কেন? রেহানার সঙ্গে দেখা হবে না তাই। এটা ওর দুষ্টমি না সত্যি সত্যি দেখা হবে না, কোনটা সে বলতে চায় সেই ধন্ধে পড়ে যাই আমি। মনের মধ্যে যেমনই হোক, মুখে বললাম, আমি কি শুধু রেহানার সঙ্গে দেখা করতেই আসি? ওর সঙ্গে তো কলেজেই দেখা হয়। তবে আসেন কেন? হেসে বললাম সেলিনাকে, মাসীমাকে দেখতে। ও বড় বড় চোখ তুলে বলল এ কিন্তু ভালো কথা নয় প্রান্তিক ভাই। আমি কিন্তু বক্সিং-এর মেয়ে। ডালিমের কথা মনে আছেতো? আমি চুপসে গেলাম। সেলিনার মনে কি অন্য কোন ছায়া পড়ছে। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, না প্রান্তিক ভাই, আপনি যাদু জানেন দেখছি। কোথায় রেহানার অবর্তমানে ভাবছি একটু মনের কথা বলব তার আর উপায় নেই জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ দেখুন না রেহানা ফিরে আসছে। অথচ যাওয়ার সময় বলে গেছে সন্ধ্যার আগে ফিরবেনা। আর দেখুন মাত্র আধঘন্টার মধ্যেই ফিরে এলো। ইনট্যুইশান না পূর্ব পরিকল্পনা কে জানে। বলতে বলতে আরো খিল খিল করে হাসতে হাসতে মরাল গ্রীবা দুলিয়ে এমন ভাবে হেটে চলে গেল যেন সরোবরে রাজহংসী সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে। সত্যি অবাক হয়ে ভাবছি কি অফুরন্ত প্রানশক্তি থাকলে জীবনটাকে এমন সহজ ভাবে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

পাশে দাঁড়িয়ে রেহানা বলল, কখন এলে? কাল তো দেখা হলো বলনিতো আসবে। কি আর বলার অছে। তবু বললাম কোথায় গিয়েছিলে? আর বলো না। খিদিরপুরে ছোট মাসীর ওখানে যাব বলে বেরিয়ে ছিলাম, শিয়ালদায় কি এক গণ্ডগোল হয়েছে, বাস-ট্রাম সব বন্ধ। বললাম ভালই হয়েছে। ও বলল কেন ভালো হয়েছে কেন? তুমি তো বলনি তুমি খিদিরপুরে যাবে। কেন বললে যেতে নাকি? আপত্তি না থাকলে আমার তরফ থেকে অসুবিধা ছিল না। তারপর বললাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে বোস না, ও বলল, একটু অপেক্ষা করো শাড়ীটা ছেড়েই আসছি।

সেলিনা চা নিয়ে এলো। বলল, কই রেহানা কই? পরামর্শটা করে নিয়েছেন? অবাক হয়ে বললাম কিসের পরামর্শ? বা কি কি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন আর কি কি বললে ঠিক মতো ম্যানেজ হয়ে যাবে বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ও। শাড়ী বদলে চোখে মুখে জল দিয়ে একে বারে আটপৌরে পোষাকে রেহানা এসে বসল মুখোমুখি। কি জানি কেন এত ভাল লাগছিল ওকে, যেন ভোরের শিউলি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। বলল অমন করে কি দেখছ? তোমাকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে রেহানা বলল ধ্যাৎ। অকারণ শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলো ও আমার দিকে না তাকিয়ে। বললাম কি অপূর্ব সহবস্থান। মানে? একজন যেন শান্ত সরোবর। আরেক জন, সেই সরোবরেই ঢেউ তুলে প্রানোচ্ছলতায় ডানা ঝাপটিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। ও চোখ তুলে বলল, তুমি সেলিনার কথা বলছ? জান ও ভীষণ ভাল মেয়ে। মনটা কাচের মত স্বচ্ছ।

ওকে ভালবেসে কেউ কখনো ঠকবেনা। আমি বললাম তার থেকে বলো ঠকাতে দেবেনা। মানে? ঠকাতে গেলেই তাকে নিয়ে যাবে বক্সিংয়ের নেটে এবং সেখান থেকে ফেরার কোন উপায় থাকবেনা। কিন্তু ওর কথা থাক। তুমি কি তা হলে বলতে চাইছো, তোমাকে ভালবাসলে ঠকার ভয় আছে।

কি জানি কেন অকারণ কেঁপে উঠলো রেহানা। বলল, আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে করে কেউ আমাকে ভালবাসতে পারে। আসলে জানকি প্রান্তিক, এক অতি সাধারণ মেয়েকে কেউ ভালবাসে না। ২/১ দিন তাকে কারো ভাল লাগলেও লাগতে পারে। মানতে পারলাম না তোমার কথা। কেন? ভালবাসা মানুষের সহজ এবং স্বভাবজাত। তাই তো বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ একে অপরকে ভালবেসে তাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীটাকে আজো সুন্দর করে রেখেছে। বরং অসাধারণরা সেখানে ব্যতিক্রম। সাধারণের ভালবাসা তার স্বাভাবিক ভালবাসা, অযত্নেও তা বিকশিত, আর ঐ যে টবের গোলাপ, হয়তো অসাধারণ, কিন্তু পরিচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটলে শুধু ফুল নয় তার উৎসেও মৃত্যু ঘটে মুহূর্তে। তুমি সাধারণ বলেইতো এত অসাধারণ আমার কাছে।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন হয়তো এখনই ভেঙে পড়বে এক চবম দুর্বলতায়। কিন্তু কে বুঝবে আমাকে, এ আকাশ কুসুম, এ অসম্ভব। বেহানাতো অসম্ভবকে পেতে চায় না তার পরশ শুধু অনুভব করতে চায়? সে কাঁদতে চায়। কাঁদতে চায় ভালবেসে। কাঁদতে চায় না পাওয়াব আনন্দে। বৈশাখী দুপুরের প্রখর সূর্যতাপে, এক খন্ড কালো মেঘ হয়ে থাকুক এই ভালবাসার বেশটুকু। বেহানা চায় না ঐ মেঘ জল হয়ে নামুক পৃথিবীতে, সিক্ত করুক তার তপ্ত হৃদয়। সেতো শেষ হওয়াব সঙ্কেত। না রেহানা তা চায় না। ওকে যতটা বুঝেছি তাতে বুঝতে পারি বাস্তবে নয় ও ধরা দিতে চায় অনুভুতিতে। রেহানা ডুবে আছে তাব আপন চিন্তার গভীবে, অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে সে যে কী কুড়াতে চাইছে, তা সেই জানে। ওব দিকে তাকাতেই দেখি হাসি হাসি মুখে কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেলিনা। ওর চোখে বিদ্যুৎ ঝলক। ইঙ্গিতে কিসের যেন ঈশারা। জানতে চাই কিছু বলবে? আবারও সেই মুক্ত ঝলক, সেই উচ্ছলতা, সেই আনন্দ প্রবাহ, নিথর সরবরে যেন হাজারো বুদ্bুদ - উত্তরে বলল থাক প্রান্তিক ভাই, নিঃশব্দতার মানেই যদি না বোঝেন, কেন যে এলেন এ পথে কে জানে।

রেহান৷ যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। মনে হল গুমোট গরম থেকে মুক্তির বাতাস বয়ে নিয়ে এসেছে সেলিনার উপস্থিতি। রেহানা উঠে দাঁড়ালো। সেলিনা বলল, কিরে উঠলি যে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি প্রান্তিক ভাই আপনাদের ছন্দপতন ঘটালাম। রেহানা আস্তে আস্তে ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল, আমি বললাম, ভীষণ ভাবে তোমাকে চাইছিলাম সেলিনা। হেসে বলল কেন বৃন্দা হতে। আমি তা পারবনা। বললাম, বৃন্দা না হতে পার চন্দ্রাবলীতে আপত্তি আছে? ও বলল দাঁড়ান দাঁড়ান আপনাদের ঐ রাধাকৃষ্ণ লীলার সব চরিত্রের নামও ভালো করে মনে থাকে না ছাই। ওই যে চন্দ্রাবলীর কথা বললেন না, ওর রোলটা কি? আমি হাসতে হাসতে বললাম রাধার প্রেমের পূর্ণতা দেওয়া। মানে? প্রেমের

আরেক সত্য অভিমান ঈর্ষা থেকে যার জন্ম জানতো। সেই অভিমানকে তীব্রতা দেওয়াই চন্দ্রাবলীর কাজ। বুঝলাম না। থাক তোমার বুঝেও কাজ নেই। আসলে তোমার বক্সিংএর মাঠে চন্দ্রাবলী একেবারে বাজে খেলোয়াড়। তা তুমি বেরোবে কখন? কোথায়? যেথা মন চায়। আপনিও যাবেন নাকি। যদি প্রথমে নক আউট না কর যেতে পারি। রেহানা জানে? যাব তোমার সাথে তাতে রেহানার জানার দরকার কি? তাছাড়া আমিতো রেহানার সঙ্গে যাচ্ছিনা। সাহস আছে আমার সঙ্গে বেরোবার? আগে না বেরিয়ে বলি কি করে? তাহলে দরকার নেই। আপনি বরং আরেক দিন যাবেন। কেন আজ নয় কেন? ও কি ভেবে যেন বলল, বেশ চলুন, কিন্তু সারা পথে আমার সঙ্গে আমার কথাই বলবেন। রেহানার কোন কথা কিন্তু জিজ্ঞাস করতে পারবেন না। কেন রেহানাকে তুমি ঈর্ষা কর নাকি? না মশাই না, রেহানাতো সাধারণ বাগানের সহস্র গোলাপের একটি গোলাপ মাত্র। আর তুমি? কেন? ঐ যে বড়লোকের সখের টবের পরিচর্যিত গোলাপ। যত্ন না পেলে মুহূর্তে উৎস সহ শুকিয়ে যেতে পারে। তাইতো চলার পথে যত্ন থেকে বিচ্যুত হতে চাইনে। মিষ্টি মিষ্টি হাসছেও। বুঝলাম সব কথা শুনেছে ও। তাই বললাম, কিন্তু এমন টবও তো আছে সেলিনা যেখানে বাগানের গোলাপ ঝরে গেলেও টবের গোলাপ কিন্তু ঝরেনা। সেলিনা বলল, ও আপনি প্লাস্টিক গোলাপের কথা বলছেন তো? হবে হয়তো। তাই হয়তো ডালিমরা ছিঁড়তে পারে না। আঘাতে পর্য্যুদস্ত হয় মাত্র। যাকগে সে কথা, আমার সাথে পথ চলবেন বলেছেন, তাহলে আর দেরি কেন?

এতো পরিচিত সেলিনা নয়। কোথায় যেন ছন্দপতন হয়ে গেছে। এ কোন সেলিনা? আমি কি ভুল করেছি? রেহানা কি ভুল করেছে? কিন্তু মুহূর্তে মাত্র। আবার সেই সেলিনা। মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে বললে কৈ চলুন। তারপর হেসে উঠলো খিল খিল করে। সেই পরিচিত সেলিনা। মনের মধ্যে যেন কিছু লুকিয়ে থাকতে নেই। বলল খুব ভয় পেয়ে গেছেন, তাই না? বললাম, সত্যি বেরোবে? কেন? আমার সঙ্গে যেতে সাহস হচ্ছে না বুঝি। না ঠিক তা নয়। তাহলে? আসলে! থাক থাক আর বলতে হবে না। আমারই ভুল প্রান্তিক ভাই। রেহানা একা আর আপনি রেরুবেন আমার সঙ্গে এ হয় নাকি? তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল ও ঘর থেকে বাইরে, তার পরে পথে।

আমি জোরে জোরে ডাকলাম দাঁড়াও সেলিনা আমিও আসছি। রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আফরোজ বেগম বললেন, কোথায় যাবে তুমি? উত্তরে বললাম উঠতে হবে মাসীমা। উনি বললেন, সেলিনা এক্ষুনি আসবে। ও কোথায় গেল। এই একটু দোকানে গেছে। যাবে আর আসবে। তবু আমাকে উঠতে হবে মাসীমা। ভাবছি একবার গ্রামের বাড়ীতে যাব। পরীক্ষা হয়ে গেছে অনেক দিন যাওয়া হয় না। রেহানা পাশে এসে বলল, আমরা যদি যাই, তোমরা যাও মানে? এই আমি, সেলিনা আর মা, তারপর বলল জান গ্রাম দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে। কি যে বলব ওকে বুঝতে পারছিনা। মনের মধ্যে কি যে দ্বিধা না দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ অবশ্য একটা আছে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। আমার বাবা মাকে জানি। তাদের সব কিছু মেনে নিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু অন্যরা যদি না মেনে নেন।

তারা যদি অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেন এদের। কি উত্তর দেব আমি? রেহানা বলল, কি ভাবছো? না কিছু না। আমি জানি কি ভাবছো? কি ভাবছি? আমাদের কি পরিচয় দেবে তাই না? না মানে? যা সত্যি তাই পরিচয় দেবে। বললাম তোমার তো গ্রাম্যসমাজ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই? না তা নেই। তবে তোমার অসুবিধা যে দ্বিবিধ তা বুঝতে পারছি। যেমন? একটাতো সাধারণ। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার এবং আমাদের ধর্মমত।

বললাম, হয়তো তোমার কথাই সত্য। আর তাছাড়া আমাদের যেখানে বাড়ী তার কাছাকাছি তোমাদের ধর্মাবলম্বী কেউ নেই। রেহানা বলল, ধর্মই কি আমাদের সাধারণ ভাবে মেলামেশায় বাধা? উত্তরে বললাম, আমি জানিনা রেহানা। আমার কাছে ধর্ম মানুষের কোন আসল পরিচয় নয়। এবং এ শিক্ষা আমি আমার বাবা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাহলে? বললাম সত্যি কি তোমরা যেতে চাও?

সেলিনা যেমন দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি দ্রুত আবার ফিরেও এল। আমি বললাম বক্সিং কি হয়ে গেল। ও বলল, না হয়নি। আজ ভাবছি আমার বিপরীতে আপনাকে চাইবো। হঠাৎ আমার উপরে রাগের কারণ। কেন এতক্ষণ ধরে যে যুক্তির জাল বিছিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন। সেও তো বক্সিংএর নেট। রেহানা যেতে চাইছে আপনার সাথে, তাইনা।

না এ মেয়েটাকে কিছুই লুকোবার উপায় নেই। তারপর রেহানার দিকে তাকিয়ে বললাম, ঠিক আছে যাবে তোমরা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবে না তো। রেহানা বলল হঠাৎ তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন? না এমনি।

আফরোজ বেগম রান্না ঘর থেকে সব কথা শুনে বললেন, তুমি এবার একলা ঘুরে এসো বাবা, ওরা যখন যেতে চাইছে, পরেই যাবে। এত তাড়া কিসের। বললাম, না মাসীমা, আমি যখন যাব, আপনাদেরও নিয়েই যাব। কোন অসুবিধা হবে না। পরশু আপনাদের নিয়ে যাব, প্রস্তুত থাকবেন। এরপর আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম।

সারাটা দিন এক বিচিত্রতায় কেটে গেল আমার প্রতিটি মুহূর্ত। অশ্রুকণা, পিসি, রেহানা, সেলিনা, মিনতি সেন, তার বাবা, পরিমল বাবু, সকলেই যেন কত স্বতন্ত্র, কত আলাদা। আবার কোন কোন বিষয়ে তারা কত এক।

রাতে পিসিকে বললাম, পরশু বাড়ী যাব। বেশতো। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে পিসি, কি করা যাবে বলতো। কি? রেহানারা যেতে চায় আমার সাথে? কোথায়? তারা কখনো গ্রাম দেখেনি, তাই আমাদের গ্রামে তারা যেতে চায়। ভালো কথা, তুমি ওদের নিয়ে যাও। তুমিতো বলেই খালাস। কিন্তু পরিণতি কি হবে ভেবে দেখেছো? কিসের পরিণতি। বা গ্রামের লোকের হাজার প্রশ্নের কি উত্তর দেবো? কারো কোন উত্তর দিতে হবে এমন কি কোন কথা আছে নাকি? আছে পিসি আছে? তুমি বুঝতে পারছনা। পিসি বললেন তুমি কি বলতে চাইছো বলত। আমি ধীরে ধীরে বললাম, আমি কিন্তু তোমার উপর গভীর বিশ্বাস রেখে ওদের কথা দিয়েছি? আমার উপর বিশ্বাস রেখে? কি এমন বিশ্বাস। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সাথে।

পিসি কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, কবে যাবে বলে ঠিক করেছো। পরশু দিন। আর কে কে যাবে? রেহানা, সেলিনা ও ওর মা আফরোজ বেগম। ও আচ্ছা। তা হলে তুমি যাচ্ছতো। পিসি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি নিজেও হাফিয়ে উঠেছি। সারাদিন তোমার কথা নিয়ে ভেবেছি। দেখি একবার গ্রামের মুক্ত হাওয়া থেকে ঘুরে আসি, যদি কোন পরিবর্তন হয়।

নির্দিষ্ট দিনের রাতে ট্রেন। সকালে রেহানাদের ওখানে গেলাম। গোটা বাড়ীটা একটা থম থমে ভাব। কলিং বেল বাজিয়ে চলেছি। কেউ খুলে দেওয়ার জন্য আসছেনা। এমনতো হওয়ার কথা নয়। অনেক বারতো এসেছি এ বাড়িতে। তবে কি আমার কলিং বেল বাজানোর শব্দ ওরা শুনতে পাচ্ছেনা। আবার বেল দিলাম। সেলিনা বেরিয়ে এল। কোথায় সেই চঞ্চলা হরিণী। আমাকে দেখে বলল, প্রান্তিক ভাই অনেকক্ষণ বুঝি? কিন্তু সেই আগ্রহ, সেই দাবী, সেই অধিকার, সেই চপলতা সবই যেন অনুপস্থিত। বললো ভিতরে আসবেন? এতো আহ্বান নয়। এযে বিতাড়ন। তবু বললাম, আজ আমার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার কথা। সেদিন কথা হয়েছিল তোমরাও যাবে। রাতে ট্রেন। তাই বলতে এসেছিলাম। কিন্তু কোন কথা বলতে আমার ভয় হচ্ছে। আসলে আমি বুঝতে পারছিনা এই দু দিনের মধ্যে কি এমন হয়েছে যা আমি বুঝতে পারছিনা। সেলিনা বলল প্রান্তিক ভাই, হয় আপনি ভিতরে এসে বসুন, না হয় পরে আসুন।

এযে কি দুর্বিষহ অবস্থা, তা কাউকে বোঝাতে পারছিনা। রাস্তার দিকের সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ। বাইরে থেকে বোঝারও কোন উপায় নেই ভিতরে কেউ আছে কি না। মন ভীষণ ভাবে চাইছিল রেহানার সঙ্গে একবার দেখা হোক। কিন্তু মুখে তা বলতে পারছিনা। আমার জানা ও দেখা সেলিনা সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে আমার সামনেই গেটের দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল। এই কি সেই সেলিনা নিজেকে যে বক্সার হিসাবে জাহির করে। যার এক আঘাতে ডালিম নামের ছেলেটি আর কোনদিন এদিকে পা বাড়ায়নি।

আস্তে আস্তে ফিরে এলাম। পিসিকেই বা কি বলব। তিনি রাজী হয়েছেন। টিকিট কাটতে বলা হয়েছে। ফেরার পথে টিকিট কেটে নিয়ে যাব। পিসি কাল রাত থেকে গোছানো আরম্ভ করেছেন। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কিনতে হবে। তাই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন, আমাকে নিয়ে বেরোবেন। কিন্তু এখন যে ফিরে গিয়ে কি বলব। কিছুই ভালো লাগছে না। কেন যে রেহানারা এমন ব্যবহার করল কে জানে? আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি তো। অবশ্য এতদিন ওদের বাড়ী আমার যাতায়াত, ওদের কোন আত্মীয় স্বজন আছেন কি না জানিনা। সেদিন কেবল মাত্র শুনেছিলাম রেহানার কোন এক মাসী নাকি খিদিরপুর থাকেন। হঠাৎ মনে হল তাদের কেউ আসেনিতো। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে বাড়ীতে ফিরে এলাম। পিসি বললেন, অনেক তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছো। টিকিট পেয়েছো তো। বললাম না পিসি। কোন টিকিট নেই। পিসি অবাক হয়ে বললেন, সেকি কথা, কোন টিকিট নেই মানে? প্রথম শ্রেণী এসি বা সাধারণ কোন টিকিটই নেই। আমি সম্পূর্ণ মিথ্যে করে বললাম, অন্য কোন শ্রেণীর খোঁজ নিইনি। তুমি যদি বল, তা হলে আমি এখনি গিয়ে

খোঁজ নিয়ে আসছি। বুঝতে পারছি পিসি আশাহত হয়েছেন। বললেন, মনকে ভীষন ভাবে প্রস্তুত করেছিলাম। গ্রামের সেই ছেলেবেলার দিনগুলি নিয়ে কতকিছুই না ভাবছিলাম, কিন্তু আমি চাইলেই হবে কেন? সবার অলক্ষ্যে যিনি আমাদের নিয়ে দিনরাত খেলা করে চলেছেন, তিনি না চাইলে যে কিছুই হবার নয়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীলাঞ্জনা পিসি।

আমি বললাম, এতো আশাহত হওয়ার কি আছে পিসি? আজকে যাওয়া হলোনা বলে কয়েকদিন পরেও যাওয়া যাবে না, তাতো নয় পিসি বললেন, হয়তো যাবে, কিন্তু সেদিন আর আজকের ইচ্ছেটা থাকবে কিনা কে জানে? বললাম, সব কিছুতেই তোমার এই হতাশা আমার ভালো লাগেনা, মনের ইচ্ছে বলেতো একটা জিনিষ আছে। তা আছে, তাই বলে হতাশায় ভুগতে আমি রাজি নই। পিসি বললেন, তোমাদের বয়স অল্প, স্বপ্ন বা উদ্যম তোমাদের যে ভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের কি সেই ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? যাকগে সেকথা, কিন্তু তোমার সঙ্গে যারা যাবে বলেছিলেন, তাদের জানিয়েছো না জানাওনি। দেখি এক সময় গিয়ে জানিয়ে আসব। তারা যদি প্রস্তুত হয়ে থাকেন? কি আর করা যাবে। সত্যি কথাটাই তো বলতে হবে। তারপর বললাম আচ্ছা পিসি চলনা কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। অবাক হয়ে নীলাঞ্জনা বললেন কোথায়? যে কোন জায়গায়। পিসি, এই যে আজকে যাওয়া হচ্ছে না, এ আমারও ভাল লাগছেনা। কিন্তু কোথায় যেতে চাও? যেকোন জায়গায়। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে যাবে? ভাল লাগবে? তোমার সঙ্গে যাবো, ভালো লাগবেনা কেন? কি করে ভাল লাগবে, ভাল লাগার জন্য যে স্বপ্ন দেখতে হয়। আর সেই স্বপ্ন দেখার বয়সটাই যে নেই আমার। কি এক গভীর হতাশা নেমে আসে নিলাঞ্জনা পিসির কণ্ঠে। আমি বললাম তোমার এই হতাশা আমায় ভীষণ যন্ত্রণা দেয় পিসি। পার না নিজেকে সব সময় উদ্যমী রাখতে। পিসি কি ভাবলেন, তা তিনিই জানেন। জানতে চাইলেন বল কোথায় যাবে? আরো বললেন, যদি আমার সঙ্গে যেতে তোমার খারাপ না লাগে তা হলে যে কোন জায়গায় যেতে চাও চল। বললাম তা হলে চলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। কোথায়? ডায়মন্ড হারবার। ডায়মন্ডহারবার? আর কেউ যাবে? না শুধু তুমি আর আমি। হঠাৎ পিসি বললেন, বুঝতে পারছি যেকোন কারণে হোক তোমার মন আজ ঠিক নেই। কি হয়েছে বলত প্রান্তিক। না কিছু হয়নি। তাহলে আজই তোমার ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে কেন? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছো, না ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ঝগড়া করব কেন? আর ভুল বোঝাবুঝিইবা হবে কেন? তা আমি কি করে বলব। তারপর ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে বললেন, রেহানারা কি যেতে রাজী হয়নি?

বুঝতে পারছি, পিসি কিছু একটা সন্দেহ করেছেন, বললাম, ওদের বাড়ীতেতো যাওয়াই হয়নি, সুতরাং ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ কোথায়? নিলাঞ্জনা পিসি বললেন, প্রান্তিক আমি শুধু তোমার পিসি নই, আমি তোমার বন্ধুও বটে। আমার মন বলছে কি যেন তুমি আমাকে লুকাচ্ছো। তার থেকে চল বিকালে আমরা রেহানাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। মেয়েটিকে আজো আমি দেখিনি। চল না ওর মায়ের সঙ্গেও আলাপ করা যাবে।

আমি না করতে পারছিনা, আবার যেতেও মন সায় দিচ্ছেনা। বিশদ ভাবে না

বললেও টুকরো টুকরো ভাবে তাদের কথা আমি বলেছি পিসিকে। ওদের সম্পর্কে পিসির একটা ধারণা হয়েছে, তা ভেঙে যাক, আমি তা চাইতে পারিনা। বললাম তুমি যেতে চাইছো তোমাকে আমার নিয়ে যাওয়া উচিৎ। তবুও পিসি এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে। ওরা অপ্রস্তুত হতে পারে। তা ছাড়া ওরা মানে আফরোজ বেগমেরা কবে ফ্রি থাকতে পারেন তাওতো জানা দরকার। আমার মনে হয় বরং ওদের সঙ্গে কথা বলে একদিন সময় করে যাওয়া যেতে পরে।

নীলাঞ্জনা পিসি আর কথা বাড়ালেন না। বললেন বেশ, তোমার কথাই থাক। তাহলে ডায়মন্ডহারবার যাওয়াই ঠিক। চল বেরিয়েতো পড়া যাক। তারপর যেতে যেতে যদি মনে হয় অন্য কোথাও গেলে হয় তখন না হয় সে কথা ভাবা যাবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শিয়ালদা স্টেশানে এসে শুনলাম ডায়মন্ডহারবার লাইনে তার কাটা গেছে। বিকালের আগে লাইন ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পিসি বললেন না, আজকের দিনটা একেবারে খারাপ। শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি করবে? তুমি যা বলবে। আমি আর কি বলব। আজকে আমি তোমার উপরে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো। বললাম আমার সাধ্য কোথায় পিসি। তবু কোথাও চল। এভাবে স্টেশানে বসে থাকা যায় না কি? তোমার কোন বন্ধুদের বাড়ী নেই কাছাকাছি? আছে কিন্তু আমার হঠাৎ হঠাৎ যাওয়া আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া কি এক। বরং চল দক্ষিণেশ্বর যাই। ওখান থেকে নৌকোয় বেলুড় তারপর ফিরে আসা। সন্ধ্যার দিকে না হয় একবার মন্দিরে ঢুকে আরতি দেখা। হ্যাঁ সেই ভালো।

দুপুরের দিকে একটা ডানকুনি লোকালে উঠে দক্ষিণেশ্বর এলাম আমরা। পঞ্চবটী বনে অনেকক্ষণ বসে থেকে গঙ্গাকে দেখলাম। পিসি বললেন, এখানে এলে আমার ছোট বেলার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের বাড়ীর পাশে যে নদী, প্রায়ই সেখানে এসে নদীর পাড়ে বসতাম। নদী যে কেন আমাকে এত টানে কে জানে? বাবা মায়ের কাছে এই নিয়ে কত বকুনি খেয়েছি, তবু আসতাম। তুমি একা? প্রায়ই একা আসতাম। মাঝে মাঝে বন্ধুদের কেউ কেউ থাকতো। কিন্তু আমার মতো তারা কেউ নদীপাগল ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হতো আমি বুঝি নদীর প্রেমে পড়ে গেছি। এত যে তোমার নদী ভাললাগে, তাহলে, বাসার কাছেও তো গঙ্গা আছে, যেতে পারোতো। পিসি বললেন না ঐ বাবুঘাট, আউটট্রাম ঘাট, এ গঙ্গা আমার একদম ভালো লাগেনা। আর এই দক্ষিণেশ্বর? না, এটা খুব একটা খারাপ লাগেনা। কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগে, গঙ্গার নির্জন ঘাট। হয় শুধু আমি একা, অথবা আমাকে যে বুঝতে পারে এমন কেউ সঙ্গে থাকবে।

জানি, পিসির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করা ধৃষ্টতা। তবু এমন কতকগুলো মুহূর্ত আসে জীবনে, তখন একাকার হয়ে যায় এই সব আপাত ব্যবধানের সম্পর্ক। তাই হয়তো কবিগুরুরও অসুবিধা হয় না সুরের তান তুলতে হৃদয় তন্ত্রীতে। তবু চুপ করে আছি দেখে পিসি বললেন, কিভাবছো প্রান্তিক। তোমার কথা। আমার কথা? হ্যাঁ তোমার কথা

পিসি। তুমি যখন গ্রামে ছিলে আমি তখন কত ছোট। দূর থেকে দেখতাম তোমাকে। মাঝে মাঝে গাল টিপে দিতে। তারপর হাসতে হাসতে চলে যেতে। আমার খুব অভিমান হতো তোমার পরে। কেন? আমার কেন যেন মনে হতো আমি ছোট বলেই তুমি আমার সাথে কথা বলনা। মনে মনে শুধু ভাবতাম আমি কবে বড় হবো। বড় হলেতো তুমি আর কথা না বলে পারবেনা।

পিসি একটু হাসলেন শুধু। আমি বললাম হাসছো যে। না হাসিনি, আসলে জানকি প্রান্তিক, সব শিশুরাই তাই ভাবে। তারা কবে বড় হবে? বড় হলে তার সাধগুলো, স্বপ্নগুলো তারা নিজেরাই পূর্ণ করতে পারবে। কিন্তু তা আর পারেনা। বড় হওয়ার সাথে সাথে ছোট বেলার সেই স্বপ্নগুলো মরে গিয়ে অথবা দূরে সরে গিয়ে আরো নতুন নতুন স্বপ্ন নতুন নতুন ইচ্ছে মনের উপর আছড়ে পড়ে। অবহেলায় পড়ে থাকে ছোট বেলার সাধ ও আকাঙ্খা। এটাই জগতের নিয়ম। আসলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় প্রান্তিক। আমি বললাম, মানিনা তোমার কথা। কি মাননা? এই যে তুমি বললে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের স্বপ্নগুলো মরে যায়। মরেনা বুঝি? এক চিলতে রহস্যময়ী হাসি মিলিয়ে যায় পিসির ওষ্ঠ প্রান্তে।

আমাদের থেকে একটু খানি দূরে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে বসল। হয়তো তারা কলেজেই পড়ে। ছেলেটি বলল কেন যে তোমার সাধ হলো এখানে আসার? মেয়েটি বলল কেন জায়গাটা কি খারাপ? জান এখানে একদিন স্বয়ং রামকৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আমার জেনে কাজ নেই। ঠিক আছে কিন্তু তোমার এই গঙ্গা ভালো লাগেনা। আমার এত ভীড় ভালো লাগেনা। তাহলে চল, নৌকায় আমরা বেলুড় মঠে যাই। আবার সেই বেলুড় মঠ। তাহলে কোথায় যাবে? যেখানে শুধু তুমি আর আমি, পাশে কেউ থাকবে না। মাথার উপরে নীল আকাশ, আমি তাকিয়ে থাকবো তোমার দিকে। একটুখানি স্মিত হেসে মেয়েটি বলল শুধু তাকিয়ে থাকবে? হ্যাঁ শুধু তাকিয়ে থাকবো। তোমার চোখের তারায় খুঁজে পেতে চেষ্টা করব নিজেকে। তেপান্তর থেকে ছুটে আসবে এলোমেলো দুরন্ত বাতাস, যা তোমার শক্ত করে বাঁধা বেণী থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাইবে। ২/১ টি কুঞ্চিত কেশ আর ঐ দুরন্ত বাতাসের দুরন্তপনায় তোমার আঁচল উড়বে দূর আকাশে বলাকার পাখার মত। সোনাঝরা সন্ধ্যার সেই মূহুর্তে তুমি শুধু আমার হয়ে থাকবে। হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, তোমার ক্ষেপামী যাবে না দেখছি। কতদিন ধরেই তো দেখছ, তবু আশ মিটলনা। মিটল কই? আর সত্যি সত্যি যেদিন মিটবে সেদিন তুমি আর রহস্যময়ী থাকবেনা। মনও কাঁদবেনা তোমার জন্য। তারপর বলল, চল ওঠা যাক। ওরা উঠে চলে গেল।

এতক্ষণে পিসি একটিও কথা বলেনি। আমিও বলি নি। আমি নিশ্চয়ই জানি আমারই মতো পিসিও ওদের কথা শুনেছেন নিবিষ্ট মনে। সত্যি ছেলেটির মনের জোর আছে বলতে হবে। নিজের কথা স্পষ্ট করে বলার অধিকার আছে তার। আর তাই মেয়েটিও তাকে অস্বীকার করতে পারে না। পিসি হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বলল, ওরা কিন্তু একটা কথা ঠিক বলেছে প্রান্তিক, আমি চকিতে পিসির দিকে তাকিয়ে বললাম কি? ঐ যে ছেলেটি

বলল, যেদিন আশ মিটবে সেদিন তুমি আর রহস্যময়ী থাকবেনা। মনও কাঁদবেনা তোমার জন্য।

কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময়। বললাম, ওরাতো আরো অনেক কথা বলেছে, তার একটাও তোমার ভাল লাগলনা। ভাল লাগেনি বলছিনা। ছেলেটি তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ফালতু অজুহাতে জীবনের অমূল্য মুহূর্ত সে হারাতে চায়না। সে ভীরু নয়। তার মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারার জন্য এক প্রকারের শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু খুব যে একটা দাগ কেটেছে আমার মনে তা নয় কিন্তু। কিন্তু আশ মিটলে তুমি আর রহস্যময়ী থাকবেনা, এযেন আমার জীবন দর্শনের নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। অতি সাধারণ কথা, কিন্তু কি অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়।

একটা হাত তার কাঁধে রেখে আস্তে বললাম, পিসি তোমার মনে যে এত দুঃখ লুকিয়ে আছে আগে কোন দিন বুঝতে পারিনি। বললেন আজও কি বুঝতে পারছ? বোঝা যায় না প্রান্তিক, জীবনের রহস্যময়তাই তার বেঁচে থাকার রসদ। একদিন যা মনে হতো শুধু সত্য নয় একমাত্র সত্য আর একদিন তাই কেমন এক নিমেষেই মিথ্যে হয়ে যায়। আমি বললাম, জীবনের সব সত্যই কি মিথ্যে হয় পিসি? ঠিক বুঝতে পারছিনা তুমি কি বলছ? জীবনের সত্য বলে কিছু আছে কীনা আমি জানিনা। তবে আজ বুঝতে পারছি, দামিনী কেন বেঁচে আছে? আমি বোকার মত প্রশ্ন করলাম কোন দামিনী? পিসি বলল, দামিনীকে চেননা? আমার তো মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথ দামিনীর থেকে বড় করে আর কোন নারী চরিত্র এঁকেছেন কীনা। চতুরঙ্গ পড়েছো। দামিনীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি, সাধ মিটিল না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ ছেলেটি কি বলেছে? আশ যে দিন মিটবে সেদিন আর তুমি রহস্যময়ী থাকবেনা। মনও কাঁদবেনা। দামিনীরও মন কাঁদতোনা যদি তার সাধমিটে যেতো। তারপর একটু খানি চুপ করে থেকে, একেবারে অতর্কিত ভাবে আমার একটা হাত তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। কিন্তু একটিও কথা বললেন না। বললাম তোমার শরীর খারাপ করছে? না। তাহলে চুপ করে আছো কেন?

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তিনি জানতে চাইলেন কে তোমাকে বেশী করে টানে প্রান্তিক অশ্রুকণা না রেহানা? আমি অবাক হয়ে পিসির এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গেনিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। বললাম, না পিসি কেউ নয়। ঐ ছেলেটি যেমন করে তার অধিকারের দৃপ্ত ঘোষণা জানিয়েছে আমার জীবনে তেমনি করে কেউ আসেনি আজো। আসেনি, না আসতে দাওনি? আমি বললাম তোমার কি হয়েছে বলতো আজ? এমন এমন প্রশ্ন করছ যা কোন দিন করনি? বললেন থাক ও কথা। একটু আগে তুমি বলেছনা, যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমার সঙ্গে কথা না বলে শুধু গাল টিপে দিতাম বলে তোমার ভীষণ অভিমান হতো, আর ভাবতে কবে তুমি বড় হবে। বড় হলে আমার সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারবে। আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। পিসি বলে চলেছেন। এখনতো তুমি বড় হয়েছো। অন্তত গালটিপে দেওয়ার বয়স তোমার নেই। অনেকদিন ধরে আছো আমার সাথে। কই তোমার কোন কথাই তো বলনা আমাকে। তার মানে শৈশরের সেই স্বপ্নগুলো তোমার মরে গেছে

অথবা হারিয়ে গেছে নতুন স্বপ্নের ভিড়ে তাই না? আমি চমকে উঠে বললাম, না পিসি কিছুই মরেনি। আজো তোমার সাথে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে ভালো লাগে। কিন্তু তোমার সময় কোথায়? আর তাই বলে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আমার নেই। কেন? অভিযোগ নেই কেন? বললাম স্বপ্ন হয়তো মরেনা পিসি কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের বালুতটে অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়। যেমন এইখানে না আসলে, আমার জানা হতোনা তোমার নিঃসঙ্গ অতীত। তোমার একাকিত্ব, হতাশা, ব্যথা ও বেদনা। উনি বললেন, এটা জেনেই বা তোমার কি লাভ হবে? না পিসি, লাভ লোকসান দিয়ে সব অঙ্ক মিলানো যায় না। এই যে কতক্ষণ আমরা বসে আছি এখানে। সূর্য হেলতে হেলতে গঙ্গার বুকে লাল আবির ছড়িয়েছে অথচ সময়কে আমরা জয় করেছি, কেন? এই অঙ্কের কি হিসাব মিলাতে পারবে? পারবেনা। তার থেকে চল সন্ধ্যা হয়ে এলো। মন্দিরের আরতি দেখবে বলেছিলে না? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিসি বললেন, হ্যাঁ চলো।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরে যাওয়ার আগে যতটা বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল, এখন আর অতটা নেই। পিসি বললেন, সেই দুপুরে খেয়েছো, খিদে পায়নি? হ্যাঁ পেয়েছে। তাহলে চল, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

দুজনার জন্য যা যা অর্ডার দিয়েছিলাম তা থেকে পিসি তার ভাগের অর্দ্ধেক আমাকে তুলে দিলেন। আমি বাঁধা দিলামনা। আসলে আমি পিসিকে শুধু দেখেই চলেছি। কত কাছে আছি আমি এই মানুষটির। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কিছুই জানিনা তাকে। তিনিও কি জানেন আমাকে? না, হয়তো জানেন না, কাউকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়তো সম্ভবও নয়।

পরিমলবাবুকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন পিসি। অনেক স্মৃতি হয়তো জড়িয়ে আছে তার সাথে। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় কোনদিন ভুলেও সেই স্মৃতির পাতা ওল্টাননি এক মুহূর্ত্তের জন্যও। অনেক বার মুখে এলেও ঐ স্মৃতির কথা উচ্চারণ করতে পারিনি আমিও। যদি অন্য রকম কিছু ভাবেন। পিসি বললেন, আর কিছু খাবে? আমি অন্যমনস্কের মত বললাম, তুমি যদি দাও তাহলে খাব। কি খাবে? তোমার যা ইচ্ছে? পিসি আবার কিছু অর্ডার দিলেন তার ইচ্ছে মত। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ীতে যখন ফিরলাম, তখন রাত ৮ টা। গোটা বাড়ীটা অন্ধকার। গেটে এসে দেখলাম, বাইরে থেকে তালা বন্ধ। তার মানে পরিমলবাবু এখনো ফেরেননি। পিসিকে জিজ্ঞাস করলাম, ওনার দেরি হবে এমন কথা উনি কিছু বলেছেন? পিসি বললেন উনি জানেন আমরা সন্ধ্যার ট্রেনে বেরিয়ে যাবো। তাই হয়তো দেরি করে ফিরবেন। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। গেট খুলে চলো ভিতরে।

গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া হবে বলে, গোছাতে গোছাতে সেগুলো আবার তেমনি এলোমেলো রেখে বেরিয়ে পড়া হয়েছিল। পিসি সেগুলো আবার ঠিক ঠাক করে গুছিয়ে রাখলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগলো। কিন্তু পরিমলবাবু তখনো এলেন না। কি করা যায় বলতো প্রান্তিক। তারপর নিজেই বললেন, তুমি কি একবার দীপঙ্করবাবুর ওখানে যাবে? ওখান থেকে যদি ফোন করা যায়? বললাম কোথায় ফোন করতে হবে?

পিসি কয়েকটা ফোন নাম্বার দিলেন। একটা পরিমলবাবুর সিনিয়র বসের। আর দুটোর একটা তার স্টেনো'র এবং অন্যটি পরিমলবাবুর অধিনস্ত সহকারী ম্যানেজারের। দীপঙ্করবাবুকে বলবে, একটু খোঁজ নিয়ে যেন তোমাকে সত্যি সংবাদটি জানান।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। অত রাতে দীপঙ্করবাবু তখন শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার যাওয়াতে উনি উঠে পড়লেন। পিসি যা বলেছেন আমি ওনাকে বললাম। উনি বললেন, তুমি নিজেই ফোন কর। এস আমার সঙ্গে। সিনিয়র বস এবং সহকারী ম্যানেজারের ফোন এনেছো? ফোন করাতে মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন বললেন স্পিকিং কাকলী মিত্র। আমি নমস্কার জানিয়ে বললাম আমি পরিমলবাবুর বাড়ী থেকে বলছি। উনিতো এখনো ফেরেননি। আজ কি উনি অফিসে গিয়েছিলেন? আপনার পরিচয়? ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সেই মেয়েলি কণ্ঠ। আমি ওনার আত্মীয়, আই মীন উনি আমার পিসেমশাই হন। প্লীজ ওয়েট বলে উনি ফোন রেখে দিলেন। এবং খানিক পরে বললেন, হ্যাঁ এসেছিলেন, কিন্তু আপনার পিসি কি জানেন না, উনি ট্যুরে ৭ দিনের জন্য বাইরে গেছেন। আমি বললাম, আসলে আমাদের আজ গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টিকিট না পাওয়ার জন্য যাওয়া হয়নি। হয়তো পিসিকে বলেছিলেন, কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তিনি তা ভুলে গেছেন। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। উনি গুডনাইট জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিতে চাইলে আমি বললাম, আচ্ছা ম্যাডাম আপনি ওনার ট্যুরের জায়গার ফোন নাম্বার দিতে পারবেন? নো সরি। আরেকটা কথা ওনার সঙ্গে আর কে গেছেন? ইট ইজ এ ভেরি ভেরি কনফিডেনসিয়াল, নো মোর প্লিজ। ওকে। গুডনাইট। গুড নাইট। ফোনটা ছেড়ে দিলেন কাকলী মিত্র।

দীপঙ্করবাবু বললেন খোঁজ পাওয়া গেল? হ্যাঁ, উনি ট্যুরে গেছেন। তোমাদের বলে যায়নি? হয়তো বলেছেন। আসলে আমার আর পিসির গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি। পিসিকে যদি বলেও থাকেন উনি তা মনে করতে পারছেন না। ও আই সি? ঠিক আছে। সাবধানে যেও।

পিসিকে সব বলতে, তিনি থ মেরে গেলেন। আমি বললাম কি হল পিসি? তুমি চুপ করে আছো কেন? না চুপ করে আর থাকব না। আমি আর পারছিনা প্রান্তিক। ওর যদি আমাকে আর ভালো না লাগে বলে দিলেই পারে। এই ছল চাতুরীর দরকার কি? সকালে ওকে কত করে বললাম, তুমিও চল না। কতদিনতো যাওয়া হয় না। না আমার সময় নেই। কেন এত কি কাজ? দিল্লী থেকে চেয়ারম্যান আসবেন। অফিসের ফাইল পত্রগুলো প্রস্তুত করতে হবে। বললাম তুমি একা একা থাকবে? মাত্র কটাদিনতো, তারপর বললাম বেশ তুমি আমাদের সঙ্গে না যাও একটা দিন ট্যুর নিয়ে ঘুরে এসো। বললেন কোন উপায় নেই। অফিস থেকে এখন বেরোবার কোন উপায় নেই। আর তার ষ্টেনো বলল তিনি ৭ দিনের ট্যুরে চলে গেছেন। এ অসহ্য।

মিথ্যে কথা আমারও অসহ্য। প্রয়োজনে অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে হয় তা অস্বীকার করিনা। কিন্তু পরিমলবাবুর ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারছিনা। পিসির দুঃখ যন্ত্রণা যেমন বুঝি তেমনি পরিমলবাবুর পক্ষেও যে কিছু বলার আছে, সেটাকে অস্বীকার করতে

পারিনা। কিন্তু কাকলী মিত্রর শেষের কথাটি আমাকে পিসির সঙ্গে সহমত হতে সাহায্য করছে। তিনি একটা অফিস থেকে অফিসিয়াল ট্যুরে গেছেন, তিনি তো আর ভারত সরকারের কোন গোপন শাখায় কাজ করেন না, যে তার ট্যুর ভেরি ভেরি কনফিডেনসিয়াল হবে। যাই হোক পিসিকে বললাম, তোমার হয়তো পিসেমশাইয়কে বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে পিসি। আর তা ছাড়া তুমি নিজেইতো বলেছো, এ কয়দিন না হয় যেন কোন ট্যুর থেকে ঘুরে আসে। তোমার সঙ্গে যখন কথা বলেছিলেন, তখন হয়তো উনি যা বলেছিলেন সেটা সত্যি ছিল। পরে হয়তো অফিসে গিয়ে জানলেন, তার থেকে, জরুরী তার ট্যুরে যাওয়ার তাই তিনি চলেও গেছেন, এতে তোমার অসহ্যের কি আছে? পিসির রাগ পড়েনি। ভিতরে ভিতরে তিনি যে গজরাচ্ছেন বুঝতে পারছি। বললেন, দেখ প্রান্তিক এই ভাবে কারো দোষ ঢাকতে যেওনা। তাতে একূল ওকূল দুকূলই যাওয়ার সম্ভবনা।

বললাম তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে পিসি? যদি সত্যি সত্যি তোমার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তিনি তোমার মন থেকে দূরে সরে গেছেন। সন্দেহকে বাড়িয়ে দিয়ে কি তাকে কাছে টানা যায়? তুমি যদি তাকে আগের মত পেতে চাও, তোমাকেও ভালবাসতে হবে আগের মত। তার মন থেকে মুছে দিতে হবে অন্য কোন ছায়াপাত।

পিসি বললেন আজ আর তা সম্ভব নয় প্রান্তিক। কেন? জানিনা কেন? তবু পরিমলকে আমার আর আগের মত ভালবাসা সম্ভব নয়। প্রথম কথা ছল-চাতুরী আমি একদম সহ্য করতে পারিনা। বললাম পিসি, শুধু নিজের ভাবনা থেকে ও ভাবে বিচার করছ কেন? উনিওতো কিছু ভাবতে পারেন তোমার সম্পর্কে, যা তার মনকে তোমার কাছ থেকে আগে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। রেগে গিয়ে পিসি বললেন কি বলতে চাও তুমি? আমাকে উনি বিনা কারণে সন্দেহ করবে কেন? কি প্রমাণ আছে আমাকে সন্দেহ করার? বললাম তোমরা হাতেও কি কোন প্রমাণ আছে তাকে সন্দেহ করার? এবার উল্টো পাল্টা ভাবে পিসি বললেন প্রমাণটাই কি সব। নিত্যদিনের আচার আচরণ আমার অনুভূতি এর কি কোন মূল্য নেই? বুঝতে পারছি পিসির এসব যুক্তিহীনের যুক্তি। আসলে পরিমলবাবুকে উনি এত ভালবাসেন যে একটুখানি বিচ্যুতিই তার কাছে বিরাট হয়ে দেখা দেয়। বললাম, তোমার অনুভূতির নিশ্চয়ই মূল্য আছে পিসি। তবু সব কিছুর জন্য অপেক্ষার মূল্যও কম নয়। উনি আসুক। দেখবে সময় একদিন তোমার মনের এই গ্লানি মুছে দেবে। উনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তাই যেন হয়।

পরের দিন সকাল যেন এক নতুন বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভোরের আকাশ সূর্য্যের অপেক্ষায় মৌন। ছাদের টবে ফুটেছে অজস্র গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা। কি তার রংএর বাহার। একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে অজস্র রঙের সমহারে। দেখতে অপূর্ব। ভীষণ লোভ হচ্ছে ওই ফুলটি তুলে কোন প্রিয়জনের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু কে আমার প্রিয়জন, কার হাতে তুলে দেবো আমার আকাঙ্খার চন্দ্রমল্লিকা। পিসিকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে আকাঙ্খায় মন উন্মুক্ত, সেখানেতো নীলাঞ্জনা পিসি নেই।

ভোরের আকাশকে সাক্ষী রেখে কোন দিন এই ছাদে উঠিনি আমি। আকাশের পূর্ব

প্রান্ত লাল, কিন্তু অন্ধকারের মায়াবী আলো যেন এখনো মুছে যায় নি।

হঠাৎ ছাদের দরজা খুলে যায়। একি পিসি তুমি? হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এত ভোরে ছাদে কি করছ? দেখ কি অপরূপ অজস্র গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার সমাহারে রাতের আকাশ যেন নতুন প্রভাতকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায়। রাতে তুমি ঘুমাওনি? না পিসী একদম ঘুম হয়নি। তাইতো সকাল না হতেই উঠে এসেছি ছাদে। কেন? যদি আজকের আকাশ কোন নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। পিসি বললেন, সাররাত না ঘুমিয়েও তুমি এই সতেজ মনটা কোথা থেকে পাও প্রান্তিক? বললাম, জীবনের সব কিছুকে হাসিমুখে গ্রহণ করার একটা জেদ আমাকে চির সতেজ করে তোলে। ভুল প্রান্তিক ভুল। তাই যদি হতো, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতে। কিন্তু তাতো পারনি, অথচ নিজেকে মিথ্যে মায়ায় আচ্ছন্ন করে - যা সত্য নয় তাকেই সত্য বলে প্রকাশ করতে চাইছো। তারপর চোখের পর চোখ রেখে বললেন এখনো কুয়াশা কাটে নি দেখেছ? হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু কুয়াশা ছিল না। পূর্ব প্রান্ত লাল হয়ে উঠেছিল সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। যদিও অন্ধকার ছিল, তবু আলোর নিশানা আমি টের পেয়েছিলাম। ঐ দেখ সেদিন যে বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার টবটা কিনেছিলাম আজ তা পূর্ণতায় বিকশিত একটি ফুটন্ত চন্দ্রমল্লিকা। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবছিলাম জান? কি? কোন এক প্রিয়জনকে উপহার দেব তা। তাই বুঝি? কে তোমাকে না করছে? না কেউ না করেনি। আসলে বুঝতে পারছিনা, কোথায় ওর সত্যিকারের জায়গা। মানে? এই ভোরের বাতাস তোমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে না পিসি? মনে হচ্ছে না আঃ কি আরাম! তুমিকি সারারাত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছো? হয়তো দেখেছি, হয়তো দেখিনি, তুমি কিন্তু তাই বলে কথার অক্টোপাশে এই মুগ্ধ আর মোহময়ী সকালকে ভুল বুঝনা। ঠিক আছে তাই হবে। তোমার চিন্তার সঙ্গে চেতনাকে মিশিয়ে দেখি সকালটা তোমার মতো আমার জীবনেও কোন নতুন সুরের তান তোলে কীনা। হ্যাঁ সেই ভাল। কিন্তু পিসি আমার কথার তো উত্তর দিলে না। কি? ঐ অপূর্ব রঙের চন্দ্রমল্লিকার আসল জায়গাটা কোথায়? এ উত্তর দাতাব ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না প্রান্তিক। তুমি যখন তোমার কোন প্রিয়জনকে দেবে বলে ঠিক করেছো, তখন তোমার মনকেই জিজ্ঞাস করো, কোথায় ওর সত্যিকারের জায়গা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম পিসির দিকে তাকিয়ে। একি পিসি? নতুন শাড়ী পরেছো, চুল বেঁধেছো নতুন করে, কোথাও যাবে নাকি? যাবো বলেইতো তোমার ঘরে গিয়েছিলাম প্রান্তিক। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, তুমি ঘরে নেই। অথচ বাইরে যাওয়ার গেট বন্ধ। তাইতো ছাদে এলাম। খুব ভাল করেছে পিসি। একটু দাঁড়াও, নড়বেনা কিন্তু। কেন? যা বলছি তাই করনা।

নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে রইলেন। আমি চন্দ্রমল্লিকাটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, পিসি যেখানে গুরুজন সেখানে তার চরণতলে অর্পণ করব এই ফুলটি। হঠাৎ মনে হল দূর ওতো ভক্তের নৈবেদ্য। না আমি তা পারবনা। তাহলে কর কমলে? দূর। তাই হয় নাকি কখনো। প্রথম প্রেমের লাজ নম্রতায় প্রেমিকের হয়তো

তা মানিয়ে যায়। কিন্তু আমার জীবনে পিসির অবস্থান কোথায়। তিনি কি আমার পূজার বেদী না বন্ধু না আর কিছু। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলাম, পিসির কাছে। একেবারে বুকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পিসিকে বললাম, চোখ বন্ধ কর পিসি। কেন? আরে করইনা। পিসি কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে চোখ বন্ধ করলেন। আর আমি, চন্দ্রমল্লিকাটি গুজে দিলাম পিসির শিথিল বেণীতে। তারপর মন যা চাইল, হেরে গেলাম যুক্তির কাছে। পিসি কিন্তু বিজয়িনী যেন। আমার দ্বিধান্বিতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তার রক্ত গোলাপ ঠোঁট দুটি নিমেষে নামিয়ে নিয়ে এলেন আমার ভীরু ওষ্ঠা ধরে। তারপর দ্রুত পালিয়ে গেলেন যেন। না বললেন আমার সঙ্গে কোন কথা, না চাইলেন প্রতিদান হিসাবে কিছু।

আর এই নিয়ে পিসি দুই বার তার ব্যগ্রতাকে নিয়ে এসেছেন আমার স্পর্শতার মধ্যে। তবু যেন কত ব্যবধান। সেদিন কিন্তু দেহের তন্ত্রীতে এ শিহরণ ছিল না। তবে আজ কোথা থেকে এলো, ভীরু বুকে এই কম্পিত শিহরণ! সেদিন পিসিকে চোখের পর চোখ রেখে বলতে পেরেছিলাম, আমি তোমায় ভালবাসি পিসি। আজ ভালবাসা কথাটি উচ্চারণ করতে আড়ষ্টতা কেন? কেন পারলাম না বলতে এ আমার ভালবাসার প্রথম উপহার। ধীরে ধীরে নেমে এলাম ছাদ থেকে। ঘরের অন্ধকার এখনো যায়নি। ভেজানো দরজার ঘরে আলো জ্বেলে পিসি হয়তো দেখছেন নিজেকে। আমি টোকা দিতে বললেন, ভিতরে এস। এতক্ষণ যে শাড়ীটা পরে ছিলেন, বদলে ফেলেছেন তা। অঙ্গে জড়িয়েছেন বাসন্তী রঙের বালুচরী। সিঁথিতে সিঁদুর, দুই ভ্রুর মাঝখানে সোনা ঝরা টিপ, আঁচলটা সবে বুকের পরে তুলে নেবেন, আমি ঢুকতে গিয়েই বেরিয়ে এলাম। উনি আর আমাকে পিছু ডাকলেন না। আমি নিজের ঘরে এসে নিজে কেন এমন ব্যবহার করলাম তাই নিয়ে ভাবছি। উনি আমার ঘরে এসে বললেন, এখনো জামা প্যাণ্ট পরনি? আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওনার দিকে? বললেন, তাড়াতাড়ি কর প্রান্তিক। এযেন সকাল বেলাকার ছাদের সেই দ্বিধান্বিতা নীলাঞ্জনা নন। এ যেন এক দীপ্তিময়ী নতুন নীলাঞ্জনা। স্পষ্টতা আর অধিকার যেন তাকে এক নতুন মহিমা দান করেছে।

অপূর্ব লাগছে নীলাঞ্জনা পিসিকে। অঙ্গের পোষাকের সঙ্গে বেণীতে গোঁজা ঐ সাত রঙা চন্দ্রমল্লিকা যেন আপন গরবে গরবিনী। আর সৌন্দর্যের কাছে মাথা নত করে না এমন কে আছে? বয়স কি সব সময় সৌন্দর্যের প্রতিবন্ধক? আমার মনে হয় না তা নয়। পিসির বয়স যেন তার সৌন্দর্যকে এক অপূর্ব লাবণ্যময় মর্যাদা দিয়েছে। বললাম কোথায় যাবে? পিসি বললেন কোথাও না। তবু ...। ভোরের রাজপথ আমাদের চলমানতার সাক্ষী হয়ে থাকুক। ঠিক পাঁচ মিনিট। আর একটুও দেরি করোনা কিন্তু প্রান্তিক। যদিও অনুরোধ, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করতে পারি এমন সাধ্য নেই।

কেটে গেছে বেশ কয়েকটি দিন। পরিমলবাবু ফিরে এসেছেন ট্যুর থেকে। পিসি এব্যাপারে একটিও কথা বলেননি তার সাথে। পরিমলবাবু শুধু বলেছেন, তোমাদের তা হলে যাওয়া হলো না? তার কোন প্রতি উত্তর পিসি দেননি। পরিমলবাবুও এনিয়ে কোন জোর জবরদস্তি করেননি।

অনেকদিন ধরে দেখা হয়না অশ্রুকণা, অনুতপা, রেহানা বা অন্যান্য কলেজ বন্ধুদে সাথে। আজ সবেবরাত। সৌভাগ্য রজনী। ভাবছি একবার যাব রেহানাদের ওখানে। হয়তে আর আগের মতো ওরা আমাকে গ্রহণ করতে পারবেনা, তবু অন্তত নিজের কাছে নিজে কৈফিয়ৎ দিতে পারব, আমি তোমাদের ভুল বুঝিনি, তোমারাই আমাকে ভুল বুঝে দূ সরিয়ে দিয়েছো।

সন্ধ্যের পর, ওদের বাড়ীতে যখন গেছি, এক নিঃশব্দ পুরীর মতো মনে হচ্ছে ওদে বাড়ী। আজ কি তবে সৌভাগ্যরজনী নয়? তাইবা কি করে হবে। অনেক বাড়ীতো আলো মালায় সেজেছে। আমি মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা নিয়ে বেল দিলাম। বেল দিতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। রেহানা। কিন্তু একি চেহারা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো পরনের শাড়ি অবিন্যস্ত। উদাস চোখ। ওকে দেখে ভীষণ ভয় হল। বললাম, কি হয়েছে তোমার রেহানা তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? বলল, এস ভিতরে এস কি যেন ছিল সে কণ্ঠে। হতাশা ন বিষাদ, বুঝতে পারছিনা। আস্তে আস্তে ওর পিছনে পিছনে এসে বসলাম ওদের বসার ঘরে বলল, এত দিন পরে এলে? গিয়েছিলে গ্রামের বাড়ীতে? মনে হল যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। বললাম, না যাওয়া আর হল কই? কেন? গেলে না কেন? সে অনেক কথা থাক। কিন্তু তোমার এই অবস্থা কেন? সেলিনা কোথায়? হাসপাতালে। হাসপাতালে চমকে উঠলাম আমি জানতে চাইলাম কি হয়েছে ওর? বলব! আজ সবেবরাত। সৌভাগ রজনী। আমাদের সৌভাগ্যতো দেখতে পারছ। আমার এই অবস্থা। সেলিনা হাসপাতালে মা জ্বরে বেহুঁশ। নিজেদের রান্না পর্য্যন্ত ঠিক মতো হয় না। তা তুমি কেমন আছো? ভালো না এতো ভালো থাকার কথা নয় প্রান্তিক? আমি বাঁধা দিয়ে বললাম আমার কথা পরে শুনো। জেনে রাখো আমি ভাল আছি। তা তোমাদের এই অবস্থা। আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? রেহানা তার উত্তর না দিয়ে বলল তুমি চা খাবে? একটু বসো। আমি চা নিয়ে আসছি পাশের ঘর থেকে আফরোজ বেগম বললেন, কে কথা বলছেরে রেহানা? উত্তরে রেহান বলল প্রান্তিক। ওকে একবার আমার কাছে আসতে বলতো। রেহানা বলল, তোমার কাছে গেলেই তো তুমি কান্নাকাটি করবে। কি দরকার আমাদের দুঃখের বোঝা ওকে জানিয়ে বুঝতে পারছি কি যেন অভিমান জমে আছে রেহানার বুকে। আমি বললাম, আমি ও ঘরে আছি তুমি চা নিয়ে ও ঘরেই এসো। আমি আফরোজ বেগমের ঘরে গিয়ে বসলাম। উনি শুয়ে আছেন। হাতে এবং পায়ে ব্যান্ডেজ। কপালে হাত দিলাম, জ্বর খুব। বললাম, মাসিমা, আমাকে শুধু মিথ্যেই আপন আপন করেন। কি হয়েছে আপনাদের জানতে চাইনে, কিন্তু আমাকে একবার জানাবারও প্রয়োজন মনে করলেন না।

আফরোজ বেগমের দুই চোখ বেয়ে জল নেমে এলো। আমি রুমাল বের করে মুছিয়ে দিয়ে বললাম, ভেঙে পড়বেন না মাসিমা। মন শক্ত করুন। দেখবেন একদিন সব ঠিক হয়ে গেছে।

রেহানা চা নিয়ে এলো। সঙ্গে ২টো নিমকি, আর দুটো সন্দেশ। আমি বললাম মাসিমা আর তোমার চা। মা এই সময় চা খাননা, আর আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

বেশ গরম। তবু রেহানা শাড়ীর আঁচল আরো শক্ত করে জড়িয়ে নিচ্ছে নিজের শরীরের সঙ্গে, বললাম অমন করছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে? ও বলল না, এমনি। তুমি খাও আমি আসছি। একটু পরেই ফিরে এল আবার। একটা ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে দিয়ে বলল আজ দুদিন হাসপাতালে যেতে পারছিনা। কি জানি কেমন আছে সেলিনা। কোনদিন কোন কথাই তোমাকে বলিনি। আজ অনুরোধ করছি, যদি এর মধ্যে গ্রামের বাড়ীতে না যাও রোজ অন্তত একবার যেও হাসপাতালে? কি জানি কেমন আছে ও? বললাম, কি হয়েছে। সে তুমি গেলেই দেখতে পাবে। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে বলল, আমার অনুরোধটুকু রাখছতো প্রান্তিক? কিন্তু একি? আফরোজ বেগমের মতো ওরও যে প্রচণ্ড জ্বর। বললাম, কদিন এই জ্বর চলছে? বেশ কয়েকদিন হল। ডাক্তার দেখিয়েছো? হ্যাঁ। কি বলছেন? কমে যাবে বলেছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম রেহানা তুমি এত নিষ্ঠুর? থাক ওসব কথা। তুমি কাল যাচ্ছতো হাসপাতালে? বললাম, আমি এখনি যাচ্ছি। কিন্তু এখনতো তোমায় ঢুকতে দেবে না। না তা হয়তো দেবেনা, কিন্তু সংবাদটাতো পাব। কিছু প্রয়োজন হলে অন্তত দিয়ে আসতে পারব। কাল সকালে ওর সাথে দেখা করব। দুপুরে তোমাদের সংবাদ দেবো। তারপর ওর দিকে চোখ রেখে বললাম, নিশ্চয়ই সকাল থেকে খাওয়া হয় নি, দোকান থেকে খাবার এনে দিয়ে যাবো? দরকার নেই প্রান্তিক। সকালে একটু সুস্থ ছিলাম, রান্না করেছিলাম, বিকালটাও চলে যাবে। তুমি আজ যাবে বললেনা? যদি কোন সংবাদ পাও একটু দিয়ে যাবে? দুদিন সংবাদ না পেয়ে মায়ের মনের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। আমি আর কি বলব। শুধু বললাম, আমার উপর তোমার কোন দাবী নেই তাইনা? ও কিছু বললনা। শুধু মাথা নিচু করে রইল। আমি বেরিয়ে এলাম।

হাসপাতালে এসে দেখি যে ওয়ার্ডে সেলিনা ভর্ত্তি আছে সেখানে আমার পরিচিত একটি মেয়ে কাজ করে। ওর নাম তপতী। আমাকে দেখে ও বলল, আরে প্রান্তিক না? এখানে তোমার কে আছে? আমার এক বন্ধুর বোন তোমাদের এখানে ভর্তি আছে, ওর নাম্বার বললাম। তপতী বলল, ও সেলিনা রহমান, এবারের ক্লাব বক্সিং এ প্রথম পুরস্কার বিজয়িনী। কিন্তু ওর কোন দাদা আছে বলেতো জানিনা। ওর এক দিদি না বোন সেই আসতো, কি যেন নাম - হ্যাঁ মনে পড়ছে রেহানা রহমান। ভীষণ মিষ্টি মেয়েটি। তা ওতো দুদিন আসছে না। আমি বললাম, রেহানা আমার সহপাঠী। ওর কথাই বলছিলাম, ও এবং ওর মা দু'জনই খুব অসুস্থ। আজ হঠাৎ গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে। তপতী ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে তারপর বলল - ও তাই বল।

তপতী আমার স্কুল জীবনের বন্ধু সম্পর্কটি এক সময় ছিল অম্ল মধুর। কিন্তু সে সব পুরনো কথা। দেখা না হলে হয়তো কোন কথাই মনে পড়তনা। স্কুল ফাইনাল পাশ করে ও নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে চলে এসেছে। ওর সঙ্গে যে হঠাৎ এখানে দেখা হবে ভাবিনি। তপতী বলল, আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ। না কিছু ভাবছিনা। তারপর বললাম, জগৎটা কি বিচিত্র তাই না? এই দেখনা, কতদিন হয়ে গেছে, সেই যে তুমি নার্সিং ট্রেনিংএ চলে

গেলে, তোমার সঙ্গে যে আবার আমার দেখা হতে পারে তাই কি কখনো ভেবেছি? তা ঠিক। আমিও ভাবিনি। তারপর কণ্ঠটা একটু নীচু করে বলল, আমাকে বোধ হয় তুমি চিনতে পারনি। না সত্যি পারিনি, আর তা ছাড়া তুমি এখানে আছো জানলে হয়তো চিনবার চেষ্টা করতাম। আরো অসুবিধা, নার্সিং ড্রেসে আসল চেহারা অনেকটা চাপা পড়ে যায়। ও বলল, চা খাবে? আর্তকে উঠে বললাম এত রাতে? ও বলল, তুমিতো নীলাঞ্জনা পিসিদের ওখানে আছো তাই না? হ্যাঁ। উনি কেমন আছেন? ভাল। আমাকে কি চিনতে পারবেন? হয়তো হঠাৎ দেখলে নাও চিনতে পারেন, তবে পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন বলেই মনে হয়। দেখেছি তো গ্রামের কথা প্রায়ই ভাবেন। তপতী বলল, আমাদের গ্রামের সব চেয়ে প্রতিভাময়ী মেয়ে। দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। বললাম একবার এসোনা পিসীর বাড়ীতে। যাব একদিন। তুমি ওর ঠিকানাটা দাও। তুমি থাক কোথায়? এখানে হোষ্টেলেই থাকি। তারপর বলল, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক। তুমি কি সেলিনার সঙ্গে দেখা করতে চাও? এখনকি তোমরা দেখা করতে দেবে? দুষ্টু হাসি ঠোটের কোনে মিলিয়ে দিয়ে তপতী বলল, না অসময়ে দেখা কবার নিয়ম নেই। তবে তোমার যখন ভীষণ ইচ্ছে এস আমার সঙ্গে। আমি অন্যান্য পেসেন্টের সঙ্গে কথা বলার মাঝে তোমার কথা, দেখা এবং অন্যান্য প্রয়োজন শেষ করে নেবে। হাতে সময় দশ মিনিট। ডাক্তার বাবু রাউন্ডে আসবেন, বললাম আচ্ছা চল।

অবাক হয়ে দেখলাম, সেলিনাব পায়ে এবং মাথায় ব্যান্ডেজ। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আমাকে দেখে ও অবাক হয়ে তাকায় আমার দিকে আছে। তপতী বলল, সেলিনা, তোমাব দিদি ও মা অসুস্থ, তাই আসতে পারেননি। ওকে তোমার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। তোমাদের প্রয়োজন দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে নাও। ডাক্তার বাবু এসে গেলে কিন্তু আমার অসুবিধা হবে। ধন্যবাদ বলে সেলিনা আমাকে পাশের টুলে বসতে বলল। তারপর দেখতে পাচ্ছি ওর চোখ দুটো ছল ছল করছে। এখনি বোধ হয় কান্না ঝরে পড়বে। আমি বললাম, কাল দুবেলায়ই আসব আমি, তখন সব কথা শুনবো। এখন বলত, তোমার কিছুর প্রয়োজন আছে কীনা? ও সকলেব সামনে আমার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, প্রান্তিক ভাই আমার সেদিনের ব্যবহার কি ক্ষমা করতে পেরেছেন? ওকে বাঁধা দিয়ে বললাম, থাক ওসবকথা। তুমি এখন আগের থেকে ভালোতো? হ্যাঁ অনেকটা ভালো। ঘাও প্রায় শুকিয়ে এসেছে। শুধু সে দিনের কথা চিন্তা করলে মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে। তারপর বলল, রেহানার জ্বর কমেনি? না এখনো কমেনি। তবে তার জন্য তুমি চিন্তা করোনা। তোমার কিছু দরকার কি না সেটা আগে বল। দুদিন জামা কাপড় চেঞ্জ করতে পারছিনা। আমি বললাম এখানে খেতে পারছতো। চলে যাচ্ছে প্রান্তিক ভাই, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। জানি কষ্ট হবে তবু মা ও রেহানাকে একটু দেখবেন। তাবপর অন্য দিকে পাশ ফিরে শুলো সেলিনা। আমি উঠে পড়ে বললাম, আজ তাহলে আসি, কাল আসব। তুমি বাড়ীর জন্য চিন্তা করোনা।

বেরিয়ে আসার সময় তপতী এলো কাছে। বললাম আমি তা হলে আসি তপতী।

ও বলল, ঠিক আছে এসো। চিন্তার কিছু নেই, খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি বললাম তাই যেন হয়। ও আমার আরো কাছে এসে বলল, ওর জন্য আলাদা করে কিছু করতে চাইলে তোমার আপত্তি হবে নাতো প্রান্তিক? মানে? ও বলল রেহানা এলেও দেখেছি তো ও যেন কাকে খুঁজতো। তারপর ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেলে, ওর বুকে যেন কিসের হতাশা নেমে আসতো। পেশেন্টের পরিচর্য্যা করতে করতে আমি তোমাদের লক্ষ করছিলাম। তুমি জেনো প্রান্তিক ও আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাবে। চিন্তা করো না। আমিতো এই হোস্টেলেই থাকি, ওর কোন অসুবিধা হবে না। শাড়ি ব্লাউজ যা যা প্রায়োজন আমিই কাল সকালে দিয়ে যাবো। তপতীর ভুল ভাঙাতে ইচ্ছে করল না। শুধু বললাম সে তুমি যা ভালো বোঝ করবে। আমি বেরিয়ে এলাম। রাত প্রায় দশটা আবার রেহানাদের বাড়ী। রেহানা জানালা খুলে দেখল যে আমি। বললাম দরজা খুলবার দরকার নেই। সেলিনা ভালো আছে। ওর যা প্রয়োজন মোটমুটি একটা এরেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। অসুবিধা হবে না। হয়তো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে। কাল সকালে ওর সঙ্গে দেখা করে দুপুরে আসব। চিন্তা করোনা।

আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে যখন ফিরেছি তখন দশটা তিরিশ বেজে গেছে। পরিমলবাবু আজও হঠাৎ না ব'লে বাড়ী ফেরেননি। পিসি শুধু ঘর আর বার করছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু বাইরে তা কিছুতেই প্রকাশ না করে গেটের তালা খুলে দিলেন। বললাম, আমি খুব দুঃখিত পিসি। তোমাকে সংবাদ দিতে পারিনি। পিসি কোন কথাই বললেন না। আমি বললাম কোথায় গিয়েছিলাম কেন দেরি হল কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না? কি প্রয়োজন। দরকার মনে করোনি সংবাদ দাওনি। রাত হয়েছে খাওয়ার প্রয়োজন হলে খেতে এসো। আমি বললাম, পিসেমশাইয়ের সংবাদ নেবো না। কোন প্রয়োজন নেই। আমার জন্য যখন কেউ ভাবেনা, তখন আমিই বা ভাবতে যাব কেন?

আমি আর কথা বাড়ালাম না। খাওয়ার টেবিলে এসে খেতে বসলাম। পিসি বললেন, তোমার কলেজ খুলতে আর কদিন বাকী আছে? দিন দশেক। তাহলে কি ঠিক করলে গ্রামের বাড়ীতে যাবেনা বলে মনস্থির করেছো? না ঠিক কিছুই করিনি। আর তাছাড়া তুমিও আর কিছুই বলনি। এবার তাহলে বল কবে যেতে চাও? পিসি বললেন, কালই চল। কাল? কেন তোমার অসুবিধা আছে নাকি। হ্যাঁ তা একটু আছে পিসি। তবে পরশু চল। আমি বললাম, আর কয়েকটি দিন দেরি করলে হয় না। কেন? তোমার এখানে এত কি কাজ যে কয়েকদিন দেরি করতে চাইছো? কণ্ঠে অসম্ভব উষ্মা। আমি ধীরে ধীরে বললাম। তুমি জানতে না চাইলেও আমি বলতাম পিসি। আসলে তোমাকে না বলে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। কি এমন কথা যে আমাকে না বলে তুমি শান্তি পাচ্ছ না। বললাম, শোনার আগে তোমার একটু শান্ত হওয়া দরকার পিসি। আমি কি অশান্ত? তুমি আমার থেকে নিজেই ভালো জানো তুমি শান্ত না অশান্ত। আমার কণ্ঠে যেন কি ছিল হয়তো উদ্বিগ্নতা আর দুশ্চিন্তার ছাপ। পিসি বললেন, একি প্রান্তিক তোমার চোখে জল, ছি এতবড় ছেলের চোখে জল আসতে

নেই। তোমার এমন কি হয়েছে যে এত দুশ্চিন্তা করছ? আমি তো আছি। হ্যাঁ আমি জানি তুমি আছো, তাইতো নিজেকে এখনো ঠিক রাখতে পেরেছি। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বললাম। সেই ডালিমের কথা, সেলিনার কথা, রেহানার কথা, আফরোজ বেগমের কথা, এক এক করে সব বললাম পিসিকে। যে দিন গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল, সে দিন কেন যাওয়া হলো না, কেন মিথ্যে কথা বলতে হলো। আবার আজ সবেবরাতের রাতে ওদের ওখানে গিয়ে যা যা ঘটেছে, এবং হাসপাতালে তপতী, সেলিনা আবার সেখান থেকে রেহানাদের বাড়ী, কোনটাই বাদ না দিয়ে সব কিছু পিসিকে বলে, জিজ্ঞাসা করলাম এবার বল আমার কি করণীয়।

খাওয়া বন্ধ করে পিসি সব শুনলেন। তারপর বললেন অনুমান কিছু করেছিলাম প্রান্তিক। কিন্তু বাস্তব আর অনুমানতো সব সময় এক হয় না। যাই হোক, সেলিনা হয়তো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রেহানা ভোগাবে। ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে? জানিনা। সেকি কথা, ওর ঐ অবস্থা ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে কী না এটাই জান না? তারপর বললেন ঠিক আছে সকালে ডাঃ মিত্রকে নিয়ে ওদের বাড়ী যাবে। যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্যই উনি যা যা বলেন সবই করবে। যা ওষুধ বলেন সব কিনে দেবে। আর হোটেলে এরেঞ্জমেন্ট করবে যেন দুবেলা ওদের বাড়ীতে তারা খাবার পাঠায়। আমি বললাম কিন্তু। আবার কিন্তু কি। আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু এতসব করার জন্যেতো অর্থের দরকার। হ্যাঁ দরকারই তো, এ সবতো আর বিনা পয়সায় হবে না। কিন্তু ওরা যদি অত অর্থের সংস্থান করতে না পারে। তুমি দেবে। আমি? কি বলছ তুমি পিসি? আমি নিজের শরীরে যতক্ষন কুলাবে, পরিশ্রম করতে পারব, কিন্তু অর্থ কোথায় পাব? পেতে হবে প্রান্তিক। না পেলে চলবে কেন? কিন্তু কোথায় পাব? পিসি বললেন প্রিয়জনের জন্য প্রয়োজনে চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি যা হয় কিছু একটা করবে। আমি আঁতকে উঠে বললাম কি বলছ তুমি পিসি, চুরি রাহাজানি, ডাকাতি করব? না করলে তুমি এতটাকা পাবে কোথায়? দরকার নেই আমার কোন প্রিয়জনের ভালো হওয়ার। রাহাজানির টাকায় তাদের ভালো হওয়ার থেকে ধীরে ধীরে তাদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াই উচিত। তাই বুঝি। তা তোমার চোখের সামনে সামান্য চিকিৎসার অভাবে তারা যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, পারবে সেই দৃশ্য দেখতে? বললাম জানিনে পারব কিনা। তবে এসব আমি পারবনা। না যদি পারবে তা হলে ভালবাসতে গেলে কেন? ভালবাসা কি ছেলে খেলা? তারপর একটু থেমে বললেন, ঠিক আছে সারারাত না হয় ভেবে দেখ, এসব করা সম্ভব কীনা। আপাতত খেয়ে নাও। না আর খেতে ইচ্ছে করছে না। বেশ, তা হলে উঠে পড়।

সকাল বেলা, আমায় ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেন পিসি, বললেন বাবাঃ কি ঘুম ঘুমাতে পারো। ডাঃ মিত্রের ওখানে যাবে না? বললাম না থাক পিসি। ডাঃ নিয়ে গিয়ে ওদের অপ্রস্তুত করতে চাইনা। আমি জানি, তা তুমি পারবেনা। আসলে তুমি একটা ভীরু কাপুরুষ মাত্র। তারপর নিজের মানি ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে বললেন, আশা করি আপাতত মিটে

যাবে। পরে লাগলে আমাকে বলতে পারবে, না তাও পারবে না। কিন্তু পিসি? ও তুমি ভাবছো আমার কাছ থেকে এটাকা নেওয়া কি তোমার ঠিক হবে? ওটা না হয় পরেই ভেবো প্রান্তিক। আপতত, এ টাকাটা দরকার। আর দেরি করোনা, এর পরতো আবার সেলিনাকে দেখতে যাবে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকালাম পিসির দিকে। সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে যেন অপরূপ দেবীমাধুর্য। হাত পেতে নিলাম পিসির দেওয়া ভালোবাসার দান, প্রিয়জনের কাছ থেকে দান হিসাবে টাকা নেওয়া যায় কি না জানিনা। কিন্তু পিসির এ দানের সঙ্গে ঝরে পড়ছে অজস্র ভালোবাসা। আমি জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। একটা টিফিন ক্যারিয়ারের কৌটা এগিয়ে দিয়ে বললেন এটা নিয়ে যাও। কি ওটা? সকালে কিছু খেতে হবে তো।

অবাধ্য চোখর জল কিছুতেই বাধা মানতে চাইছেনা। বহু কষ্টে সামলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডাঃ মিত্রকে নিয়ে যখন রেহানাদের ওখানে পৌঁছালাম, তখন নটা বাজে। উনি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন রেহানাকে। ওষুধ লিখলেন ও কয়েকটা জটিল পরীক্ষা করতে বললেন, তারপর বললেন ভয়ের কিছু নেই। কয়েকদিন ভোগাবে, তবে সুস্থ হয়ে যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পরীক্ষাগুলো আজকেই করে ফেলতে পারলে ভালো হয়। যত দেরি হবে সঠিক চিকিৎসা তত বিলম্বিত হবে। আরেকটা কথা, এখন পরিপূর্ণ বেডরেষ্ট। টেনশন আর অমানবিক পরিশ্রম, তারপর দিনের পর দিন পরিমাণ মত খাদ্যের অভাব ওকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। মনে রাখবে প্রান্তিক বিশ্রামের যেন কোন ব্যাঘাত না হয়।

ডাঃ বাবুকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে এলাম। রেহানা বলল এসব তুমি করতে যাচ্ছ কেন? কি লাভ তোমার? জীবনের সবকিছু কি লাভ লোকসান দিয়ে বিচার হয়? শুনেছতো ডাঃ বাবুর কথা। শুধু বিশ্রাম আর বিশ্রাম। কিন্তু কিভাবে বিশ্রাম নেবো প্রান্তিক। মায়ের ঐ অবস্থা, সেলিনা হাসপাতালে, আমার কি বিশ্রাম সাজে? তাহলে মর, আমার কি? রাগ করছ কেন? না রাগ করব না, কিন্তু আমার কথা না শুনলে আর কোন দিন আসব না। আর শোন, সেলিনাকে দেখে আমি বারোটা নাগাদ আসবো, এই টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার আছে খেয়ে নিও। তারপর দেখি কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টের সঙ্গে এরেঞ্জমেন্ট করা যায় কি না। পাগলামি করোনা প্রান্তিক। তোমাকে কিছু করতে হবে না। দেখবে আস্তে আস্তে এবার আমি ভাল হয়ে গেছি। কোন পরীক্ষা না করে, কোন ওষুধ না খেয়ে? রেহানা অর্থপূর্ণ হেসে বলল, কাল থেকেতো ওষুধ খাচ্ছি প্রান্তিক। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। কাল যদি আমাকে অনেকটা সুস্থ না দেখ তোমার কথা শুনবো, কিন্তু আজ আর আমাকে নিয়ে টানাটানি করোনা। বেশ এই খাবারটা খেয়ে নিও। কি আছে ওতে? আমি জানি না। বা তুমি হাতে করে বয়ে নিয়ে এলে আর তুমি জাননা ওতে কি আছে? বললাম তুমি বড্ড তর্ক করো রেহানা। আমার সময় নেই চললাম।

সকালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট থাকতে দেওয়া হয় রোগীর কাছে। তাও পনেরো মিনিট লেট। তপতী দাঁড়িয়ে আছে তখনো। ওর ডিউটি ইভিনিং এ। আমাকে দেখে বললো

এতে দেরি করলে প্রান্তিক? হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেছে। সেলিনা কেমন আছে? ভালো আছে। তোমাকে খুঁজছে। আচ্ছা চল। তুমিই যাওনা। আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্য। কেন মিথ্যে অজুহাত খুঁজছো। চল। আমাকে যেতেই হবে? বা তুমিতো আচ্ছা মেয়ে তপতী। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে অথচ আমার সঙ্গে যাবে না। একটু হেসে তপতী বলল, অনেক দিন পরে ওর সঙ্গে কথা বলবে। এমন কথা তো কিছু থাকতে পারে যা আমার উপস্থিতিতে বলা যাবে না। যদি না যায়, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলবো। ওকেও তো মনে রাখতে হবে ও পেশেন্ট। ও হাসপাতালে আছে। তপতী কি যেন ভাবল তারপর বলল চল।

তপতী নিশ্চয়ই সকালে এসে ওর পোষাক বদলিয়ে দিয়ে গেছে। একটা আনকোরা নতুন ছাপার শাড়ী পরেছে সেলিনা। মাথার চুল বিন্যস্ত। কে যেন সুন্দর করে আঁচড়িয়ে দিয়ে গেছে। কাল যেমন লেগেছিল আজ আর তেমন লাগছে না। তপতী বলল, তুমি এগোতে থাক, আমি একটু এখনকার ডিউটি দিদির সঙ্গে কথা বলে আসি। আমি এগিয়ে যেতে সেলিনা বলল, কুড়ি মিনিট দেরিতে এলেন প্রান্তিক ভাই। হ্যাঁ একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি তো ঝগড়া করার জন্য অপেক্ষা করছি। কেন ঝগড়া করবে কেন? বা ঝগড়া কররোনা। তপতীদিকে দিয়ে আমাকে এত অপমান করলেন কেন? আমি বললাম, তপতী তোমাকে স্নেহ করে সেলিনা। মনে করোনা ও রেহানার মত তোমার আর একটা দিদি। আচ্ছা না হয় তাই ভাববো। ওকে আপনি চিনলেন কি করে? সে পরে হবে। এখন কেমন আছো? ভাল। আপনি তপতী দিকে জিজ্ঞাসা করুননা আমাকে কবে ছেড়ে দেবেন। বললাম এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এটাতো হাসপাতাল, তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা হলে আর একদিনও এরা তোমাকে রাখবেন না। হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়ালো তপতী। বলল, ভাই সেলিনা, প্রান্তিককে যে তুমি চেন তা আগে বলনি কেন? সেলিনা বলল আপনি যে ওকে চেনেন তা জানব কি করে? তাছাড়া আপনার বিরুদ্ধেও আমার একটা অভিযোগ আছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ? দেখ প্রান্তিক ও বলেকি? তোমার কথায় ওর জন্য আমি যা নয় তাই করলাম, তারপরও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ? তা ভাই অভিযোগটা কিসের? হঠাৎ হাসতে হাসতে সেলিনা বলল, থাক বলবনা।

কেটে যায় আরো কয়েকটা দিন। সেলিনাকে এখনো ছেড়ে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একটি গুলি কানের পাশ দিয়ে মাথার একটি অংশ দিয়ে গেছে। আরেকটা পায়ে। পায়ের ক্ষত শুকিয়ে গেছে প্রায় কিন্তু মাথার ক্ষত শুকাতে আরো কয়েকটা দিন লাগবে। কিন্তু সেলিনা কিছুতেই আর হাসপাতালে থাকতে চাইছেনা। অনেকদিন তো হয়ে গেছে হাসপাতালে আছে। হাসপাতালের অনেকের সঙ্গে এই দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছে। তপতী হোস্টেলে থাকে। হোস্টেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে, সেলিনার দুই বেলার খাবার ওই নিয়ে আসে। এ নিয়ে সেলিনা একদিন বলে যে, আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করেন কেন তপতীদি। তপতী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, প্রান্তিক বলেনি রেহানার মত আমিও তোমার একজন দিদি। রেহানা যদি আমার পরিবর্তে এই হোস্টেলে থাকতো, তাহলে কি তোমাকে সে হাসপাতালের খাবার খেতে

দিতো। কিন্তু আপনি কেন ভুলে যান। আমি আপনাদের ভালোবাসা বা স্নেহের যোগ্য নই। কে বলেছে? আমি বলছি। তোমার বলা বা জানাটাইকি সব? হ্যাঁ হ্যাঁ সব। তারপর বলল আমার জন্য হ্যাঁ, কেবল আমার জন্যই, আমার গোঁয়ারতুমির জন্য, শুধু আমার নিজের জীবনে নয়, আমার গোটা পরিবার তথা, প্রান্তিক ভাই এবং আপনাকেও এই কষ্ট ভুগতে হচ্ছে। তপতী ওকে বাঁধা দিয়ে বলে এত কথা বলোনা সেলিনা। ভুলে যেওনা তুমি এখনো সুস্থ হওনি। ও তাকালো তপতীর দিকে। তারপর ফাঁকা হাসপাতালের দেওয়ালের দিকে মুখ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তপতী বলল, আমার উপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে তাই না সেলিনা? সেলিনা আবার ফিরলো তপতীর দিকে। তারপর বলল, আপনারা আমাকে কেন এত ভালবাসেন বলুনতো? তপতী শুধু একটু হাসলো। তারপর বলল, তুমি ভালবাসার মতো যে, তাই তোমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারি না। সেলিনার এই সব সহানুভূতির কথা শুনলে চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে, তারপর ঝাপসা হতে হতে এক সময় জলে ভরে যায়। নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। অতিকষ্টে চোখের জলকে সংবরণ করে ও বলল, আচ্ছা তপতীদি আপনার বাড়ীতে আর কে কে আছেন? কেন যাবে নাকি আমাদের বাড়ীতে? যেতেতো ইচ্ছে করে দিদি। কিন্তু ভয় হয়। কেন ভয় হয়? সেলিনা বলল, একবার যাব বলে ঠিক করার পরিণতি তো এই, আবার যদি যেতে চাই, জানিনা, এই পৃথিবীর আলো আর দেখতে পারব কি না। গভীর হতাশা ঝরে পড়ে তার কণ্ঠে। তপতী সেলিনার এই অবস্থার অতীত ইতিহাস জানে না, তবে ভেবে নেয়, নিশ্চয়ই কোন গোপন ইতিহাস আছে এর পিছনে। খুঁচিয়ে তা বের করে সেলিনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না। বলে, থাক ও সব কথা। বরং পরে একদিন তোমার কাছ থেকে ভাল করে জেনে নেবো। এবার তাহলে আসি। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবুরা আসবেন রাউন্ডে। আমার কাজ আছে। সেলিনা বলল, আজ আর কেউ এলোনা তাই না? বুঝতে পারে তপতী। এই কেউ বলতে সেলিনা কার কথা বলছে। চারটে বাজার আগে থেকে তার মন কার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তাতো অজানা নয় তপতীর। রেহানাও আসেনা বহুদিন। প্রান্তিক সেদিন বলেছিল সেলিনাকে রেহানা এখনো পরিপূর্ণ সুস্থ নয়। আর মা। না তিনি অনেকটা ভাল আছেন। ব্যান্ডেজ খুলে দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়েছেন। রেহানার জ্বর কি এখনো কমেনি? কমেছে কিন্তু খুব দুর্বল। রোজই বায়না ধরে তোমার কাছে আসবে বলে। কিন্তু নর্থ থেকে সাউথে আসার ধক্কল সইতে পারবে কি না সেই ভয়ে আমি বলেছি, আরেকটু সুস্থ হও, তারপর নিয়ে যাবো। তাছাড়া আমিতো রোজই যাচ্ছি। রোজই তোমাদের সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি। তপতী আছে ওখানে। ও ওর যথাসাধ্য করছে। সেলিনা জানতে চায় রেহানার চেহারা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে? তুমি এই সব ভাব বুঝি। তোমাকে না বলেছি সেলিনা, এখন আর কারও কথা ভাববে না।

সেলিনার স্বগতোক্তির উত্তরে তপতী জানায় তোমাকে বলে যেতে ভুলে গেছে প্রান্তিক, তাই যাওয়ার পরে মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে এসে আমাকে বলে গেছে কাল ওর আসা হবে না। খুব জরুরি একটা কাজ আছে। তাই আমাকে বিশেষ ভাবে বলে গেছে,

ভিজিটিং আওয়ারের সময়টুকু যেন আমি তোমার কাছে থাকি। তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে যেন জেনে নিই। তা তুমিতো কিছুই বলছো না। প্রান্তিক জানতে চাইলে কি বলব। ও জানতো না যে আমি যাবো না, জানা থাকলে হয়তো এতটা উতলা হতোনা। বলল, আমার তো সব প্রয়োজনই আপনি মিটাচ্ছেন নতুন করে আর কি প্রয়োজন হবে?

এতদিনে তপতীও জেনে গেছে, প্রান্তিকের সমস্ত মন জুড়ে আছে সেলিনা এবং তাদের পরিবারের সকলে, কিন্তু সম্পর্কটা কোন স্তরের তার কোন হদিস পায়নি। না সেলিনা না প্রান্তিক কেউ তাদের আচরণে এমন কোন কিছুর প্রকাশ হতে দেয় নি যে, তাদের সম্পর্ক নিয়ে অন্য কিছু ভাবা যায়। এই সম্পর্ক ভাই-বোনের স্নেহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তপতী প্রথম প্রথম একটু আধটু ঠাট্টা করতে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এমন কিছু দৃষ্টিকটু ব্যবহার তাদের মধ্যে নেই যে সেই ঠাট্টাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যেতে পারে। জানতে চাইলো প্রান্তিকের কাছে· আমি কি সেলিনাকে জানিয়ে দেব যে তুমি কাল আসতে পারবে না। কি দরকার আগে আগে জানিয়ে। ববং তাতে ওর মনটা অকারণ খারাপ হয়ে যেতে পারে। অন্তত পুরোটা সময় তো সে ভাবতে থাকবে, আমি আসতেও পারি। কিন্তু সত্যি করে যখন সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন জানিয়ে দিও। আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রান্তিক? বল। ওদের জন্য তুমি এত করছ কেন? আমি একটু হাসলাম, তারপর চুপ করে থেকে বললাম, ভগবান না করুন, এরকম অবস্থায় পড়লে, আমাকে তোমার পাশে পাবে ঠিক এখনকারই মতন। তবু যেন তপতীর কোথায় অতৃপ্তি থেকে যায়। ঠিক উত্তর যেন পাওয়া হল না। বলল, তুমি যে এদের জন্য এত করছ নীলাঞ্জনা পিসি জানেন?

আমি বুঝতে পারছি। আমার ভিতর থেকে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে আসল সত্যটা বের করে নিতে চাইছে তপতী। বললাম হয়তো জানেন। তোমার একথার মানে? কি করে এর মানে তোমাকে বলি, বলত তপতী। পিসিতো কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নি, আমি কোথায় যাই, কি করি। তার মানে তোমার বাঁধন বলতে কোথাও কিছু নেই। তোমার নিজের ইচ্ছেয় যা কিছু করতে পারো। বললাম, এ তোমার রাগের কথা তপতী। কোন বাঁধন নেই এটাই তুমি বুঝলে? তারপর বললাম যদি কোন বাঁধন না থাকবে, তাহলে আমি রোজ আসি কেন এখানে, আর তুমিই বা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এত করছ কেন? আমার কথা ছাড়, আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমি তপতীর কৌতূহলকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, রাত অনেক হয়েছে। আর নয় তপতী। তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, তুমি পিসির ঠিকানা নিয়েছিলে একবার যাবেও বলেছিলে। যাবে না কি? কবে? যে কোনদিন। আচ্ছা ভেবে দেখব। আমি যখন উঠে পড়ছি, আবার পিছু ডাকলো তপতী। বললাম বল। রেহানা ওর বোন না দিদি? দিদি। ও কি এখানে আসার মত সুস্থ হয় নি? কেন বলত। না ও বলছিল, কতদিন রেহানাকে দেখেনা। আমার মনে হয়েছে রেহানাকে ও ভীষণ ভালবাসে। যদি সম্ভব হয় কালকে পারবেনা বলছ, পরশু ওকে নিয়ে এসোনা। আচ্ছা দেখি।

পিসিকে যে মিনতি সেন ফোন করতে পারেন তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। এটা ঠিক, মিনতি সেনদের ওখানে যাওয়া হয় না অনেক দিন। যাব যাব করেও যাওয়া হয়

নি। আসলে সময় করে উঠতে পারিনি। কিন্তু মিনতি সেনের বাবা যে অসুস্থ। একবার আমি যাব কথা দিয়েও যাওয়া হয়নি। এটা খুব অন্যায় হয়েছে- জানি। তাই বলে পিসিকে ফোন করে আমার কথা জানতে চাইবেন, না একথা কখনো ভাবিনি। তাই পিসি যখন বললেন, আজ মিনতি সেন ফোন করেছিলেন। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, মিনতি সেন তোমাকে ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ করেছিলেন তো, কিন্তু তুমি যে ভীষণ অবাক হচ্ছো। উনি কি কোন কারণে আমাকে ফোন করতে পারেন না। পারেন না সে কথা আমি বলিনি, কিন্তু কেন ফোন করলেন সেটাই আমার জানার বিষয়। আমি ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আছি কি জানি কি কথা না বলেছেন মিনতি সেন। পিসি বললেন তুমি বলেছিলে, ওর বাবা খুব অসুস্থ। তুমি যাবে একবার। হ্যাঁ বলেছিলাম, তবে যাওনি কেন? নানা ঝামেলায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এত কি ঝামেলা যে একজন ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েও তা রাখা গেলনা। আমি বললাম, না পিসি ঠিক তা নয়, আমি কথা দিলে তা রাখবার আপ্রাণ চেষ্ঠা করি। পিসি উষ্মা নিয়ে বললেন এইতো তার নমুনা। যাকগে সে কথা তুমি কি পরশুদিন যেতে পারবে? কেন তুমি যাবে আমার সাথে? আমি যাব কেন? আমাকে কি যেতে বলেছেন নাকি? আমি বললাম জানি না উনি কি বলেছেন, তবে শুধু আমার যাওয়ার কথা বললে তো পিসেমশাইকে বলে দিতে পারতেন। তোমাকে নিশ্চয়ই ফোন করতেন না। তারপব কাতর অনুরোধ করে বললাম চল না পিসি আমার সাথে। পিসি যে আমার এই অনুবোধে রেগে যেতে পারেন, ভাবতে পাবিনি। বললেন, দেখ প্রান্তিক ছেলেমানুষীর একটা সীমা আছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। প্রায় রাত ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। আলোটা নিভানো হয়নি বলে পিসি এলেন আমার ঘরে। বললেন, আলোটাতো নিভিয়ে শুতে পারতে তা হলে আমার আর কষ্ট করে আসতে হতোনা। কি যে কর। তারপর যেমন ভাবে এসেছিলেন, আলোটা বন্ধ করে তেমনি ভাবে চলে যেতে উদ্যত হতেই আমি বললাম, শোন পিসি। কি বল? তোমার ঘুম পাচ্ছে? পিসি আবো রেগে গিয়ে বললেন, এই সব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। বুঝতে পারি কোথাও কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ধরতে পারছিনা। তবু কোন রকম রাগ বা উষ্মা প্রকাশ না করে বললাম, যে কোন কারণে তোমার আজ মন ভালো নেই পিসি। তোমার বুঝি তাই মনে হচ্ছে? কিন্তু সেসব ভুল। আমি ভীষণ ভালো আছি। আজ আমি ভীষণ আনন্দে আছি। কি সব প্রলাপ বকছ পিসি? পিসি আরো রেগে গিয়ে বললেন। আমি প্রলাপ বকছি? মানে আমি পাগল? পাগল তোমার পিসেমশাই। পাগল তোমার মিনতি সেন। পাগল তুমি তোমরা সবাই।

আমি যে কি করব বুঝতে পারছি না। আলো নিভাতে সমস্ত ঘরটা ঘুরঘুটে অন্ধকার। আমি বিছানায় বসে নাইট বাল্বটা জ্বেলে দিলাম। দেখলাম পিসি দুই হাতের পর মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছেন। হঠাৎ খুব দুশ্চিন্তা হল আমার, তবে কি পিসেমশাইয়ের না আসা, এবং মিনতি সেনের আমাকে ফোন করে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোন গভীর যোগসূত্র আছে?

বললাম পিসি ওভাবে বসে আছো যে। যাও ঘুমিয়ে পড়ো গে। আবারো সেই রাগী

জবাব তুমি ঘুমাও। আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমার সময় হলে আমি ঘুমাতে যাব। আমি উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। আস্তে আস্তে দাঁড়ালাম পিসির পাশে এসে। পিঠে হাত রেখে ডাকলাম পিসি। আমার গায়ে হাত দেবে না। তোমরা সব শত্রু। কেউ তোমরা আমাকে চাও না। আমার ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তোমাদের। আমি শুধু অবাক আর অবাক হয়ে চলেছি। বললাম কি যা তা বলছ পিসি? কে তোমার শত্রু? এ তোমার মনের ভুল। মনকে ঠিক কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার পিসি আর কোন কথা বললেন না। আমি আবারও ডাকলাম পিসি। কিন্তু কোন সাড়া নেই। এবার জোর করে মুখটা তুলে ধরতেই দেখলাম, দুচোখের জলে তার বুকের আঁচল ভিজে একাকার। বললাম ছিঃ পিসি ছিঃ! কি হয়েছে না বলে নিজের মধ্যে চেপে রেখে দিলে কি সমাধান হবে? এবার উনি আমাকে আস্তে আস্তে ওর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, আমি খুব খারাপ তাই না প্রান্তিক? এসব তুমি কি বলছ পিসি, কে বলেছে তুমি খারাপ। তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছো কেন? আমি পিসির বাহুপাশ থেকে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, সামনের চেয়ারটায় পিসিকে বসিয়ে দিয়ে, বিছানার এক পাশে মুখোমুখি বসে মৃদু কণ্ঠে বললাম, কে তোমাকে এই বাজে কথা বলেছে জানিনা। যেই বলুক সে মিথ্যে কথা বলেছে? আমি কোথায় যাব পিসি? কে আছে আমার এখানে? আর কেনই বা যাবো? তুমিতো আমার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করনি যাতে রাগ করে চলে যাব। পিসি বললেন, তার মানে, আমি খারাপ ব্যবহার করলে তুমি চলে যেতে পার। আর এখন না গেলেও ভবিষ্যতে যেতে পারো নিশ্চিত, তাই না? আমি কি তাই বলেছি? না স্পষ্ট করে বলোনি, তবে তুমি যা বলেছো, তার তো মানে একটাই। কিন্তু প্রান্তিক তুমিতো নিজেই বলেছো আমাকে তুমি ভালবাস। আমার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে তোমাব ভাল লাগে। তাইনা? পিসিব প্রশ্নের উত্তরে বললাম সত্যি কথাইতো বলেছি পিসি। সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি। নীলাঞ্জনা বললেন, ভালবাসা বুঝি খুব পলকা জিনিষ, যে সামান্য আঘাতে তা ভেঙে যাবে। বললাম বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছো পিসি। নীলাঞ্জনা বললেন, কথা দাও প্রান্তিক আমি যদি খারাপ ব্যবহারও করি কোন দিন, তাহলেও তুমি কোনদিন চলে যাবেনা। তাহলে তো বুঝবো তুমি আমাকে ভালবাস।

পিসির এই এলো মেলো ব্যবহারে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। তবু বললাম জানিনে আমার মুখ দিয়ে তুমি কি শুনতে চাও। বল তুমি আমি কি বললে তুমি খুশী হবে? আমার খুশী হওয়াটা কি তোমরা চাও? তোমরা বলতে কি বলতে চাইছো জানিনা, কিন্তু আমার কথা বলতে পারি, তুমি চাওনা, তুমি খুশী হতে পার না এমন কিছু আমি করবনা, কোন দিনই আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না পিসি। নীলাঞ্জনা চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। বললেন, একথার মানে কি জান? জানি। কি জান? বললাম আমি আমার কথা বলেছি পিসি, আর তুমিও বধির নও যে শোননি। তাই নতুন করে এককথা বার বার বলতে পারবনা। পিসি মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু আমাকে সুখী দেখতে বা করতে গিয়ে যদি তোমাকে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়? তাই নেবো পিসি। সহজ কণ্ঠে নীলাঞ্জনা বললেন, এখনো সময়

আছে প্রান্তিক এমন কঠিন সিদ্ধান্ত তুমি নিওনা। আমি ধীরে ধীরে বললাম, এ কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নয় পিসি। আমার জীবনে তোমার অবদানকে আমি অস্বীকার করব কি করে? নীলাঞ্জনা বললেন যদি আমার হঠকারিতার জন্য জেদের জন্য একে একে সবাই আমাকে ছেড়ে যায়? আমি যাব না। কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি বলে। আর একথা তো তোমাকে বহুবার বলেছি। আমার কথা শুনে পিসি আবারও রেগে উঠলেন। বললেন, ভালবাসার মানে জান? না জানিনা, কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কোন সুখ কিনতে চাইনে। কিন্তু ভেবে দেখোছো কি এসব করতে গিয়ে যদি তোমার জীবন জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যায়? কোন দিনইতা তুমি জ্বালাতে পারবে না পিসি কারণ আমার জীবনে আগুন জ্বালিয়ে তোমার সুখ কেনা হবে না। সুতরাং ওতে আমি ভয় পাইনা পিসি, মিছিমিছি ভয় দেখিওনা আমাকে। আমিও খানিকটা একরোখা হয়ে কথাগুলো বললাম পিসিকে। কি যেন ভাবলেন পিসি। তারপর একবার পিছনের দবজার দিকে তাকালেন অকারণে। এগিয়ে এলেন আমার দিকে আস্তে আস্তে। আমি তখন মাথা নীচু করে আছি। দু হাতে আমার মুখটা তুলে নিলেন। ভয় যে পেলাম না তা নয়। আগেও দুই দুইবার তার দুর্বলতার আঁচ পেয়েছি আমি। আমার চোখ দিয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছে। নিজের আঁচলে তা মুছে দিয়ে বললেন, চোখের জল যে মাঝে মাঝে জীবনের কত কঠিনতাকে উর্বর করে তুলতে পাবে নিজের জীবন অভিজ্ঞতায় তা আমি বুঝেছি। মুছে ফেল চোখের জল প্রান্তিক। তারপর বললেন যাতে তোমাকে সুখী দেখতে পারবনা, তেমন সুখ আমি কি চাইতে পারি। আমার ভিতরের কান্না গলা পর্য্যন্ত উঠে এলো, বললাম পিসি! পিসি আমাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন। তারপর মশারি খাটিয়ে, ঘরের সব গুলো আলো নিভিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত কাটলো এক গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। কি যে হল আর কি যে হল না, কোনটাই যেন ঠিক মনে করতে পারছিনা। পিসি কি চাইলেন আর আমি কি দিলাম তার চেয়েও বড় হয়ে উঠলো পিসি কি দিলেন, আর আমি কি পেলাম। পিসি কি নিজেকে সরিয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে? না তিনি আমার মনের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন সেই অপূর্ণতা, যার জন্য পিসি নয়, আমাকেই যেতে হবে তার কাছে। জানিনে কিছুই জানিনে।

সকালের বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছেনা। ভাবছিলাম পরিমলবাবুর কথা। কে দায়ী পিসি না পরিমলবাবু? আপাত দৃষ্টিতে পরিমলবাবুর বিশেষ কোন দোষ আমি দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু কিছু একটা আছে যা পিসি এবং পরিমলবাবুকে সন্দেহের দোলায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সকালের চা নিয়ে এসে পিসি বললেন, রাতে নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি। না হয়নি। আমি জানতাম তুমিতো সবই জান। হ্যাঁ জানিতো। কালকের সেই বিষন্নতা একে বারে অনুপস্থিত। সকালে স্নান করেছেন পিসি। পরেছেন গরদের লাল পেড়ে শাড়ী। একটু আগের প্রভাত পূজার শঙ্খধ্বনি এসেছে কানে। আগে করতেন না। কিন্তু ইদানিং সকাল সন্ধ্যা দু বেলাই মঙ্গলদীপ জ্বালান তিনি তার দেবতার মন্দিরে। নটরাজের পূজারি নীলাঞ্জনা পিসি। বললাম এত সকালে তোমাব পূজা শেষ? তারপর জানতে চাইলাম আজ কি প্রার্থনা করলে

তোমার দেবতার কাছে। পিসি বললেন আমার দেবতা নটরাজ। তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে। তার কাছে তো চাইবার কিছু নেই আমার, তবু মৃদু হেসে পিসি বললেন বলেছি আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দাও হে নটরাজ তোমার আপন খেয়ালে। ব্যস তোমার প্রার্থনা শেষ? কেন তুমি কি অন্য কিছু চাইতে নাকি? না পিসি কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা আমার পোষাবে না, আমি বরং তোমার কাছে প্রার্থনা করতে পারি। আমার কাছে বল কি চাও তুমি। হেসে বললাম কিছুই চাইনা। শুধু তোমাকে চাই পিসি শুধু তোমাকে। পিসি চায়ের পেয়ালা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই ধর চা। অফিসের সময় হয়ে গেছে। আর বলছিলাম কি বেশী মন খারাপ না করে একবার মিনতি সেনের কাছে যাও।

মিনতি সেন সাধারণত ৫/৩০টার আগে বাড়ীতে ফেরেন না। হাসপাতাল থেকে মিনতি সেনের বাড়ীতে যেতে গেলে এক ঘন্টার উপর সময় লাগে। তাই তপতীকে বলে এসেছি আজ আমার আসা হবে না, তুমি ওকে সময় দিও। কিন্তু কে জানতো, শিয়ালদা স্টেশনে হঠাৎ করে এমনি ভাবে দেখা হয়ে যাবে পরিমলবাবুর সঙ্গে। রেল ক্যান্টিন থেকে রেরুচ্ছেন পরিমল বাবু, সঙ্গে এক সুন্দরী মহিলা। তা হলে পিসির অনুমান ঠিক। কিন্তু এ মহিলার যে সিঁথিতে সিঁদুর। তা হলে কে এই মহিলা? মিনতি সেন যে নন, তাতো দেখতেই পারছি। তবে কি কাকলী মিত্র? কিন্তু যতদূর জানি কাকলী মিত্র অবিবাহিতা। অবশ্য পরিমলবাবু যদি গোপনে তাকে বিয়ে করে থাকেন তা হলে অন্য কথা। কিন্তু তাইবা কি করে সম্ভব। পিসির অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবে কি করে? আমি একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালম। শুনতে পেলাম ভদ্রমহিলা বলছেন, রোজ রোজ ব্যারাকপুর থেকে আমি আসতে পারবনা। তাহলে কি করবে? কি আর করব। তোমার পরেতো আমারও অধিকার আছে? আমিতো অস্বীকার করছিনা। তা হলে তোমার যেতে আপত্তি কোথায়? তুমি বুঝতে পারছ না, যুঁথি। আমি সবই বুঝতে পারছি। তারপর বললেন তোমারই অনুরোধে আমি চুপ করে ছিলাম এতদিন। আর সম্ভব না। তাহলে কি করতে চাও? আমি আর আসতে পারবনা। বেশ তাই হবে, কাল আমিই যাব।

আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠলো ভদ্রমহিলার চোখ। পরিমলবাবু বললেন, সেই প্রথম দিনের মতো ফিরিয়ে দেবে নাতো। তোমার মনে আছে সেদিনের কথা। মনে থাকবেনা কেন? আজো সেদিনের কথা মনে পড়লে অপমানের জ্বালায় আমি কেঁপে উঠি। তাই বুঝি। হ্যাঁ যুঁথি তাই। তবুও তো ভুলতে পারলেনা। না পারলামনা। তারপর বললেন, হয়তো পারতাম তবে পারলে না কেন? ওরা ক্যান্টিনের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গা বেঁছে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আমার যে কি হল আমি কিছুতেই পা নাড়াতে পারছিনা। পরিমলবাবু বললেন পারলাম না তোমার জন্য? আমার জন্য? হ্যাঁ তোমারই জন্য। আরো বললেন, কারণ আমি কথা দিয়েছিলাম. আমার সন্তানের মা তুমি ছাড়া আর কেউ হবে না। বিজয়িনীর হাসি দেখা গেল যুঁথির মুখে। বললেন, কিন্তু আমি যে শুনেছি সন্তান দেওয়ার মতো ক্ষমতাই তোমার নেই। তাই বুঝি। বেশ কালতো যাচ্ছি। পরীক্ষা দেবে? হ্যাঁ পরীক্ষাই দেব, কিন্তু পাশ করলে কি দেবে বল? তার আগেতো প্রবেশাধিকার চাই। সেটা পাও আগে।

তার মানে এখনো তোমার সেই হেঁয়ালি। আমার জন্য কি তোমার কোন মায়া হয় না? যুঁথি বললেন কালতো যাচ্ছ? কাল বলব। কাল কেন আজ বলা যায় না। হয়তো যায়, কিন্তু এখনো আমার নিজেকে জানা হয়নি। যাকগে চলি। চল তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। কোন দরকার নেই। তুমি চলে যাও। আমি একাই যেতে পারব। বেশ জোর করবনা।

পরিমলবাবু সিড়ি ভেঙে নেমে গেলেন। আর যুঁথি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে নেমে এলেন। টিকিট কাউন্টারে এসে টিকিট কাটলেন। হ্যাঁ ব্যারাকপুর এর টিকিট। আমি নিজে তার পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের টিকিট কাটলাম।

চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে খুব কিন্তু চায়ের ফেরিওয়ালা, অন্যদিকে থাকায় আমি জোবে ডাকলাম, এই চা। কিন্তু ও বোধ হয় শুনতে পায়নি। ও অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে গেল। আমি আপন মনে বললাম, ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু চাওয়ালা শুমতেই পেলনা। হাসলেন যুঁথি। হাসলে ভীষণ সুন্দর লাগে ভদ্রমহিলাকে। ভদ্রমহিলার চেহারার মধ্যে এমন একটা আলাদা জৌলুস আছে যা যেকোন পুরুষকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য কববে। উনি নিজেব ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে আমি বললাম, না থাক আপনি খান। অবারও হাসলেন যুঁথি। লজ্জা করছে? ছেলেদের লজ্জা আমার কাছে কেমন বোকা বোকা মনে হয়। আমি বললাম আমারও তাই মনে হয়। কি? ঐ যে আপনি বললেন না লাজুক ছেলেদের আপনার কেমন বোকা বোকা মনে হয়।

ট্রেনের যাত্রীরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং আমাদের দিকে তাকাবার তাদের সময় কোথায়? তবু যে ২/১ জন আড়চোখে তাকাচ্ছেনা তা হলপ করে বলা যায় না। যুঁথি বললেন, তাই বুঝি। বুঝতে পারছি যতটা বোকা তিনি আমাকে মনে করেছিলেন আমি যে তা নই এটা বুঝতে পেবেই একটা সমীহের দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। বললেন আপনি তো ভারি সুন্দর কথা বলতে পারেন। আপনি কি ব্যারাকপুরেই থাকেন? এত জায়গা থাকতে হঠাৎ আপনার ব্যারাকপুরের কথা মনে হলো কেন? আস্তে আস্তে বললেন, আপনাকে আমি টিকিট কাউন্টার থেকে লক্ষ কবছি। আপনি ব্যারাকপুরের টিকিট কেটেছেন তাও দেখেছি। আমি হেসে ফেললাম। হাসলেন যে। না এতলোক থাকতে আপনি আমার গতিবিধি লক্ষ কবেছেন কীনা তাই। তারপর বললাম না আমি ব্যারাকপুর থাকি না। তবে আমার এক বন্ধুর ওখানে অপেক্ষা করার কথা, কি জানি অপেক্ষা করে আছেন না চলে গেছেন। চলে গেলে তো খুব দুঃখের কথা। কেন দুঃখ হবে কেন? বা দুঃখ হবে না, আপনি এত কষ্ট করে গিয়ে দেখলেন যে যার থাকার কথা তিনি নেই। এতো দুঃখেরই কথা। আমি খুব গম্ভীর ভাবে বললাম। আমি কোন কিছুকে মূল্যহীন মনে করিনা কারণ উনি না থাকলেও আমার সঙ্গে তো একজন নতুন বন্ধু রয়েছেন। কে? কেন আপনি? অবাক হয় যুঁথি? এ ছেলেটি বলে কি? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে অধিকাংশ ছেলের লেজেগোবরে অবস্থা হয়, এ ছেলেটির মধ্যেতো তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কত সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্য। কোন আড়ষ্টতা নেই, নেই কোন অস্পষ্টতাও। নিজের মতামত দৃঢ়ভাবে জানাতে পারে। এমন ছেলেদেরইতো মেয়েদের সাধারণত ভালালাগার কথা। যুঁথির তাই ভাল না

লেগে উপায় নেই। এমন একজন সহজ সাবলীল এবং সোজাসুজি কথা বলতে পারে এমন যুবকের সঙ্গে কথা বলতে পারা যে অনেক মেয়ের কাছে ঈর্ষণীয় তাকে অস্বীকার করবে কি করে যুঁথি। বললেন, আমাকে আপনি বন্ধু বলে মনে করেন? অবশই যতক্ষণ ট্রেনে চলছি ততক্ষণ তাতে আপত্তি কি? সময়টাতো অন্তত ভালো কাটবে। যুঁথির যেন আর কোন কথা জোগায় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন তরফের থেকেই কোন কথা নেই। সামনে একজন রহস্যময়ী সুন্দরী মহিলা বসে আছেন। হোকনা তিনি আমার থেকে বেশী বয়সী তাতে কি? সৌন্দর্যের পরিমাপ কি বয়স দিয়ে মাপা যায়? সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাখা না থাকলে অনেক পুরুষের বুকে যে আগুন জ্বালাবার সৌন্দর্য আকর্ষণ তার আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর তা ছাড়া ট্রেনে চলতে চলতে হয় উদাস দৃষ্টিতে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে হয় না হয় চোখ দুটিকে নিবদ্ধ রাখতে হয় ঠিক আমার সামনে যিনি বসে আছেন তার দিকে। দুটোই সমস্যার। অনেক সময কথা না বলেও এত কথা বলা যায় যে নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়। ঠিক কিনা বলুন? শেষের কথাটায় একটু জোর বেশী দিলাম যাতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন উনি, বললেন না আপনার সঙ্গে সত্যি পেরে ওঠা যাবে না. বললাম আপনি যে বেশীক্ষণ পারবেন না তা আমি জানি. যাক গে সে সব কথা। এবার বলুনতো আপনি কি করেন? যুঁথি সহজ ভাবে বললেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন বলুনতো? আপনার সঙ্গে হয়তো ভবিষ্যতে আমার আর কোন দিন আর দেখা নাও হতে পারে। হতেও তো পারে। আবার সেই কথার মারপ্যাচ। হয়তো যুঁথি মনে মনে ভেবে চলেছেন, ছেলেটার বয়স বেশী নয়, কিন্তু যেকোন বয়সের মেয়েদের সঙ্গে যে তার সাবলীল মেলা মেশার অধিকার আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। হয়তো মনে মনে ভেবে নিয়েছেন যুঁথি যে যতক্ষণ একসঙ্গে পথ চলা হচ্ছে, ততক্ষণ চুপকরে না থাকাই ভাল। বললেন আপনার এই আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে পেলেন বলুনতো? ঠিক বুঝলামনা আপনার কথা, উনি বললেন এই যে আমার কথার প্রতি উত্তরে অমন করে বললেন, আপনি যে বেশীক্ষণ পারবেন না তা আমি জানি। এই আত্মবিশ্বাস। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। পাশের যাত্রীরাও চমকে উঠে তাকালেন আমার দিকে ঠিক যুঁথির মতো।

ততক্ষণে ট্রেনটি ব্যারাকপুর স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। সবাই নামার জন্য ব্যস্ত। আমি বললাম, কি হলো নামবেন না। হ্যাঁ নামব। এ ট্রেনের শেষতো এখানেই, অত তাড়াহুড়োর কি আছে? সত্যিইতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এই জন্যই আমার আপনাকে ভীষন ভালো লেগেছে। মানে? এতক্ষনে বুঝেছি, আপনি ধৈর্য্য ধরতে জানেন। জানেন এটা মেয়েদের একটা বিশেষ গুন। আপনি বুঝি মেয়েদের খুব ভালো ভাবে চেনেন। এই দেখুন আপনি কেমন অবাস্তব কথা বল্লেন। মেয়েদের চেনে না এমন কেউ আছে নাকি? মা, বোন, বৌদি, পিসি, মাসি এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত সবাইতো মেয়ে। আপনি কি বলতে চান এদের আমি চিনিনা? তারপর বললাম, না এবার নামতে হবে, ট্রেনে আর কেউ নেই দেখছি।

আমরা প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে এলাম। যুঁথি বললেন, কই আপনার বন্ধু নেই?

না দেখছিনা। তা হলে কি করবেন? হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললাম, চলুননা ওইতো চায়ের দোকান, ওই দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খাওয়া যাক। আপনার বোধহয় মাঝে মাঝেই চা তেষ্টা পায়। মাঝে মাঝে নয়, তবে সঙ্গে কেউ থাকলে চা খাওয়ার একটা বিশেষ জেদ চেপে যায়। শুধু চা আর কিছু খেতে ইচ্ছে করেনা? না করেনা, কারণ পকেট ওর বেশী পারমিট করে না। আবারও হেসে উঠলেন যুঁথি, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ট্রেন প্রায় ৪০ মিনিট পরে ছাড়বে, আমার বাড়ী কাছেই, যদি আপত্তি না হয় তা হলে চলুন না, বাড়ীতে চা করে খাওয়া যাবে। আবারও সেই মুখচোরা হাসি। বুঝতে পারছি আমার কথাবার্ত্তা তার কাছে যেন হঠাৎ পাওয়া মজার সামগ্রী। খুব গম্ভীর কিন্তু হতাশ কণ্ঠে বললাম। যেতে তো ইচ্ছে করে কিন্তু বাড়ীতে কেউ যদি কিছু ভাবেন। ভাবলোই বা। মানে? মানে আবার কি, যদি কেউ কিছু ভাবতে চান, ভাববেন, তাতে আপনার কি। আমিতো আপনার বন্ধু কি তাই না? কিন্তু ওরা যদি বিশ্বাস করতে না চান। ওদের বিশ্বাসে কি যায় আসে, আমিতো বিশ্বাস করছি। আমি অবাক হয়ে বললাম সত্যি? কেন আমাকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। না ঠিক তা নয় আসলে। কি আসলে? আসলে আপনি সত্যিই বলছেন তো যে, আমি আপনার বন্ধু। কেন আমার বন্ধু হতে আপত্তি আছে আপনার না ঠিক তা নয়। তারপর বললাম আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন? যতটুকু চিনি তাতেই চলবে। চলুন এবার।

সত্যি কাছেই বাড়ী। একতলা, ছিমছাম, সত্যিই সুন্দর বাড়ীটা। ছোট বাড়ী, উনি নিজের চাবি দিয়ে তালা খুলে ভিতরে এলেন। ছোট্ট বসার ঘর। এক দেওয়ালে দেওয়াল ঘড়ি, আর এক দেওয়ালে একটা বড় ফটো সুন্দর করে বাঁধানো। এগিয়ে ভাল করে দেখি পরিমলবাবুর ছবি। আমি বললাম, আপনি এখানে একাই থাকেন? হ্যাঁ। দেওয়ালের ছবিটির দিকে তাকিয়ে বললাম ওটা কার ছবি? আমার বন্ধুর। আপনার বন্ধু? হ্যাঁ। আমাকে তো আপনি বন্ধু বললেন তাইনা? হ্যাঁ। তাহলে এবার আমার একটি ছবি বাঁধিয়ে আপনাকে দিয়ে যাব। কেন? বা এক বন্ধুর ছবি রাখবেন, আরেক বন্ধুর রাখবেন না।

আবার সেই মন পাগল করা হাসি। বললেন, আচ্ছা দেবেন, রাখব? সতি? হ্যাঁ সত্যি? যাঃ তাই হয় নাকি? কি হয়না। উনি আপনার সত্যি কারের বন্ধু হতে পারেন। কিন্তু আমিতো চলতি পথের সাথী হারা বন্ধু মাত্র। যুঁথি বললেন, কেউ সাথী হারা নয়। চলতি পথে কোন সাথী হারিয়ে গেলে নুতন সাথী জুটে যায়। যেমন আপনি। ওর কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠলাম, আর আমার সঙ্গে হেসে উঠলেন যুঁথিও।

মিনিট পাঁচেক পরে কফি, কিছু মিষ্টি এবং নিমকি নিয়ে এলেন যুঁথি। আমি অবাক হয়ে বললাম কফি? হ্যাঁ, আপনি পছন্দ করেন না। ভীষণ ভীষণ পছন্দ করি, কি করে যে আমার মনের কথাটি বুঝতে পারলেন। আবার সেই কৌতুক হাসির রেখা ওষ্ঠা ধরে বিলিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেয়েদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে জানেন? হ্যাঁ জানি। তা হলে? আমিতো সেই জন্যই ভাবি যারা মেয়ে চায়না বলে ...। থাক, বলে থেমে গেলাম।

কফির কাপটা তুলে নিলাম। বললাম, কই আপনি নিলেন না? এই নিই। কফি খাওয়া শেষ হলো। বললাম তা হলে উঠি। আচ্ছা। কিন্তু একটা কথা জানা হল না? কি?

আবার কি আমাদের দেখা হতে পারে। আপনিতো বাড়ী চিনে গেলেন, আসবেন সময় করে। আপনি বুঝি একা থাকেন? আপাতত। আচ্ছা আপনাকে চিনবো কি করে? আই মীন কি পরিচয়ে। আমার নাম যুঁথি। এই নামেই এ পাড়ার সকলেই চেনেন আমাকে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাকেই বলবেন, তারাই চিনিয়ে দেবেন আমার বাড়ী। তা তো না হয় হলো, কিন্তু তারা যদি জানতে চান, আপনি আমার কে হন? তা হলে? আপনার যেমন ইচ্ছে আমার পরিচয় দেবেন। যদি বলি আমার বন্ধু। তাই দেবেন। আচ্ছা যাওয়ার আগে একটি কথা জিজ্ঞাস কবি, ঐ ছবির মানুষটি আপনার স্বামী তাই না? চুপ করে থাকেন যুঁথি। আমি বললাম, আমি জানতাম, তাই বলেছিলাম, ওই ছবির পাশে কিছুতেই আপনি আমার ছবি টাঙাতে পারবেন না। তা উনি কি এখানে থাকনে না? না। কেন? আমাকে না জানিয়ে উনি আবার একজনকে বিয়ে করেছেন তাই। আমি অবাক হয়ে বললাম, সেকি সাংঘাতিক কথা, আপনার মতো একজন সুন্দরী স্ত্রী থাকতেও আবার বিয়ে করেছেন? আপনিতো ওর বিরুদ্ধে কোর্টে যেতে পারতেন। আজ থাক বলে কি যেন একটা সম্বোধন করতে চাইছিলেন আমাকে। বললাম, আমার নাম প্রান্তিক, আপনি প্রান্তিক নামেই ডাকবেন আমাকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, ইস? অনেক দেরি হয়ে গেল। আবেক দিন আসব হাতে সময় নিয়ে। সেদিন শুনবো আপনার কথা। তারপর বললাম না ভদ্রলোক যথেষ্ট অন্যায় করেছেন। দেখতে পাচ্ছি যুঁথির মনটা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু বলেই চলেছি আপনাকে এব্টা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। যুঁথি উদ্বিগ্ন হযে বললেন, কিসের স্থির সিদ্ধান্ত। আমি বললাম, বাঃ আপনিতো কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য বধু নন, যে স্বামীর অন্যায় অবিচার মুখ বুজে মেনে নেবেন, কোন উপায় নেই বলে। আপনি শিক্ষিত নারী। প্রচলিত আইন যে জানেন না তা'ও নয়। তাই আপনার নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ততো আপনাকেই নিতে হবে, অন্যায়কে মেনে নেবেন না প্রতিবাদ কববেন। তারপর হেসে বললাম, যাই হোক, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুযোগ মাত্র। আজ তাহলে চলি আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি। যুঁথিও বললেন শুভরাত্রি। কিন্তু তাকে খুব বিষণ্ণ দেখায়।

বাসায় যখন ফিরলাম, তখন রাত ১১টা বেজে গেছে। ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকলাম। কোথায় ভাবলাম পিসিকে আজ নতুন কথা শুনিয়ে অবাক করে দেবো, তা নয়। এযে দেখছি আষাঢ়ের মেঘ। আমি বেল দিতেই তিনি গেট খুলে দিলেন ঠিকই, কিন্তু কোন কথা না বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমি পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালাম পিসির পাশে। পিসি বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? সে অনেক কথা তোমাকে পরে বলব। আর বলার দরকার হবে না। আমার সব জানা শেষ হয়ে গেছে। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, তোমার কি হয়েছে পিসি। তুমি এমন করে কথা বলছ কেন? পিসি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা সাদা খাম, যার উপরে সুন্দর পুরুষালী হাতে নীলাঞ্জনা নাম লেখা। আমার হাতে দিয়ে বললেন আমার ছাড়পত্র। তুমি পড়, তারপর বল আমার কী করণীয়। পিসি খামটা দিয়ে নিজের ঘর থেকে চলে গেলেন যে ঘরে আমি থাকি। আর তারপরে সে ঘরের বিছানায় নিজের দেহটা এলিয়ে দিলেন হয়তো কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা

ভেবে। আমি খামটা খুলে পড়তে লাগলাম।

নীলাঞ্জনা,

তোমাকে আগের মতো 'হে আমার সন্ধ্যাকাশের তারা' এই নামে ডাকতে পারলাম না। জীবনের অনেক গুলো বছর তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম নিখুঁত অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। অভিনয়ও তো কখনো কখনো ভালবাসায় পর্যবেশিত হয়। একদিন তাই তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেও ছিলাম। পেয়েও ছিলাম তোমার কাছ থেকে ভালোবাসার প্রতিদান। কিন্তু যে বন্ধন এতদিন আমাদের এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল আজ আর তা নেই। কেন নেই তারজন্য কাউকে অভিযোগ জানাব না। অপরাধের বোঝা সব নিজের ঘাড়ে নিয়ে তোমার জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমার বিরুদ্ধে তুমি কোর্টে যেতে পার। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করব না। যে মিথ্যে অভিনয় এতদিন তোমার সাথে নিখুঁত্র ভাবে করেছি, আমি মনে প্রানে বিশ্বাস করি তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। তোমাকে ভুল বোঝাবার জন্য আমি দুঃখিত। হয়তো আর কোনদিনই তোমার সাথে দেখা হবে না আমার। যদি কোন নতুন জীবন বেছে নাও, আমি ঈশ্বরের কাছে তোমার ও তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো পরিমল।

একবার নয়, বার বার পড়লাম পরিমলবাবুর চিঠি। তার মানে কাল তিনি যাবেন যুঁথির কাছে। যদি এই জীবনটুকু না জানতাম, ভালো হতো। নীলাঞ্জনা পিসির যেমন অনেক কথা বলার আছে, তেমনি যুথিরও যে অনেক কথা বলার আছে ত [illegible] করে। এতদিনে, এত অবিচারের পরেও যুঁথি কি ভুলতে পেরেছেন পরিমলবাবুকে? না পারেননি, তাহলে নীলাঞ্জনা পিসি বা ভুলবেন কি করে? যৌবনেব উষালগ্ন থেকে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। আজ যদি হঠাৎ তা বালির বাধের মত ভেঙে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় তাতেই কি মুছে যায় তার স্মৃতি রেখা। কি বলব পিসিকে সব মেনে নাও। একথাটা বলা যত সহজ, মেনে নেওয়াটা কি ততই সোজা? ভেবে দেখলাম সত্যিকারের অপরাধ যদি কেউ করে থাকেন তিনি পরিমলবাবু। আবার একথাও সত্য ভালবাসাতো কোন আইন মানেনা যে নিক্তিতে ওজন করে ভালবাসতে হবে। তবুও আমার মনে হয় পরিমলবাবু যদি বলতেন আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি নীলাঞ্জনা, কিন্তু সব ভালবাসাই যেমন মিলনে শেষ হয় না, তোমার আমার ভালোবাসাও মিলনে শেষ হবে না কারণ আমি বিবাহিত আর এদেশের আইন দ্বিতীয় বিয়েকে সমর্থন করবেনা। তাই আমাদের ভালবাসা শুধু ভালবাসাতেই তার পূর্ণতা পাক নীলাঞ্জনা। তাহলে পিসি হয়তো তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

আমি এখন বিশ্বাস করি যে পিসির এই দূরে সরে যাওয়াটা সত্যি না হলেও পরিমলবাবুকে একদিন পিসিকে ছাড়তেই হতো। কিন্তু কেন পরিমলবাবু এটা করলেন যুঁথি যথেষ্ট সুন্দরী বলে। আমারতো মনে হয় পিসির চেয়েও সুন্দরী। তাহলে? কেন যুঁথিকে দূরে সরিয়ে রেখে সেদিন পরিমলবাবুকে নীলাঞ্জনার কাছে আসতে হল? কেন মিথ্যা অভিনয়ে নীলাঞ্জনার বুকের মধ্যে পরিমলবাবু তার স্থায়ী আসন অধিকার করে নিলেন? যদি না জানতাম, মিথ্যে সন্দেহ করতাম হয়তো পিসিকে। বলতাম, এ দাম্পত্যকলহ একদিন মিটে

যাবে পিসি এটাই নিয়ম, কিন্তু আমি যে জানি সব। আমার জানা কথাটি কি ভাবে যে বলব পিসিকে বুঝতে পারিনা। তবু আস্তে আস্তে ধীর পায়ে আসি একসময় আমার ঘরে যেখানে পিসি আছেন। বসি তার মাথার কাছে। আলতোভাবে আমার ডান হাতটা রাখি পিসির মাথায়। আর তাতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমাকে তার বুকের পরে টেনে নিয়ে বলেন, আমি কি করব প্রান্তিক, আমাকে বলে দাও কি আমার করণীয়। পিসির কান্নার অশ্রুবিন্দু ছোঁয়াচের মতন আমাকেও সংক্রামিত করতে থাকে। আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। তারপর বললাম, আমি জানি না পিসি, আমি কিছু জানি না, এখন কি তোমার করণীয়। তারপর একসময় নিজের চোখের জল মুছে নিয়ে, পিসির আঁচলে পিসির চোখের জল মুছে দিয়ে বললাম, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মেনে নিতে হবে পিসি। জানি আমি যা বলছি, এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে তা মেনে নিতে কষ্ট হবে, কিন্তু এ ছাড়া পথ কি? পিসি কোন কথা না বলে, উঠে বসলেন, তারপর বললেন, জানতাম একদিন এমন কিছু ঘটবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ঘটবে তা ভাবিনি। আমি বললাম, তুমি যদি জানতে, তা হলে শুধু সময়ের হেরফেরের জন্য অভিযোগ করে কি লাভ? আমি শুধু বলব, পরিমলবাবু যতই নিখুঁত অভিনয় করুন না কেন তুমিতো করনি। তোমাব ভালবাসা, তোমার একনিষ্ঠতা তাকে তোমার কাছে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে কীনা জানিনা। কিন্তু কেউ ছোট্ট হয়ে গেল বলে তুমি কেন ছোট্ট হবে। পিসি বললেন, তোমার কথা ভাবছে প্রান্তিক। [illegible] না করে ও একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসুক, তাতে ও-ও বাঁচবে আমিও বাঁচব। কিন্তু শেষের সে দিন যখন সত্যিই এল তখন আমার বুকের মধ্যে এত ধড়ফড় করছে কেন? বলে তিনি আমার একটা হাত টেনে নিয়ে রাখলেন তার বুকের ওপর।

অসম্ভব ওঠানামা করছে তার হৃদপিন্ড। নাড়ীর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তার বুকের ওঠা নামা। আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। বললাম পিসি, বাথরুমে গিয়ে ভালো করে স্নান করো, আমি গীজারে জল গরম করে দিচ্ছি। যাব তার আগে আমাকে বলতো, তুমিও কি আমার সঙ্গে নিখুঁত অভিনয় করছো? একদিন তুমিও কি এমনি করে ছেড়ে যাবে আমাকে। আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন পিসি। আমি পিসিকে আমার বুকের পরে টেনে নিয়ে বললাম না পিসি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, তুমি তাড়িয়ে না দিলে আমি কোথাও যাব না। সত্যি? বলে তিনি আমার ওষ্ঠাধরে এক জ্বালাহীন চুম্বন এঁকে দিলেন। আর আমি? প্রতিদান দিলাম তার কপালে প্রতি চুম্বন এঁকে।

গতদিন কলেজ খুলেছে। ২/৩ দিন যেতে পারিনি, না রেহানার কাছে, না সেলিনার কাছে। তাই প্রথম কলেজ খোলার দিনটা কামাই করতে হল। সকালে চলে গেলাম হাসপাতালে। ডিউটিতে আছে তপতী। আমাকে দেখেই প্রচন্ড রেগে গিয়ে বলল, তুমি কি প্রান্তিক? আজ তিন দিন তুমি আসনা। রেহানাও আসে না। প্রথম ২ দিন যদিও বা কিছু খাইয়েছি, কাল যে সারাদিন কিছুই খায়নি। সারাদিন সে এক কথা বলেছে না দিদি, হয় প্রান্তিক ভাইয়ের কিছু হয়েছে, না হয় রেহানার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আমি কিছুই

খাবনা। ডাঃ সরকার অনেক করে বোঝালেন কিন্তু তার সেই এক কথা, তোমাদের সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুই খাবে না। তারপর তপতী জানতে চাইল কি হয়েছিল তোমার? শরীর খারাপ, না রেহানার বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে? ওর মা-ই বা কেমন আছেন? কি করে বলি আমার নিজের অবস্থার কথা। রেহানার সংবাদ তো জানিনে ২/৩ দিন। ওতো অন্তত আসতে পারতো। তিন দিন আগে ওর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তখনতো ওর শরীর অনেক ভালোছিল। যাকগে, ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। আমি তপতীকে বললাম, পিসির শরীরটা কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছেনা। আমার তাই, রেহানাদের ওখানে বা এখানে কোথাও আসা হয়ে ওঠেনি। সেলিনা যে এতটা পাগলামি করবে তা ভাবতে পারিনি। যাকগে আমি এখন কি করব বলতো তপতী। ও অবাক হয়ে বলল আমি বলে দেব তোমাকে যে তুমি কি করবে? বললাম, দেখ আমার মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, এটা ঠাট্টা করার সময় নয়। তুমি সেবিকা সেবাই তোমার ধর্ম রোগীর ভাল মন্দ তুমি যেমন বুঝবে আমি কি তা বুঝব। তাছাড়া আমিতো বুঝতেই পারছিনা সেলিনা আমাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে না শান্ত হবে। তপতী কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ। তারপর বলল। তুমি দেখা করে যাও প্রান্তিক। না হলে এ বেলাও খাবেনা। বেশ তাই হবে।

আমি যখন সেলিনার কাছে এলাম দেখলাম দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে ও। আমার উপস্থিতি টের পায়নি মনে হয় আমিও ডাকিনি তাকে ইচ্ছে করে। একটু পরে এল তপতী। আমি ওকে ঈশারায় না ডাকবার জন্য বললাম। ও একটু হেসে বেরিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দেখা করার সময় প্রায় আধ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর দেরি করলে হয়তো কথাই বলা যাবে না। ওর মাথায় আলতো হাত রাখতে আমার দিকে ফিরেই কেঁদে ফেলল। আমি তো ভীষণ অপ্রস্তুত। বললাম, ছিঃ সেলিনা কাঁদেনা। তুমি কাল সারাদিন খাওনি কেন? ও বলল, আমি কিছু খাবনা, আর আপনার সঙ্গে কথাও বলবনা। কেন এত রাগ করছ কেন? এ কয়দিন আসেননি কেন? আপনি আমাকে একটুও ভালবাসেন না, আমি আর এখানে থাকবোনা, আমি আজই বাড়ী চলে যাবো। আমি বললাম পাগলামি করেনা সেলিনা। আমি আজই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে যাবো। তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম তুমি যে খেলে না কিছু, কাল সারদিন পোষাকও বদলালে না এতে তপতীদির দুঃখ হয় না? না হয় না। আমার জন্য কারও কোন দুঃখ হয় না। আমি বললাম, তুমিতো এমন ছিলে না। এমন হয়ে যাচ্ছ কেন? তপতীদি যা যা বলেন অবশ্যই করবে। তিনি তোমাকে ভালবাসেন। আমি বিকালে আবার আসবো। রেহানাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবো। জানতে চাইল ও কেমন আছে? আগের থেকে ভালো। তারপর উঠে আসার আগে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, তপতীদির কথা শুনবে না? ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, হ্যাঁ শুনবো। আঃ কি শান্তি।

আমি বেরিয়ে এলাম। আর ও, আমি যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, কি যে চায় ও, কে জানে? মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। নিজের চোখের জলকে চাপতে গিয়ে আর এক বার তাকিয়ে দেখি, এক দৃষ্টিতে ও আমার দিকেই অকিয়ে

আছে। বললাম, আমি বিকালে আবার আসব। তপতী পাশেই ছিল বলল, অভিমান ভেঙেছে? বাবা! পারও বটে তুমি। কথাটা কেমন যেন বেসুরো লাগে আমার কানে। বললাম, তোমাকে সত্যি অসুবিধায় ফেলেছি তপতী। কিন্তু এ দায়িত্ব তো তুমি নিজেই গ্রহণ করেছিলে। আমি কি তা অস্বীকার করছি? না বরং তুমি তোমার দায়িত্ব ষোল আনার জায়গায় ১৮ আনা পালন করেছো আর তাতেই ওর ধারণা হয়েছে, আমাদের উপর অভিমান করার ওর সত্যি সত্যি অধিকার আছে। তারপর বললাম আর কয়েকটা দিন একটু দেখ তপতী। তপতী বলল, আমার কথায় রাগ করলে প্রান্তিক? কেন রাগ করবো কেন? তোমার উপর কি রাগ করা সাজে? কিন্তু যাকগে সেকথা, তুমি জানকি, ওকে আর কয়দিন হাসপাতালে থাকতে হবে? কাল ওর ব্যান্ডেজ খোলা হবে। সব ঠিক থাকলে কালই ছেড়ে দেওয়া হবে। সত্যি বলছ? নীরব আনন্দে দুচোখ আমার যেন উছলে উঠছে। তারপর বললাম, একেতো ডানপিটে মেয়ে, তারপর মা ও দিদিকে ছাড়া। এই হাসপাতালের বন্ধ ঘরে ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। তা ছাড়া এখানে ও আর একদম থাকতে চাইছেনা। ঠিক আছে তুমি আর চিন্তা করোনা, ওকে যাতে ছেড়ে দেয় তার জন্য ডাক্তারবাবুকে যা বলার আমি বলবো। তারপর সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললো এরপরতো তুমি আর আসবে না তাইনা প্রান্তিক। তপতীর একথার মানে হয়তো খানিকটা অনুমান করতে পারছি। বললাম, আসব না একথা তুমি ভাবলে কি করে? কেন আসবে? কার জন্য আসবে? গলাটা কেমন যেন ভারি মনে হয় তপতীর। বললাম কে যে কার জন্য কোথায় যায় আর কার জন্য কত কি ভাবে কেউ বলতে পারে? আমিতো তোমার জন্যও আসতে পারি তপতী? আমার জন্য ঠাট্টা করছ? আমি ওকে বললাম, ঠাট্টা কিনা জানিনা, তবে এখানে যদি আসি তবে তোমার জন্যই আসবো তপতী। আর কোন কথা না বলে ওর কাছ থেকে কোন প্রতি উত্তর না শুনেই, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। না, রেহানা ততটা সুস্থ হয় নি। আমাকেই তাই আসতে হল সেলিনাকে নেওয়ার জন্য। হাসপাতালের সমস্ত কিছু মিটিয়ে দিয়ে আমি যখন ওকে নিয়ে আসব, সেই সময়ের মধ্যে একবারও আসেনি তপতী। আমি আয়াকে দিয়ে ওকে সংবাদ পাঠালাম। তবুও এলোনা। সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাই তপতীদি আসবেনা। আমি কি কোন অন্যায় করেছি ওর কাছে? নানা তুমি কেন অন্যায় করবে। তুমি একটু বোস, আমি আসছি।

ডিউটি ঘরে গিয়ে দেখি, তপতী তার দু হাতের মধ্যে মাথা গুজে বসে আছে। আমি ডাকলাম, তপতী। ও তাকালো আমার দিকে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ও শুধু বলল, আমি যাব না প্রান্তিক। আমি কিছুতেই সেলিনার কাছে যাবো না। কেন? কেন জানতে চাইছো? আজ কতদিন হয়ে গেল। এই মান অভিমানের অতীত হয়ে গেছি আমি। নিজেকে শুধু যন্ত্রের মত মনে হয়েছে এই দীর্ঘ বছরগুলো। আর আজ এতগুলো বছর পরে মেয়েটা আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে প্রান্তিক। সবকিছু। বললাম, এ তোমার ভুল তপতী। বল জীবন তোমার কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। তোমার স্বজাতি নয়, তোমার ধর্মেরও নয়, অথচ কি তীব্র অভিমানে ওর সামনে যেতে পারছনা, এর কি কোন মূল্য নেই তপতী? আমি তো দেখেছি অনেক দিন, কি ছটফটে আর অফুরন্ত

জীবনশক্তির একটা মেয়ে, এই আঘাতে মিইয়ে গেছে। ওকে তুমি ভুল বুঝো না তপতী। তপতী বলল আমি ওকে ভুল বুঝেছি, এই কি তোমার মনে হলো? তারপর বলল তুমি জাননা প্রান্তিক আমাব বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে? এখানে তো সম্ভব নয়, অন্য কোথাও হলে তোমাকে বলতাম, আমার বুকে হাত দিয়ে বলতো প্রান্তিক সেলিনা কি আমার কেউ নয়? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তপতী। অদ্ভুত এই মানব চরিত্র, কার জন্য যে কোথায় কে অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। কিন্তু না, পারলামনা, ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে। শুধু বললাম, চোখের জল মুছে ফেল তপতী। আঘাত তোমার যতই তীব্র হোক তুমি বড়। সেলিনা চাইছে তুমি একবার অন্তত এস ওর কাছে। নিজের আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে ও বলল, তুমি এগোও প্রান্তিক, আমি আসছি।

আসামাত্র সেলিনা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার কথা তোমার মনে থাকবে তপতীদি? ওরে পাগলি মেয়ে তোকে কি আমি ভুলতে পারব। তুই যে আমাকে কি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিস তুই নিজেও তা জানিসনে। তোকে শুধু একটা অনুরোধ জীবনে অনেক ঝড় ঝপটা আসবে, কেটেও যাবে, কিন্তু প্রান্তিককে কখনো কোন দিন ভুল বুঝিসনি ভাই। ঈশ্বর ওর মত মানুষকে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে পাঠিয়ে প্রমান করতে চান যে পৃথিবী এখনো বাসের অযোগ্য হয়নি। সেলিনা তাকালো আমার দিকে, তারপর কি মনে হতেই, হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো তপতীকে। আর তপতী ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ওর কপালে পরপর কয়েকটা চুমু খেল। সেলিনা বলল, তা হলে তুমি কবে যাচ্ছ আমাদের ওখানে। যাবরে পাগলি যাব! বোধ হয় কান্না চাপতে পালিয়ে গেল তপতী। ট্যাক্সিটা ছাড়বার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারলনা।

সারাটা পথ উদাস দৃষ্টিতে, গাড়ীর জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলো সেলিনা। একটি কথাও বললোনা আমার সাথে। আমি বললাম, মন খুব খাবাপ লাগছে তাই না? অথচ দেখ সেলিনা, হাসপাতাল থেকে চলে আসার জন্য কি আকুলতা তোমার। আর এখন সেই হাসপাতাল, ওখানকার প্রতিটি মুহূর্ত, বার বার তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। এই হয় সেলিনা। এই ভালবাসা, এই মমতা, এই মুগ্ধ স্মৃতি এটুকু বয়ে নিয়ে চলি বলেই আমবা মানুষ। কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর দিল না সেলিনা। একবারও বাইরের দৃষ্টিকে ভিতরে এনে আমার দিকে তাকালোনা।

তারপর রেহানাদের ওখানে যখন পৌঁছালাম তখন রাত প্রায় ৯টা হয়ে গেছে। রেহানা তার দুর্বল শরীর নিয়ে এগিয়ে এলো। কানের পাশের কপালের ঘাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, তবে দাগ যে কোনদিন মুছে যাবে না এটা নিশ্চিত। ট্যাক্সি থেকে নামতেই সেলিনাকে জড়িয়ে ধরল রেহানা। কিন্তু তার সাথেও কোন রকম কথা না বলে ভিতরে চলে গেলো সেলিনা। আফরোজ বেগমের অবস্থা এখন অনেক ভালো। সংসারের কাজও একটু একটু করে করা আরম্ভ করেছেন। সেলিনাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে ওকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি বসার ঘরে বসলাম। রেহানা বলল, চা খাবে? না। সেলিনার কি হয়েছে বলত। কোন খারাপ সংবাদ কিছু আছে? আমি আঁতকে উঠে বললাম, কি খারাপ

সংবাদ থাকবে বলতো। না হলে এতদিন পরে দেখা হলো, অথচ কোন কথাই বলল না আমার সাথে। সেতো আমার সাথেও বলেনি সারাটা পথ। গাড়ীর কাঁচ খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল। রেহানা বলল কেন ও এসব করছে? আমাদের কি এসব ভাল লাগবে? আমি বললাম রেহানা, হাসপাতালে মানুষ অনেক আশা নিয়ে যায়, ফিরে আসে স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা নিয়ে। ও কিন্তু ফিরে এসেছে অনেক স্মৃতি নিয়ে। হাসপাতালের মায়ায় পড়ে গিয়েছে, কাটিয়ে উঠতে তো সময় লাগবে। তারপর জানতে চাই তুমি এখন কেমন আছো? ভালো। ছোট উত্তর। আমি বললাম যখনি জানতে চাই তখনি বল ভাল। কিন্তু তোমার চেহারা যে দিন দিন কত খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখ কি? ও তোমার মনের ভুল, না হলে আমি সতিই ভালো আছি। ভালো আছো না ছাই। আসলে তুমি আমার কাছে নিজেকে লুকাচ্ছো। আমাকে কি তুমি একটুও বিশ্বাস করতে পারনা। থাক ও সব কথা, ওই দেখ, তুমি চা খাবে না বলেছো, অথচ মা তোমার জন্য চা নিয়ে এসেছেন, চাটা খাও। আমি আসছি। আফরোজ বেগম বললেন, তোমার ঋণ কি ভাবে শোধ করব জানিনা। আমি বললাম, ছিঃ মাসীমা। ছেলের কাছে কি মায়ের কোন ঋণ থাকে নাকি? এ কথা শোনাও যে পাপ। আফরোজ বেগম আর কোন কথাই বলতে পারলেন না। রেহানা আসাতে, উনি আবারও ফিরে গেলেন নিজের কাজে।

রেহানা, একটা মোটা খাম আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা নাও। কি এটা। আগে ধর তারপর বলছি। আমি নিলাম ওর হাত থেকে। তারপর খুলতে যেতেই রেহানা বাধা দিয়ে বলল এখন নয়, পরে এক সময় খুলো। কেন? কি আছে এতে। আমার কৃতজ্ঞতা। তুচ্ছ করোনা প্রান্তিক। ও আর সামনে দাঁড়ালো না। আমি ডাকলাম, রেহানা শোন ও আবার এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। বললাম বস। ও বসল। আমি বললাম, ওতে কি আছে আমি হয়তো অনুমান করতে পারছি। কিন্তু রেহানা, আমিও তো মানুষ। পশু বা দেবতা নই। ভুল যদি করে থাকি, তার শাস্তি এ ভাবেই দিতে হবে। তোমরা কি ভাবো বলতো আমাকে।

রেহানা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম তোমার কিছুই বলার নেই? ও বলল, আছে। তবে বল। ওতেই যা বলার বলেছি। আমি বড্ড ক্লান্ত। ও প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। আমি কোন ভাবে ওকে ধরে ফেললাম। কতক্ষণ ওকে ওই ভাবে ধরে ছিলাম মনে নেই। সম্বিৎ ফিরে পেলাম, ও যখন বলল, ছাড়, মা আসছেন। আফরোজ বেগম গরম গরম লুচি, বেগুন ভাজা আর মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, রাত অনেকটা হয়েছে, খেয়ে নাও বাবা। আপনি আবার এসব করতে গেলেন কেন? কই আর করলাম। আমাদেরও তো খেতে হবে। আমি দ্বিরুক্তি না করে খেয়ে নিলাম। আফরোজ বেগম বললেন, খাওয়া শেষ হলে একবার সেলিনার সঙ্গে দেখা করে যেও। ও কারো সঙ্গে কোন কথা বলছেনা। বলছে খাবেনা। আমি বললাম কেন? কি জানি বাবা, ওকেতো কোনদিনও বুঝিনি। আজই বা বুঝবো কি করে। আফরোজ বেগম চলে গেলে রেহানা তাকালো আমার দিকে। ওর চোখে কি যেন মায়া আছে। বেশীক্ষণ তাকাতে পারিনা, আপনিই চোখ নামিয়ে নিতে হয়। বললাম, কি হয়েছে বলত, কি করে বলি প্রান্তিক। সত্যিই মাঝে মাঝে নিজের

উপর ঘৃণা হয়, ধিক্কার হয়। বললাম তুমিও চল, ও আবার তাকালো আমার দিকে তার সেই মায়াবী চোখ তুলে। বলল না তুমি যাও প্রান্তিক। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনা।

সেলিনা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ডাকলাম, সেলিনা। কোন উত্তর নেই। আবারও ডাকলাম, তেমনি নিরুত্তর। এবার ওর কপালে হাত ছোঁয়াতে চোখ মেলে তাকালো। বলল, আপনি এখনো যাননি প্রান্তিক ভাই? আমি ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম তোমার কি হয়েছে বলত। হাসপাতালে কি কিছু হয়েছে? কেন বলুনতো। না মাসীমা বললেন তুমি কারো সঙ্গে কথা বলছনা। এমন কি খাওনি পর্যন্ত। আমার খেতে ইচ্ছে করছেনা। তা কি হয়। সেই কখন খেয়েছো। খাবেনা কেন? খেয়ে নাও। বোঝনা কেন, তুমি না খেলে এরা খায় কি করে? আজ দুদিন ধরে তুমি রেহানার কথা একবারও জিজ্ঞাসা করনি। এখানে এসেও তুমি ওকে এড়িয়ে গেলে, কেন? ও সে সবের দিকে না গিয়ে বলল, কাল থেকে তো আর আপনি আসবেন না, তাই না? কে বলেছে? আমি জানি, আর আপনি আসবেন না। তারপর নিজেই বলল, আসতে হবে না। কেন আসবেন? আমরা আপনাকে দুঃখ ছাড়া কি দিয়েছি? আমি অবাক হয়ে বললাম, এসব তোমাব মাথায় কে ঢুকিয়েছে? তারপব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, যতদিন না তুমি সুস্থ হয়ে আবার বক্সিংএর রিংএ ফিরে না যাচ্ছ ততদিন রোজই আসব। ম্লান হেসে সেলিনা বলল, কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দেন প্রান্তিক ভাই। আমিতো আর বক্সিংএর রিংএ ফিরতে পারবনা সেতো আপনি ভাল ভাবেই জানেন। তারপর যেন আপন মনে বলল, দরকার নেই রোজ আসার কিন্তু মাঝে মাঝে আসবেন বলুন। বলে একটা হাত আমার ওর নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, কেন যে প্রান্তিক ভাই বেঁচে ফিরলাম। এতদিনে আপনার পরিচিত সেলিনার যে মৃত্যু হয়েছে। দুটিচোখ দিয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ল। একবার ভাবলাম মুছে দিই। পরে মনে হল, না, ওর কান্নার প্রয়োজন। ভীষণ প্রয়োজন। বললাম ছাড় আমাকে যেতে হবে। রাত হয়েছে অনেক। ও আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর বললাম, শোন যদি আগের মত হওয়ার চেষ্টা না করো তাহলে আর কোনদিন আসবোনা। আরেকটা কথা, নিয়মিত খেয়ে নেবে। মাকে কষ্ট দেবেনা। আপনি কষ্ট পাবেন না? জানিনা বলে ওর কাছ থেকে বেরিয়ে দেখি রেহানা দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর ওর সঙ্গে কোন রকম কথা না বলে বেরিয়ে এলাম।

বহুদিন পরে অশ্রুকণার সঙ্গে দেখা হল কলেজ ক্যান্টিনে, অথচ কি অদ্ভুত আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যেতে উদ্যত হতেই আমি বললাম, কি ব্যাপার চিনতে পারছনা? কেমন যেন হঠাৎ দেখা হয়েছে, তারই আনন্দের রেশ টেনে বলল, আরে প্রান্তিক। তুমি কি গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলে • কি? বহুদিন কোন খোঁজ টোজ নেই। খোঁজ কি রাখার চেষ্টা করেছো? কেন বলত। না তা হলে জানতে পারতে আমি কোথায় আছি। ও তাই বল। তবে এর মাঝে তোমার পিসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল জান? আমার পিসি? কই বলেননি তো। তোমার সঙ্গে দেখা হলেতো বলবে। আমি আসলে তোমার মিনতি পিসির কথা বলছি। মনে মনে বললাম মিনতি সেন। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার কি এখন ক্লাস আছে? না। তাহলে এস না চা খাওয়া যাক। আচ্ছা চল। চা ও টোস্টের অর্ডার দিলাম।

তারপর ওকে বললাম, হ্যাঁ অনেকদিন যাওয়া হয় না মিনতি পিসির ওখানে। কেন যাওনি কেন? তোমার কথা অনেক করে বলেছিলেন। তোমার দাদুর অবস্থাও খুব ভাল না। প্রায়ই তোমার নাম করে বলে, প্রান্তিক এসেছে? পিসি যখন বলেন, যে না আসেনি, তখন আবার চুপ করে যান, তুমি একবার যেও প্রান্তিক। তোমার পিসি ও দাদু তোমার কথা খুব ভাবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ এবার একদিন যাব। মনে মনে ভাবছিলাম তার আগে একদিন প্রতীম বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ও বলল, কিছু বলছ? না, কিন্তু কণা, তুমি আমাকে জানাওনি কেন? আমিতো জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার পিসি এমন করে না করলেন যে, আমি তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিনি এতদিন, যদি দেখা হলেই বলে ফেলি। তাহলে আজ কেন বললে? কি করে জানব এত দিনেও তোমার যাওয়া হয়নি। চা খেয়ে উঠে পড়লাম। ও বলল, চললে? হ্যাঁ, আমার ক্লাস আছে। ও আমি উঠতেই বলল, রেহানাকে দেখছিনা, ওকি কলেজে আসেনি? আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। বলে আর কোন কথার অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলাম।

দুর্গাপুরে একটি ফার্মে ম্যানেজারের পোস্টে চাকরি করতেন প্রতীমবাবু। কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন লিলুয়াতে। ওখানে গিয়েই জানতে পারলাম। পরের দিন আবার তাই লিলুয়া। বেশ বড় ফার্ম। এখানকার সিনিয়র ম্যানেজার প্রতীম চৌধুরি। বড় বড় অক্ষরে নামের ফলক। আমি একজন স্বাক্ষাৎপ্রার্থী। স্লিপ দিয়ে অপেক্ষা করছি। প্রায় ১৫ মিনিট পরে, অনুমতি এল। আমি ঘরে ঢুকতেই উনি একবার চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। সুন্দর সৌম্য চেহারা। প্রায় ৬ ফুট লম্বা গৌরবর্ণ ছিপছিপে মানুষটি। কানের কাছে জুলপির ২/১টা চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু তা সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। গোফ কামানো। দামী ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে চোখের ঈশারায় বসতে বললেন।

বেল দিতেই এক ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। বললেন দু কাপ কফি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি উনিকি তবে সব সাক্ষাৎ প্রার্থীকে কফি খাওয়ান? কি জানি? পরিমলবাবুও কলকাতার একটা মার্চেন্ট ফার্মে কাজ করেন। কোন দিনতো যাইনি, তাই জানিনে নিয়ম কানুন। কফি আসতেই, উনি এক পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, কফিটা নিন, তারপর বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? আমার জন্য? আমার ঘরেতো আর কেউ নেই। হাসলেন উনি, তারপর বললেন, ও আপনি ভাবছেন আপনার জন্য কফি কেন? না, আপনার জন্য আলাদা করে কফির অর্ডার দেওয়া হয়নি। আসলে আপনি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় লিখেছেন, প্রয়োজন ব্যক্তিগত। তাই আপনাকে ইচ্ছে করে দেরি করে ডাকা হয়েছে। আমার সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় শেষ। অবশ্য এর মাঝে কয়েকবার আপনার নামটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, আগে কখনো আপনার নাম শুনেছি কিনা! নিশ্চয়ই শোনেননি। আপনি কি মনে করেন শোনা উচিৎ ? হাসতে হাসতে বললাম, কি যে বলেন। না না আমি সে সব কথা বলিনি। কথার পরে কথা বলতে হয় তাই বলা। উনি বললেন, তাহলে বলুন আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমার নাম প্রান্তিক। হ্যাঁ, স্লিপে তাই লিখেছেন। কি করেন আপনি? আমি ওনাকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি একজন

কর্মব্যস্ত মানুষ। হয়তো অনেক অমূল্য সময় আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। তবু এসে যখন পড়েছি, তখন কি আরেকটু সময় আমায় দিতে পারবেন? যদি বলেন, সম্ভব নয় তাহলে কবে সম্ভব হবে জানালে আমি সেদিন আসতে পারি। কতক্ষণ লাগবে? যদি আপনি কিছুই না বলতে চান তাহলে ১০ মিনিট আর যদি শুনে কিছু বলতে চান তাহলে অন্তত আধঘন্টা। বা আপনিতো বেশ মজার মানুষ। কি করেন? কিছুই করিনা। তবু। আমি এবার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ও তাহলে তো তুমি বলা যেতে পারে। নিশ্চিন্তে। আর তা হলে আমার পক্ষেও ভাল হয়। কেন ভাল হয় কেন? আসলে আপনি বললে অনেকটা দূরের বলে মনে হয়। তুমি বললে অনেকটা কাছের মনে হয় তাই আরকি। বেশ বল তাহলে।

আমি একটা গলা খাঁকানি দিয়ে বললাম, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? কেঁউ না। কিন্তু কেন? তাহলে বাড়ীতে গিয়ে বললে ভাল হয়। খুব কি গোঁপন কথা। মোটেই না, কিন্তু অফিসে কথা বলতে বলতে দেখা গেল, আপনার কাজের ফাইল এসে গেছে, আমাকে থেমে যেতে হবে। তারপর আবার যখন আরম্ভ করব তখন হয়তো দেখব, যা বলছিলাম তা ভুলে গেছি, উনি একটু হাসলেন শুধু। তারপর বললেন, তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার। আপাতত এখানে কোন ফাইল আসবেনা। আমি কি বলব ভাবছি। উনি বললেন কই কিছু বললে না। বললাম, আপনার এখানে কেউ নেই, তার মানে বাড়ীর সব কি দেশের বাড়ীতে? তুমি চেন আমার দেশের বাড়ী? না চিনি না, তবে জানি। তারপর জানতে চাই আচ্ছা আপনার মা বাবা বেঁছে আছেন এখনো? না ওরা কেউ আর নেই এখন। আপনিতো বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান তাইনা? হ্যাঁ, কিন্তু এত কথা তুমি জানলে কি করে? সে তো পরের কথা, আপনি একা থাকেন মানে ...। উনি বললেন তুমি জানতে চাইছো আমি বিয়ে করেছি কিনা তাইতো। হ্যাঁ। না করিনি। এরপরে তুমি জানতে চাইবে কেন করিনি। ঠিক তাই। কেন তোমার এসব কথা জেনে কি হবে। আমি বললাম আসলে আমি একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা চালাচ্ছি। যারা বিভিন্ন প্রাইভেট কনসার্নে এক্সিকিউটিভ আছেন, তাদের ব্যক্তিগত জীবন কাজকে কি ভাবে প্রভাবিত করে। উনি বললেন ভেরি ইনটারেস্টিং। এমন কোন সমীক্ষা হয়েছে বলেতো জানা নেই। তা কতদিন তুমি এটা করছ। তা বেশ কিছু দিন হল। কতজনের কাজের ধারা, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ইত্যাদি সমীক্ষা শেষ করেছো। তা কয়েকজনের হয়েছে। আসলে আমার কাছে আপনার যে ঠিকানা ছিল, তা দুর্গাপুরের। আমি সেখানেই গিয়েছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনি আর ওখানে নেই। হ্যাঁ, সেতো অনেক দিন আগের কথা, পরে আমি জার্মানি যাই, এবং সেখান থেকে ফিরে বছর তিনেক হলো আমি এখানে জয়েন করেছি। বললাম খুব ভালকথা, আপনি কি মনে করেন একাকী জীবনে কাজ করা সহজ না সংঘবদ্ধ পারিবারিক জীবন থেকে তা সহজ। দেখ। তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। তাহলে আপনি ভাবুন, আমি বরং পরে একদিন আসব। কোন প্রয়োজন নেই, আমার যা মনে হয় তাই তোমাকে বলতে পারি। তাইতো বলবেন, আমিতো আপনি যা মনে করেন তাই জানতে চাই। কি মনে হয় আপনার?

দেখ আমি একাকী থাকি। তাই সময়ও আমার অফুরন্ত ইচ্ছে করলে অনেক কাজ করতে পারি। তবে করেন না কেন? মাঝে মাঝে একঘেয়েমি মনে হয় তাই। এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে আপনি কি চান? কি আর চাইব। আমি বললাম পরিবার, সঙ্গ এসবতো জীবনে প্রয়োজন। উনি বললেন মাঝে মাঝে হতাশ মনে হয় নিজেকে। কেন কাজ করব? কার জন্য করবো? তাহলে অবকাশ সময় কাটান কি করে? কাটাবার তো বিভিন্ন উপায় আছে তবে আমার ভালো লাগেনা। কেন? একটা বিস্মৃত অধ্যায় মাঝে মাঝে আমাকে তাড়া করে ফেরে। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বল। আপনি কি কাউকে ভালবাসতেন? কেন বলতো? ঐ যে আপনি বললেন না একটা বিস্মৃত অধ্যায় তাই আর কি। কি হবে সে সব কথা শুনে। না আমি জোর করবনা। তবে যে সমীক্ষা আমি চালাচ্ছি, তাতে ঐ বিস্মৃত অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারলে আমার ভাল হতো। আমার কাজের সুবিধা হতো। নাম ধাম গোপন করে ঘটনা বলতে কি আপনার আপত্তি আছে। না তা নেই তবে সে সব অতীত অতীতই থাকুক না। ঠিকই বলেছেন, অতীতের তো অতীতেই থাকা উচিৎ বর্তমানে তাকে টেনে এনে যন্ত্রণা বাড়ানো কেন? কিন্তু অতীতকে ভুলে থাকাকি অতই সহজ? না, স্যার তা মোটেই সহজ নয়। এই যেমন ধরুন, প্রানপনে আপনি আপনার অতীতকে ভুলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন কি? যদি পারতেন তাহলে তো আপনাকে এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হতো না। তারপর বললাম আপনার কাছে তা অতীত নয় বলেই তো এখনো অপেক্ষায় আছেন আপনি তাইনা? চমকে উঠলেন প্রতীম চৌধুরী। তিনি কি সামান্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে?

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলেন প্রতীম চৌধুরী। তাকালেন আমার দিকে। তারপর বলেলেন ভাবছি কি হবে তোমাকে সে সব কথা বলে? না আমাকে বলে হয়তো আপনার প্রতীক্ষার অবসান হবে না, তবু আমার এই ছোট্ট জীবন দিয়ে বুঝেছি নিজের দুঃখের বোঝা কাউকে না কাউকে ভাগ করে দিতে হয় এবং তা বললে মনটা হয়তো একটু হাল্কা হতে পারে। উনি বললেন বেশ আমি বলছি, কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে প্রান্তিক, একথা আর কেউ জানবেনা। তোমার গবেষণা পত্রেও এ ঘটনার কোন ছায়াপাত ঘটাবে না তুমি। কথা দিলাম। উনি ধীরে ধীরে বললেন, না জীবনে কোন মেয়েকে কোনদিন ভালবাসিনি। আসলে ক্যারিয়ার এবং পড়াশোনার বাইরে যে একটা জগৎ আছে তাই আমার জানা ছিল না। তারপর একদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়। পছন্দও হয়। মনে মনে স্বপ্নও দেখি ওকে নিয়ে। একটু থামলেন প্রতীম চৌধুরী। বললেন কফি খাবে? যদি আপনি খান তাহলে আপত্তি নেই। বেয়ারা এলে উনি কফির অর্ডার দিলেন এবং বললেন, আধ ঘন্টা পরে দুই প্লেট লাঞ্চ। উনি তারপর বলে চললেন, পাকা দেখার দিন, কি হয়েছিল জানিনা, সব কিছু ঠিক ঠাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ বিয়ে হল না। মেয়েটির মা আত্মহত্যা করলেন। ওর বাবাকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করলেন। জেল হল তার পরে একদিন জেল থেকে ফিরেও এলেন, চরম ট্রাজেডির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমরা কিন্তু রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটি রাজী হলেন না। স্বপ্ন ভেঙে গেল প্রান্তিক। তবু আজো আমি সেই স্বপ্নই দেখি।

বললাম মেয়েটির সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়নি কোন দিন? না। কেন দেখা করেননি কেন? ভয়ে। কিসের ভয়? যদি মুখের পরে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি বললাম চিঠি লিখেও তো জানতে চাইতে পারতেন তার মনের কথা! তুমি ঠিকই বলেছো। আমি আমার মনের কথা তাকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু ভালোবাসার চিঠিতো কোন দিন লিখিনি হয়তো তা লেখার জন্য আলাদা মুন্সিয়ানার দরকার। যা হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে পারে। আমার চিঠিটা ছিল খুবই সোজাসুজি। জানিয়েছিলাম, আমি অপেক্ষা করতে রাজী। মৃদু হেসে বললাম, তিনি কি উত্তরে কিছু বলে ছিলেন? না প্রান্তিক। তাই এখন যদি জানতে চাও তার ঠিকানা আমি জানি কীনা। কিন্তু জানলেও সে ঠিকানা তো আমি তোমায় দিতে পারব না প্রান্তিক।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। এর মাঝে কফি এল। নীরবে দুজনেই কফি খেলাম। তারপর আমি বললাম। আজো কি আপনি তার অপেক্ষায় আছেন। ঠিক জানিনা। তবে নতুন কাউকে জীবনের সঙ্গে মেনে নিতে পারিনি। সেতো দেখতে পারছ। আমি বললাম, আপনার এই নীরব পূজার মানে কি? এতো অর্থহীন। আর সত্যি সত্যিই যদি মন থেকে তাকে চান, খুঁজে বের করুন তাকে। দাঁড়ান তার মুখোমুখি, বলুন আপনার কথা নিজের অধিকারকে দাবী করুন তার কাছে। ভয় হয় প্রান্তিক ভীষণ ভয় হয়, যদি আবার ফিরিয়ে দেয়। দিলেনই বা। পৃথিবীর সব দাবী কি কারো মেটে? তাই বলে দাবী করার অধিকার যার আছে, সে কি দাবী করতে ভুলে যাবে? কি করে বুঝবো আমার দাবীর অধিকার আছে? এক নিঃসঙ্গ বিষন্নতা ধরা পড়ে তার কণ্ঠে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তবু আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি তার কাছে যান, বুঝুন তাকে। হয়তো এমনও হতে পারে, আপনারই অপেক্ষায় আজো বসে আছেন তিনি পথ চেয়ে। এরপর জোর দিয়ে বললাম কেন দুটো জীবন এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? কোথায় খুঁজবো তাকে? কেন যেখানে তারা থাকতেন, সে ঠিকানাতো আপনার জানা। সেখানে কি তারা নেই? জানি না প্রান্তিক কিছুই জানিনা আমি, আমার ভয় হয় কি জান? কি? তুমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বিখ্যাত কবিতা পড়েছো? কোন কবিতা। ঐ যে ইয়ারো আনভিসিটেড এবং ইয়ারো ভিসিটেড। এখনো সে বেঁচে আছে আমার স্বপ্নে। কিন্তু গিয়ে যদি সে স্বপ্ন মায়ামরীচিকার মতো মিলিয়ে যায়। বললাম হয়তো বাস্তবের মুখো মুখি দাঁড়িয়ে একথা মনে হতে পারে আপনার। তাতে কি? স্বপ্ন আর বাস্তব যে এক নয় এটাও তো আপনার জানা দরকার। তারপর বললাম বলবেন কি তার ঠিকানা যদি কোন উপকারে আসে। না থাক প্রান্তিক। আমার সত্য আমার কাছেই থাক। তাকে গবেষণাগারে ফেলে লাভ নেই। তবে যদি কোন দিন চলতি পথে তার সাথে দেখা হয় নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবো, আমার সেদিনের চিঠির উত্তর তিনি দিলেন না কেন? আর যদি এমন হয় আপনার চিঠির উত্তর তিনি দেননি ঠিকই, কিন্তু তিনিও তার জীবন বয়ে নিয়ে চলেছেন একাকিনী নিঃসঙ্গ তপস্বিনীর মতো আপনারই প্রতীক্ষায়। দিন গুনে গুনে, কি করবেন আপনি? আবেগে আপ্লুত কণ্ঠ। বললেন জানিনা কি করব। সত্যি আমি জানিনা আমার কী করা উচিৎ।

আমার জানার যা তা জানা হয়ে গেছে। এবার আমাকে উঠতে হবে। অথচ উনি

লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছেন, তাই বসতে হয়। বললাম, জীবনে যদি এমন শুভ মুহূর্ত কোন দিন আসে। আমাকে জানাবেন তো? উনি বললেন তোমার ঠিকানাটা দাও। আমি ঠিকানাটা লিখে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। লাঞ্চ এলো। খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রেহানার চিঠিটা পড়েছি বেশ কয়েকবার। কি যে ও বলতে চায়, বার বার পড়েও উদ্ধার করতে পারিনি। কেন যে এত চাপা আর এত অস্পষ্টতা নিয়ে ও এগিয়ে চলেছে কে জানে। একবার বলেছে তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব? আবার বলছে আমায় ক্ষমা করো তোমাকে এসব কথা বলছি বলে। চিঠিটা আরেকবার পড়ি আমি। লিখেছে রেহানা।

প্রান্তিক।

আমি জীবনে কাউকে কোনদিন কোন চিঠি লিখিনি। লেখার প্রয়োজনও হয়নি। আজ তোমাকে লিখছি, মুখে সব কথা বলতে পারবনা বলে। তোমার ঈশ্বর আর আমার আল্লাহ্ কেউ বোধ হয় চায়নি, আমরা এক সাথে পথ চলি। মানুষ যে কেন, এমন করে প্রতিরোধ খাড়া করে বুঝতে পারিনা। তোমাকে বোধ হয় ডালিমের কথা বলিনি কোনদিন। ওকে একদিন ভাল লেগেছিল। আস্তে আস্তে বোধ হয় ভালও বেসে ছিলাম, কিন্তু কি যে হলো জানিনা, ও সেলিনাকে যে ভাষায় চিঠি লিখলো ঘৃণায় তা উচ্চারণও করা যায় না। ভুলে গিয়েছিলাম সব। ডালিম নামের কোন ছেলে যে এই পৃথিবীতে বাস করে তাও মনে হয়নি পরে কোনদিন।

এর মাঝে পরিচয় হলো তোমার সাথে। আস্তে আস্তে কেমন যেন দুর্বল হয়ে যেতে লাগলাম, সেলিনা আমার থেকে ২ বছরের ছোট। কিন্তু ও আমার সব থেকে কাছের বন্ধু। আমার দুর্বলতাকে আরো দুর্বল করে দিয়ে আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে চাইল তোমার কাছে। জানিনে কতটুকু পৌঁছাতে পেরেছিলাম। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিনি প্রান্তিক। তোমার আর ডালিমের মধ্যে আছে এক দুস্তর ব্যবধান। তুমি তোমাকে বুঝতে দাওনা, আর ডালিম, সে তার অধিকার জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়, আর তার জন্য কোন নিষ্ঠুরতাই যেন তার কাছ কোন বাধা নয়।

নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম যাব তোমার সাথে, জানি অনেক বাধা আছে, তবু আমি চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে একাকী কাটিয়ে দেব কয়েকটি দিন। আগের দিন রাতেই বলছিল সেলিনা যে সে যাবে না। ওকে অনেক করে বলেছিলাম, কিন্তু ওর ওই এক কথা, না রেহানা তোরা যা। আমি এ কয়দিন খিদিরপুর মাসির ওখানে গিয়ে থাকবো। মাও যাবেন আমার সাথে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সব গোলমাল হয়ে গেল।

ডালিম এলো আরো কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে। ওতো আসেনা বহুদিন। সেলিনা প্রথমে ওদের ঢুকতে দিতে চায়নি, কিন্তু মা বললেন আসতে দে ওদের। শোন ওরা কি বলতে চায়। সেলিনা ওদের বসবার ঘরে বসতে বললে মা বললেন না ওদের ভিতরের ঘরে নিয়ে আয়। ওরা ভিতরের ঘরে গেলে আমিও গেলাম ও ঘরে। আমার চোখের পরে চোখ রেখে ডালিম বলল, তোমরা নাকি একটা কাফের ছেলের সাথে তাদের গ্রামে যেতে চাইছো। সেলিনা বললো, এ ভাবে কথা বলছেন কেন? কাফের বলে আমাদের কাছে কিছু

নেই। হ্যাঁ, ওর সাথেই ওদের গ্রামের বাড়ীতে যাব আমরা। না যেতে পারবেনা এটা আমার আদেশ। আদেশ? আপনার বোধ হয় সেদিনের কথা মনে নেই সেলিনা বলল। ডালিম তার উত্তরে বলে আছে। আর আছে বলেই আমরা সেই ভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। কি বলতে চান আপনি? ডালিম বলল, আমি মৌলবীকে বলে এসেছি, আজই রেহানার সাথে আমার বিয়ে হবে?

বিশ্বাস কর প্রান্তিক, আমি মাটির সাথে মিশে যেতে লাগলাম। বলে কি এরা? এটা কি মধ্যযুগ নাকি? আধুনিকতার শিক্ষা কি এরা পায়নি? বললাম, এ তুমি কি বলছ ডালিম। তুমিতো শিক্ষিত ছেলে। প্রেসিডেন্সিতে পড়াশোনা করেছো। জোর করে কাউকে বিয়ে করা যায় নাকি? ওদের মধ্যে একজন ছিলেন নুরুজ্জুমান, সেও ভালো ছেলে, বলল এক হিন্দু কাফের তোমাকে শয্যাসঙ্গিনী করবে সেটা বুঝি ভাল হবে? আজকেই তোমাদের দুই বোনের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হবে। সেলিনা বলল, আবদার নাকি?

এই সময় বেল দিলে তুমি। কয়েকবারই দিলে। সেলিনার ঐ অবস্থায় তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমি জানালা দিয়ে বিমর্ষ ভাবে তোমার ফিরে যাওয়া দেখলাম। কিন্তু তোমাকে ডাকতে পারলাম না। পারলাম না আমাদের চরম লজ্জার মধ্যে তোমাকে নিয়ে আসতে।

এতক্ষণে মা বলল, তোমরা কি বলতে চাইছো ডালিম। তোমাদের কারো সঙ্গে আমি আমার কোন মেয়েরই বিয়ে দেবোনা। তোমরা বেরিয়ে যাও। সেলিনা বলল ডালিম ভাই, ভাল ভাবেই বলছি আপনারা বেরিয়ে যান, তা না হলে কিন্তু অপমানিত হতে হবে। ডালিম উদ্যত হয়ে বলল অপমানিত হতে হবে? একজন কাফেরের রক্ত কি আমার রক্তের থেকে দামী। তাহলে আজই সেই রক্তের দাম আমাকে মিটাতেই হবে? বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে সেলিনাকে টেনে নিল ওর বুকের মধ্যে তারপর বীভৎস ভাবে জোর করে তার কোমার্য্য লুণ্ঠিত করতে চাইলে দরজার ডাঁসা দিয়ে ডালিমের মাথায় আঘাত হানেন মা। আমি ভয়ে লুটিয়ে পড়ি মেঝেতে। তবু ওর মধ্যে থেকে দেখি, ডালিম পড়ে গিয়েও মায়ের হাত থেকে কেড়ে নেয় সেই ডাশা, এবং তাই দিয়ে আঘাত হানে মায়ের ডান হাতে, মা পড়ে যান। কিন্তু তাতেও লম্পটটা ছাড়ে না, ঐ ডাঁশা দিয়ে মায়ের পায়ে আঘাত করলে, সেলিনা কোন ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে রান্না ঘরে গিয়ে বড় আঁস বটিটা নিয়ে এসে আক্রমণ করে ওদের। নুরুজ্জুমান সহ তিনজন পালিয়ে যায়। কিন্তু ডালিম শেষ বারের মত চেষ্টা করে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে। কোন ভাবে সেলিনার বটির একটা কোপ বাঁচিয়ে, নিজের পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করে সে সেলিনার মাথা লক্ষ করে। গুলিটা কানের পাশ দিয়ে মাথার একটা অংশ ক্ষত করে বেরিয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই আমি শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেলিনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি। ডালিম ততক্ষণে আবার গুলি করে, কিন্তু তা সেলিনার পায়ে লাগে, এবার আমি ভয়ংকর মুর্তিতে সেই আঁস বটি নিয়ে এগিয়ে যাই ডালিমের দিকে। সম্ভবত ওর পিস্তলে আর গুলি ছিল না। ওকোন ভাবে পালিয়ে যায়। আমি তখন ভয়ংকরী।

আমার শাড়ী কোথায় জানিনা, ব্লাউজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। ডালিমের নিষ্ঠুরতায় ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে, মা জ্ঞানহীন। আর সেলিনা নারীর শেষ কৌমার্য্যটুকু যদিও রক্ষা করেছে, কিন্তু হায়েনার দাঁতের আঘাতে সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত। সে কি দুর্বিসহ অবস্থা। তোমাকে বলে বোঝাবার নয়।

কি করব আমি, শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই। অথচ ডাক্তার ডাকতে হবে। মনে মনে চাইছিলাম আর প্রার্থনা করছিলাম হে করুণাময় আল্লাহ প্রান্তিককে এই সময় একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার এই আকুল আহ্বান বধির আল্লাহর কানে পৌঁছালনা। কোন ভাবে শাড়িটা খুঁজে পেয়ে তা দেহের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়ে আমাদের মোড়ে যে ডাঃ সরকার আছেন, তার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। তিনি বললেন কি হয়েছে মা। সব সংক্ষেপে খুলে বললাম তাকে। তিনি এলেন দেখলেন, তারপর সেলিনাকে হাসপাতলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মাকে বাড়ীতেই যা করার করলেন। পুলিশে সংবাদ দিলেন ঐ ৪ জনকেই এ্যারেষ্ট করা হল। তারপর কি হয়েছে জানিনা।

আজ ভয় হয় প্রান্তিক, কি হবে সেলিনার ও মায়ের। আমার কথা ভাবিনা। নিজের মৃত্যুর পরওয়ানা নিজেই লিখে দিয়ে যাব একদিন। কিন্তু ওরা? ওদের কি হবে?

জানি, একদিন আমার কাছে জানতে চাইবে সব। পারবনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এসব কথা বলতে। তাই তো আগে থেকে লিখে জানিয়ে দিলাম সব। আমার আর কিছুই বলার নেই প্রান্তিক। তোমার জীবনে আমার দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিতে চাইনে। যদি কোন মুহূর্তে কোন দুর্বলতা তোমাকে স্পর্শ করে থাকে তার জন্য আমায় ক্ষমা করো। ভেবেছিলাম কোন কথাই বলব না তোমাকে কিন্তু কেন যে জানালাম তার উত্তর জানিনা। তুমিও জানতে চেয়োনা - রেহানা।

সেলিনাদের গোটা পরিবারের ঘটনায় এমন যে কিছু একটা থাকতে পারে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু ডালিম যে সেই ঘৃণ্য ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছে ভাবতে পারিনি। সেলিনার কাছে ডালিমের কথা শুনেছি, মানে সেলিনা যতটুকু বলেছে, তাতে ডালিমের ঐ ব্যাপারটি যৌবনের এক হঠাৎ খেয়াল বলে মনে হয়েছিল। তাকে অত হিংস্র বলে কখনো মনে হয়নি। প্রেসিডেন্সির শিক্ষিত ছেলে কেন এত হিংস্র হবে। আর মধ্যযুগীয় বর্বরতা? এতো অসহনীয়। কিন্তু তাই বলে ঘটনার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একদিনতো ফিরে আসবে ডালিমরা, সেদিন যে আবার প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠবে না কে বলতে পারে। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি। কতটুকু ক্ষমতা আমার। আমি আমার জীবন দিয়ে এদের পাশে দাঁড়াতে পারি, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে এদের সাহয্য করতে পারি, তার বেশি ক্ষমতা কোথায়? আর ডালিমদের মোটেই ছোট করে দেখা উচিৎ নয়। ওরা ভয়ংকর বিষধর সাপ। ছোবল মারার প্রতিক্ষায় থাকবেই। কি করব। কি করা উচিৎ কোনটাই বুঝতে পারছিনা। রেহানাদের সংবাদও জানিনা ২/৩ দিন। কোন দিনই আমি আইন-আদালতের পাতা দেখিনা। কিন্তু আজ নিজের অজান্তেই চলে আসি এই পাতায়। হঠাৎ দেখি আগামী সোমবার একটি বিশেষ কেসের শুনানী হবে। আসামি ডালিম নুরুজ্জুমান সহ চারজনকে সেদিন কোর্ট প্রাঙ্গণে আনবার

জন্য পুলিশকে মহামান্য বিচারক আদেশ জারী করেছেন, চোখটা আটকে গেল ওখানে। কয়েকবারই পড়লাম লাইনগুলো। না কোথাও রেহানা, সেলিনা বা আফরোজ বেগমের কথা নেই।

চিন্তায় আছি ভীষণ। রেহানাদের যা অপমান ওদের হাতে হতে হয়েছে, ওতেই যেন শেষ হয় সব আর যেন কোন অপমান আদালত প্রাঙ্গণে না হয়। কারণ যদি ওদের সাক্ষী হিসেবে এই আদালতে আনতে হয়, তা হলে উকিলের উল্টো পাল্টা প্রশ্নে বেআব্রু হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

কলেজ থেকে সোজা বাড়ী না ফিরে শিয়ালদা স্টেশান এবং সেখান থেকে ট্রেনে ঢাকুরিয়া, কে আমাকে নিয়ে এল আমি জানিনে। আমার এখানে আসার কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না অথচ এলাম। কতদিন পরে। ঘড়িতে দেখলাম প্রায় ৪/৩০, তার মানে মিনতি সেনের ফিরে আসার সময় হয়েছে, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম বাড়ীর দিকে।

বেল দিতেই এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। কাকে চাই? আমি বললাম, পিসি, মানে মিনতি সেন আছেন? আপনি ভিতরে আসুন। ভিতরে গিযে দেখি, মিনতি সেনের বাবার অবস্থা বেশ খারাপ। মিনতি সেন তাই কয়েকদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, প্রান্তিক তুমি এসেছো? তোমার কথাই ভাবছিলাম। কয়েকদিন ধরে বাবা শুধু তোমার নাম করছে। তুমি একটু বোস বাবার পাশে। আমি বসলাম তারপর আস্তে ডাকলাম দাদু। বৃদ্ধ চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টি ঘোলাটে। তবু আমাকে চিনতে পারলেন, আমার একটা হাত তার দুর্বল হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললেন, এতদিন আসনি কেন দাদু। আমি আর কি বলব, উনি আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

মিনতি সেন মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এলেন। বললেন, কলেজ থেকে আসছ? হ্যাঁ। তারপর যে ভদ্রমহিলা আমাকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাকে বললেন, জবার মা, তুমি প্রান্তিক কে কিছু খেতে দাও। আমি বললাম দরকার নেই পিসি। উনি বললেন, দরকার তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে এসো তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি আর অন্যথা না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে এলাম। উনি বললেন স্টেশান পেরিয়ে গেলে দেখবে ডাঃ অমল মজুমদারের চেম্বার। তোমাকে একবার তাকে নিয়ে আসতে হবে। যাবে আর আসবে। একদম দেরি করবে না।

আমি আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে পড়লাম। চেম্বারে তখন রোগী ভর্ত্তি, এদের সবাইকে এড়িয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে তার কাছে। তাই একজন রোগী ভিতর থেকে বেরোতে জোর করে ঢুকে পড়ি ভিতরে ডাঃ বাবু খুব রেগে গেলেন কি ব্যাপার এ ভাবে না বলে ভিতরে ঢুকে পড়ছো যে। আমার উপায় নেই, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতেই হবে। কোথায়? এই কাছেই। অসম্ভব। আমি কাকুতি মিনতি করে বললাম, অসম্ভব হলে চলবেনা ডাঃ বাবু আমার দাদুর অবস্থা খুব খারাপ। সেতো বুঝলাম, কিন্তু চেম্বারের এত রোগী এদের ফেলে যাই কি করে? আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। কিন্তু ডাক্তার বাবু এদের অবস্থা তো খুব খারাপ নয়, ১০

মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আমার দাদু যে সে সময়টুকও পাবেন কীনা জানিনা। কে তোমার দাদু? আমি বললাম, আপনি নিশ্চয়ই মিনতি সেনকে চেনেন? ওনার বাবা। আমার কথা শুনে যে ভাবে ডাঃ বাবু উঠে পড়লেন, তাতে বুঝতে পারছি রোগী বা মিনতি সেনদের ডাঃ বাবু ভালভাবেই চেনেন। বললেন চল, আমি একটা রিক্সা ডাকতে চাইলে উনি বললেন, তুমি আমার গাড়ীতে এসো। ডাঃ বাবু এলেন। রোগী দেখলেন। মিনতি সেন বললেন কাকাবাবু কি হবে? উনি বললেন, ভয় নেই মা। আমি একটা ইনজেকসান দিচ্ছি ঘুমাবে। তবে তোমরা কেউ না কেউ কাছে থাকবে। জাগলে যেন কাউকে না কাউকে দেখতে পায়। মিনতি সেন বললেন, কোন হাসপাতাল বা নাসিংহোমে ভর্তি করার প্রয়োজন আছে? কোন প্রয়োজন নেই মা। তুমি সর্বক্ষণের জন্য একজন কাজের লোক রাখ। যিনি প্রয়োজনে সব সময় ওনার কাছে থাকতে পারে। আপনার কথা মতো রেখেছিতো কাকাবাবু। রেখেছো? খুব ভাল করেছো। আচ্ছা বলত মা, উনি কি চান? মানে? কাউকে দেখতে চান কিনা, হ্যাঁ কাকাবাবু, প্রায়ই প্রান্তিকের নাম বলে। ও কেন আসেনা? লাস্ট কবে এসেছিল? কে সে? আমার ভাইপো। সেকি এসেছে? আমি এগিয়ে এসে বললাম আমার নাম প্রান্তিক? ও তুমি। ভেরি গুড ইয়ংম্যান। তুমি এখানে থাক কোথায়? নর্থ ক্যালকাটায়? তা তুমি মাঝে মাঝে আসতে পারতো? তারপর বললেন মাঝে মাঝে আসবে বুঝেছ? মিনতি সেনকে বললেন উঠি মা। চেম্বারভর্তি রোগী। উনি উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় আমায় ইশারায় ডাকলেন। আমি গাড়ীর কাঁছে গিয়ে দাঁড়ালে উনি গাড়ীতে উঠতে উঠতে বললেন, এমনিতে ভাল আছেন, ভাল হয়ে যাবেন, তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এস, আচ্ছা চলি।

কি জানি একথা বলবার জন্য আমাকে ডাকবার দরকার হল কেন? আমি আবার ফিরে এলাম। মিনতি সেন বললেন, বাবা ঘুমাচ্ছেন, তারপর জবার মাকে ডেকে বললেন, জবার মা তুমি এখানে থেকো। বাবা উঠে পড়লে আমাদের ডেকো। আমরা উপরের ঘরে আছি।

আমি বললাম, আমাকে সংবাদ দেননি কেন? কি ভাবে সংবাদ দেবো? কেন পরিমল বাবুকে দিয়ে। পরিমলবাবু? কি বলছ তুমি প্রান্তিক। পরিমলবাবু কোথায় কাজ করেন তাও কি তোমরা জাননা? কাকাবাবুকে যে বললে তোমরা নর্থ ক্যালকাটায় আছ, তাহলে কি তোমরা যাওনি পরিমলবাবুর সঙ্গে? আমি অবাক আর অবাক হচ্ছি। উনি আমার অস্বস্তি না বাড়িয়ে বললেন, হয়তো তোমাকে জানাবার দরকার মনে করেন নি। তারপর বললেন আমাদের কোম্পানীর একটা নতুন অফিস খুলেছে রানাঘাট, সেখানে তিনি চলে গেছেন। তার সঙ্গেতো আমার দেখা হয় না। তবে কোম্পানী তাকে কোয়াটার দিয়েছে। উনিতো বলেছিলেন, ওখানেই উঠবেন। হয়তো এখনো যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাকগে সে কথা, কেমন আছো তুমি? ভালো খুব ভালো। আমি আর কি বলব, একটু হাসলাম শুধু। একটা কথা জিজ্ঞাসার জন্য আমার মন উশখুশ করছে। উনি বললেন, মনে হচ্ছে কি যেন বলবে? আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম আচ্ছা পিসি আপনি এর মাঝে বলেছিলেন না কলকাতায় কে একজন বড় পুলিশ অফিসার আপনার কাকা। হ্যাঁ তো, কলকাতার পুলিশ

কমিশনার আমার কাকা। আপন কাকা? না আপন নয়। তবে তোমার প্রয়োজন কি? কিছু বলতে হবে? আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, আপনি কিছু বললে তিনি শুনবেন? মিনতি সেন কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। মিনতি সেন বললেন, সম্ভবত পুলিশ কমিশনার। এই সময় উনি প্রায়ই ফোন করে বাবার খোঁজ নেন। তুমি বোস। মিনতি সেন ফোন ছেড়ে এসে বললেন, তোমার কথা বলেছি। আমার একটা চিঠি নিয়ে যাবে। তোমার প্রয়োজনের কথা বলবে। আশা করি তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

মিনতি সেন কয়েক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন আমাকে, বললেন কবে যাবে? কাল ঠিক আছে। কিন্তু কি ব্যাপারে আমাকে বলা যায় না? যায়, তবে ওনার সঙ্গে কথা বলে আসি। এরপর উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন। আচ্ছা অশ্রুকণার সঙ্গে আরেকটি মেয়ে, কি যেন নাম বলে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ও মনে পড়েছে, রেহানা। ভারি মিষ্টি মেয়েটি, ওর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয় না? হ্যাঁ, হয়তো, কিন্তু কেন বলুনতো? না কি একটা বিশ্রী ঘটনা নিয়ে ওদের নাম দেখছিলাম কাগজে। আমি ভীষণ উদ্‌দ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কি লিখেছে কাগজে? কবেকার কাগজে? আমার চোখে মুখে উৎকন্টা। উনি বললেন, তুমি অমন করছ কেন? তুমি কি জান ওদের ব্যাপারটি। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। উনি বললেন, কি হয়েছিল আমাকে বলা যাবে? আমি এক গ্লাস জল চাইলাম। পিসি ফ্রীজ থেকে জল বের করে দিলেন। জল খাওয়া হলে বললেন কফি খাবে? হলে ভাল হয়। মিনতি সেন এরপর জবার মাকে ডেকে ২ কাপ কফি পাঠাতে বললেন। তারপর বললেন, এবার বল প্রান্তিক ওদের নিয়ে আসল ব্যাপারটি কি? আমি যা যা জানি কোন কিছু এক বর্ণ বাদ না দিয়ে এমনকি রেহানার চিঠিটা পর্য্যন্ত, সব কিছু ওনাকে খুলে বললাম, উনি সব শুনে একটিও কথা বললেন না। উঠে গেলেন আমার পাশ থেকে। কাকে যেন ফোন করলেন, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে বুঝতে পারছিনা। শুধু শুনতে পেলাম। উনি বলছেন ভট্টাচার্য সাহেবকে বলবেন। আমি মিনতি সেন ফোন করছি। আগামী সোমবার শিয়ালদা কোর্টে কেস্ আছে। এ কেসের দায়ীত্ব তাকেই নিতে হবে। ওপাশের উত্তরে আবার বললেন ঠিক আছে ওনাকে দাও। মিনতি সেন বলে চলেছেন। আমি মিনতি বলছি। অসম্ভব বললে হবে না। এটা আমার মান মর্য্যাদার প্রশ্ন। কি চাই? আমি চাই ওরা যেন আর কোনদিনই জেল থেকে বেরোতে না পারে। না ওটা হবে না। কি ভাবে হবে সেটা আপনি জানেন। সম্পূর্ন নিজের ভাবে এ কেসের দায়ীত্ব আপনাকেই নিতে হবে। ও অধিকার? সেতো আপনি বলছেন। হ্যাঁ সোমবার বিকাল। আপনি খাবেন? আপনার তো খাওয়ার কোন ক্ষমতাই নেই। ও বেশ মিষ্টি খাওয়াবো। আপনিতো আচ্ছা পেটুক আছেন? আচ্ছা তাই হবে। না ওরা আদালতে যাবে না। ও বাড়ী হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই নিয়ে যাবো কথা দিচ্ছি।

সবটা বুঝতে পারলাম না। মিনতি সেন কার ব্যাপার নিয়ে কথা বলছেন। ফিরে এসে বললেন, রাত তো অনেক হয়েছে তোমাকে তো বাড়ী ফিরতে হবে তাইনা? হ্যাঁ, পিসি খুব ভাববেন। আচ্ছা প্রান্তিক বলো তো তুমি কি রেহানাকে ভালেবাস? আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন, তোমার পিসি জানে? আমার মুখে কোন উত্তর নেই। উনি

তারপরও বললেন তোমার মা - বাবা মেনে নেবেন? আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্রুকণা কি আন্দাজ করেছে রেহানাই তোমার ভালবাসার পাত্রী?

কি বলব আমি, মিনতি সেন একের পর এক বলে যাচ্ছেন, যেন রেহানাই আমার ধ্যান জ্ঞান। উনি আবারও বললেন, ওর মা তোমাকে ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু রেহানাকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি কি রাজী হবেন? না আর নয়। এবার পিসিকে থামাতেই হবে। বললাম, পিসি এসব আপনি কি বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। নীলাঞ্জনা পিসি জানেন, আমি মাঝে মাঝে ওদের বাড়ীতে যাই। ওদের ওই বিপদে পিসি ও আমি সাধ্যমত সাহায্য করেছি মাত্র। আর অশ্রুকণা? ও এবং রেহানা উভয়ে আমার সহপাঠী। এখানে কোন আন্দাজের প্রশ্ন নেই পিসি। আর তুমি? ভেবে দেখিনি। প্রান্তিক, হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন চট করে মনে পড়েছে এমনি ভাবে বললেন, চাকরি করবে প্রান্তিক? চাকরি হ্যাঁ চাকরি। কে দেবে আমাকে চাকরি। আমিই দেব করবে কী না বল?

একের পর এক ঘটনা এমন ভাবে ঘটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন মিনতি সেন কোন রক্ত মাংসের মানুষ নন, তিনি যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। যা মন চাইবে তাই পাবেন। ডাঃ তার নাম শুনে চেম্বার ফেলে উঠে আসেন। পুলিশ কমিশনার তার কথা ফেলতে পারবেন না, উকিল সাহবেকে তো রীতিমত অর্ডার করছেন। কেসের রায় যেন তার মনের মত হয়। আর এখন, আমাকে বলছেন, চাকরী করব কী না। উনি চাকরী দেবেন। অথচ নিজের জীবনে বয়ে নিয়ে চলেছেন এক চরম নিঃসঙ্গতা। মনে মনে ভাবছি নিজের জীবনের অঙ্ক যিনি মেলাতে পারছেন না, তিনি মেলাবেন অন্যের জীবনের অঙ্ক? বললেন, কি ভাবছ? কিছু নয়।

হঠাৎ জবার মা ডেকে পাঠালেন পিসিকে। পিসির সঙ্গে আমিও নীচে নামলাম। রাতের রান্না করতে হবে জবার মাকে তাই ডেকে পাঠানো। দাদুর ঘুম তখনো ভাঙেনি। আমি বললাম আসি পিসি। আচ্ছা এসো। আমি গেট খুলে বেরোতে যাব, উনি বললেন শোন। বলুন। সোমবার একবার আসতে পারবে? আসব। কিন্তু কখন? বিকাল ৪টেয়। আচ্ছা। আরেকটা কথা ঐ সময়ে অবশ্যই রেহানাকে নিয়ে আসবে। দেখব।

আবার সেই রেহানা। কয়েকদিন যাওয়া হয়নি। কি জানি কি ভাবছে। বেল দিতেই দরজা খুলে দিল রেহানা। আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে ভিতরে চলে গেল। খারাপ, ভীষন খারাপ লাগছিল। বসার ঘরে একাকী বসে আছি। ভেবেছিলাম আসবে বুঝি রেহানা আবার। কিন্তু এলো না। আফরোজ বেগম তার ঘর থেকে বললেন, কে এলোরে রেহানা। আমার সামনে দিয়ে রেহানা বেরিয়ে গিয়ে যে ঘরে আফরোজ বেগম আছেন সে ঘরে গেল। আমি কান পেতে আছি ওদের কথা শুনবার জন্য। রেহানা বলল যে প্রান্তিক এসেছে। প্রান্তিক , আর ওকে তুই একা বসিয়ে রেখেছিস? বলিহারি তোদের ব্যবহার। ওর শরীর ভাল আছে তো? শুনতে পাচ্ছি রেহানা বলছে, জিজ্ঞাসা করিনি। বা জিজ্ঞাসা করিসনি। ছেলেটা তোদের জন্য এত করল, আর তোরা সব কি বলত। ওর তো শরীর খারাপ করতে পারে? রেহানা আস্তে বলল কি এত জোরে জোরে কথা বলছ মা? আমিতো কানে কালা নই। না তা

নোস। তবে ধীরে ধীরে যে বোবা হয়ে যাচ্ছিস তা বুঝতে পারছি। তুমিতো সবই বুঝতে পারছ। আমার আর কি বলার আছে? না তোর কিছু বলার নেই যা ওকে এক কাপ চা করে দিয়ে আয়। আমার শরীরটা একদম ভাল লাগছেনা। ভাল লাগছেনা, কই আগেতো বলিসনি। সব কথা কি তোমাকে বলতে হবে? না তা বলবি কেন? আমি মা, আমার কষ্টতো বুঝবিনা। তুমি যদি মিছিমিছি কষ্ট পাও আমি কি করতে পারি মা। হ্যাঁ আমি মিছিমিছি কষ্ট পাই। তোরা আমাকে কোন কষ্ট দিসনা এই তো। ঠিক আছে তুই যা, বরং পারলে ওকে বলে দিয়ে যা, ও যেন এই ঘরে আসে।

ভাবছি উঠে যাব কীনা। কিন্তু উঠতেও পারছিনা। বার বার মনে হচ্ছে রেহানার অনেক কথা ছিল আমার সাথে। তীব্র অভিমানে মুখ ফিরিযে নিয়েছে আমি কিছু বলিনি বলে। জানি, ও আমাকে কিছুই বলবেনা, তাই ওর বলার অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে আফরোজ বেগমের কাছে গিয়ে বসলাম। আমার যাওয়া মাত্র রেহানা বেরিয়ে যেতে চাইলে আমি বললাম, তুমিও বোস না রেহানা। শরীর কি এখনো ঠিক হয়নি? কলেজে ক্লাশ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে অথচ তুমি যাচ্ছ না? বেহানা কোন উত্তব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, বলছ শরীর খারাপ অথচ দাঁড়িয়ে আছ ব্যপার কি? আর তা ছাড়া, আমি কি কোন অন্যায় করেছি যে আমার সঙ্গে কোন কথা বলা যাবে না আমার এই আক্রমণেও ও কোন কথা বলল না। আফরোজ বেগম বললেন, যা যা তোকে আর সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমার ভাল লাগেনা এসব। আমার হয়েছে যতসব জ্বালা।

এই পরিবেশে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু কি করব চলে আসার একটা অজুহাতও খুঁজে পাচ্ছি না। রেহানা আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি আফরোজ বেগমকে বললাম, কেন ওকে বকাবকি করছেন মাসিমা! ওর হয়তো সত্যিই শবীর খারাপই। শরীরতো খারপ, নতুন করে আর কি খারাপ হবে? আজ সকালেও তোমার কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে তাই। আমি রেহানাকে বললাম, তুই একবার দেখনা ওর কোন খোঁজ নিতে পারিস কিনা, না হলেও অন্তত কলেজে যা। দেখা হবে, না হলে জানতে পারবি কি হয়েছে। তাতে বলে কিনা মেয়ে আমি আর কলেজে যাব না। আমি আঁতকে উঠে বললাম সেকি। কলেজে যাবে না। শুধু কি তাই বাবা। বলে এ মুখ সে আর কাউকে দেখাবেনা। চমকে উঠে বললাম, বলে কি? ও কি অন্যায় করেছে যে মুখ দেখাতে পারবেনা। তুমি একবার বুঝাওতো বাবা! আমি আর পারছিনা এদের নিয়ে। বললাম আচ্ছা। যাওয়ার সময়ে দেখা করে যাব ওর সঙ্গে। আজ সেলিনা কেমন আছে? ভাল আছে অনেকটা। একটু একটু হাঁটাচলা করছে। তবে বেশীক্ষণ পারছেনা মাথা ঘুরে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া। ওটাই তো এক সমস্যা। কিছুতেই খেতে চায়না। তুমি কি একটু বুঝিয়ে যাবে? আমি বললাম, চিন্তা করবেন না মাসিমা। একদিন দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। মানসিক আঘাতটাতো কম নয়। আমি বরং সেলিনার কাছে যাচ্ছি। তাই যাও বাবা। আমি ওই ঘরেই চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেলিনা খাটের রেলিংএ হেলান দিয়ে, কি একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। আমাকে দেখে

একটু সোজা হয়ে বসে বলল, আরে প্রান্তিক ভাই যে। কতক্ষণ। অনেকক্ষণ, সকলের সঙ্গে দেখা করেই আমার সঙ্গে বুঝি? বলতে পার। তার মানে কর্তব্য পালন তাইতো? তাও বলতে পার। সবই যদি আমি বলব, তা হলে আপনি কি বলবেন। আমার কথা শোনার কি তোমাদের সময় আছে? আমার কণ্ঠ অভিমানী। চমকে উঠে সেলিনা বলল, এ ভাবেতো আপনি কথা বলেন না প্রান্তিক ভাই, কি হয়েছে? শরীর খারাপ? বললাম না শরীর আমার ঠিক আছে। আমার কথা থাক, তুমি কেমন আছ? ভালো। শুধু ভালো বললে তো আর কোন কথা বলার থাকে না, অথচ মাসিমা বললেন, তোমার ঘরে চা পাঠিয়ে দেবেন, অন্তত চা খাওয়ার সময়টুকু যাতে তোমার কাছে থাকা যায় তার জন্য এমন কিছু বল, যাতে সময়টা কাটানো যায়। ও উৎসুক হয়ে বলল, কি জানতে চান? বললাম বক্সিংএর দুনিয়ায় ফিরতে হবে তো, এ ভাবে মিইয়ে গেলে চলবে কেন? মনে সাহস আনতে হবে। সব সময় শুয়ে থাকলে চলবে কেন? তাহলে কি করব। রাস্তায় বেরুবে? কি হয়ে ছিল ভুলে গিয়ে জীবনের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে হবে।

কি যেন ভাবলো সেলিনা, তারপর বলল, এসব কথা যে ভাবিনা তা নয়। কিন্তু ভয় হয়। কিসের ভয়? ঐ শয়তান গুলোতো হারিয়ে যায়নি। যদি আবার আসে? কোন শয়তানগুলো? কেন রেহানা আপনাকে কিছুই বলেনি? আরো আশ্চর্য হয়ে বললাম, ওতো আমার সঙ্গে কোন কথাই বলছেনা। কেন কথা বলছেনা কেন? কি করে বলব সেলিনা। তুমিও মাঝে মাঝে আড়ি করে দাও, আমার সঙ্গে আর কথা বলবেনা বলে।

অনেক অনেকদিন পর খিল খিল করে হেসে উঠলো সেলিনা। যেন দমবন্ধকরা গুমোট ঘরে দখিনা হাওয়া লুটোপুটি খেলছে। বললাম এমন হাসলে, কি যে ভাল লাগে। হ্যাঁ বহুদিন হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। কেমন যেন হতাশ লাগছিল সব কিছুতেই। আজ মনে হচ্ছে দূর হতাশার কি আছে? জীবনের সব ঘটনাকে কি মনে রাখতে হবে না কি? তারপর জোরে জোরে চিৎকার করে মাকে ডেকে বলল, মা রেহানাকে বলতো আমি ডাকছি। আফরোজ বেগমের চা ততক্ষণে হয়ে গেছে। উনি আমার আর সেলিনার জন্য নিমকি আর চা নিয়ে এলেন।

হাসি হাসি মুখ সেলিনার। মায়ের মনতো। সন্তানের মনের সংবাদ তার থেকে বেশী কে জানবে। তিনি বললেন, তোমরা চা খাও, দেখি রেহানাকে বলে দেখি।

আমরা চায়ের কাপ নিয়ে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ যদি রেহানা আসে। কিন্তু আফরোজ বেগম জানালেন, না ও আসবেনা ওর অসম্ভব মাথা ধরেছে, বলছে আসতে পারবেনা। আমি সেলিনার দিকে তাকিয়ে দেখি মিটিমিটি হাসছে। আমি ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম আমি যতক্ষণ থাকবো, ও সুস্থ হবে না, আসলে ও আমাকে সহ্য করতে পারছেনা কেন যেন? সেলিনা বলল তাই বুঝি? তা নাহলে আর কি ভাববো বল? হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সেলিনা বলল, ওকে নিয়ে একদিন ঘুরে আসুননা। দেখবেন, ভিতরের মেঘ কেটে গেছে। তারপর বললো,

আপনার এক বন্ধু আছে না, কি যেন নাম? হ্যাঁ মনে পড়ছে অশ্রুকণা। হ্যাঁ আছে।

কিন্তু ওকে তুমি চেনো নাকি? না চিনতাম না তবে ২/৩ দিন আগে এসেছিল আমাদের বাড়ী? তোমাদের বাড়ী? আমি চমকে উঠলাম। আমার চমকে ওঠাটা সেলিনার দৃষ্টি এড়ালনা বলল, এতে চমকে উঠছেন কেন? ও যেমন আপনার বন্ধু, তেমনি রেহনারও তো বন্ধু। তা ঠিক। কি জন্য এসেছিল ও? এটাতো আপনার ঠিক হচ্ছে না প্রান্তিক ভাই? আপনি ছাড়া রেহানার কাছে আর কেউ আসবে না, এ হয় নাকি? সেলিনার কথায় কি যে হচ্ছিল আমার বুঝাতে পারব না, কাউকে। সেলিনা বলে চলে এ কিন্তু আপনার ভীষণ বাড়াবাড়ি। আমি কি তাই বলেছি? না বলেননি, কিন্তু বলতে চেয়েছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম আমি বলতে চেয়েছি? না সেলিনা না আমি শুধু বলতে চেয়েছি এ ঘরের বদ্ধতা তোমার জন্য নয়। তোমার চাই মুক্ত বাতাস উন্মুক্ত প্রান্তর। তেপান্তরের মাঠ। আর বক্সিং এর রিং সেটা বলবেন না। না বলব না। কারণ ঐ রিং এ যাওয়ার কোন ইচ্ছেই তোমার নেই। তার থেকে তুমি প্রস্তুত থেকো, আমি আসব কাল বিকালে, বেরোবে আমার সঙ্গে। আপনার সঙ্গে। কেন আপত্তি আছে? আছে বৈকি। তারপর হেসে বলল না প্রান্তিক ভাই, আপনার সঙ্গে নয়, বরং কাল আপনি আমার সঙ্গে চলুন। কোথায়? একবার তপতিদিকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। যাবেন? আচ্ছা যাব। কখন যাবে? আপনি আপনার বাড়ী থেকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবেন, বিকেল ৩টে নাগাদ, আমি যাব ঐ সময়। তুমি আমার বাড়ী চেন? না চিনিনা, তবে জানি আপনি কোথায় থাকেন?

আচ্ছা বলে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। অভিমানের প্রত্যাঘাতে চেয়েছিলাম, যাব না রেহানার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পা যে ঐ দিকেই এগিয়ে চলল, একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে, ফুলফোর্সে পাখা চালিয়ে শুয়ে আছে রেহানা। কৃষ্ণবর্ণ আর পান্ডুরতায় আচ্ছন্ন তার মুখচ্ছবি। চোখ বন্ধ করে আছে। কি যে গভীর ব্যথা লুকিয়ে আছে ওর বুকের মধ্যে কে জানে? মনে মনে ভেবে নিয়েছি কদিন আগে অশ্রুকণা এসেছিল, নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে, যা রেহানার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কি তা। আমি আস্তে হাত রাখলাম ওর কপালে। চোখ মেলে দেখে আমি সামনে। ও বলল, তুমি আর এসোনা প্রান্তিক। কেউ ব্যথা পাক আমি চাইনা। বুঝতে পারছি আমার অনুমান ঠিক। অশ্রুকণা নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। কিন্তু কি বলতে পারে ও। হয়তো কাগজে যে সমস্ত ঘটনা বেরিয়েছে বলে মিনতি সেন বলেছিলেন, তেমনি কোন খবর অশ্রুকণার নজরে এসেছে আর তাকেই হয়তো রূপে রংএ ব্যাখ্যা করেছে রেহানাকে। যা রেহানার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আর চিরদিনের চাপা স্বভাবের মেয়ে রেহানা, সব বেদনার বোঝা নিজে গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দিতে চাইছে। বললাম কেউ ব্যথা পাক এটা তুমি চাও না। কিন্তু আমি ব্যথা পাই তাইকি তুমি চাও? কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে যে এই ভাবে অপমান করছ? বেশ তবে থাক তুমি তোমার মত, কয়েকদিন আসতে পারিনি, মনে করোনা তোমার চিঠি এর জন্য দায়ী, আমি আসতে পারিনি তার কারণ, আরো এমন কতকগুলো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে একদম সময় করে উঠতে পারিনি। অশ্রুকণা কি বলেছে জানিনে, ওর সঙ্গে আমার একটি মাত্র কথা হয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছিল, রেহানা আসেনি? বলেছিলাম আমার সঙ্গে

দেখা হয়নি। হ্যাঁ এটা মিথ্যে কথা, জেনে শুনেই বলেছিলাম, এর বাইরে যদি কিছু বলে থাকে তার দায়িত্ব তার আমার নয়। ও তেমনি চোখ বন্ধ করে রয়েছে। জানিনা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে কী না।, তবু বলে চললাম, রেহানা আমিও মানুষ। রক্ত মাংসের মানুষ। মান-অপমান, ভালবাসা-ঘৃণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস অন্য সকলের মত আমারও আছে। যাকগে এসব কথা বলে তোমাকে আর আঘাত দেবো না। সোমবার ঠিক ৩/৩০ টায় শিয়ালদা সাউথ প্লাটফর্মে অপেক্ষা করব। আসা না আসা তোমার ব্যাপার। চলি।

না ফিরে তাকাইনি ওর দিকে। নিজেই দরজা এবং গেট খুলে বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। হঠাৎ কি খেয়াল হল তাকালাম পিছন ফিরে। দেখলাম রাস্তার দিকের জানালা খুলে তাকিয়ে আছে রেহানা।

সোমবার ৩-২৮। না রেহানা আসেনি, ধরে নিয়েছি আসবেনা। ও হারিয়ে যেতে চায় আমাব জীবন থেকে, এটা মেনে নিতে পারছিনা। কিন্তু ওযে আমাব জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না। এ উপলব্ধির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। কিন্তু একি। আস্তে আস্তে আমাব কাঁধে পিছন থেকে হাত রাখল কে? তাকিয়ে দেখি রেহানা। আমি অবাক চোখে তাকাতে বলল, ভেবেছিলে আমি আসবনা তাইনা? তাছাড়া কি অন্য কিছু ভাবা যেতো? কেন আমার উপর তোমার কোন বিশ্বাসই নেই? নেই কোন অধিকার? আমি বললাম, গাড়ী স্টার্ট দিচ্ছে তাড়াতাড়ি এসো। ওকে আগে তুলে দিয়ে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠলাম। দেখলাম ও হাফাচ্ছে। তবুও জানতে চাইল, কোথায় যাব আমরা। জাহান্নামে। খুব সুন্দর জায়গা তাই না। বলেকি মেয়েটি। বললাম, জাহান্নাম সুন্দর কীনা জানিনা, তবে সুন্দর যে তুমি, তাতে কোন ভুল নেই। ধ্যাৎ।

ট্রেন থেকে নেমে বললাম, হেঁটে যেতে পারবে না রিক্সা ডাকব। কাছে? হ্যাঁ কাছেই। কোথায়? তোমার মিনতি সেনের কথা মনে আছে? জলযোগে একবার দেখা হয়েছিল। বলেছিলাম আমার পিসি। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো রেহানা। বলল, ওখানে কেন? খানিকটা জড়সড় যেন। বললাম, আমাকে বিশ্বাস করতো রেহানা? জানিনা। না জানলে চলবে কেন? একটু আগে তুমি জাহান্নামকেও একটা সুন্দর জায়গা বলে বর্ণনা করেছে কেন বলত। সামান্য হেসে বলল, সেতো তোমার জন্য। আমার জন্য? হ্যাঁ তোমার জন্য। তোমার সঙ্গে আমার নরকে যেতেও আপত্তি নেই। আমি বললাম। আমাকে তুমি এত ভালবাস রেহানা? জানিনা, বলে চুপ করে গেল। আমারও যেন কিছু বলার নেই।

এই মেয়েই পরশুদিন বলেছে তুমি আর এসো না প্রান্তিক। এই হয়। জীবনের চলমানতা কেমন করে কাকে কোন পথে নিয়ে যাবে, কেউ তা জানেনা। মুহূর্ত আগেও মনে হচ্ছিল, রেহানা সত্যিই হারিয়ে যেতে চায় আমার জীবন থেকে। আর এখন, রেহানার স্বপ্নগুলো আবর্তিত হয়, সাধারণ অতি সাধারণ প্রান্তিক কে নিয়ে।

মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা। মিনতি সেনের বাড়ীতে বেল দিতেই তিনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। আমার পাশে রেহানাকে দেখে বললেন, তুমি রেহানা না? একি চেহারা করেছ? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রান্তিক এ তোমার খুব অন্যায় এত কষ্ট

দিলে কেন ওকে? আমি রেহানাকে বললাম, আমার পিসি মিনতি সেন। ভীষন লজ্জা পেয়েও রেহানা মিনতি সেনকে প্রনাম করে বলল, আমার কথা আপনার মনে আছে? মনে থাকবে না কেন পাগলি? তবে একি চেহারা বানিয়েছিস। কেন এমন চেহারা করেছিস? মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। উপরে যাও প্রান্তিক।

আমি উপরে এসে দেখলাম সেখানে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। সামনে কোর্টের কিছু ব্রিফ। মানে ভদ্রলোক হয় এ্যাডভোকেট না হলে এ্যাডভোকেটের কোন নিয়োজিত ব্যক্তি। আমি সামনা সামনি একটা চেয়ারে বসলাম। উনি জিজ্ঞাস করলেন, আপনি মিস সেনের কিছু হন? ভাইপো। আপনার নাম? প্রান্তিক। ও আপনাকেই দরকার। বাস্তবিকই আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। মিস সেন কোথায়? বললাম আসছেন। আচ্ছা আপনার সঙ্গে রেহানা নামে একজনার আসর কথা ছিল না? হ্যাঁ ছিল, এবং এসেছেনও। উনি কোথায়? পিসি ওকে নিয়ে আসছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু মনে করবেন না, আপনি? আমি সুরেশ ভট্টাচার্য্য। লিগাল প্রাকটিস্ করি। তারপর নিজেই বললেন, এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় কি ভাবে? বেহানা আমার সঙ্গে পড়ে। ও তার মানে আপনি ছাত্র? আমি হ্যাঁ বলে বললাম, আমাকে আপনি তুমি করেই বলবেন। কেন ইয়ং ম্যান, আপনিতে আপত্তি আছে? হ্যাঁ আছে, বড়রা কেউ আপনি করে বলুক, আমার ভাল লাগেনা, আচ্ছা তাই হবে?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি মিনতি সেন, পিছনে রেহানা। কিন্তু একি, এ পোষাকে তো রেহানা আসেনি। সুন্দর লাল হলুদের মহীশূর সিল্ক পরেছে রেহানা। বেণীটি সুন্দর করে বাঁধা। তার গোড়ায় গোঁজা লাল গোলাপ। ব্লাউজটা ঠিক আছে, যতদূর মনে পড়ে হাত খালি ছিল। কিন্তু এখন দেখছি দু হাতে দুটো বালা, গলায় লকেট সহ সরু চেন বুকের খাদে লেপটে আছে, খানিকটা স্নো পাউডারের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে মুখশ্রীতে, আই ভ্রু পেন্সিল ইউজ করা হয়েছে চোখের পাতায় এবং ভ্রূতে। সবুজ টিপ দেওয়া হয়েছে দুই ভ্রূর মাঝে। আর এতেই অনেকটা ঢাকা পড়েছে তার কৃশতা। আই ভ্রূর পেন্সিলের স্বাভাবিকতায় উজ্জ্বলতর হয়েছে দুটো চোখের দৃষ্টি। হাতে মিষ্টির প্লেট। নিমকি। সিঙ্গারা এবং ৩/৪ বকমেব মিষ্টি। আমি একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিলাম। রেহানার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সামান্য প্রসাধনে এত অসামান্য হতে পারে তা আমার ভাবনার বাইরে। মিনতি সেন বললেন, মিঃ ভট্টাচার্য। কথা দিয়ে ছিলাম, ওকে দেখাব একবার আপনাকে। এই সেই রেহানা যার কেসটা আপনাকে নিতে বলেছিলাম। আপনি আমার কথা রেখেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। এর নাম রেহানা। আর ও প্রান্তিক। এদের কথাতো আপনাকে বলেছি। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষনে প্রান্তিক কে জানিয়ে দিয়েছেন আজকের শুনানিতে কি হয়েছে। ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, না এখনো জানানো হয়নি। বরং আপনিই জানিয়ে দিন। মিনতি সেন বললেন এ্যাডভোকেট আপনি আর জানিয়ে দেব আমি? উনি বললেন, আমিতো বলছি। তারপর মিষ্টির প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, এত খেতে পারবনা মিস সেন। বরং আরেকটা প্লেট নিয়ে আসুন। মিনতি সেন বললেন ঐ সামান্য মিষ্টি, আবার কি প্লেট নিয়ে আসব। আপনি খেয়ে নিন। তারপর রেহানাকে বললেন, চল মেয়ে, এদের জন্য কফি নিয়ে আসবি। ভট্টাচার্য সাহেব বললেন

তোমার নাম রেহানা? রেহানা একটু হাসলেন। মিনতি সেন তাকালেন রেহানার দিকে। রেহানা নীচু হয়ে প্রণাম করতে উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন একি করছ মা। আজকাল আবার এসব কেউ করে নাকি? মিনতি সেন বললেন। বা করবে না কেন? বাঙালী কৃষ্টিকে কি অস্বীকার করা যায়? ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, তা ঠিক জানিনা মিস সেন। আমারও যে এসব ভালো লাগে না তা নয়, তবে সমস্যা কোথায় জানেন? আমার মেয়ে, সেতো মা তোমারই মত বয়স, এবার প্রথম বর্ষ এম এ করছে। তাকে গুরুজনদের প্রনাম করতে বললে, সে বলে তার নাকি লজ্জা করে। আমারও ধীরে ধীরে বিশ্বাস হচ্ছিল, সত্যি হয়তো আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের এসব বুঝি ভালো লাগেনা। তোমাকে দেখে আমাকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

উনি মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ প্রান্তিক, জীবনে অনেক আঘাত আসবে, সমস্যা আসবে, আসবে দুঃখ-ঝড়, তাই বলে নিজের বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেল না। তোমার পিসিকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি, তার কারণ ভিন্ন। তাই তার আবেদনকে অস্বীকার করতে পারলামনা। স্বতঃ প্রনোদিত হয়ে এ কেস আমি গ্রহণ করেছি। ওদেব যাতে আদালতে উঠতে না হয় তার জন্য আমি আপ্রান চেষ্টা করব। কিন্তু মিস সেন আপনাকেও আপনার কাকাবাবুকে বলতে হবে, পুলিশ যাতে কেসটি ঠিক ঠিক মত প্লেস করে সেটা দেখতে। এক মাস পরে ওদের আবার আদালতে হাজির করা হবে। আমি দেখব যাতে ওদের শাস্তি কঠোর হয়। আর মা রেহানা কয়েকটা সই-টই লাগতে পারে। প্রান্তিকই যেন যোগাযোগ রাখে, আমি দেখব। আমার মেয়ের নাম শান্তা, এসোনা একদিন আমাদের বাড়ীতে। তোমাদের দেখে যদি ওর চিন্তার কোন পরিবর্তন হয়। মিনতি সেন বললেন, আপনার কি খুব দুঃখ ভট্টাচার্য সাহেব। এতদিন বিলাতে ছিলেন, তাতেও মানসিকতার পরিবর্তন হল না। কে বলেছে হয়নি মিস সেন? তবু বাঙালীর এই ভদ্রতা, এই নম্রতা, গুরুজনদের প্রতি এই শিষ্টাচার আজো নষ্টালজিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমার মেয়ে এক খ্রিস্টান যুবককে ভালবাসে। আমার কোন আপত্তি নেই, শুধু চাই ওর ভিতর যেন দেখতে পাই এই বাঙালী কৃষ্টিকে।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, না অনেক দেরি হয়ে গেল, উঠতে হবে। রেহানা বলল, একটু বসুন কাকাবাবু, আপনার কফিটা নিয়ে আসি। রেহানা বেরিয়ে গেলে ভট্টাচার্জ সাহেব বললেন, ইয়ু আর আ ভেরি লাকি ইয়ংম্যান। তোমাদের শুভ কামনা জানাই। আমি আর কি বলব। লজ্জায় শুধু চুপ করে রইলাম। রেহানা কফি নিয়ে এলে, তার হাত থেকেই কফির পেয়ালা তুলে নিলেন ভট্টাচার্জ সাহেব। মিনতি সেন বললেন, ঐ বোধহয় বাবা উঠেছেন, তুমি যাওনা প্রান্তিক একটু ওঁর কাছে, আমি এগিয়ে গেলে, রেহানাকে বললেন তুইও যা মেয়ে।

পিসি ভট্টাচার্জ সাহেবকে বললেন, আপনার তো বহু জায়গায় যোগযোগ আছে। প্রান্তিককে একটা চাকরি করে দিন না। হাসলেন ভট্টাচার্জ সাহেব, বললেন, এই আইন আদালতের চাকরি ভাল লাগবে ওর। আইন আদালতের চাকরি দেবেন কেন? আপনিতো

সুর এ্যাণ্ড সুর মার্চেন্ট অফিসেরও এ্যাডভোকেট তাইনা? হ্যাঁ, তাহলে ওদেখু ওখানেই দিন না। ওরাতো কয়েক জন সহকারী ম্যানেজার নেবেন বলেছেন। ভট্টাচার্জ সাহেব তাকালেন মিনতি সেনর দিকে। তারপর বললেন, কিন্তু ওরা যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান স্নাতক চায়। কদিনই পরে ওতো স্নাতক হবে। পারবেন না ম্যানেজ করতে? দেখব। তারপর তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, ও যাবেতো? মিনতি সেন বললেন, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

এবার ফিরতে হবে। মিনতি সেনের বাবা বললেন, দিদি ভাই তোমার মতো মিষ্টি মেয়ে খুব কম দেখিছি। মাত্র কয়দিন হলো মিনতির কাছে তোমার নাম শুনেছি, একদিন মিনতিও হয়তো তোমার মত মিষ্টি মেযেব মা হতে পারতো। কিন্তু কি যে হয়ে গেল, ও বোধহয় তোমাদের মাধ্যমে, সেই মাতৃত্বের সাধ মিটাতে চায়। কদিন আর বাঁচব, রেহানার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, কি আর বলব, ও যদি তোমাদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়! একটু দেখো। হাতটা ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে পাশ ফিরে শুলেন বৃদ্ধ আমি ডাকলাম, দাদু এবার যে উঠতে হবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আচ্ছা, বলে চুপ করে গেলেন বৃদ্ধ।

মিনতি সেন বললেন, একি করছিস মেয়ে। ওসব তোর। রেহানা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। মিনতি সেন বললেন, এসব খুলে রেখে যাবি বলে কি পরতে দিয়েছি? কিন্তু, কোন কিন্তু নয় মেয়ে। শুনলি তো বাবার কাছে আমিও তোর মত মেয়ের মা হতে পারতাম।

জানি অসুবিধা কোথায়। কোথায় সঙ্কোচ রেহানার। আবার মিনতি সেনের মনের অবস্থাটাও বিচার করতে হবে। যে গভীর ভালোবাসা আর স্নেহের উপর ভিত্তি করে রেহানাকে এই সাজে সাজিয়েছেন, তার অধিকারটাকে বুঝতে হবে। বললাম, থাক না রেহানা, মাসিমাকে যা বলবার আমি বলব।

বেরিয়ে এলাম, আমবা। আসার সময় রেহানার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে বললেন, না করিসনে মেয়ে এটা সেলিনাকে দিয়ে দিবি। বলবি আমি দিয়েছি। এতক্ষণে যদিও বা সম্ভব ছিল, রেহানা আর পারলনা, টপটপ করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মিনতি সেন বললেন একি পাগলি কী করছিস? রেহানা বলল, আপনার এই ভালবাসার যোগ্যতা যে আমার নেই। মিনতি সেন ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন যোগ্যতার মানদণ্ডের হিসাব কি সব জেনে বসে আছিস পাগলি। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের আচলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন একদম কাঁদবি না পাগলি। একটা কথা সব সময় মনে রাখবি যারা তোর কাছে চাইবেনা কিছুই, পারিস তো তাদের মনের ঠিকানা খোঁজবার চেষ্টা করিস।

বেরিয়ে এলাম আমরা। সারাটা পথ একসঙ্গে হেঁটেছি। কিন্তু কিছু চাওয়াতো দূরের কথা, কোন কথা বলতেই পারলাম না। তাই একটা কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, মন যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ সেখানে চাইবার কিছু নেই। একটাও কথা না বলে, আমরা

এলাম প্লাটফর্মে। ওঁকে বসিয়ে রেখে টিকিটটা কেটে নিয়ে এলাম। এসে দেখি চুপ করে বসে আছে রেহানা। আমি যে এসেছি সে বুঝি বুঝতেই পারেনি। শিয়ালদাগামী ট্রেন এসে দাঁড়ালো প্লাটফর্মে। আমি বললাম কই ওঠ। ও বলল, এ ট্রেনটা ছেড়ে দাও প্রান্তিক। পরের ট্রেনে যাব। ট্রেনটা বেরিয়ে গেল।

বললাম চা খাবে? বলল না। তাহলে ট্রেনটা ছেড়ে দিলে কেন? জানিনা। আমার একদম বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছেনা। কেন? বলতে পারবো না কেন? প্রান্তিক আমার বোধ হয় না আসলেই ভাল হতো। কেন? তোমাকে সত্যি কথাই বলছি, এত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। মিনতি পিসি কি চান আমি জানিনা। তার বাবার কথায় আমার মত তারও একটা মেয়ে থাকতে পারতো? কিন্তু হয়নি, কি কারণ, আর দুঃখটাইবা কি কোনটাইতো আমি জানিনে, অথচ যে ভাবে তিনি তার সর্বগ্রাসী ভালবাসার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন, জানিনা এর কি প্রতিদান আমি দিতে পারবো। বারবার মনে হচ্ছে কি জান প্রান্তিক, আমাকে যদি তিনি সাধারণ একেবারে সাধারণ কোন করুণা প্রার্থীর মতন ভাবতেন, আমার বোধ হয় এত কষ্ট হতো না।

বললাম, কেন এত ভাবছো রেহানা, মিনতি সেনবা আছেন বলেইতো, আজো দুঃখ বেদনা আর শত আঘাতেও বাঁচবার সাধ জাগে, স্বপ্ন দেখবার ইচ্ছে হয়। যদি সে স্বপ্ন পূরণ না হয়। নাইবা হলো, তাতে স্বপ্ন দেখাটাতো মিথ্যে হয়ে যাবে না। তুমি হয়তো পারবে প্রান্তিক, কিন্তু আমার কথা ভেবেছো? যে মেয়ে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তাকে যদি নতুন স্বপ্নের ফেরি করতে হয়, সে পারবে কেন? আর এই যে, যে সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন আমাকে মিনতি পিসি, এযে আমার আনন্দ না দুঃখ সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। হয়তো বেশী দাবী হয়ে যাবে, তবু যদি এই সাজে তুমি আমায় সাজিয়ে দিতে এত বোধহয় কষ্ট হতো না। জানতাম, তুমি না চাইলেও হয়তো কিছু দাবি আছে তোমার পরে। স্মৃতির সাঝিতে ভরে নিতাম সেই দাবির অলংকার যা একদিন ফুল হয়ে ফুটতো, তার পর হয়তো বা ঝরে যেতো, তবু মনকে সান্ত্বনা দিতাম, এর মধ্যে করুণা আছে কীনা জানিনা, কিন্তু পথ চলার অধিকার তো ছিল একদিন। তা হলে কেন তুমি আমাকে এমনি চরম অবহেলা আর তাচ্ছিল্যে একাকী পথের বাকে এসে দাড় করিয়ে দিলে?

আমি অবাক আর বিস্ময় ভরা চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। হয়তো বিষাদ আছে আনন্দের বেলাভূমে, কিন্তু গোধুলি আকাশের সন্ধ্যা আভায় ধুসর হয়ে আসা প্রান্তরে এ কোন মেয়ের চরণধ্বনি। একে কি চিনি আমি? সৌন্দর্য আর মহিমাত্বের মাখামাখিতে রেহানা যেন নতুন স্বপ্নের সাগরভূমি। চোখ কি পারবে ওই সৌন্দর্য্যকে সয়ে নিতে!

আমি নিজেও কম অবাক হইনি, মিনতি পিসির আচরণে। হ্যাঁ, বুঝতে পারি উপলব্ধির গভীরতায় যে, মিনতি পিসির নিঃসঙ্গ জীবন, এমনি একটা স্বপ্ন দেখার অপেক্ষায়। কিন্তু নিজের ক্ষমতাকে কি আমি যাচাই করে দেখেছি, এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে কী না। কে আমি? কতটুকু আমার ক্ষমতা? অথচ অবাক হয়ে ভাবি যাদের ভালবাসা আমাকে ধন্য করেছে, তারা কি তাদের ভালবাসা বিলিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে চেয়েছে, না তাদের

ভালবাসায় আমাকে দিয়েছে পথ চলার অনুপ্রেরণা।

বললাম, অবহেলা যদি করেও থাকি তোমাকে, দুঃখকি রেহানা, তোমার চলার পথকে কর দিগন্ত বিস্তৃত। সরু এক ফালি পথ থেকে বেরিয়ে এসে তুমি দাঁড়াও রাজপথে। যারা অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার অপেক্ষায় আছে বরণ করে নেওয়ার জন্য, ধন্য কর তাদের, তুলে নাও তাদের ভালাবাসা তোমার হৃদয় মাঝে। অবহেলার মধ্যে নিজের মুক্তি চেওনা রেহানা আবার তাচ্ছিল্য ভাবে তাকে পেতেও চেওনা। তাতে জিতবেনা তুমি। জীবনে যা পেয়েছো তাকে গ্রহণ কর সহজ ভাবে। আঘাত দুঃখ বেদনা সব কিছুকে ভাগ করে নাও আনন্দের সাথে। জীবনের জয়কে যেমন সাদরে বরণ করে নাও, তেমনি হারকেও গ্রহণ করেনও সমান মর্যদায়। মনে রেখ জীবনে যা কিছু আসে কখনো তা কুসুমাস্তীর্ন পথে আসে না। সে হারই হোক আর জিতই হোক। অবহেলাকে অবহেলা দিয়ে জয় করো। তাচ্ছিল্যকে করো আরো তাচ্ছিল্য। তাই বলে যে তোমাকে তার হৃদয়ের ভালবাসা আর আবেগ দিয়ে সাজিয়েছেন, তার দেওয়া এ স্নেহের দান, ছোটই হোক আর বড়ই হোক গ্রহণ করো পরম পাওনা বলে। এই পৃথিবীতে ক'জন পায় এই অযাচিত দান। ঈশ্বরের আর্শীবাদ না থাকলে তা পাওয়া যায় না রেহানা।

এরপর যে কি বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে গেলাম। বুঝতে পারছি আমার বলাটাও কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। কি যে বলতে চেয়েছি, তাইতো ছাই বুঝতে পারছিনা। তবু মনের সেই দিক্‌হীন নিশানায় আর একবার তাকালাম রেহানার দিকে। অপলক তাকিয়ে আছে ও আমার দিকে। বললাম, অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছ? কোন কথা না বলে, মিনতি সেনের ভালবাসায় গুজে দেওয়া ফুলটা বেনী থেকে খুলে নিল রেহানা। এখনো সতেজ গাঢ় লাল, তারপর তা আমার হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ফিরিয়ে দিওনা প্রান্তিক, এ আমার অহংকার। যার জন্য দিয়েছেন তাকেই দিলাম নিঃস্ব করে।

পরের গাড়ীটা এসে গেল। ওর হাত থেকে ফুলটা নিয়ে দ্রুত সেই তাড়াহুড়োর মধ্যে আবার সেটা ওর বেনীতে গুঁজে দিয়ে বললাম, তোমার অহংকারটুকুই আমার পাথেয় হয়ে থাকুক।

যখন ওদের বাড়ীতে ফিরেছি, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। উদ্বিগ্নতায় প্রহর গুনছেন ওরা। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল সেলিনা। আমার পিছনে ওকে দেখে আশ্বস্ত হল ঠিকই, কিন্তু পোষাকের দিকে চোখ আটকে গেল সেলিনার। রেহানা ওর সঙ্গে কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে নিজের ঘরে চলে গেলো। পিছনে পিছনে সেলিনাও ঢুকল ওর ঘরে। অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। তারপর বলল, একটু বলে গেলে পারতিস রেহানা। বলতো, তোর এই চরম আনন্দের দিনে আমাদের কি উদ্বিগ্নতায় রাখলি। প্রান্তিক ভাইয়ের সঙ্গে কোথাও যেতে তো আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। তারপর একটু থেমে বলল, খুশীতো রেহানা? রেহানা ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বলল, তুই থামবি তো সেলিনা। ও বলল, দেখ রেহানা যদি এক চিলতে সিঁদুর দিতিস সিঁথিতে অপূর্ব লাগতো তোকে? তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, প্রান্তিক ভাই খুশীতো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেও বকুনি লাগাল

সেলিনাকে, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না সেলিনা। কোথায় উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইবি কেন এত রাত হলো। কোন বিপদ টিপদ হয় নিতো? তা নয় যত সব আজেবাজে কথা। সেলিনা মৃদু হেসে বলল, বিপদে যে সত্যি সত্যি পড়েছিলি, তাতো তোকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

প্রথমে বেনীতে গোঁজা রক্ত গোলাপ, তারপর গলার চেন এবং শাড়ী খুলতে খুলতে বলল, তোর মুখে কিছুই বাঁধেনা তাইনা সেলিনা? বাঃ তোদের আনন্দটাকি ভাগ করেও নিতে দিবিনা? কি বড় মাপের মনটাকে তুই জয় করে নিলি, অথচ একটুও আনন্দ উৎসব হবে না এও কি তুই ঠিক করলি? রেহানা বলল, কি বলতে চাস তুই? সেলিনা বলল, তাহলে ডাকি প্রান্তিক ভাইকে! না দরকার নেই। তারপর মিনতি সেনের দেওয়া প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোর। আমার? কি আছে ওতে? কি করে বলব, খুলে দেখ।

সেলিন্য খুলে অবাক। একি? ওসব কি প্রান্তিক ভাই দিয়েছে। রেহানা একটু উত্তেজিত হয়ে বলল প্রান্তিক-প্রান্তিক-প্রান্তিক। কোথায় পাবে প্রান্তিক এসব? ওকি চাকরি করে? সেলিনা হাসতে হাসতে বলে, তুই অতো রেগে যাচ্ছিস কেন বলতো রেহানা। এখন থেকেই নিজের মানুষটাকে এমন লুকিয়ে রাখতে চাইছিস যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে না যায়? বিষন্ন কণ্ঠে রেহানা বলল, বুঝতেই যাকে পারলামনা আজো তাকে আবার লুকিয়ে রাখা। তারপর বলল দেখ প্রান্তিক একা বসে আছে। ও ঘরে যা, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

সেলিনা আসে আমার কাছে। প্যাকেটটা আমার সামনে টেবিলের পরে রেখে বলে, আড়ি আপনার সঙ্গে প্রান্তিক ভাই। কেন? বাঃ, কাল সারাটা বিকাল আপনার সঙ্গে ঘুরলাম, একেবারে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না, যে আজই রেহানা আপনার সঙ্গে বেরোবে। ওই প্যাকেটটা আমর সামনে মেলে ধরে তুমি কি জানতে চাইছো? ও হাসতে হাসতে বলল, রেহানাকে আপনি অল্পে ভুলাতে পারেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না। বললাম একশো ভাগ ঠিক কথা সেলিনা। রেহানা তোমার তুলনায় এত সামান্য যে, আমি কিছু না দিলেও ওকে ভোলানো অসম্ভব হবে না, কিন্তু তোমাকে যে ভোলানো যাবে না, এতে আমার কোন দ্বিমত নেই। আজতো আপনাদের আনন্দের দিন, এমন আনন্দের দিনে একটু বলে গেলেন না কেন? আমিতো অবাক, তবু বললাম বুঝতে পারিনি এতদেরি হবে তাই। কোথায় গিয়েছিলেন? আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আজ তোমাদের কেসটা ছিল জান? কি কেস? বাঃ যার জন্য এত ভুগালে সেটাই ভুলে গেলে? আজ ডালিমদের কোর্টে তোলা হয়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সেলিনার মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বোধ হয় সেদিনের সব ঘটনা একে একে মনে পড়তে লাগল। আমি বললাম, ওই কেসটার ব্যাপারে কয়েকদিন আগে আমার এক পিসি, তুমি চেননা, রেহানা চেনে, মিনতি সেনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যাতে একজন ভালো উকিল দেওয়া যায়। আজ সেই উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর মিনতি সেন মানে আমার পিসি, যা নিয়ে এতক্ষণ তুমি রেহানা কে ঠাট্টা, করলে এসব দিয়েছেন, আর তুমিতো যাওনি তাই অন্য প্যাকেটটাও তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। ওর মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই সেলিনা। আছে এক মমতাময়ী মায়ের স্নেহসিক্ত ভালবাসা।

সেলিনা চুপ করে রইল। কোন উত্তর বুঝি জানা নেই। আমি বললাম যাও সেলিনা প্যাকেটটা খুলে দেখ ওটা তোমার পছন্দ কী না। পিসি দিয়েছেন, আমি কেন রেহানাও জানে না ওতে কি আছে? রেহানা চা নিয়ে আসতেই সেলিনা প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেল। আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম এবার উঠতে হবে রেহানা। কাল কি কলেজে যাচ্ছ? ও বলল, তুমি বল কি করব? হেসে বললাম আমি বলার কে? কেউ নও? এ কথার বুঝি কোন উত্তর হয় না। বললাম, কারো প্রতি মিথ্যে অভিমানে নিজের স্বপ্নকে মরে যেতে দিওনা। এর বেশী আমার কিছু বলার নেই। তারপর বললাম তাহলে কাল দেখা হবে কলেজে। আচ্ছা বলতে, আমি উঠে দাঁড়ালাম। বেরোতে যাবো। মিনতি সেনের দেওয়া উপহার সম্ভার নিজের অঙ্গে ধারণ করে সামনে এসে দাঁড়ালো সেলিনা। অপরূপ মানিয়েছে তাকে চোখ ফেরানো যায় না। বলল, চললেন যে প্রান্তিক ভাই। আমাকে যে যেতে হবে, অনেক রাত হয়েছে। আর তো দেরি করা যাবে না। পিসি চিন্তা করবেন। সেলিনা বলল আমাকে কেমন মানিয়েছে বললেন না। আমাকে বলতে হবে? বা বলবেন মা কেন? সুন্দর না কুৎসিৎ এটা বলার অধিকারতো আপনার আছে। আমি বললাম যিনি তোমাকে এই সব জিনিষ দিয়েছেন, বলার অধিকাবতো তার। তাকে পাব কোথায়? তার হয়ে বরং আপনিই বলুননা। বললাম সুন্দর বললে সৌন্দর্যের অপমান হবে। তাই বলছি অপূর্ব। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল ঠাট্টা করছেন? তোমার কি তাই মনে হল। বলুন না আমি কি কোন অন্যায় করেছি, ওর গলাটা অকারণ ভারি হয়ে ওঠে। আমি বললাম। আজ আর তোমার অভিমানের উত্তর দেওয়ার সময় নেই সেলিনা। তাই ওটা বাকি থাক। আরেকদিন বলব, সত্যি সত্যি আমি কোন ঠাট্টা করেছি কিনা।

নীলাঞ্জনা পিসির সঙ্গে আজকাল সম্পর্কটা কেমন যেন শিথিল হয়ে এসেছে। আগের মত অতটা ভালমন্দ নিয়ে বিচার করেন না। অফিস, বাড়ী, রান্না-বান্না , ছুটির দিনে একটু এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আমি যে এই বাড়ীতে আছি, মনে হয় তাও অনেকটা ভুলে গেছেন। তাড়াতাড়ি আসলেও বলেন না, আজ এত তাড়াতাড়ি কেন। দেরি করলেও বলেননা এত দেরি কেন? কি এক চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন থাকেন সর্বক্ষণ। রেহানাদের কথা আগে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন। আজকাল তাও করেননা। এর মাঝে কবে নাকি অশ্রুকণার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে বললেন, তুমি কি আজকাল কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ নাকি? তা হলে আর এখানে থেকে লাভ কি? আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমাকে কে বলেছে এসব কথা? পিসি বললেন আমাকে কেউ না বললে আমি জানব কি করে? সেতো ঠিকই, কিন্তু কে বলেছে আমিতো জানতে চাইতে পারি? কেন তুমি কি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি? না ঝগড়া করবনা পিসি, কিন্তু জানা দরকার কে আমার এই উপকারটুকু করল। পিসি বললেন কাল অশ্রুকণার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোথায়? ও আমার অফিসে গিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম তোমার অফিসে? হঠাৎ? কেন তুমি কি কিছু সন্দেহ করছ নাকি? না পিসি সন্দেহ নয়। কাল ৩টে পর্যন্ত ও কলেজে ছিল। আমাকে বলল, একটু বিবাদী বাগ যাব যাবে নাকি?

আমি জানতে চাইলাম ওখানে কি কোন কাজ আছে? উত্তরে বলল, হ্যাঁ একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন। উত্তরে বললাম তাহলে তুমি যাও। আমার পরের ক্লাশটা খুব ইমপর্টেন্ট। এ কথার পরে ও চলে গেল। তারপর আজ ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু কই কিছুই তো বললো না। পিসি জানতে চাইলেন তোমার সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে কি? আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, ঝগড়া? আমার সঙ্গে? তুমি এসব কি বলছ পিসি? নীলাঞ্জনা বললেন আমি কিছু বলতে চাইনে প্রান্তিক। যা কানে আসে তাই বললাম। আরো বললেন তুমি নাকি রেহানাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? ফিরেছো অনেক রাতে। তারপর তাকে কি সব উপহার টুপহার দিয়েছ? আমি যে এর কি উত্তর দেব বুঝতে পারছিনা? বললাম অশ্রুকণা তোমাকে এই সব কথা বলেছে? আরো অনেক কথা বলেছে, আমি সে সব কথা বলতে চাইনে। তোমাদের নাকি রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেছে, এই সব আর কি। মুহূর্তে মাথায় রাগ চড়ে গেল। অশ্রুকণা বলেছে এইসব ? এত মিথ্যে? আজ রেহানাদের জন্য যা করছি অশ্রুকণাদের জীবনেও ভগবান না করুন কিছু হলে আমি আমার সাধ্যমত এই কাজই করতাম। এতটুকু বিশ্বাস নেই ওর আমার প্রতি। এত মিথ্যে বলতে ওর জিভটা আটকে গেলনা। আর রেজিস্ট্রেশান যদি করতেই হয় তবে তা গোপনে করব কেন? ভিতরটা জ্বলতে লাগল তীব্র ঘৃণায়। আর মন? চরম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো অশ্রুকণার উপর। মনে মনে ভাবলাম ছিঃ, এরাই আবার সভ্যতার বড়াই করে, ভালবাসার অহঙ্কার করে। আমাকে চিন্তিত দেখে পিসি বললেন, কি ভাবছ? আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম কিছু ভাবছিনা পিসি। শুধু মনে হচ্ছে এদের, আমি একদিন বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। এতবড় ভুল আমার হলো কী করে?

তুমি রেহানাকে ভালবাসনা? জানতে চাইলেন পিসি। হ্যাঁ বাসি। তাহলে? তাহলেই কি রেজিস্ট্রি করতে হবে? আর তুমি তা জানবেনা? তুমি আমাকে কি ভাব বলতো, পিসি? আমি তোমাকে কিছুই ভাবিনা। আর তুমিতো ভালভাবে জান, যার নিজের জীবনের কোন স্থিরতা নেই তার ভাবনার কি মূল্য আছে? তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন, তুমি কি অশ্রুকণাকে ভালবাস না। বললাম সব ভালবাসাতো একই মানদণ্ডে বিচার হয়না পিসি। আমি যেমন রেহানাকে ভালবাসি, তেমনি অশ্রুকণাকেও ভালবাসি। আবার তোমাকেও ভালবাসি। যদি তা পাল্লায় ওজন করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সব ভালবাসার ওজন একই রকম হবে না। পিসি বললেন, তা হলে তো বিশ্বাস করতে হয় রেহানাকে তুমি একটু বেশী ভালবাস। তা হয়তো হবে। কিন্তু পিসি সেটা উপলব্ধির বিষয়। যুক্তিতর্ক দিয়ে তা বোঝানো যাবে না। তোমার কথাই মনে কর না পিসি, একদিন যে বিশ্বাস তুমি আমার ওপর রাখতে আজ আর তা রাখনা। কি করে বুঝলে? আমার উপলব্ধি দিয়ে। তোমার উপলব্ধি বুঝি সব। আমার যন্ত্রনার কোন মূল্য নেই তাইনা? আমি বললাম পিসি, এভাবে কোন কিছুর বিচার করা যায় না। অশ্রুকণা তোমাকে কি বলেছে জানি না। কেন বলেছে তাও বলতে পারবো না। কিন্তু তোমার যন্ত্রণা আমি বুঝি না এ তোমার ভুল। ভুল? হ্যাঁ ভুল। আর একটা কথা পিসি, আমি চিৎকার করে বলতে পারি আমার থেকে তোমাকে কেউ বেশী

বোঝেনা, কেউ না। বরং তুমি আমার যন্ত্রণা কিছুই বোঝনা। বোঝবার চেষ্টাও করো না। হয়তো তোমার নিজের জীবনের কোন স্থিরতা নেই তাই। তবু যতদিন পরিমলবাবু ছিলেন, খানিকটা হয়তো বোঝার চেষ্টা করতে, আর বুঝতেও। কিন্তু এখন একদম বোঝনা। আমাকে বোঝার মতো সময়ই নেই তোমার। তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই পিসি। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় যে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে কী অভিযোগ জানাবো। আমিতো জানি তোমাকে। বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে নীলাঞ্জনা বললেন কি বলতে চাও তুমি। পিসি সব জেনেও একটা মানুষ যখন সব কিছু গোপন করে চলেছেন, বার বার বলতে চেয়েও বলতে পারছেন না, তার মনের সেই অবস্থার কোন খোঁজ রাখ? বুঝতে পার সে যে কী কষ্ট? কি যেন ভাবলেন নীলাঞ্জনা। হয়তো ভাবলেন যে আমি আমার কথা বলছি। তাইতো বললেন, জানিনা তুমি কি বলতে চাইছো প্রান্তিক। আমি কি তোমার জীবনে কোন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি? কোন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি? ছিঃ, এসব কি কথা বলছ তুমি পিসি। তুমি আমায় ভালবাস। আমার জীবনের পূর্ণতা তোমার কাম্য, তুমি কেন বাঁধা হয়ে দাড়াবে? নীলাঞ্জনা বললেন, তাহলে কি এমন গোপন কথা যা তুমি একাকী বয়ে নিয়ে চলেছো, যা প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় তুমি গুমরে মরছো? বললাম শুনতে চাও? নীলাঞ্জনা বললেন সে তো আমি বলতে পারবো না তুমি আমাকে শুনাতে চাও কী না। তবে সেই গোপন কথা শুনিয়ে যদি তোমার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাও আমার শুনতে আপত্তি হবে কেন? বুঝতে পারছি পিসি তার নিজের ভুলের জাল থেকে বেরোতে পারেননি। তার ধারণা যন্ত্রণাটা আমার নিজের আর তার জন্য দায়ী পিসি। কিন্তু এ ভুল তার ভেঙে দিতে হবে, না হলে এ ভুল বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে যে সেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না। বললাম, পিসি এক গ্লাস জল খাওয়াবে? এই আনি।

পিসির আনা সেই জল এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে একটু থেমে বললাম, পিসি, নতুন করে কি জীবন আরম্ভ করা যায় না? মানে? কি হবে অতীতকে আঁকড়ে থেকে। নদীর জল কোথাও তো দাঁড়িয়ে থাকে না। তবে তুমি কেন দাঁড়িয়ে থাকবে? কেন নতুন করে স্বপ্ন দেখবেনা। বাঁচার স্বপ্ন। বেঁচে ওঠার স্বপ্ন। আমি কি মরে গেছি? না তুমি মরে যাওনি। কিন্তু স্বপ্নগুলো তোমার মরে গেছে। পিসি বললেন যা মরে গেছে কি করে আর তাকে বাঁচিয়ে তুলবো। উত্তরে বললাম যে স্বপ্নগুলো মরে গেছে আমিতো তাকে বাঁচাতে বলিনি। আমি বলেছি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে। জীবনকে নতুন ভাবে আরম্ভ করতে। নীলাঞ্জনা বললেন, আজ আর তা সম্ভব নয় প্রান্তিক। কেন নয়? যে মন মরে গেছে তাকে কি বাঁচিয়ে তোলা যায়? আমি বললাম, মনতো তোমার মরেনি পিসি। আচ্ছাদনে ঢাকা পড়েছে মাত্র কতক গুলো বস্তা পচা আদর্শে। সত্যি কিনা বল? না সত্যি নয়। সত্যি যদি নয়, তাহলে কিসের আশায় আজো তুমি সিঁথিতে সিঁদুর দাও? কেন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে তোমার হাতের শাখা আর এয়োতির চিহ্ন লোহা, কেন আজো একলা ঘরে ডুকরে কেঁদে ওঠো গভীর রাতে? এসব কি ভুল? তিনি যে ধরা পড়ে গেছেন একথা বুঝতে পেরে বলে ওঠেন জানিনা, কিছু জানিনা আমি বলে চলে যেতে উদ্দত হতে, আমি তার হাতটা ধরে বলি যেওনা পিসি একটু

অপেক্ষা কর। আমার সব কথা শুনে যাও। উনি বললেন আমি আর শুনতে চাইনা। আমি জোর দিয়ে বললাম কেন শুনবেনা। শুনতে তোমাকে হবেই পিসি? তারপর বললাম জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। তা সে যত বড়ই হোক বা অতি সাধারণ হোক। আমার বলায় এত তেজছিল যে তাকে অবজ্ঞা করতে না পেরে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েন নীলাঞ্জনা পিসি। আমি বলতে থাকি, পরিমলবাবুতো তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তোমার সঙ্গে তিনি নিখুঁত অভিনয় ক'রে-তোমাকে ঠকিয়েছেন। প্রয়োজনে তুমি আদালতে যেতে পার বলে জানিয়েছেন। তিনিতো ছাড়পত্র দিতে কোথাও কোন ফাঁক রাখেননি। তাহলে তুমি কেন এত ফাঁক রাখছ? পিসি বললেন, ও যদি ভুল করে, তবে আমিও কি সেই একই ভুল করব? না করবেনা। কিন্তু কতদিন? যতদিন তোমার সেই মানুষটাকে ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে ততদিন। পিসি বললেন তুমিকি বলতে চাও যে আর কোনদিন সে তার ভুল বুঝে ফিরে আসবে না? আমি দৃঢ় ভাবে বললাম না আসবে না। কি করে বুঝলে? আমি যে সব জানি পিসি। তুমি জান! কি জান তুমি? যা তুমি জাননা তাই আমি জানি। তারপর বললাম পরিমলবাবু চলে যাওয়ার পরে কোন খোঁজ নিয়েছো তার? না নিইনি। কেন? দরকার মনে করিনি তাই? এও তোমার ভুল পিসি। আসলে আজো তুমি পরিমলবাবুকে ভালবাস ধ্রুব তাবাব মত। তাইতো ভয়, যদি আবার তোমার দেখা স্বপ্নগুলো বালির বাঁধের মতো ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। তাইনা ।

নীলাঞ্জনা পিসি কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। আমি জানতে চাইলাম, তুমি কি জান পরিমলবাবু কোথায় গেছেন? না খোঁজ নিইনি। খোঁজ নাও। কি হবে খোঁজ নিয়ে? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। কাজ নেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার থেকে ও যেখানে থাকুক সুখে থাকুক। বললাম পিসি এ তোমার মহতী কথা। তোমার অন্তরের কথা নয়। তবে কি আমার অন্তরের কথা? থাক পিসি, দরকার নেই। তার থেকে কাল যাবে আমার সাথে। কোথায়? যে নারী বেঁধেছে তাকে আপন বাঁধনে, আর ভ্রান্ত পথিক খুঁজে পেয়েছে তার আপন পথ। যাবে সেখানে। তুমি চেন নাকি তাকে? না চিনতামনা। তবে যে দিন পরিমলবাবুর ছাড়পত্র এলো তোমার কাছে সেদিনই তাকে জেনেছি। তুমি হেরে গেছো তার কাছে, সব দিক দিয়ে হেরে গেছো পিসি। তুমি হারিয়েছো তার স্ত্রীর অধিকার, তার ভালবাসার অধিকার, এমনকি তার প্রেমিকার অধিকারও। কোন দিনই আর তিনি ফিরে আসবেন না তোমার কাছে। তাহলে কেন এই পথ চাওয়া? তাই বলছিলাম পিসি জীবন থেকে যে হারিয়ে গেছে, তাকে হারিয়ে যেতে দাও। খ্যাপার মতো পরশ পাথর খুঁজে ফিরো না।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে আমি থামলাম। পিসি চুপ করে বসে আছেন। আকাশ পাতাল ভাবছেন হয়তো। তাকে বিরক্ত না করে আমি উঠে গেলাম। গ্যাস জ্বালিয়ে কফি বানালাম, তারপর তার দিকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললাম, দুঃখ করোনা পিসি। সে দিনের দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘটনা মনে আছে তো? আশ মিটলে তো ফুরিয়ে গেল। আর দামিনীর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি। সাধ মিটিল না। আর এই খানেইতো রয়েছে বার বার

ফিরে আসর অঙ্গীকার। একটু থেমে বললাম যুঁথি কেন তার দাবি ছেড়ে দেবে তোমাকে? তার দাবিতো তোমারও আগে। বরং বলতে গেলে, তোমার সঙ্গে সম্পর্কের কোন আইন গত স্বীকৃতি নেই। বড় জোর একসঙ্গে কিছুদিন কাটাবার স্মৃতি ছাড়া তোমার দাবি করাব মততো কিছু নেই পিসি। যুঁথি তাব বিবাহিতা স্ত্রী। সব জেনে বুঝে তবেই তো পরিমলবাবু আনতে চাননি তোমার মাধ্যমে তাব কোন উত্তবাধিকার। তোমার যে সে ক্ষমতা নেই, এও এক নিখুঁত অভিনয় মাত্র। আব তুমি এমন এক বোকা মেয়ে যে ভালবাসাব নেশায় সব বিশ্বাস করে বসে আছো। তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে পিসি বললেন, তুমি চুপ কর তুমি কিঁ বলছ তুমি নিজেই জাননা। আমি কোন রকম প্রতিবাদ না কবে বললাম, তোমাব কথা যদি সত্যি হতো আমার থেকে খুশী কেউ হতো না পিসি। কিন্তু তা যে হওয়ার নয়। কাবণ, একদিন নিজের পরিচয় গোপন করে গিয়েছিলাম যুঁথিব কাছে, কিন্তু সে সব কথা বলাব সময় পেলামনা পিসি, সেদিনইতো তুমি পেয়ে গেছো তোমাব ছাড়পত্র।

এসব নতুন, একেবারে নতুন নীলাঞ্জনার কাছে। ভাবতেও পাবেননি কখনো, পবিমল এমন বেইমান হতে পারে। আমি তো তাকে নতুন কাউকে ঘরে আনতে বলেছিলাম, তবে এ মিথ্যার আশ্রয় নিল কেন সে? বুঝতে পাবছি পিসির গলা কাঁপছে। তবু তিনি বললেন, তুমি এসব সত্যি কথা বলছতো প্রান্তিক? না আমাকে পরীক্ষা করছ? এখনো সন্দেহ। আমি মরমে মরে গিয়ে বললাম, বহুবার বলব বলব করেও বলতে পারিনি পিসি। আজ বলতে পেরে নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। নীলাঞ্জনা পিসি এরপর উঠে গেলেন। আমি আর তাকে বাধা দিলাম না। ওর এখন একা থাক ভীষণ দরকার। একেবারে একা। নিজেকে নিয়ে ভাবার জন্য এই একাকীত্ব তার খুবই প্রয়োজন।

কয়েকদিন পরে কলেজ গেটে একটা জটলা দেখে এগিয়ে যাই। কে যেন বলল, কলেজের একটা মেয়ে বাসে চাপা পড়েছে। তাকেই নিয়ে আসা হয়েছে কলেজ গেটে। ভাবলাম, মেয়েটাকে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কলেজ গেটে কেন? গিয়ে দেখি রক্তে মাথামাখি। কে মেয়েটি? আসার পথেই শুনতে পেলাম, অশ্রুকণা। ওকে নিয়ে এত জটলা, কিন্তু কারও একে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ছেনা। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে ওকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আরো দুটি ছেলে এবং রেহানা। ওব শরীর এখনো ঠিক হয়নি, বললাম, তুমিতো না গেলেও পারতে। কি দরকাব। এ টেনশন তুমি সহ্য করতে পারবেনা। রেহানা আমার কথা শুনলো, কিন্তু যাওয়া বন্ধ করল না।

হাসপাতালের এমারজেন্সীতে সেই সময় কোন ডাক্তার নেই। কয়েকজন স্টুডেন্ট তখন আউটডোরের দায়িত্বে আছেন। অশ্রুকণাকে নিয়ে গেলে, তারা এক বার দেখেই মেঝেতে ফেলে রাখলেন। বললাম, ওকে ওই ভাবে ফেলে রাখলে চলবে কেন? ওরতো চিকিৎসা দরকার। ছেলেরা বললেন স্যার আসুক। তারপর চিকিৎসা হবে। বললাম অপূর্ব। রোগী মারা গেলে কি আপনাদের স্যার আসবেন। এখনি ডাকুন তাকে। আগে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। ওরা নির্বিকার ভাবে বললেন স্যারের একটু দেরি হবে। মাথা ঠিক রাখতে

পারলামনা, বললাম, কেন দেরি হবে? সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে? অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা পেয়েছেন কি? এই জন্যই হাসপাতালে রোগীর বাড়ীর লোকেরা হঠাৎ হঠাৎ ডাক্তারদের আক্রমণ করে বসেন। ছেলেরা বললেন, আপনাদের তাড়া থাকলে আপনারা অন্য কোথাও নিয়ে যান। কেন অন্য কোথাও নিয়ে যাব কেন? আপনাদের স্যার সরকারের কাছ থেকে মাইনে নেন না? কৈফিয়তের উত্তর আমরা দিতে পারব না। দিতে পারবেন না মানে, দিতে হবে। মনে রাখবেন আপনারা যারা ছাত্র, আপনাদের পিছনে সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন সে অর্থ আমরা দিই। আমাদের টাকায় আপনাদের ডাক্তার হওয়া। আর আমাদের অবহেলা? পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যেই আপনাদের স্যারকে যেখান থেকে পারেন ধরে নিয়ে আসুন। ওরা নির্বিকার ভাবে বললেন ওর সময় হলেই আসবেন। সেই একই রেকর্ড বাজানো। আমি আর পারলামনা। যে ছেলেটি তর্ক করছিলেন তার হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম পেয়েছেন কি? হাত ছাড়ুন। ছাড়বো তার আগে চলুন আমার সঙ্গে দেখিয়ে দিন কোথায় আপনার স্যার, আমিই তাকে ডাকবো। আমার ওই চেঁচামেচিতে অনেকে জড়ো হয়ে গেছেন সেখানে। রেহানা বোধ হয ভয় পেয়েছে সে আমার একটা হাত ধরে বলল, ওকে ছেড়ে দাও প্রান্তিক। কি ছেলেমানুষী করছ। না আমি ছাড়বনা, আগে ওকে ওর স্যারকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে তবে ছাড়া পাবেন। পেয়েছেন কি এরা? রোগী মরবে বিনা চিকিৎসায়, আর এরা গুলতানি করবে, এরাই কি আমাদের ভবিষ্যৎ? ছেলেটি জোর করে আমার হাত থেকে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, আপনি কোথাকার নবাব মশাই, জানেন আপনার এই অভব্য আচরণের জন্য আপনাকে পুলিশে দিতে পারি। বললাম তাই নাকি। বেশ ডাকুন আপনার পুলিশকে। আমিও আপনাকে বলছি, প্রয়োজনে আপনার ডাক্তারী পড়া আমি চিরতরে ঘুচিয়ে দিতে পারি, একথাটাও সেই সঙ্গে মনে রাখবেন। আমার মাথায় যেন তখন আগুন জ্বলছে।

এতক্ষণে ঐ দিনের কর্তব্যরত ডাক্তার ডাঃ বল এলেন। এসেই বললেন, কি হয়েছে এত জটলা কেন? আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আপনিই তাহলে ডাক্তার? আউটডোর ছেড়ে কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে ছোকরা? বললেন ডাঃ বল। হ্যাঁ, আমাকেই দিতে হবে, কারণ রোগী নিয়ে এসেছি আমি। ডাঃ বল ছেলেদের কাছ থেকে কি শুনলেন তা উনিই জানেন। বললেন ঐ রোগী পরে দেখা হবে। আর ইমার্জেন্সীতে কর্তব্যরত গ্রুপ ডি স্টাফদের বললেন, এদের এখান থেকে চলে যেতে বল। কেউ যেন এখানে কোন ঝামেলা না করে। আর যে রক্ষীবাহিনী থাকে তাদের নির্দেশ দিলেন, বাড়াবাড়ি করলে লাঠি চালাতে পিছপা হবেন না। অপমানের জ্বালায় জ্বলতে লাগলাম আমি। রেহানাকে বললাম, সুমিত ও স্নেহাংশু আছে, তোমরা এখানে থাক, আমি আসছি। সুমিত বলল, কেন যে মাথা গরম করলি প্রান্তিক। এখনতো এদের দয়ার অপেক্ষা করতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে। তোরা এখানে থাক। রেহানাকে বললাম তোমার কাছে টাকা আছে? ও আমাকে ব্যাগ থেকে বের করে ১০ টাকা দিল। আমি বললাম, আমি আসছি। বেশী দেরি হবে না।

বাইরে গিয়ে মিনতি সেনকে ফোন করে সব জানালাম। বললেন সেকি! ওরা কি মানুষ? ঠিক আছে তুমি কলেজের বাইরের গেটে দাঁড়াও। আমি পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে এখনি আসছি। কত সময় লাগবে? না সময় লাগবেনা। ওঁর সঙ্গে আমার একটা এপয়েন্টমেন্ট আছে। মিনিট পাঁচেকেব মধ্যেই উনি আসবেন। এলেই আমি নিয়ে আসছি। তুমি অপেক্ষা কর। এরপর অশ্রুকণাদের বাড়ীতে একটা ফোন করলাম।

সত্যি ১০ মিনিটের মধ্যে মিনতি পিসি এলেন। সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার, নিশ্চয়ই পুলিশ কমিশনার। মিনতি সেন পরিচয় করিয়ে দিলেন কাকাবাবু এই্ সেই প্রান্তিক। আমি প্রণাম করলাম কমিশনার সাহেবকে। তিনি সংক্ষেপে আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন ব্যপারটি। পুলিশ কমিশনাব সোজা সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে গিয়ে আজকেব ঘটনা তাকে অবহিত করে সুবিচাব দাবি করলেন। উনি নিজে উঠে এসে ডাঃ বলকে বললেন, আপনি ডিউটি আওয়ারে কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে পুলিশ কমিশনার পাশে আমি, ডাঃ বল একটু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আমতা আমতা করে যা বললেন, তাতে সুপারিনটেনডেন্ট মোটের উপর সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, ঐ রোগীকে বাদ দিয়ে আপনি অন্য রোগী দেখছেন কেন? মানুষের জীবন নিয়ে এই ছেলেখেলা করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন? মনে রাখবেন আপনি ডাক্তার, মানুষের সেবাই আপনার ধর্ম। যদি তা পালন করতে না পারেন কি দরকার এই লাইনে আসা। আব ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা ছাত্র। জান কি তোমাদের এক একজনকে ডাক্তার বানাতে সরকারের কত ব্যয় হয়? এবং সরকাবকে সেই টাকা দেন সাধারণ মানুষ। তোমরা প্রত্যেকে সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ শুনলে, তোমাদের কলেজ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব। তাবপর ডাঃ বলকে বললেন, রোগীর যা যা করণীয় তাই করুণ। আলাদা কেবিন এ্যারেজমেন্ট করে নিয়মিত আমাকে সংবাদ দিয়ে যাবেন। দেখবেন রোগীর যেন কোন অযত্ন না হয়। তারপর পুলিশ কমিশনারকে বললেন, আমি দুঃখিত। আপনাকে কষ্ট করে ছুটে না আসলেও চলত। একটা ফোনই যথেষ্ট। পুলিশ কমিশনার সে কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন ধন্যবাদ। চলি, আশা রাখব আর কোন অসুবিধা হবে না।

রেহানা এসে দাঁড়ালো মিনতি সেনের পাশে। বলল, আপনি ভাল আছেন তো? হ্যাঁরে মেয়ে হ্যাঁ। কবে আসছিস? আপনি কবে আসবেন? আমাকে ডেকে মিনতি সেন বললেন, তুমি কাল একবার আসতে পারবে? যাবো। তারপর পুলিশ কমিশনারকে বললেন, এই মেয়েটিই রেহানা। আপনাকে এর কথাও বেশ কয়েকবার বলেছি। কোন ব্যাপারে যেন? আপনি সব ভুলে যান। কমিশনার সাহেব প্রান খুলে হেসে বললেন তোর এই বকুনিটুকু আমার এত ভাল লাগে যে, বার বার তোর বকুনি খেতে ইচ্ছে করে। তারপর নিজেই বললেন, ঐ ডালিমের কেসটা নিয়েতো। তারপর রেহানার চিবুকটা একটুখানি নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি ভেবো না মামনি। মিনতি যখন তোমাদের সহায় ভগবানেরও সাধ্য নেই তোমাদের হারায়। তারপর মিনতি সেনকে তাড়া লাগিয়ে বললেন চল চল দেরি হয়ে যাবে। আর একটা কথা, বলে আমাকে ডেকে নিলেন কাছে, বললেন হয়তো কোন অযত্ন হবে না, তবু

তুমি আমাকে নিয়মিত সংবাদ জানাবে। আমার ফোন নাম্বার জানতো। বললাম জানি। ওরা বেরিয়ে গেলেন।

না অশ্রুকণার চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয় নি। আলাদা কেবিন। বিশেষ খাতির করে দুবেলা দেখা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যা যা করণীয় সবই করছেন ঘড়ির কাটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে। আমি রোজ আসতে পারিনি, কিন্তু রেহানা এসেছে রোজ। ওর কাছ থেকে সংবাদ নিয়েছি। যেদিন ওকে ছেড়ে দেবে রেহানা বললো আজো তুমি যাবে না? না রেহানা তুমি যাও। এ তোমার ঠিক হচ্ছে না প্রান্তিক। আর এসবের মানে আমি যদি ভুল করি তা হলে তুমি এই রকমই করবে তাইতো। তুমি জাননা রেহানা অশ্রুকণা যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। জানি আমি। না জাননা? রেজিস্ট্রি করে আমায় বিয়ে করেছো এইতো। হাসতে হাসতে বলল রেহানা। আমি রেগে গিয়ে বললাম এটাকে তুমি সামান্য অপরাধ বলে মনে কর? না করিনা। এটাকে আমি অসামান্য অপরাধ বলেই মনে করি, যদি বলে থেমে গেল রেহানা। থামলে কেন? বল না যদি কি? ও বলল থাক না, যা মিথ্যা, তাতো সত্যি হবে না কোন দিন, কি দরকার ও নিয়ে মাথা ঘামাবার। তাছাড়া অশ্রুকণা এজন্য খুব অনুতপ্ত। এই এ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে ওরও একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাছাড়া সত্যি কথা কি জান? কি? আমি তাকালাম ওর দিকে। ও বলল, ও তোমাকে ভালবাসে প্রান্তিক ভীষণ ভালবাসে। আসলে ঘটনা চক্রে যাই ঘটুকনা কেন, এবং যে ভাবেই তার প্রচার হোক না কেন, আমি যে তোমার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, এবং অনেক রাতে ফিরেছিলাম, এটাকে ও কোন ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই রাগের মাথায় ও সব কথা ও বলে ফেলেছে। আমি বললাম কাকে বলেছে জান? জানি। কাকে? তোমার পিসিকে তো। তুমি কি করে জানলে? বা, হাসতে হাসতে রেহানা বলল, রেজিস্ট্রি করে বিয়ের কথা যখন বললাম তখনতো জিজ্ঞাসা করলেনা কার কাছে শুনেছি। আর অনেক রাতে ফেরার কথা শুনে জানতে চাইছ কার কাছে শুনেছি?

আমি বললাম ঐ ভাবে ব্যাখা করছ কেন রেহানা। আসলে পিসির কাছে যে দিন শুনলাম অশ্রুকণা এইসব কথা বলেছে, রাগে আমি জ্বলতে লাগলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম ওর সঙ্গে জীবনেও আর কথা বলবনা। হাসতে হাসতে রেহানা বলল, অথচ দেখ, ওকে নিয়ে সবাই যখন জটলা করছে, তখন কেবল তুমিই বুঝতে পারলে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর সেই হাসপাতাল কাণ্ড, এতো আমাদের জীবনের অক্ষয় সম্পদ। নাতি নাতনিদের সঙ্গে গল্প করার বিষয় কি বল? আমি ভীষণ চেষ্টায় হাসি দমন করতে গিয়েও পারলাম না। বললো হাসলে যে বাঃ হাসবনা, তোমার স্বপ্ন কত দিগন্ত বিস্তৃত। আগেতো ছেলে মেয়ে তার পরতো নাতি নাতনি। কিন্তু তার আগে দরকার বিয়ে। সে সামাজিক হোক বা রেজিস্ট্রি তাই না? যা অসভ্য কোথাকার। বলে দ্রুত পালিয়ে গেল।

অশ্রুকণার বাবা, বাইরে আছেন, ওর মা বলেছেন, বাবা প্রান্তিক, ভর্ত্তিতো তুমিই করে ছিলে, ওকে রিলিজ করেও তুমিই বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিও। এই দায়িত্ব তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা মাসিমা ঠিক আছে।

ভেবেছিলাম রেহানাকে পাঠাবো। আমি যাব না। কিন্তু রেহানার এতগুলো কথার

পর যদি না যাই, রেহানা বলবে অশ্রুকণার প্রতি তোমার ভালবাসা এত গভীর যে, অভিমানের উর্দ্ধে উঠতে পারলে না। কিন্তু একি। ওযে আসছেই না। কে জানে কখন আসবে?

হঠাৎ দেখি সেলিনা আসছে। আবদার করে বলল চলুন না প্রান্তিক ভাই এটুকুতো মাত্র পথ হেটেই যাইনা। মন্দ হয় না বললাম আমি। আরো বললাম তোমার শরীর কিন্তু এখনো ঠিক হয়নি সেলিনা, কষ্ট হবে। তুমি নিশ্চয়ই জান অশ্রুকণাকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা হয়তো অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্য। হঠাৎ সেলিনা বলল, আচ্ছা প্রান্তিক ভাই, অশ্রুকণাদি যদি জিজ্ঞাসা কবেন, এ কে? আপনি কি পারিচয় দেবেন? তোমার যা পরিচয়? কি আমার পরিচয়? মৃদু হেসে বললাম সে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে উত্তরটা তাকে দেব। অশ্রুকণাকি চেনেনা তোমাকে? না জানেনা তুমি কে? হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনাব খুব কষ্ট হয় তাইনা? ভাবতে পারছিনা ওকি বলতে চায়। কেন যে ও এল আমার সাথে, আর এলই যদি তবে ওর যা সাধারণ পোষাক তাই পরে এলোনা কেন? কি দরকার ছিল মিনতি সেনের দেওয়া এই রাজকীয় পোষাক পরার। এটাকি ছেলে মানুষী না শুধুই খেয়াল, অথবা অন্য কিছু। হল না বাসে বা ট্রামে ওঠা। বাধ্য হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসতে হল এ পথটুকু ওর সাথে। যে কারণেই হোক ওর ইচ্ছে যে পূর্ণ হয়েছে এতে যে ও আনন্দিত তা ওর শারীরিক ভাষায় বোঝা গেলেও মুখে কিছু বললনা। তারপর হাসপাতালের যাবতীয় দেনা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আমি যখন অশ্রুকণার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি ও আমার দিকে তাকিয়ে ঝবঝর করে কেঁদে ফেলল। এতটা বোধ হয় সেলিনাও ভাবেনি। ও তাই অশ্রুকণার কাছে গিয়ে বলল, একি অশ্রুদি, এখনকি ভেঙে পড়ার সময়? মনকে দৃঢ় করুন। আঘাতকে গ্রহণ করুন সহজ ভাবে। আমি অবাক হয়ে তাকাই সেলিনার দিকে। এত দিনে বুঝেছি যে সেলিনাব ভিতর আছে এক কৌতুক প্রিয় আর সংবেদনশীল মন। তাই তো ওর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিঃ অশ্রুদি এটাকি কান্নার সময়? জীবনে কত পথ পাড়ি দিতে হবে দুর্গম না সহজ আমরা কি জানি? তাই আর কান্না নয়। দাঁড়ান সোজা হয়ে। এবং তারপর, নিজের দামী শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল ওর চোখের জল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় জানতে চাইল ওর পরিচয়। বললাম একেতো তোমার না চেনার কথা নয়, এ সেলিনা রেহানার বোন। সেলিনা। নামটাকে ও মনে করতে পারছে কীনা বোঝা গেলনা। সেলিনা হেসে বলল চিনতে পারছেন নাতো একটু মনে করার চেষ্টা করুন ঠিক চিনতে পারবেন। অশ্রুকণা তবুও মনে হয় চিনতে পারলনা। তারপর বললাম ওকে যে চিনতেই হবে তার কি কোন মানে আছে? সবাই কে কি আমরা চিনি? অশ্রুকণা মনে মনে ভাবে, প্রান্তিক যাই ভাবুক। যে ভাবেই আমার না চেনাটাকে ব্যাখ্যা করুক একথাটা মানতে হবে যে, সেলিনা নামের এই মেয়েটিকে যদি আমি না চিনতাম, তাহলে কিছুতেই ও নিয়ে আসতোনা। তাছাড়া ও যে রেহানার বোন সে পরিচয়ও তো দিয়েছে প্রান্তিক। এরপরে তার অবশ্যই চেনা উচিৎ ছিল। কিন্তু কেন যে কিছুতেই মনে করতে পারছেনা। নিজের স্মৃতি শক্তির উপর খুব রাগ হয় অশ্রুকণার। সেলিনা বলল, বেশ গরম আইসক্রিম খাবেন? আমি হেসে বললাম গরম কোথায়? এখনতো ঠান্ডা পড়ে গেছে বলা যায়। তুমি খেতে

পার আমি খাব না। আর আপনি অশ্রুদি। অনেক আশা করে তাকালো ওর দিকে। অশ্রুকণা বলল, প্রান্তিক তিনটে আইসক্রিম নিয়ে এসো না। তিনটে কেন? বা আমরা তো তিনজন না? আমিতো খাব না বলছি। সেলিনা বলল এ আপনার ভীষণ বাড়াবাড়ি প্রান্তিক ভাই। আপনি খাবেন না। বেশ তো। কিন্তু খাবেন না একথাটার পরে এত জোর দিচ্ছেন যে, আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা বন্ধ করে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস। মেয়েটির চতুরতাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। বললাম, ঠিক আছে তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি যাব আর আসব। আমি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি হঠাৎ দেখি অশ্রুকণা সেলিনাকে তার নিজের বুকের পরে টেনে নিয়ে বলছে। আমাকে ক্ষমা করো সেলিনা তোমাকে চিনতে না পাবার জন্য। এবার কি তবে চিনতে পেবেছেন? হাসি মুখে বলল সেলিনা। অশ্রুকণা বলল, তোমাকে চেনা যে অতি কঠিন কাজ একথা বহুবার শুনেছি প্রান্তিকের কাছে, মন তোমার চির সবুজ, হৃদয় যেন এক স্রোতাস্বিনী নদী। হেলায় জয় করতে চাও দুনিয়াকে, নিজেকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দেওয়াতেই তোমার আনন্দ। আরো যেন কি সব বলতে যাচ্ছিল অশ্রুকণা —। তাকে বাঁধা দিয়ে সেলিনা বলল, দাঁড়ান অশ্রুদি, এভাবে প্রশংসা বা নিন্দা যাইই করুন না কেন, তা দিয়ে আমাকে চিনবেন কি করে? তারপর বলল প্রান্তিক ভাই কি জানি কি বলেছেন তার ব্যাখা উনি দিতে পারবেনা। কিন্তু আমি যে, এতদিন পথ চললাম ওর সাথে, আজো চিনতে পারিনি ওকে একটুও, তা সে সত্য বা মিথ্যে যাই হোকনা কেন। তারপর হেসে বলল, এই দেখুন না, এই গোলাপটি আজইতো তার নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন আমার বেনীতে, হয়তো আপন খেয়ালে, অথবা অনুরোধ এড়াতে পারেননি তাই, কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিধর্মী হয়েও ওর পায়ে যে মাথা নোয়ালাম অথচ একবারও বললেন না, সেলিনা তোমাকে আমি ভালবাসি, তাই তো এই সুন্দর গোলাপটিকে তার যোগ্য স্থানে রাখতে পেরে নিজেকে ধন্যমনে করছি। কি নিষ্ঠুবতা। কি অপমান! এবার আপনিই বলুননা অশ্রুদি, একি অপমান নয়? সুন্দরকে যদি যোগ্য মর্য্যাদাই না দিতে পারবেন তবে আর তার আরাধনা কেন?

অবাক হয়ে শোনে অশ্রুকণা আর নিবিষ্ট মনে ভাবে সেলিনার কথা, কি অকপটতা। যেন কোন গ্লানি নেই। যেন কোন মন্দ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ওর কথায় একটু খানি হেসে অশ্রু আমাকে বলল, যাও প্রান্তিক তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। তারপর সেলিনাকে বললো, এসো ভাই একবার আমার কাছে, আমি রেহানা নই, আমি তোমার মত অসামান্যও কেউ নই। অশ্রুকণার চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো। এই দুই নারীর নিজস্ব আদান প্রদানে আমি আর কেন স্বাক্ষী হয়ে থাকি। বেরোতে হবে। ট্যাক্সির মিটার উঠছে। যদিও মাসীমা, মানে অশ্রুকণার মা, টাকা দিয়ে দিয়েছেন। আমি ওদের আবেগ ধারায় কোন ছন্দ পতন না ঘটিয়ে আইসক্রিমের জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

সেলিনা বলল, দিদি আমি পৃথিবীকে সোজাসুজি দেখতে ভালবাসি। কারো করুণার প্রত্যাশা আমি কোন দিনই করিনা। তবু আমার জীবনে আলোড়ন তুলে এলেন এই প্রান্তিক ভাই। তারপর অশ্রুকণার দিকে তাকিয়ে বলল, না না ভুল বুঝবেন না, আমি আপনাদের

মত করে কোন দিনই চাইনি ওকে। এরপর বলল আপনিতো স্পষ্ট করে বলছেন আপনার কথা, আর রেহানা? নিজের কথা কোন দিনই সে বলতে পারবেনা কাউকে। আপনি ওকে ঠিক বুঝেছেন, অন্যের জন্য ও সরে দাঁড়াবে, তবু নিজের দাবি পেশ করবেনা কোন দিন। কান্নাতেই বোধ হয় ওর আনন্দ। আর দেখুননা প্রান্তিক ভাইয়ের ব্যাপাব, ও কি বোঝেনা রেহানা ওর কাছে কি চায়? কে পারে নিজেকে এমন নিঃস্ব করে তুলে ধরতে। তবু কি কঠিন হৃদয়? একবারও বলতে পারলেন না। না হয় মিথ্যে করেই বলতেন, রেহানা আমি তোমায় ভালবাসি। একটু থেমে বলল, রেহানার বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বালতে আমিও কম চেষ্টা করিনি, যাতে অন্তত ও যা চায় তার উপর অধিকার দাবি করতে পারে। কিন্তু সবই নিষ্ফল অশ্রুদি, আজ তাই আর একবার চেষ্টা করছি, দেখি যদি ওর মনের দরজা খোলে তাতে। তারপর কি ভাবতেই সেলিনা বলল, আমার পরে রাগ করলেন অশ্রুদি? কেন বলত। আমার স্বার্থপরতায়। তোমার স্বার্থপরতায? হ্যাঁ, আমার স্বার্থপরতায়, কারণ আমি জানি রেহানার থেকে আপনিও কম ভালবাসেন না প্রান্তিক ভাইকে। অথচ সেই আমি রেহানার হয়ে ওকালতি করে যাচ্ছি, একি আমার স্বার্থপরতা নয়? অশ্রুকণা আবারও ওকে তার বুকের পরে টেনে নিয়ে বলল, তোমার মতন স্বার্থপর একটা বোন যদি আমার থাকতো। সেলিনা বলল আমাকে কি আপনি তাই ভাবতে পারেন না, না পারিনা। কেন? কোন বোনকি তার দিদিকে আপনি বলে? সেলিনা বলল, আমার অন্যায় হয়েছে, এই কান ধরছি, আব হবে না। তারপর দুজনেই খিল খিল করে হেসে উঠলো। দু জনের চোখেই জল দেখতে পেলাম।

আমরা যখন অশ্রুদের বাড়ী পৌঁছালাম তখন প্রায় ৯টা বেজে গেছে। সেলিনাকে নিয়ে আবার এতটা পথ পাড়ি দিতে হবে। স্নেহময়ী দেবী সেলিনাকে বললেন, তুমি মা আসবে একটু আমার ঘরে? সেলিনা ওই ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলে, অশ্রুকণা বলল, আমায় কি তুমি ক্ষমা করতে পারবেনা প্রান্তিক? কেন বলত। বা আমি যা করেছি তাতো তোমার অজানা নয়, এবার তুমিই বল সেটা অন্যায় নয়? কিসের অন্যায়? আর তাছাড়া তুমিতো অন্যায় জেনে কিছু করনি? কিন্তু আমি যে মিথ্যে কথা বলেছি। জেনে তো মিথ্যে কথা বলনি আর না জেনে যদি কিছু করে থাক, তাতে অন্যায়টা কোথায়? প্রান্তিক তুমি মানুষ না দেবতা? এভাবে কথা বলছ কেন? দেখ আমি এক অতি তুচ্ছ মানুষ মাত্র। আমার রাগ আছে, অভিমান আছে আছে হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ ঈর্ষা। আছে চাওয়া পাওয়া রক্ত মাংসের কামনা বাসনা সবই, শুধু পার্থক্য কি জান? কি? বলে তাকালো আমার দিকে আমি বললাম, আমার কথা আমি প্রকাশ করতে পারি না। কেন পারনা? কেন তুমি তোমার দাবিকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারনা? কেন পারনা বলতে তোমার একান্ত প্রিয়জনকে যে আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে আমি চাই। তোমার জন্যই আমার বেঁচে থাকা, তোমার জন্যই আমার স্বপ্ন দেখা। বললাম, দেখ কণা, যত সহজে তুমি একথা বলতে পারছ, আমি তা পারিনা। কেন পার না? কেন এত ভীরু তুমি? সে তুমি বুঝবেনা কণা। তারপর বললাম আচ্ছা আজ যদি আমি তোমায় বলি, কণা চল আমরা হারিয়ে যাই, পারবে হারিয়ে যেতে? ও

আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, না আজ আর তা পারবো না। এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, কিন্তু একদিন এই আমিই তোমার সাথে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম যেখানে খুশী। সেদিন যদি তুমি বলতে, চল নরকে যাই, আমার হাসিমুখে তোমার সাথে নরকে যেতেও কোন আপত্তি হতো না। ওর কথা মনোযোগ সহকারে শুনে বললাম, তবে আজ অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা যে কোথায় সেকি তুমি জাননা? না আমাকে তুমি পরীক্ষা করতে চাইছো? পরীক্ষা? আমি কি তত বড় মানুষ যে তোমাকে পরীক্ষা করার অধিকার আমার আছে? যাক ও সব কথা। একটা কথা জিজ্ঞাস করব? সত্যি কথা বলবে? মৃদু হেসে বললাম, নিশ্চয়ই বলব, বল কি জানতে চাও। কে তোমার মন জুড়ে। বসে আছে রেহানা না সেলিনা? আমি রেগে গিয়ে বললাম, কণা? ও বলল, রাগ করছ কেন প্রান্তিক। আমি জানি, আমিতো মেয়ে, একজন মেয়ে হিসাবে পুরুষের চোখের ভাষা যেটুকু বুঝি, তাতে রেহানা আছে তোমার সমস্ত অন্তর জুড়ে, আর, আর কি? আর সেলিনা আছে তোমার স্বপ্ন হয়ে - এক পলকে যে আমার মত মেয়েকে জয় করে নিতে পারে, তোমার পৌরুষ তাকে অস্বীকার করবে কি করে প্রান্তিক? জানি, তোমার জীবন আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন পথ খুঁজে পাও, তুমি যেন জয়ী হও।

কি যে হল আমার কে জানে? সেলিনাকে তো কখনো এ ভাবে ভাবিনি আমি। অনেক দুর্বল মুহূর্ত যে আসেনি জীবনে তা নয়। তবু এমন করে কেউতো আমাকে এই পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় নি, যেমন করে দিয়েছে অশ্রুকণা। তবু মনেব দ্বিধাকে অস্বীকার করার জন্য বললাম, জানিনা কণা, কে আমাকে বেশী টানে, তুমি না রেহানা? সেলিনা না নীলাঞ্জনা, জানিনা আমি কিছু জানিনা। আমি এক দিকভ্রান্ত পথিক। কোথায় যে যাব তাইতো জানিনা, আমি যে কেমন করে কখন আমার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি তাইতো জানি না। আর এও জানিনা কে আমাকে পৌঁছে দেবে সেই হারানো ঠিকানায়। অবাক আর বিস্ময় ভরা দুটি চোখ তুলে তাকালো অশ্রুকণা আমার দৃষ্টি কে অনুসরণ করে। পারলাম না ওর মত অপলক তাকিয়ে থাকতে। তখনো আমার হাতখানা নিশিন্ত আশ্রয় নিয়ে আছে তার হাতের মধ্যে। ঠিক সেই সময় খাবার, আর কফির পেয়ালা নিয়ে পাশে এসে দাড়ালো সেলিনা আর তার পিছনে ওর মা। হাতখানা ছিনিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে। সেলিনার দিকে তাকিয়ে বললাম রাত হয়েছে অনেক, এবার যেতে হবে সেলিনা। হাসি হাসি মুখে সেলিনা বলল, কফিটা না খেয়েই যাবেন প্রান্তিক ভাই। চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে, সোজাসুজি রাখলাম আমার দুটি চোখ ওর চোখের পরে। কি অপূর্ব আর সুন্দর লাগছে সেলিনাকে।

সেলিনা নারী। পুরুষের চোখের ভাষা তার অজানা নয়। এতো মেয়েদের সহজাত ধর্ম। চোখ দুটি সেলিনা নামিয়ে নিল। নিজেকে সহজ আর স্বাভাবিক করতে রাখল কফির পেয়ালা আর খাবারের প্লেট সামনের টেবিলে। তারপর দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার আগে বলল, আপনি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন প্রান্তিক ভাই, আমার দেরী হবে না। কারো কোন কিছু বলার

সময় না দিয়ে নিজেকে অদৃশ্য করে নিয়ে গেল পর্দার আড়ালে।

স্নেহময়ী দেবী বললেন, হ্যাঁ বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। অনেক রাত হয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আবার কবে আসবে? বললাম আসব মাসিমা, চিন্তা করবেন না। খাওয়া শেষে উঠে পড়লাম। স্নেহময়ী দেবী বললেন, তুমি আমাব অশ্রুকে নতুন জন্ম দিয়েছো বাবা। তোমার কথা ভুলতে পারবো না কোনদিন। ওব বাবা নেই এখানে, তুমি না থাকলে কি যে হতো। বললাম, এ আপনার ভুল ধারণা মাসিমা। কারো জন্য কোন কাজ পড়ে থাকে না এ বিশ্বাস আমাব আছে। তারপর স্বাভাবিকের থেকে একটু জোরে সেলিনাকে ডেকে বললাম, সেলিনা তাড়াতাড়ি এসো।

অশ্রুকণা আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে সেলিনাকে বলল, রেহানাকে বলো আমি ভালো আছি। কিন্তু আবার কবে আসবে তুমি? নিজের স্বাভাবিকতায়·ফিরে যেতে যেতে সেলিনা বলল, যত তাড়াতাড়ি তুমি আমাদের বাড়ীতে যাবে। তারপর আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, চলুন না, প্রান্তিক ভাই। এর পরতো দেখছি বাস ট্রাম কিছুই পাওয়া যাবে না।

রেহানাদের বাড়ীর রাস্তায় ঢুকতে ঢুকতে দেখি, জানালা খুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেহানা। সেলিনা বেল দিতেই রেহানা দরজা খুলে দিলো। আমি বললাম অনেক বাত হয়ে গেছে আর ভিতরে যাব না। ও বলল আচ্ছা। সেলিনাও ভিতরে যাওযার জন্য কোন অনুরোধ জানায় না। ফিরেই এলাম, পিছনে তাকিয়ে দেখি জানালায় তখনো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেহানা। ওর মনে কি কোন ঝড উঠেছে। কে জানে। ওঠাটা যে অস্বাভাবিক নয়, এতদিনে তা বুঝতে পারছি।

সেদিন তপতীকে কথা দিয়েছিলাম, আসব একদিন। নিশ্চয়ই শুনবো তোমার কথা। ও বলেছিল সেদিন একা আসবে তো। বলেছিলাম তাই হবে। সত্যি সত্যি একদিন তাই রেহানাদের কেসের সংবাদ নিতে এসে ভট্টাচার্য্য সাহেবের বাড়ী থেকে ওকে ফোন করে জানালাম, ফ্রি আছো তো? আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি আমি। উত্তরে বলেছিল, গেটের বাইবে ঝাউবনের পাশে অপেক্ষা করব।

এসে দেখি সত্যি সত্যি অপেক্ষা করছে ও। এতদিন হাসপাতালে ওকে সেবিকার পোষাকেই দেখেছি। মনের মধ্যে সেই ছবিটি গেঁথে আছে। তাই নীল শাড়ী আর লাল ব্লাউজে একটু বুঝি চিনতে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু তা কোন অস্বস্তিতে ফেলতে পারে নি, কারণ, ওই-ই দুর থেকে বলল, ১০ মিনিট লেট প্রান্তিক। বললাম হবে বা। ও বলল চল আমরা হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়া যাই। মনে মনে ভাবলাম হয়তো যা ও বলতে চায় তা হাঁটতে হাঁটতেই বলাটা সহজ হবে। আমার তাতে আপত্তি নেই। এক অজ গ্রাম থেকে শহরে এসে এ কয় বছরেতো কম অভিজ্ঞতা হয়নি। কার মনে যে কোথায় কোন ছবি লুকিয়ে আছে কে জানে। স্যোৎসাহে বললাম, খুব সুন্দর প্রস্তাব, সহজ মনে তোমার কথা শোনা যাবে।

ভিতরে ঢুকে দেখি কোন জায়গাই প্রায় ফাঁকা নেই। খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গা ফাঁকা পাওয়া গেল। আমরা বসলাম। তপতী জিজ্ঞাসা করল তুমি কি এর আগে কখনো এসেছো এখানে? না। তাহলে এত কথা জানলে কি করে? আমি তাকে থামিয়ে

দিয়ে বললাম তার আগে তুমি বলত এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে এলে কেন? তাহলে কোথায় যেতাম। তারপর বলল তুমিতো জান, আমি হোস্টেলে থাকি, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাই কি করে? আমি বললাম যাকগে সে কথা, তুমি আমাকে কি জন্যে আসতে বলেছিলে? তুমি কি রাগ করেছ তোমাকে আসতে বলার জন্য, না সেলিনার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছো? আমি বললাম, তপতী তোমার একটা কথা জানা ভীষণ দরকার যে তুমি সেলিনাকে জড়িয়ে যে সব ইঙ্গিত করছো এসব ভুল। ভুল? সেলিনাকে তুমি ভালবাস না? সেলিনা তোমাকে ভালবাসেনা? হ্যাঁ বাসে। তা হলে? তাহলে কি? এরপরও বলছ আমার ভুল? হ্যাঁ ভুল তপতী, ভীষণ ভুল। আমি ভাবছিলাম, তোমার এ ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। ও বলল, আমি একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের মনের ভাষা বুঝিনা এইকি তুমি বলতে চাও? আমি কিছুই বলতে চাইনে, শুধু বলতে চাই এ তোমার ভুল। তপতী বলল, আমি তোমাকে বুঝতে পাবছিনা প্রান্তিক তুমি কি বলতে চাইছো? আর এই যদি তোমার মনের কথা হয় তাহলে বলব, সেলিনা বড় দুঃখিনী। আমি একটু হাসলাম বললাম, সেলিনাকে তুমি আজো চিনতে পারনি। তপতী প্রতিবাদ করে বলল, আমি বলব প্রান্তিক তুমি সেলিনাকে বুঝতে পারনি। হাসপাতালে ওকে আমি কাছ থেকে দেখেছি, ওর মনকে বুঝেছি। তুমি একদিন না এলে ওব অভিমান যে কত তীব্র হতে পারে, আমিতো তার সাক্ষী। তবু তুমি বলবে ওকে আমি বুঝতে পারিনি? না পারনি তপতী, থাক সে কথা, আর কেন বুঝতে পারনি তা তোমাকে আরেকদিন বুঝিয়ে বলব। এবার তোমার কথা বল। আমার কথা! তারপর বলল আমার কথা কি তোমার শুনতে ভাল লাগবে? কেন লাগবেনা। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তা আমর শুনতে খারাপ লাগবে কেন? ও বলল, তোমার সৌমেন্দ্রর কথা মনে আছে? আমি একটু চিন্তা করে বললাম, কোন সৌমেন্দ্র। ও বলল আমাদের বাড়ীর কারো কথা কি মনে আছে তোমার? কেন থাকবেনা। তোমার বাবা মা তারপর তোমার এক ভাই প্রতুল। ও এখন কি করছে? এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে? আমাদের বাড়ীর আর কারো কথা তোমার মনে পড়ে না? তোমাদের বিরাট পরিবার। মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, আগে ছিল এখন আর নেই। যাই হোক সবাইকে মনে রাখাতো আমার পক্ষে সম্ভব নয় তপতী। হ্যাঁ, এবার বল সৌমেন্দ্রর কথা। তার মানে সৌমেন্দ্রকে তুমি মনে করতে পারছনা। তারপরে বলল, আমাদের বাড়ীতে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন আমরা সবাই তাকে পিসিমা বলে ডাকতাম, মনে আছে? আমি মনে করতে পেরে বললাম হ্যাঁ মনে পড়ছে। কি একটা ব্যাপারে যেন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ ওনারই ছেলে সৌমেন্দ্র। আমাদের থেকে এক ক্লাশ উপরে পড়তো। তা হয়তো হবে, তখন তো অনেক ছোট ছিলাম। ও এখন ফাইনাল ইয়ার ডাক্তারী পড়ে। আমি আনন্দ প্রকাশ করে বললাম খুব ভাল কথা। তোমাকে ডেকেছি, সেই কারনে। একটা উপকার করে দেবে প্রান্তিক? আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম কি ব্যাপার বলত। তপতী বলল, কাল চিঠি এসেছে ওর মা অসুস্থ, কিন্তু ওর পরীক্ষা চলছে, এখন বাড়ীতে গেলে এ বছরটা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলবে? আমি বোঝাব? আমার কথা উনি শুনবেন কেন? তপতী বলল আমার বিশ্বাস, ও শুনবে তোমার

কথা। তুমি আমাকে ফোন না করলে আমিই যেতাম নীলাঞ্জনা পিসির বাড়ীতে, এবং আজই। বললাম, সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি যখন আমায় আসতে বলেছিলে, তখনতো এই ঘটনা ছিল না, তা হলে কেন আসতে বলেছিলে? ওর জন্যই আসতে বলেছিলাম। ওর জন্য? আমি অবাক হয়ে বললাম হাসপাতালে অনেক বার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে একবারও তো ওর কথা বলনি? না বলিনি। কারণ বুঝতে পারিনি, তার সঙ্গে কথা বলেও তাকে তুমি চিনতে পারবে না। অদ্ভুত! হ্যাঁ অদ্ভুত। তারপর বললো একদিন কৈশোরের চপলতা বশত তোমাকে একটা চিঠি লিখে শুধু মাস্টার মশাইয়ের কাছে নয় বাড়ীতেও পর্যন্ত মার খেয়েছিলাম। মনে আছে? হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু তুমি ওই রকম একটা চিঠি লিখতে গিয়েছিলে কেন? কেন লিখতে গিয়েছিলাম সে উত্তর তো দিতে পারবো না প্রান্তিক, কিন্তু লিখেছিলাম। ওতে কি লিখেছিলাম তোমাব কি মনে আছে? আমি খানিকক্ষন চিন্তা করে বললাম, কিছু কিছু মনে পড়ছে। তুমি যা লিখেছিলে, তার কযেকটা লাইন এই রকমই ছিল, তুমি আকাশ, আমি চাঁদ, কখনো তোমার ভালবাসায় বিকশিত হই শুক্লপক্ষের পূর্ণ চন্দ্রে। আরো বোধহয় লিখেছিলে, তোমার নিষ্ঠুরতায় পাষাণকেও হার মানাতে হয়, তবু আমি নিজেকে সঁপে দিতে চাই সেই পাষণের বেদীতলে। হেসে উঠলাম আমি। কি ছেলেমানুষী ছিল সেদিন তোমার। তপতীর কণ্ঠ বুঝি আবেগে বুজে আসতে চাইলো। হ্যাঁ ছেলেমানুষি। কিন্তু তোমার উত্তরটা সেটা মনে আছে তোমাব? আমি বললাম, আজ আর সেই অতীতকে নিয়ে এত ঘাটাঘাটি করছ কেন? তাপর বললাম, হয়তো তোমাকে অনেক আঘাত দিয়ে যা লিখেছিলাম, তা আমার লেখা উচিত হয় নি, কিন্তু আমার ঐ চিঠির জন্য যে তোমাকে এত মার খেতে হবে, তা কিন্তু ভাবিনি। আসলে তোমার চিঠিটাকে মনে করেছিলাম একটা খেলা, তাই খেলাচ্ছলে আমিও খেলা করেছিলাম। হ্যাঁ, সত্যি খেলা করেছিলে। তাইতো লিখতে পেরেছিলে, কিসের এত দম্ভ তোমার আমার আকাশে চাঁদ হয়ে ফুটতে চাও, চাও আমার ভালোবাসাব অধিকার দাবী করতে? ভিখিরিকে করুণা করা যায় ভালবাসা যায়না। আজো আমি কেঁপে উঠি তোমার সেই হুল ফোঁটানো লেখা গুলো মনে পড়লে। আজো অনেক রাতে ঝরে আমার চোখের জল। দুঃখের ভারি বোঝায় একাকী ভাবি, একবার কি আসতে পারতেনা, শুধু একবার। পারতেনা বলতে, তপতী চিঠিতে যা লিখেছি সেটা আমার মনের কথা নয়।। কিন্তু আসনি। কেন আসনি জানিনা, কিন্তু আমার মনের পর্দায় যে ছবি এঁকে গেলে তাকে তো মুছে ফেলতে পারলামনা আজো। সেদিনের সে সব কথা অনেক বার ভেবেছি হাসপাতালের সেই মুহূর্তগুলোতে, একবার মনেও হয়েছিল তোমাকে জিজ্ঞাস করবো, সত্যি কি আমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য ঐ হুল ফুটিয়েছিলে না নিজেকে গোপন করতে চেয়েছিলে কঠিন পাষাণে।

দেখলাম ওর চোখদুটি ছল ছল করে উঠছে। আমি তার একটা হাত আমার হাতের মধ্য নিয়ে বললাম, তপতী অতীত অতীতই, কেন হৃদয় খুঁড়ে সেই বেদনা জাগাতে চাইছো। আজ তোমার আমার পথ এক নয়। এ কথাতো মানবে 'আমাদের দুটি পথ দুটি দিকে গেছে চলে'। তবে আর পিছন ফিরে তাকানো কেন? তপতী বলল, তাকাতাম না প্রান্তিক, সৌমেন্দ্রর

মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছি। ওর মাকে যদিও পিসি বলেই জানতাম, বড় হয়ে জানতে পেরেছি উনি ছিলেন আমাদের বাড়ীর কাজের মেয়ে। দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তিনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন। যেদিন জানতে পারলাম অকারণে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে, সেদিন থেকে তোমার প্রত্যাঘাতকে ভালবাসায় রূপান্তর করে ভরে দিতে চাইলাম তাকে। আর তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে সেদিন দেখলাম তোমাকে, অনেক অনেক বছর পরে। দেখলাম সেলিনার প্রতি তোমার গভীর ভালবাসা, ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগলাম আমি। মুহূর্তে ভুলে গেলাম সৌমেন্দ্রকে দেওয়া আমার আশ্বাস আমার প্রতিশ্রুতি। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই প্রান্তিক, কয়েকটা দিন পাগলের মত শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। কিন্তু তার মধ্যেই দেখলাম, তোমার প্রতি সেলিনার আকর্ষণ। তার গভীর ভালবাসা। তার জেদ, তার অভিমান, আর অন্যদিকে, তোমার স্নেহের পরশে ও যেন এক নতুন মানুষ। ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেললাম ওকে। যা আমি পাইনি তাই পাওয়ার সাধ জাগলো ওর মাধ্যমে। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম, যে হিংসার অনলে একদিন তোমার ধ্বংস কামনা করেছিলাম, সেলিনা সেখানে নিয়ে এল এক নতুন জীবন। তারপর বলল, শুনেছি তোমার সমস্ত জীবন ব্যাপী আছে রেহানা, সেলিনার সেখানে কোন অধিকার নেই, জানিনা এটাও সেলিনার অভিমান কি না। তোমাকে বলতে চেয়ে ছিলাম নিজের কথা, জানাতে চেয়েছিলাম, সেই তপতীর মৃত্যু হয়েছে প্রান্তিক। যাকে তুমি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিলে।

তারপর কিছুক্ষণের জন্যে থামল তপতী। তাকালো আমার দিকে। বলল আমার বদলির আদেশ হয়েছে, সৌমেন্দ্রর পরীক্ষা শেষ হলে নতুন জায়গায় চলে যাবো। ওর মাকে নিয়ে আসব কাছে এই স্বপ্ন যখন দেখে চলেছি, তখনি এলো এই দুঃসংবাদ। জানিনা আজো তুমি আঘাত দেবে কি না, সেদিন যাকে ভিখারিনি বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলে তোমার অহংকারে ঘা লেগেছিল বলে আজ কিন্তু সে সত্যিই ভিখিরিনির মত তোমার কাছে এসেছে, ফিরিয়ে দেবেনা তো? ওর চোখে জল।

তপতী তার নিজের কথা বলতে গিয়ে বার বার অতীতকে কেন মনে করিয়ে দিচ্ছে জানিনা। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনের সেই ঘটনাগুলোকে কৈশোরের চপলতা ছাড়া আমার অন্য কিছু মনে হয়নি। তা যে এতদিন কোন মেয়ে তার মনের নিভৃত কোনে এতগুলো বছর অভিমানে বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমার ধারণারও অতীত। মাঝে মাঝে মনে হয় কতটুকু জানি আমরা মানুষকে। এই হাসপাতালে ওকে না দেখলে হয়তো মনেই পড়তোনা তপতী নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার একটি অতীত স্মৃতি আছে, আর সৌমেন্দ্র, ও আমাদের থেকে সিনিয়র ছিল। ওর বাবা মারা গেছেন ও যখন একেবারে ছোট। ভাল করে মনে নেই। তপতীর ভালবাসা তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মনে হয়, তাকে ডাক্তার করার পিছনেও আছে তপতীর পরিশ্রম আর স্বপ্ন। মুহূর্তে ভাল লেগে গেল তপতীকে। ভীষণ ভালো। জীবনতো এই রকমই, তার বাঁকে বাঁকে কত যে মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে কে তার খোঁজ রাখে? মনে মনে ভাবি কি ভুলই না আমরা করি। একটা ছোট্ট ঘটনা,

কৈশোরের চপলতা, হয়তো বা মনের নিভৃতে ভালবাসার রঙে রঙ্গীন হয়ে পাখা মেলতে চেয়েছিল। ঐ চিঠিটা, সে প্রান্তিক কে না লিখে যে কোন কিশোরকেই লিখতে পারতো। যদি আমি কোন উত্তর না দিতাম, তা হলে হয়তো হারিয়ে যেতো তার চপলতা। কিন্তু আমার ঘৃণা আর আঘাত, ওর মনের চপলতাকে দিল এক দৃঢ় প্রত্যয়। মার খেয়েও কোন প্রতিবাদ না করে সে খুঁজে নিতে চাইল তার ভালবাসার একনিষ্ঠতা অন্যত্র, অন্যখানে। সবই ঠিক।

আমার অতীত জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করে তপতী বলল, কি ভাবছ প্রান্তিক। কিছু না। তাকালাম দূর আকাশ পানে, কখন যেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছে। আকাশে মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলক আর ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে বললাম, দেখেছো এখনি মনে হচ্ছে প্রবল বর্ষা নামবে। ভিক্টোরিয়ার রক্ষীরা গাছের গুড়িতে এখনো কেউ বসে আছে কীনা তাই খুঁজতে বেরিয়েছেন। বলতে এসেছেন, তারা যেন আর দেরি না করে চলে যান, ঝড় ও জল এক সঙ্গে নামতে পারে। বললাম চল তপতী, আর দেরি করা ঠিক হবে না। কি এক গভীর আকুলতা নিয়ে ও তখনো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি যেন দেখেও দেখতে চাইলামনা এই আকুল ব্যগ্রতা।

দুই একটা জলের ফোটা গায়ে এসে লাগে। মুহূর্তে সারা আকাশ কালো হয়ে চারিদিক গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল। ঝড় উঠলো, প্রথমে ধুলিঝড়, তারপর প্রবল বৃষ্টি। গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলাম, রাস্তার উপর দিয়ে জল বয়ে চলেছে, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। ভিজে একাকার হয়ে গেছি আমরা। কোন দিকে যাব বুঝতে পর্যন্ত পারছিনা।

সর্বাঙ্গ ভেজা তপতীকে আমি কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব? কিভাবে পৌঁছিয়ে দেব তাকে তার বাসায়। রাস্তায় কোথাও হাটু জল কোথাও বা তার থেকেও বেশী। বৃষ্টির অন্ধকারেও যেটুকু আবছা আলো আছে তাতেই তাকাতে পারছিনা ওর দিকে। হঠাৎ চলতে চলতে পা পিছলে পড়ে গেল তপতী। ওকে কোন ভাবে তুলে নিলাম দুহাতে। বললাম মনে হচ্ছে আর হাটা যাবে না। এবার কোথাও দাঁড়ানো যাক। ও বলল তা হয় না প্রান্তিক বেশী রাত হলে হোস্টেলে ফেরাই কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমার হাতটা ধর তারপর এগিয়ে চল। যে কোন ভাবেই হোক রাত ৮টার আগে হোস্টেলে আমাকে ফিরতেই হবে। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আগে আগে পথ চলছি। ও কি ভাবছে জানিনা। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবছি, ও একটু আগে ভিখারিনির মত কিছু চেয়েছিল, কি দিতে পারতাম জানিনা, কিন্তু দুর্বার প্রকৃতি বুঝি, সব চাহিদা মিটিয়ে দিয়েছে ওর। জানি এই মুহূর্তটুকু ও ভুলতে পারবেনা কোনদিন। তাই জীবনে যা দিতে পারিনি, স্মৃতি হয়ে তাই অন্তত বেঁচে থাকুক, ওর মনের মণিকোঠায়।

সাড়ে সাতটা নাগাদ অনেক দুর্যোগ আর জল পেরিয়ে ওর হোস্টেলের কাছে সম্পূর্ণ স্নান করে এসে দাঁড়ালাম। ও তাকাল আমার দিকে। বললাম, একেবারে স্নান করে উঠেছো তপতী। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। ও বলল, তুমি কিভাবে যাবে? আমার জন্য ভেবোনা। ঠিক পৌঁছে যাব। আবার কি দেখা হবে? কেন হবে না? অবশ্যই হবে। এই পৃথিবী যতবড়ই

হোকনা কেন তাকে ছোট করে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম তাইনা? বললাম কোন কোন কষ্ট আনন্দের দ্যোতনা হয়ে বেঁচে থাকে জীবনে। আজকের কষ্টটাও না হয় সেই ভাবে বেঁচে থাক। কি জানি, বলল তপতী। আমি বললাম, কি যেন চেয়েছিলে আমার কাছে, বললে না তো। ও বলল, পেয়ে গেছি প্রান্তিক। যে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলাম এই দুর্যোগের দুরন্তপণা তা যেন নতুন করে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আমাকে। তারপরে বলল সাবধানে যেও। আচ্ছা। আর একটা কথা। বল। যাওয়ার আগে একবার রেহানাকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে, দেখাবে? ওকে কি তোমার প্রয়োজন? প্রয়োজন? হ্যা, ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন। আচ্ছা মনে রাখব তোমার কথা। আর সৌমেন্দ্রকে বল, পরীক্ষা যেন ড্রপ না করে। ওকে চিনতে না পারার জন্য ভীষণ খারাপ লাগছে। তাকে বলো যতটা অমানবিক আমাকে তিনি মনে করেছেন। আমি কিন্তু তা নই। বেশ বলব। তুমি কিন্তু আর দেরি করো না প্রান্তিক। তারপর বলল সারাটা রাস্তা তোমাকে হয়তো হেঁটেই যেতে হবে।

বাড়ীতে গিয়ে দেখি পিসি ফেরেনি তখনো। রাত হয়েছে অনেক। সারা রাস্তায় কোন বাসট্রাম নেই। সারা কলকাতা যেন এক সীমাহীন সমুদ্র। শুধু জল আর জল। কোথায় খুঁজবো তাকে। অগত্যা দীনেন্দ্রস্ট্রীটে গিয়ে ওর অফিসে ফোন করলাম। এক চান্সে ফোনটা পেয়েও গেলাম। নীলাঞ্জনার কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন ডেকে দিলেন। হ্যালো। আমি প্রান্তিক বলছি। পিসি বললেন তুমি বাড়ীতে পৌঁছে গেছ? হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কিভাবে আসবে? আমার জন্য চিন্তা করোনা। অফিসে প্রায় সবাই আটকা পড়ে গেছি। এরা একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করছে, চলে আসব, ফোন ছেড়ে দিলেন।

গভীর রাতে ফিরলেন পিসি। সমস্ত শরীর ভিজে একাকার। বললেন, এত জল যে গাড়ী আসতে পারছেনা, তাই হাঁটতে হল। আঁতকে উঠে বললাম ইস্ একেবারে স্নান করে ফেলেছো। আমি গীজারে জল গরম করে দিচ্ছি, স্নানটা করে নাও। না থাক। এত রাতে আর স্নান করবনা। বললাম সেটা ঠিক হবে না। স্নান না করলে শরীর আরো খারাপ লাগবে। যাই হোক আমার কথা শুনে পুরো স্নান না করলেও অর্দ্ধেক চান করলেন তিনি। কিন্তু অতরাতে আর কিছু খেতে রাজী হলেন না। বললাম, এক গ্লাস গরম দুধ অন্তত মুড়ি দিয়ে খেয়ে নাও। তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

পরের দিন সকালে, অনেক রাস্তা থেকে জল সরে গেছে, তবে অনেক নীচু রাস্তা এখনো জলের নীচে। একবার রেহানাদের ওখানে যাওয়া দরকার। কাল যা জল হয়েছে, তাতে তাদের একতলা বাড়ীতে কোমর জল হওয়ার কথা। কলেজে যাওয়ার আগে ওদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখনো ঘরের মেঝে থেকে জল সরেনি। বেল দিতেই দরজা খুলে দিল সেলিনা। বলল, কাল জলের সময় কোথায় ছিলেন প্রান্তিক ভাই? কোথায় আর থাকব। একবার উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। ও! বলে থেমে গেল সেলিনা। বলল চা খাবেন? না, তা কাল কি তোমরা এখানেই ছিলে? কোথায় আর যাব বলুন। দেখতে পারছি বিছানাপত্র সব ভেজা। অন্য কোথাও চলে যেতে পারতেনা? কোথায় আর যাব। সর্বত্রই তো জল, সবারই তো একই অবস্থা। আপনি বরং বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি। ভিজে

কাপড়ে রেহানা এসে দাঁড়ালো। বললাম, ভিজে কাপড়ে আছ, ঠান্ডা লাগবে যে। কি আর করব। কাল রাতে সব ভিজে গেছে। জল আলমারিতে পর্যন্ত ঢুকে সব ভিজিয়ে দিয়েছে। একটু সরিয়ে নিতে পারলেনা? হয়তো পারতাম, কিন্তু যখন সরাতে গেছি তার অগেই সব কিছু ভিজে একাকার। তারপর বলল, তুমি কাল ভেজোনি তো। যা সামান্য ভিজেছি তাতে অসুবিধা হয়নি। ও বলল একবার মনে হয়েছিল তুমি আসতে পার, কিন্তু না আসতে ভাবলাম হয়তো কোথাও আটকে পড়েছো। কি হয়েছিল। কাল পিসি প্রায় রাত ২টোয় ফিরেছে। আঁতকে উঠে বলল কেন? প্রায় ১২টা পর্যন্ত অফিসে আটকে ছিল, তারপর যদিওবা অফিস থেকে গাড়ীর এ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলো কিন্তু এতজলে গাড়ী কোথা দিয়েও আসতেই পারলনা। অগত্যা হাঁটা, এবং তারপর সাঁতরিয়ে এবং স্নান করে যখন বাড়ীতে পৌঁছালেন, তখন ২টো বাজে। কালকের ধকলে শরীরটা সকাল থেকেই খারাপ। রেহানাকে খুব চিন্তান্বিত মনে হল।

সেলিনা চা নিয়ে এল। ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম মাসিমা কোথায়? রান্নাঘরে। ও চাটা দিয়ে চলে গেল। রেহানা বলল, তোমার শরীরটা যে একদম ভাল লাগছে না, কি হয়েছে? কৈ কিছু নাতো। কিছুনা কি? তুমি লুকোচ্ছ। দেখতে পাচ্ছি চোখ দুটো তোমার লাল সারা মুখে চিন্তার ছাপ, আবার জ্বর আসবেনা তো? বলেই আমার কপালে হাত রেখে পরীক্ষা করে রেহানা। তার পরে বলে তুমি কিগো? গায়ে তো জ্বর। কেন মিথ্যে কথা বল? তারপর আমার হাত ধরে বলল, ওঠো এবার? কোথায়? সেলিনার ঘরের বিছানা জলে ভেজেনি। চল শুয়ে পড়বে। আমি বললাম, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন রেহানা। আমি ঠিক আছি, তোমায় এত ব্যস্ত হতে হবে না। ও আস্তে আস্তে বলল, কেন এত কষ্ট দাও বলত? তোমার শরীর খারাপ, আমার ভাল লাগবে? ওঠ লক্ষ্মীটি। চল ও ঘরে। লজ্জা ভীষণ লজ্জা আমাকে আড়ষ্ট করে দেয়। বললাম, চিন্তা করোনা রেহানা। আমার কিছু হবে না দেখো, জানি তোমার কিছু হবে না আর কিছু হলে যে তোমার মহত্ত্ব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি অনেক বড় প্রান্তিক, তাই হয়তো আমার মত সাধারণ মেয়ের উদ্বিগ্নতা তোমাকে ভাবায় না। তারপর বলে বেশ, তোমাকে ও ঘরে যেতে হবে না, কিন্তু কলেজেও তুমি যেতে পারবেনা। কেন? কেন আবার কি? তুমি কি বাড়াবাড়ি রকমের একটা কিছু বাধাতে চাও না কি?

এ এক নতুন রেহানা। এমন করেতো কোনদিন ও আমার সাথে কথা বলেনি। চিরদিনই নিজেকে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে, মেপে মেপে কথা বলেছে দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতা যদি কিছু থাকেও তাকে কখনো বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, বুঝতেও দেয়নি তার ভাবনা চিন্তা গুলোকে।

আর আজ? আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। সেলিনা চায়ের কাপ নিতে এসে দেখে, রেহানা ঠিক আমার মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার আঙুল বিলি কেটে চলেছে আমার মাথার চুলে। ওর বোধ হয় খেয়ালই নেই, বাড়ীতে আর কেউ আছে কি না। ওর বুকের সিক্ত কবোষ্ণতা আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। এমন করে ওতো কাছে আসেনি

কোনদিন। মন হয়তো কখনো বা চেয়েছিল, ওর আবেগ ছুঁয়ে যাক আমার হৃদয়কে। এই যে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা, এরতো একটা মূল্য আছে। তাকে উপেক্ষা করি কি ভাবে?

সেলিনাও বুঝি কম অবাক হয়না। এমন করে ও যে আমার কাছে আসতে পারে সে বুঝি সেলিনারও স্বপ্নের অতীত। কিন্তু ও এমন এক জাতের মেয়ে, সব কিছুকে নিতে পারে অতি সহজ ভাবে। অন্য কেউ হলে হয়তো একটি হাঁচি দিয়ে তার উপস্থিতি জানাতো, অথবা নীরবে সরে যেতো। কিন্তু সেলিনা অন্য ধাতুতে গড়া। রেহানাকে এ অবস্থায় দেখে সেলিনা বলল, যে ভাবে ভিজে কাপড়ে তুই প্রান্তিক ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিস তাতে তোর সংক্রামক ব্যধি ওকে না সংক্রামিত করে। যা, শাড়ীটা শুকিয়ে গেছে। সারারাত যে ভাবে ভিজে ছিস্ তাতে প্রান্তিক ভাইকে না আবার তোকে নার্সিং করতে হয়। ত্বরিতে সরে দাঁড়ায় রেহানা। মাথার চুলে বিলি কাটুনি বন্ধ করে হাতটাও সরিয়ে নেয দ্রুত রেহানা। আমিও লজ্জা কম পেলাম না। মন বুঝি প্রস্তুত ছিল রেহানার ভালবাসার আঙুলের স্পর্শ পাওয়ার জন্য। সেলিনা বলল এতে এত লজ্জাবতী হয়ে গেলি কেনরে রেহানা। নিজের জিনিষের প্রতি মমতা কার না হয়। যেন লজ্জায় মরে যেতে যেতে অস্পষ্ট ভাবে বলতে বলতে গেল, শুধু বাঁদরামি। সেলিনা বলল, কি হয়েছে প্রান্তিক ভাই, শরীর খারাপ? না না ঠিক আছে। তা হলে অমন বিপরীত মুখী সেবা নিচ্ছিলেন কেন? এতো আপনাদেব ক্ষেত্রে একেবারে বেমানান? রেহানাকে বলল ওভাবে আঁতকে উঠলি কেন, যা স্নান করে শাড়ীটা বদলিয়ে আয়, ততক্ষণে দেখছি প্রান্তিক ভাইয়ের কি হয়েছে। রেহানা আস্তে আস্তে চলে গেলে সেলিনা আমার কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে বলল, একি প্রান্তিক ভাই এযে অনেক জ্বর। চলুন। কোথায়? এ বাড়ীতে তো আর কোন শুকনো বিছানা নেই, তাই বাধ্য হয়ে মন না চাইলেও আমার বিছানায় যেতে হবে। ভয় নেই। রেহানা স্নান করে এলেই, তাকে পাঠিয়ে দেবো। মুখ টিপে হাসতে লাগল সেলিনা। আমি বললাম, সেলিনা এই রকম ভয়ংকর ঠাট্টা করে কি আনন্দ পাও তুমি? অন্তত দুঃখ যে পাইনে এটাতো ঠিক। আর তা ছাড়া আপনি একে ঠাট্টা বলছেন কেন? আপনি জ্বরে ভুগবেন, আর ও দূরে দূরে থাকবে, এ হয় নাকি? কেন তুমিতো আছ? আমি? হাসল সেলিনা। হাসলে যে। না, প্রান্তিক ভাই হাসছিনা, শুধু জানিয়ে যাচ্ছি, কোন রকম উচ্ছলতা, চপলতা বা প্রগলভতা প্রকাশ না করেও ও যেখানে আপনার অন্তর ছুঁয়ে যাবে হাজার সেলিনার সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছাবার। যদি এই ঠাট্টাটুকু আপনার ভাল না লাগে করব না প্রান্তিক ভাই। তাই বলে মনে করবেন না, ঠাট্টা করছি বলে আপনাদের আমি বুঝিনা। একটু চুপ করে থেকে বলল, চলুন এবার। একটু বিশ্রাম নিন প্রান্তিক ভাই তারপর ভাল না লাগলে চলে যাবেন। কথা দিচ্ছি রেহানা আপনাকে আটকাবেনা।

উঠতেই হল। আসলে বুঝতে পারছি, ভিতরে ভিতরে কি যেন চাইছে মন। জ্বরটাও বেশ চাগিয়ে আসছে, বললাম চল। সুন্দর করে বিছানা করা হয়েছে। নতুন একটা চাদর পাতা হয়েছে সদ্য ভাঁজ খুলে। বালিসে দেওয়া হয়েছে নতুন ওয়াড়। আর কোনায় সুন্দর সেলাইয়ের কাজ। সেই কবে মাকে দেখেছি, নতুন কেউ এলে এমনি করে সাজিয়ে দিতেন বিছানা। দ্বিরুক্তি না করে শুয়ে পড়লাম। শরীর যে পারছেনা, তা অস্বীকার করি কি করে।

আফরোজ বেগম আমার মাথায় জল পট্টি দিয়ে চলেছেন। কতক্ষণ জানিনা চোখ বুঝে দেখছি, যেন তপতী পাশে এসে বলছে, এ আমারই দোষ। তোমাকে যদি সেদিন ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে না যেতাম, যদি এ ভাবে তুমি জলে না ভিজতে, কিছুতেই তুমি জ্বরে পড়তেনা। চল না প্রান্তিক আমাদের হাসপাতালে। যে ওয়ার্ডে তুমি ভর্ত্তি হবে মেট্রনকে বলে সেই ওয়ার্ডেই আমি ডিউটি নেব। অন্তত ঐ কটাদিন আমার সেবার মাধ্যমে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। যাবে প্রান্তিক? বললাম না। কেন বার বার না করছ? আমার থেকে কি এরা তোমার বেশী সেবা করবে? বললাম তবুও না। আবারও সেই না। তুমি কি একটুও আমাকে বুঝতে চাইছনা? একবার তাকাও আমার দিকে। দেখ সেদিনের মত আজো জড়িয়েছি বেনীতে যুঁই ফুলের মালা। তোমার প্রিয় আকাশী রংএর শাড়ী পরেছি, কপালে লাগিয়েছি সবুজ টীপ। একদিন বলেছিলে, এ পোষাকে তোমাকে ভীষণ মানায় তপতী। একবার পরীক্ষা করে দেখনা, রেহানার থেকে আমি তোমাকে বেশী ভালবাসি কী না। বলছি তো না-না-না। তুমি যাও এখন? কিসের এত অহংকার তোমার? আমাকে এই ভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছ? তারপর যেন অভিসম্পাত দিয়ে বলছে, যাকে তুমি চাইছ সে কোনদিন আসবেনা তোমার জীবনে। দুটো জীবন তোমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে প্রান্তিক। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। চল আমার সাথে। চিৎকাব করে উঠলাম তুমি যাবে কি না।

চোখ মেলে দেখি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলছে রেহানা। বলল, আমায তুমি চলে যেতে বলছ? এত নিষ্ঠুর তুমি? আমি কি এতই অস্পৃশ্য তোমার কাছে। ও উঠে যেতে চাইলে, ওর শাড়ীর আঁচলটা ধরে টান দিতেই তা বুক থেকে খসে পড়ে গেল। আমি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম অন্য দিকে। এতক্ষণ কি তবে স্বপ্ন দেখছিলাম। চকিতে শাড়ীর আচলটা বুকে তুলে নিয়ে ও পালিয়ে গেল।

এ আমি কি করলাম। গায়ে অসহ্য যন্ত্রনা। মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। চোখ দুটো দপ দপ করছে। এত নিঃসঙ্গ লাগছে যে, সে এক অসহনীয় অবস্থা। আমার চিৎকারে ছুটে এলো সেলিনা। আমার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কি হয়েছে প্রান্তিক ভাই, এমন করছেন কেন? বললাম, একটা ট্যাক্সি ডাকতে পারবে সেলিনা, আমি বাড়ী যাব। ও ওমনি তার করাঙ্গুলি স্পর্শে আমার বুকের যন্ত্রণা লাঘব করতে করতে বলল যাবেন, কিন্তু জ্বর নিয়ে তো আপনি যেতে পারবেন না। আমাকে যে যেতেই হবে। কেন? কার প্রতি এ অভিমান আপনার? রেহানা এসে বলল, একটা ট্যাক্সি ডাক সেলিনা। আমরাতো ওর কেউ নই। কেন থাকবে এখানে? কারো শুশ্রুষা নিতে ওর বিবেকে বাঁধে। তাতে বুঝি ওর মহত্বে আঘাত লাগবে। সেলিনা রেহানার কথার কোন প্রতিবাদ না করে বলল, তুই এখানে একটু বোস আমি আসছি। কোথায় যাবি? যা যা বলছি তাই কর। বলিহারি তোর অহংকার? কেন ওকে বুঝতে চাইছিস না বলতো। এই অবস্থায় ওকে ফিরিয়ে দিলে একলা ঘরে কে তোকে সান্ত্বনা দেবে? তার থেকে বোসনা ওর কাছে। শুধু তোর ব্যথা দেখবি। ওরটা বুঝবিনা? ছিঃ রেহানা ছিঃ। কেন যে ভালবাসতে গিয়েছিলি? শুধু কাঁদতেই শিখেছিস। একটু হাসতে শেখ রেহানা।

রেহানা বসল আমার পাশে। সেলিনা চলে গেলে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিতে গেলে ও জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। আমি আবারও তা জোর করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, কি চাও তুমি রেহানা? আমি কষ্ট পাই তাইতো? ও বলল চুপ করো প্রান্তিক। বেশী কথা বলোনা। আমি চুপ করে গেলাম। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে এক সময় বললাম আমার জন্য তোমার খুব কষ্ট হয় তাইনা? না হয় না। হয় না? কেন হবে? কে তুমি আমার? নিজের মন থেকে বলছ তো আমি তোমার কে? তুমি চুপ করবে? হ্যাঁ করব। তবে আগে বল, আমার সাহচার্য কি তোমার কাছে অসহ্য? তুমি কি আঘাত দিয়ে ছাড়া কথা বলতে পার না প্রান্তিক? আমি আঘাত দিয়েছি না তুমি আমায় আঘাত দিয়েছ? বেশ আমিই তোমায় আঘাত দিয়েছি। এক দিনতো বলেছিলে, কোন আঘাতই নাকি তোমার বুকে বাজেনা। তা হলে? তাই বলে তোমার দেওয়া আঘাতও আমার বুকে বাজবেনা আমি কি এতই নিষ্ঠুর? তুমি তো পাষাণ। প্রাণহীন একখন্ড পাথর মাত্র। মমতা কি আছে তোমার?

মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বললাম মাথাটা একটু টিপে দেবে? বড্ড যন্ত্রণা। ছল ছল চোখে বলল কোথায়? আমার সমস্ত শরীরে। কেন এমন হল প্রান্তিক, কেউ কি তোমায় কঠিন আঘাত দিয়েছে? তুমি ছাড়া কারো সাধ্য নেই আমাকে কঠিন আঘাতে ঘায়েল করতে পারে। ও বলল, হাত ছাড়, মাথা টিপে দিচ্ছি।

নীরবে আমার মাথা টিপে দিতে লাগল রেহানা। এক সময় বলল, যন্ত্রণা একটু কম লাগছে? আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। ডাক্তার সরকারকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো সেলিনা। রেহানা উঠে দাঁড়ালো। ডাক্তার সরকার বললেন কি হয়েছে মা? খুব জ্বর, হাত পা কামড়াচ্ছে শরীরে ভীষণ ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ডাক্তার সরকার দেখলেন। তারপর বললেন, ভোগাবে কয়েকদিন, তবে ভয়ের কিছু নেই। বিশ্রাম দরকার। আফরোজ বেগম বললেন, ডাক্তার বাবু ছেলেটি ওর পিসির কাছে থাকে। বাবা মা কেউ কাছে নেই। কি যে হবে। ডাক্তার সরকার খুব উদার প্রকৃতির মানুষ। বললেন বাবা মা কাছে নেই, তাতে কি আপনারা তো আছেন? আপনি দেখবেন? আফরোজ বেগম বললেন আপনি বোধ হয় কিছু জানেন না ডাক্তার বাবু। কি? ওকে আমি আমার কাছে রাখব কি করে? কেন ও হিন্দুর ছেলে বলে? আমি কিন্তু একথা আপনাদের কাছে আশা করিনি। ও যা করেছে আপনাদের জন্য এবং এখনো যা করে, আপনার স্বজাতি, এমন কি আপনার ছেলেও তা করতনা। জানি ডাক্তারবাবু, কিন্তু ওর পিসি তা মানবে কেন? ও আই সি। তাহতে পারে। তবে যদি সত্যি সত্যি দায়ীত্ব পালন করতে চান, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। তারপর রেহানাকে বললেন, ওর কিন্তু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার মা। বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ ভট্টাচার্য বিনা পয়সায় যে তোমাদের কেসটি গ্রহন করেছেন, সে কিন্তু ওর জন্য, ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন আফরোজ বেগম এবং সেলিনা।

রেহানা আমার কপালে হাত রেখে বললো, ডাক্তারবাবু কি বলে গেছেন শুনেছ?

আমি চুপ করে রইলাম। এর আমি কি উত্তর দেব। রেহানা আবার বলল, কি কথা বলছোনা যে। কি বলি বলত। কি করবে? তুমি বল কি করবো? আমার কথা তোমার ভাল লাগবে? বলেই দেখনা। পিসির কাছে ফিরে যাও। তুমি যাবে তো আমার সাথে? যাব, থাকবে আমার কাছে? হাসল রেহানা, ভীষণ মিষ্টি সে হাসি। বলল, থাকব। সত্যি? তুমি বোঝ না? আমি তো সব সময় তোমার কাছে আছি। তবে আমি তোমায় দেখতে পাইনা কেন? কেন হৃদয় আমার এত খালি মনে হয় বলতে পার? পারি। তবে বল। তুমি আমায় একটুও ভালবাসনা তাই। তাই বুঝি? তবে আমি কাকে ভালবাসি? আমাকে ছাড়া সব্বাইকে? ওর একটা হাত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলাম।

সেলিনা বলল, যা রেহানা খেয়ে আয়, আমার খেতে ইচ্ছে করছেনা। ইচ্ছে না করলেও খেতে যে হবে। যা তাড়াতাড়ি খেয়ে আয়। ওষুধটা খাইয়েছিস? ডাঃ কাকু বলেছেন ওষুধটা খেলে জ্বরটা কমে যাবে। খাইয়েছি। যা তবে। বিকাল হয়ে এল। প্রান্তিক ভাইকে তো ওর পিসির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে গেল রেহানা। ঘাম দিয়ে জ্বরটা নেমে যেতে শরীরটা একটু হালকা লাগল। সেলিনাকে বললাম ভীষণ খিদে পেয়েছে। কি খাবেন? যা হোক।

গরম পরটা, আলুভাজা, মিষ্টি আর কফি নিয়ে এল রেহানা, বলল খেয়ে নাও। তারপর যেতে হবেতো। কোথায়? বা তোমার পিসি চিন্তা করবেন না।

আমি আর কোন কথা না বলে খেয়ে নিলাম। সেলিনা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। মনে মনে ভেবেছিলাম রেহানা হয়তো যাবে আমার সাথে। কিন্তু শেষ বেলায় ও বলল, তুই যা সেলিনা। আমারও বোধহয় জ্বর আসবে। সেলিনা শুধু একটু হাসল। তারপর ট্যাক্সিতে আমার পাশে এসে বসল। কয়েক মিনিটের পথ। পৌঁছে গেলাম। সেলিনা বেল দিতে গেলে বললাম, দরকার নেই সেলিনা, আমার কাছে চাবি আছে। ওকে চাবিটা দিতে, গেটটা খুলে আমাকে নিয়ে ভিতরে এল। পিসি শুয়ে আছেন। আমার সঙ্গে ওকে দেখে উঠে এলেন। সেলিনা বলল, আপনি পিসিতো। বলে মাথা নীচু করে প্রনাম করতেই নীলাঞ্জনা বললেন তুমি মানে ...। তার কথা শেষ না হতেই সেলিনা বলল। না না আমি রেহানা নই, আমি সেলিনা। কিন্তু আপনাকে ওরকম লাগছে কেন? বলে আমাকে ছেড়েই পিসির কপালে হাত দিতেই চমকে উঠে বলল একি আপনারও জ্বর? নীলাঞ্জনা বললেন, ওঁরও কি জ্বর হয়েছে? হ্যাঁ ভীষণ জ্বর। কলেজে যাওয়ার পথে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। আসলে, কালকের ঝড়জলের পরে সংবাদ নিতে আর কি। কিন্তু তখনও ওর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মা তাই ওকে আটকে দিলেন। বললেন আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই বাবা। এখন একটু বিশ্রাম নাও। তারপর বিকেলে একটু সুস্থ হলে না হয় চলে যেও। কিন্তু জ্বর আর কমে না। বাধ্যহয়ে ডাঃ কাকু মানে ডাক্তার সরকারকে ডাকা হলে উনি দেখেশুনে বললেন, ভোগাবে তবে ভয় নেই, ওর বিশ্রাম আর নার্সিং-এর দরকার। সেটাতো তোমাদের ওখানেও হতে পারতো বললেন নীলাঞ্জনা। এই দেখুন আপনি এখনো রেগে আছেন। আপনি মা, আপনার নার্সিং আর আমার মায়ের নার্সিং কি এক হবে? কেন তোমরাতো আছো, তোমরা

পারতেনা নার্সিং করতে? পারতাম পিসি কিন্তু তাতে যন্ত্রণা বাড়তো ছাড়া কমতোনা। একি আপনার শরীর যে কাঁপছে, চলুন চলুন আপনাকে শুইয়ে দিই। নীলাঞ্জনা বাঁধা দিয়ে বললেন দরকার হবে না, তুমি ওকে দেখ।

সেলিনা নীলাঞ্জনাকে ধরে নিয়ে বিছানার দিকে যেতে যেতে বলল, মায়েদের এই জেদটা আমার ভীষণ ভাল লাগে জানেন পিসি। কেমন একটা অহংকারী ভাব। সন্তানের সব ভালো-মন্দের মা-ই যেন একমাত্র জিম্মাদার। আমার মাকেও দেখেছি তো, ওঁর ধারণা উনি ছাড়া, ওর সন্তানের আর কেউ যেন কোন নার্সিং-ই জানেনা। একমাত্র ওঁর নার্সিং হলে ওর ছেলে মেয়েরা সব সুস্থ হয়ে যাবে। মাথার দু পাশের দুটো রগ চেপে ধরে শুয়ে পড়লেন নীলাঞ্জনা। সেলিনা তার হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমি টিপে দিচ্ছি, নিজে কি নিজের সেবা করা যায় নাকি? সেলিনা খুব যত্ন সহকারে, তার মাথা টিপে দিতে লাগলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল। লজ্জা করবেন না প্রান্তিক ভাই দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। তারপর নীলাঞ্জনাকে বললেন, চা খাবেন পিসি? চা কে করবে? কেন আমি? তুমি? কেন আমাকে আপনার রান্না ঘরে ঢুকতে দেবেন না? যদি না দিই। আমি জোর করে ঢুকবো, দেখি মা হয়ে কেমন করে আপনি আটকান। নীলাঞ্জনা বললেন, তুমি বার বার আমাকে মা বলছ কেন? আমিতো ওর মা নই। জানি, কিন্তু আমিতো আপনাকে প্রান্তিক ভাইয়ের মা বলিনি। তবে কার কথা বলছ? আমার মায়ের কথা বলছি। আমার মা হতেও আপত্তি আপনার?

নীলাঞ্জনা ভাবেন, এ মেয়ে বলে কি? সেলিনা তার চিন্তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে বলে, তা হলে চা করে নিয়ে আসি, গরম গরম খেয়ে দেখুন ভাল লাগবে। নীলাঞ্জনা নীরবে সম্মতি জানালে সেলিনা বলে প্রান্তিক ভাই আপনি খাবেন তো। কিন্তু আমার মতামতের অপেক্ষা না করে ও তিন কাপ চা করে নিয়ে এলো। এক কাপ আমাকে আমার ঘরে দিয়ে বাকী দু'কাপ নিয়ে নীলাঞ্জনার ঘরে ঢুকলো সেলিনা। নীলাঞ্জনা চায়ের কাপে চুমুক্ দিয়ে বললেন, বা বেশ সুন্দর চা বানিয়েছো তো তুমি? তাহলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তো? তারপর বলল নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি। আপনি চাটা খান। আমি আপনার জন্য গরম গরম কিছু খাবার আর কফি করে নিয়ে আসছি।

কি জানি নীলাঞ্জনা সেলিনাকে এবারেও কেন বাধা দিলেন না। সেলিনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গরম লুচি ও ঝাল ঝাল তরকারী করে নিয়ে এলো। আগে এটা খেয়ে নিন। কফি পরে আনছি? থাক পরে খাব। কেন পরে খাবেন কেন? এখনি খান। তারপর বলল আমি খাইয়ে দেব? কিন্তু প্রশ্নটা করে ও তারজন্য কোন অপেক্ষা না করে সত্যি সত্যি সেলিনা লুচিতে তরকারী দিয়ে নীলাঞ্জনাকে বলল হা করুন। নীলাঞ্জনা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। সেলিনা বলল, আমার দিকে তাকালে কি খাওয়া হবে পিসি, আর কোন কথা নয় এবার হা করুন। নীলাঞ্জনাকে বাধ্য হয়ে হা করতে হয়। আর সেলিনার দেওয়া লুচিটাও খেয়ে নেন নীলাঞ্জনা। তারপর বলেন, আমি নিজেই খাচ্ছি। সেলিনা বলে, কেন আমার হাতে খাওয়া যাবে না, না আমি খাওয়াতে পারব না?

হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন নীলাঞ্জনা, এমন অদ্ভুত মেয়ের পাল্লায়, এর আগে

পড়েনি কখনো। নিজেকে পরিচয় দিয়েছে রেহানার বোন হিসাবে। প্রান্তিকের কাছে ওদের সবার কথা শুনেছেন নীলাঞ্জনা। কিন্তু কোন দিনই মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতার বাইরে এদের কথা ভাবতে পারেননি। তাই তার অবাক হওয়াটা অনেক বেশী। লুচি তরকারী খাওয়া হয়ে গেলে, সেলিনা কফি করে নিয়ে এল। এবারে আমাকেও এক কাপ দিয়ে নীলাঞ্জনার ঘরে ঢুকে গেল সেলিনা। বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন পিসি, সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমাকে তো যেতে হবে। যেতে হবে? কথাটা শুনে এমন ভাবে তাকালেন নীলাঞ্জনা পিসি, যেন একথাটা ভীষণ নতুন তার কাছে? বললেন, না গেলে মা রাগ করবেন, না? তাতো করতেই পারেন। যেমন প্রান্তিক ভাই যদি আপনার কাছে ফিরে না আসতেন আপনি রাগ করতেন না? না করতাম না। তাই হয় না কি? আপনি আমাকে ছেলে ভুলাতে চাইছেন? নীলাঞ্জনা বললেন, আচ্ছা তোমাকে যদি আমি ধরে রাখি তা হলেও যাবে? ধরে রাখবেন? কেমন করে ধরে রাখবেন? আমার স্নেহ দিয়ে, আমার ভালবাসা দিয়ে। ও সব বাজে সেন্টিমেন্ট পিসি, ও সব দিয়ে কাউকে ধরে রাখা যায় না। তবে কেমন করে ধরে রাখা যায়। তার উত্তরতো আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে পিসি, কারণ আপনি তো মা।

সেলিনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজেকে খুব হালকা লাগছিল নীলাঞ্জনার। সত্যি শরীরটা তার ভীষণ খারাপ লাগছিল। একলা ঘরে তা আরো দ্বিগুন হয়ে উঠেছিল। তারপরে যখন প্রান্তিক এই মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকল, মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গ্রীষ্মের দাবদাহে এ যেন এক পশলা মিষ্টি বৃষ্টি। সেলিনা বলল, মনের জোর দিয়ে ধরতে হয়। এই দেখুন না, মা, রেহানা, চাইছিল প্রান্তিক ভাই থাকুক। তবে থাকল না কেন? জানতে চাইলেন নীলাঞ্জনা। সেলিনা পুরনো আলোচনা জের টেনে বলল ঐ যে বললাম, তাদের চাওয়ার মধ্যে সেই জোরটাই যে ছিলনা। নীলাঞ্জনা বললো ওদের না হয় জোর ছিল না, কিন্তু তোমার তো ছিল, তুমি চাইলেনা কেন? সেলিনা হাসতে হাসতে বলল এইতো আপনি ভুল করলেন পিসি, জোর যদি কারো থাকে সে ওই রেহানার আছে, কিন্তু বেচারা চাইতেই পারল না।

নীলাঞ্জনা বললেন, তা হলে আমি বলছি তুমি থাক। সেলিনা উত্তরে বলল ওটাকি জোরের কথা পিসি? ওটাতো কথার কথা। যে দিন সত্যি জোর দিয়ে বলবেন, দেখবেন হাজার প্রতিকূলতায়ও আমাকে নড়াতে পারবেন না।

কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন। জ্বরে ভুগতে হল পিসি ও আমাকে। সেলিনা আসতো মাঝে মাঝে। এবং এই আসার মধ্য দিয়ে পিসির মন ও হৃদয় ছুঁয়ে গেল সেলিনার চপল সাহচর্য। সেলিনাকে অনেক বার বলতে চেয়েছি, একবার যেন রেহানা আসে, কিন্তু পারিনি, কেন পারিনি জানিনে। সেলিনাও তার উপস্থিতির মধ্যে একবারও রেহানার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে নি। একদিন শুধু বলেছিল না প্রান্তিক ভাই, ও যা ভয় করেছিল, তা হয়নি জ্বরে পড়তে হয় নি ওকে। ভালো আছে। ব্যাস্ আর কোন কথা নয়। আফরোজ বেগম একদিন এসে পিসিকে দেখে গেছেন। সেলিনা ও আফরোজ বেগমের মধ্য দিয়ে পিসির অনেক ভুলের অবসান হয়েছে মুসলিম রক্ষণশীলতা সম্পর্কে। একদিন নীলাঞ্জনা সেলিনাকে

রেহানার কথা জিজ্ঞাস করেছিলেন, তাতে সেলিনা বলেছিল, আমাকে বুঝি আপনার আর ভাল লাগছে না ঠিক আছে ওকেই পাঠিয়ে দেব। আমি আর আসব না। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়েছিল সেলিনা। নীলাঞ্জনা বললেন, পাগলি মেয়ের কাণ্ড দেখ। আমি কি তাই বলেছি।

রেহানার আসা হয়নি। সেলিনাই এসেছে। বেশীর ভাগ সময় সে পিসির সঙ্গে কাটিয়ে গেছে। আমার কাছেও এসেছে, তবে খুব কম।

শরীরটা যথেষ্ট দুর্বল তবে সুস্থ হয়ে উঠছি তাড়াতাড়ি। পিসি, গতদিন কাজে জয়েন করেছেন। অনেকদিন পরে ঘর থেকে বেরিয়ে তার মনটাও অনেকটা ভাল। অবশ্য সেলিনার সাহচার্যে তার চপলতা ও চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে অতীতকে যেন খুঁজে পেয়েছেন নীলাঞ্জনা। আজ অফিস থেকে ফিরে বললেন, সেলিনা আসেনি? আমি বললাম তোমাকে তো বলে গেল ও আজ আসবে না। বলেছিল বুঝি, তা তুমি আজ কেমন আছ? ভাল ও আচ্ছা শোন্, মিনতি সেন আজ আমার অফিসে ফোন করেছিলেন তোমাকে। কেন? এর আগেও নাকি ২/১ বার করেছেন। খুব দরকার বুঝি? হ্যাঁ উনি বললেন, তোমাকে ওঁর ভীষণ দরকার। কবে নাগাদ তুমি যেতে পারবে। তুমি জিজ্ঞাসা করনি কি দরকার? করেছি, তবে বলেননি। কিন্তু মনে হল, সত্যি তোমাকে তার প্রয়োজন। পারবে নাকি একবার যেতে? আমি বললাম, প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, তবে কিসের প্রয়োজন সেটাইতো বুঝতে পারছিনা। পিসি বললেন, উনি কাল আবার ফোন করবেন। আমি বললাম, তুমি একটা কাজ করবে পিসি? কি? ফোন করলে বল না যে উনি যদি পারেন তবে যেন একবার আসেন। বলেছিলাম। উনি কি বললেন? বললেন যে একদম সময় করতে পারছেন না। তাই তুমি যেতে পারলে ভাল হয়। তুমি বলেছ কি, আমি কয়দিন ধরে অসুস্থ তাই যেতে পারিনি। না আমি কিছু বলিনি। কাল ফোন করলে কি বলব, তাই বল। যা ভাল বোঝ তাই বলো। আমার একা একা অতদূর যাওয়ার ক্ষমতা নেই, এইটুকু তোমাকে বলতে পারি। আচ্ছা তাই হবে।

প্রায় ২ মাস হয়ে এল, রেহানার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। এত দীর্ঘদিন ওকে না দেখে থাকিনি কখনো। কত কথা যেন জমা হয়ে আছে মনের মধ্যে। এমন করে ওর অভাবতো জীবনে কখনো অনুভব করিনি। কোন দিনই বেশী কথা বলেনা রেহানা। ওর উৎকণ্ঠা এবং নৈকট্য তাও চিরদিন দূরে দূরে থেকেছে। এক সঙ্গে পথ চলতেও দেখেছি সামান্য ২/১টা কথা চাপা ভাবে বলেছে ও। আমিও যে ওর সঙ্গে খুব বেশী কথা বলি তা নয়। তবে আকাশ ভরা জোছনা রাতে তার সঙ্গে পথ চলতে চেয়েছি কতবার, কিন্তু বলতে পারিনি। ভোরের শিশির বিন্দুতে রাজপথের পিছল পথে হাটার বাসনাও দুর্নিবার প্রচেষ্টায় দমন করেছি। জীবনের শুন্যতা কেমন ভাবে তার সাহচার্যে পূর্ণতা পেতে পারে ভাবার চেষ্টা করেছি এই দীর্ঘ মাস। ও আমাকে নিষ্ঠুর বলে, প্রাণহীন প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে, কিন্তু ওকি। ওতো জানে, আমি শুয়ে আছি, এখন আমি কোথাও যেতে পারবো না। পারত না একবার আসতে?

কি হতো এলে? নীলাঞ্জনা পিসি কিছু মনে করতেন? নিশ্চয়ই না। সেলিনার নৈকট্য তার জীবনেও এনেছে এক গভীর পরিবর্তন, কিন্তু সেই নীলাঞ্জনা এক বার, মাত্র একবারই

সেলিনাকে বলেছিলেন, রেহানা কি আসতে পারে না একবার ? আফরোজ বেগম এলেন অথচ সে এলো না। ও কি বোঝে না, আমার কান উৎকীর্ণ হয়ে কার পদধ্বনি শুনতে চায়। চোখ দুটি দেখতে চায় কার চকিত আবির্ভাব। মন চায় কার নীরবতার বিষন্নতায় মগ্ন হতে। আর সেলিনা? তারও যেন কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। একি তার অভিনয়? না এমনি ভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে সে কোন নতুন বারতা বয়ে আনতে চায়।

একটু আগে পিসি অফিসে চলে গেছেন। বলে গেছেন, সেলিনা এলে বল ও যেন তোমার খাবার গরম করে দেয়। আর আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়। আমি অপেক্ষা করে আছি ওর আসার আশায়। আর ভাবছি ও যদি আসে, তবে অনেক দিন পরে, একলা আমাকে পেয়ে সেকি ফিরে যেতে পারবে তার অতীতে? পারবে কি তেমনি হাসিঠাট্টা আর চকিত চঞ্চলতায় আমার মনকে ছুঁয়ে যেতে যেখানে আমি একটি পরশ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু কোথায় সেলিনা? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসন্ন, সেলিনার দেখা নেই।

ঝপ করে সন্ধ্যা নেমে এলো এক সময়। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলাম ঘরে। সুইচ টিপে জ্বালালাম বিদ্যুতেব আলো। এলিয়ে দিলাম ক্লান্ত দেহকে নিজের বিছানায়। সেলিনা বলল, এখন শোবেন না, প্রান্তিক ভাই, আমি কফি নিয়ে আসছি।

খানিক পরে এলো পিসি। সেলিনাকে যেন কতদিন পরে দেখছেন, এমনি এক আনন্দের সুরে ভরে উঠলো মন। বললেন, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, আমার জন্য এক কাপ কফি হবে সেলিনা? সেলিনা বলল, আপনি, হাতে মুখে জল দিয়ে আসুন, আমি এক্ষুনি কফি দিচ্ছি। আপনাব জন্যতো কফি করাই আছে।

নীলাঞ্জনা পিসি হাতে মুখে জল দিয়ে শাড়ীটা বদলে এসে ডাক দিলেন, সেলিনা। সাড়া দিয়ে সেলিনা বলল, আপনি কি প্রান্তিক ভাইয়ের ঘরে আসবেন না আপনার ঘরে দেব? বললেন, এ ঘরে নিয়ে এস। আমি তাকালাম সেলিনার দিকে। আমি ইঙ্গিতে ওকে কি যেন বলতে চাইছিলাম, সেলিনা বলল থাক না, ওকে কেন অপমান করতে চাইছেন। ওতো আছে ওর নিজের জায়গায়। হায় বোকা মেয়ে, তুমি বুঝবেনা যে, ভয়টা তোমাকে নয় ভয় নীলাঞ্জনা পিসিকে। কি জানি, যদি প্রশ্ন করে জানতে চান, কে পরিয়ে দিল, প্রান্তিক?

সেলিনা কফি আর বিস্কুট নিয়ে নীলাঞ্জনার ঘরে গেল, পর্দাটা খোলা। দুটো ঘরের অবস্থান এমন যে পর্দা বা দরজা বন্ধ না করলে একটা ঘরেরই দুটো অংশ বলে মনে হয়।

দেখতে পাচ্ছি সেলিনা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, অপলক তাকিয়ে আছেন পিসি ওর দিকে, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখছেন। সেলিনা বলল, অমন করে কি দেখছেন পিসি। চিন্তায় যেন ব্যাঘাত ঘটল এমন ভাবে নীলাঞ্জনা বললেন, না কিছুনা। তারপর জানতে চাইলেন কখন এসেছো? সন্ধ্যার একটু আগে। কাল এলেনা কেন? বা আপনাকে তো বলে গেলাম, আমার একটু কাজ আছে আসতে পারবো না।

নীলাঞ্জনা এতক্ষণে কফি খাওযা শেষ করে বললেন, খোঁপায় ফুলগুলো কে পরিয়ে

দিয়েছে? যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হল। সেলিনা কি একটু লজ্জা পেল? এই কি প্রথম মনে হতে লাগল, সত্যি কথা বলবে কীনা। কিন্তু সেলিনাতো সেলিনা, বলল, খারাপ লাগছে? তা হলে খুলে ফেলি? এই দেখ মেয়ের অভিমান, আমি কি তাই বলেছি। তারপর বললেন আমার কাছে এস। সেলিনা কাছে এলে, ওর কপালে একটি চুম্বন একে দিয়ে বললেন, ভারি সুন্দর লাগছে। তারপর নিজেব ব্যাগ থেকে আলমারীর চাবি বের করে সেলিনাকে দিয়ে বললেন, ঐ আলমারিটা খোল। সেলিনা ইতস্তত করে বলল, আমি খুলব? কেন তুমি কি খুলতে জাননা? পিসি। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেলিনার চোখ ছল ছল করে উঠছে। কিন্তু নীলাঞ্জনার সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বললেন, কি হলো তোমাকে খুলতে বলছিনা? ও বলল কোন চাবি দিয়ে খুলব বলে নীলাঞ্জনার দিকে চাবির রিং এগিয়ে দিল। নীলাঞ্জনা বললেন, এই চাবি দিয়ে খুলবে। সেলিনা একটু দ্বিধান্বিত হয়েও আলমারীটা খুলে ফেলল। নীলাঞ্জনা বললেন, ওই উপরেব তাকের থার্ড প্যাকেটটা নিয়ে এস। সেলিনা নিয়ে এলে নীলাঞ্জনা বললেন, খোল প্যাকেটটা। খুললে বেরিয়ে এল ময়ুর রং-এর একেবারে আনকোরা একটা শাড়ী, অপূর্ব রঙের বাহাব। নীলাঞ্জনা বলেলেন, ওটা দাও আমাকে। তারপর শাড়ীটা হাতে নিয়ে সেলিনাকে বললেন, গত নববর্ষে হঠাৎ খেয়ালে কিনেছিলাম এটা, ঠিক নিজে পরব বলে কিনিনি, তবু প্রান্তিক বলেছিল, পিসি এ শাড়ীটায় তোমাকে ভীষন মানাবে। বলেছিলাম ধ্যাৎ ঐ শাড়ী পড়ার বয়স আছে নাকি? উত্তরে ও কি বলেছিল জান? উৎসুক হয়ে তাকায় সেলিনা শোনার অপেক্ষায়। নীলাঞ্জনা বললেন ও সেদিন বলেছিল, আসলে তোমার মনটা মরে গেছে পিসি তা না হলে বয়স তোমার এমন কিছু নয় যে এই শাড়ী পরতে তোমার অরুচি হবে। সেলিনা বলল ঠিকইতো পিসি। প্রান্তিক ভাইতো কোন অন্যায় কথা বলেননি, আপনার মত সুন্দরী আমি খুব কমই দেখেছি। নীলাঞ্জনা সেলিনার কথাটাকে ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে না দিয়ে বললেন, সব সন্তানের কাছে তার মা সুন্দর। তোমারও তাই মনে হয়েছে সেলিনা। যাক গে সে কথা। প্রান্তিকের সে দিনের সে কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি যে আমার মন মরে গেছে। আপন খেয়ালে যে শাড়ীটা কিনেছিলাম, পরা আর তা হয়নি। প্যাকেট সমেত ওটাকে যেখান থেকে তুমি নিয়ে এলে, ওখানেই ওটা আছে সেই প্রথম দিন থেকে। কেন? পরলেন না কেন? জানতে চাইলো সেলিনা। নীলাঞ্জনা বললেন সে তো ঠিক জানিনা সেলিনা, আসলে পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলাম প্রান্তিকই ঠিক, জোর করে মনটাকে যতই সতেজ রাখার চেষ্টা করিনা কেন, জলের অভাবে তা যে কখন শুকিয়ে যায় বুঝতেও পারিনা আমরা। একটা হতাশা ফুটে ওঠে নীলাঞ্জনার কণ্ঠে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কি বলতে চাইছেন পিসি? হ্যাঁ আমি জোর করে ঐ শাড়ীটা কিনিয়েছিলাম, কারণ কথাচ্ছলে একটা শাড়ীর দোকানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমার ভীষণ পছন্দের শাড়ী, রঙটাও অপূর্ব। আমার ভীষণ মনে রাখবার মত রঙ। বলেছিলাম, তা হলে শাড়ীটা কিনে নাও। বলেছিলেন, আজ টাকা নেই, আর এক দিন কিনব। তাইতো জোর করেছিলাম।

সেলিনা বলল, বুঝতে পারছি প্রান্তিক ভাইয়ের প্রতি অভিমানে আপনি ও শাড়ীটা

পরেননি। আজ তা হলে আমার অনুরোধে এই শাড়ীটা পরুন। সত্যি অপূর্ব লাগবে আপনাকে। ভাবছি পরবো, তারপর বললেন, এবার এই চাবিটা নিয়ে লকারটা খুলে ফেলতো। ওর ভিতর আমার গয়নার বাক্স আছে নিয়ে এস। সেলিনা বুঝতে পারছেনা এসব তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে কেন? উনি নিজেও তো একাজটা করতে পারতেন। কিন্তু এটা তার মনের ভাবনা। বাইরে সে নীলাঞ্জনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলল।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে, পিসীর আজকের আচরণ মোটেই স্বাভাবিক নয়। গয়নার বাক্সটা নিয়ে এলে, নীলাঞ্জনা বললেন, এই আমার যাবতীয় গয়না। বলত সেলিনা এই শাড়ীর সাথে কোন গয়না গুলো আমাকে মানাবে। সেলিনা বলল, আমিতো ঠিক অতশত বলতে পারবো না পিসি। কারণ গয়না পরাব অভ্যেস খুব একটা নেই। আর তা ছাড়া আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে, বা ছোট খাট উৎসবে যে গয়না মানাবে, কোন পার্টিতে নিশ্চয়ই তা মানাবেনা। নীলাঞ্জনা বললেন আমি কোথাও যাবো না, তোমার সামনেই বসে থাকবো। তুমি শুধু দেখবে আমাকে, দেখবে আর বলবে, আমি কি আগের মত আছি। তোমার চোখে আমাকে মানাবে, শুধু সেই গয়না গুলো বের কর। সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাইকে ডাকি। কেন ওকে কেন? শুধু আমি দেখব উনি দেখবেন না? তা ছাড়া যে সাজ আমার ভাল লাগবে ওনারতো তা নাও লাগতে পারে। নীলাঞ্জনা হঠাৎ বললেন প্রান্তিককে তুমি খুব ভালবাস তাইনা? আমি লজ্জায় অন্য দিকে ফিরে শুলাম। সেলিনা বলল, শুধু প্রান্তিক ভাই কেন, আমিতো আপনাকেও ভীষণ ভালবাসি? আমি বিশ্বাস করি সেলিনা, সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস, তা না হলে তোমার জন্য এত অভাব বোধ করি কেন? কেন একদিন না এলে এমন শূণ্য শূণ্য লাগে। কিন্তু কি মনে হয় জান আমার? কি? প্রান্তিককে তুমি এত ভালবাস বলেই, আমাকে তুমি এত ভালবাস। তারপর কি যেন বলতে গিয়ে সেলিনাকে বল্লেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস। সেলিনা বলে থাকনা। কেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছনা? সেলিনা আর কোন কথা না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসে। নীলাঞ্জনা বললেন, প্রান্তিককে আর একজন ভালবাসে তার মন প্রান দিয়ে, তাই তুমি তোমার চঞ্চলতা, চপলতা, হাসি ঠাট্টার মাঝে নিজের বেদনাকে লুকিয়ে রেখে প্রান্তিকের ভালবাসার পাত্রীর জন্য পথ প্রশস্ত করে চলেছো এই তো।

তীব্র প্রতিবাদ করে বলে উঠলো সেলিনা না না পিসি এ মিথ্যা, আমি রেহানার মত ওকে ভালবাসি না। ওমন করে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে, শুধু প্রান্তিক ভাইকে কেন কাউকে ভালবাসিনা। তারপর বলল আমি অনেক তুচ্ছ পিসি, রেহানার ভালবাসার কাছে, আমি একেবারে খেলার সামগ্রী মাত্র। কেঁদে ফেলল সেলিনা। ওকে নিজের বুকের পরে টেনে নিয়ে, চোখের জল নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিতে দিতে নীলাঞ্জনা বল্লেন, আমি জানতাম সেলিনা কান্না ছাড়া তোমার কোন পথ নেই। যতই তুমি বক্সিং-এর মেয়ে হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসনা কেন, আসলে তোমার মন রেহানার থেকেও নরম। আর নরম বলেই মুখে তুমি এত জোর দেখাও। রেহানাকে দেখিনি, হয়তো সে তোমার থেকেও সুন্দরী, হয়তো প্রান্তিককে ভালবেসে সে পৃথিবীকে ভুলে থাকতে পেরেছে। অবশ্য এ শুধু আমার

অনুমান মাত্র। আর তুমি, সবাইকে ভালবেসে, প্রান্তিকের প্রতি তোমার ভালবাসাকে ভুলে থাকতে চেয়েছো। রেহানার কান্না হয়তো একদিন শুকিয়ে যাবে, কিন্তু সেলিনা এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হাসি ঠাট্টার মাঝে যে চোখের জল তুমি অহর্নিশি ফেলে চলেছো তা শুকাবে কি করে?

এমন তীব্র আক্রমণ, মনের অর্ন্তমহলেব সত্যকে এমন করে তুলে নিয়ে আসার স্পষ্ট ঘোষণায় বিব্রত হয়ে পড়ে সেলিনা। তার তো বয়স এমন নয়, তাই আজ যা সে হেলায় হারিয়ে ফেলতে পারে, জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞ নীলাঞ্জনারা তা পারে না। তারা জীবনকে বুঝতে শিখেছেন অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে। কিন্তু তবু সেলিনা একমত হতে পারে না নীলাঞ্জনার সাথে, বলে না পিসি এ আপনার ভুল। আমার কোন দুর্বলতাই প্রান্তিক ভাইকে স্পর্শ করেনি। আমিতো জানি তাকে। হয়তো আপনি আমার থেকেও অনেক বেশি জানেন, তবু বলব, আপনিও প্রান্তিক ভাইকেভাল চেনেননি। ক্ষণিকের দুর্বলতা, ক্ষণিকের ভাললাগা দিয়ে কোন মানুষের বিচার করা যায় না পিসি। তারপর বলল আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখনতো রোজ প্রান্তিক ভাই যেতেন আমাকে দেখতে। মান, অভিমান, অবুঝ জেদে মন যে একেবারে কখনো দুর্বল হয়নি - তা কিন্তু নয় পিসি। কিন্তু সে দিন আমি আর একজনকেও দেখেছি, দেখেছি তার নিবেদিত আত্ম সমর্পণকে, তবুতো রেহানার উপর থেকে এক বিন্দু টলানো যায় নি প্রান্তিক ভাইকে। আসলে আমার মনে হয়, ও কারো কাছে ধরা দিতে চায় না। ও যেন দূর আকাশের তারকা মাত্র। এরপর খিল খিল করে হেসে উঠে সেলিনা বলল, কি পাগল না আমি পিসি? যা নয় তাই ভেবে দুঃখ পাই। তারপব বলল এবার এই শাড়ীটা পরুনতো। নীলাঞ্জনা বললেন, হ্যাঁ এই পরি, তার আগে গয়না গুলো পছন্দ কর। সেলিনা, সত্যি নীলাঞ্জনাকে যা মানাতে পারে এমন বেশ কয়েকটি গয়না পছন্দ করে নীলাঞ্জনার হাতে দিল। নীলাঞ্জনা একটু হেসে তা গ্রহণ করল। তাবপর সেলিনাকে বল, এই ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম আছে। যাও ভাল করে চোখে মুখে জল দিয়ে এসো তো। কেন? তারপরে বলল একেবারে বাড়ী গিয়েই চোখে মুখে জল দেব তা ছাড়া রাতও তো বাড়ছে। নীলাঞ্জনা বললেন, আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসব। আনন্দে হাততালি দিয়ে সেলিনা বলল আপনি যাবেন? হ্যাঁ যাবো, তবে একটা সর্ত্তে। কি? কোন সন্তানকি তার মাকে তোমার মত করে কথা বলে। না বুঝতে পেরে তাকিয়ে থাকে সেলিনা। নীলাঞ্জনা বললেন, প্রথম দিনই তুমি বলেছিলে প্রান্তিকের মা আমি নাইবা হলাম, কিন্তু তোমার মা হতে আপত্তি নেইতো।

না আগে বুঝতে পারেনি সেলিনা, কোন হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা এমন করে কোন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় কি না। সেদিন ছিল নীলাঞ্জনাকে বোঝার স্পৃহা। আর আজ নিজেকে বোঝার তাগিদ। কি চাই আমি? আমার পথ কি ঠিক পথ? বলল, কিন্তু পিসি, আমি কি পারব তোমার যোগ্য মেয়ে হতে। আবারও নীলাঞ্জনা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, একবার আমার বুকে কান পেতে শোনতো মেয়ে এ কিসের হাহাকার। আর তোকে বুঝতে পারবো না? যে তুই, কি ভাবে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিস। তারপর

প্রায় ভগ্ন কণ্ঠে বলেন তোকে যদি আরো কিছুদিন আগে পেতাম সেলিনা। নিজেকে তাহলে কিছুতেই এমন করে শেষ হতে দিতাম না। সেলিনা অবাক। মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে নিশ্চল। দুটি পা যেন নিথর। কোনদিকে এগোবার শক্তি নেই। নীলাঞ্জনা তা বুঝতে পেরে নিজেই সেলিনাকে নিয়ে গেলেন বাথরুমে। তারপর চোখে মুখে জল দিয়ে, আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল্লেন। এবং ময়ুব রঙের শাড়ীটি তার হাতে দিয়ে বললেন আমি ও ঘরে যাচ্ছি, ততক্ষণে, শাড়ীটা পরে ফেলতো। আমি? হ্যাঁরে মেয়ে, তুই না পরলে কি আমি পরবো? পিসি। ঠিক আছে আর কথা বাড়াতে হবে না, তাড়াতাড়ি পরে ফেল।

অগত্যা সেলিনাকে শাড়ীটা পরতে হয়। মিনিট দশেক পরে শাড়ীটা পরে ফিরে এলো, নীলাঞ্জনাতো চোখ ফেরাতে পারেন না দেখে। অপূর্ব মানিয়েছে সেলিনাকে। কিন্তু বড্ড বেখাপ্পা লাগছে খোঁপা। ও টাকে সুন্দর করে বেনী করে দিলে ভাল লাগতো, কিন্তু কোথায় যেন বাধা, পারলেন না বলতে নীলাঞ্জনা। হয়তো ওর ভিতর আছে অনেক স্মৃতি। তাই ওদিকে না গিয়ে, তার জন্য যে গয়না পছন্দ করেছিল সেলিনা, এক এক করে সব গযনা নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন তাকে। তারপর আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখতো ঠিক আছে কি না। আমি কি করে বলব, তুমিই দেখনা। নীলাঞ্জনা ওর খোঁপার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ওটা থাকবে না খুলে নুতন করে বেঁধে দেব? তোমার যা ভাল লাগে। না থাক। তারপর, সন্ধ্যায় যে সাজে সাজতে হয় সেই সাজে সাজিয়ে দেওয়া হল সেলিনাকে। সাজানো শেষ হলে বললেন, চলতো প্রান্তিকের কাছে? কেন আবার ওর কাছে কেন? বাঃ তোর সাজে কোথাও কোন ত্রুটি আছে কি না ও দেখুক।

এই বোধ হয় প্রথম লজ্জায় ভেঙে পড়তে চাইল সেলিনা। বলল না পিসি, আমি যাব না। কেনরে? এই অল্প সময়ে এমন কি হল, যাতে ওর কাছে যাওয়া যাবে না। না ঠিক তা নয় পিসি। আসলে, প্রান্তিক ভাইয়ের ইচ্ছেয় একদিন যে শাড়ী তোমার জন্য কেনা হয়েছিল, সেই শাড়ী পরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না আমি। বেশ, নীলাঞ্জনা বললেন, তা হলে ওকেই ডাকছি। বলে আর অপেক্ষা না কবে ওখান থেকেই চিৎকার করে বললেন, প্রান্তিক একবার এদিকে এসতো।

এতক্ষণে ওদের সব কথাই আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সব কথা শোনা যায় নি। যা শুনেছি, তাতে মনে হয় না, সেলিনার সামনে আমি স্বাভাবিক হতে পারবো, বা সেলিনাও পারবে কী না আগের মত স্বাভাবিক হতে জানিনা। তবু পিসির ডাকে সাড়া দিয়ে এলাম। সত্যি অপরূপা যেন। এরই মধ্যে উধাও বেমানান খোপাটি। নীলাঞ্জনা বললেন, তোমরা কথা বলতে থাক. আমি আরেক কাপ চা খাব। তোমরা খাবে? আমি বললাম, আমি খাব, কিন্তু তোমার মেয়ে খাবে কি না জানি না।

অর্থাৎ প্রান্তিক সবই শুনেছে, ধরে নেয় সেলিনা। বলে আমিও খাব পিসি। নীলাঞ্জনা চলে গেলে, সেলিনা বলে, পিসি জোর করে পরিয়ে দিলেন। যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সেলিনা। বললাম, মা তার মেয়েকে পরিয়ে দিয়েছেন, এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। সেলিনা প্রতিবাদ করে বলল, হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু আমার কাছে এটা

অস্বাভাবিক। কেন? এর কোনটার প্রতি আমার কোন অধিকার নেই। কেন? নেই কেন? কে আমি নীলাঞ্জনা পিসির? তুমি তার মেয়ে সেলিনা। পিসির সম্পর্কে তুমি কিছুই জাননা তাই এসব বলছ। যদি তুমি জানতে, তার জীবনের কোন শূণ্যতা তুমি ভরে দিয়েছো, তা হলে একথা বলতে না।

তারপর হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বললাম, পিসিকে বলনা মেকআপটাকে একটু খানি মডার্ন করে দিতে। কথাটা শুনতে ভুল হয় না নীলাঞ্জনার।

তিন কাপ চা নিয়ে এসে বললেন, যদি ওল্ড বলে কিছু মনে হয়, নিজেই তো তাকে মডার্ন করে দিতে পারো। পিসির উপর দোষারোপ করে কি লাভ? উত্তরে বললাম, লাভ লোকসানের কথা নয় পিসি, আসলে অধিকার। মা মেয়ের অধিকারে আমি বাইরের লোক, আমার প্রবেশাধিকার কি ঠিক হবে।

সবটা হয়তো ঠাট্টা, কিন্তু সেলিনার কেন যে সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল বুঝতে পারছেনা। তবে কি প্রান্তিক ভাই এসব চান নি? ক্ষণিকের জন্যও কি মনে হয় নি, সেলিনা অপূর্ব তুমি, সুন্দর তুমি, তোমাকেও ভালবাসা যায়।

সেলিনা বলল, আপনার যদি হিংসা হয়ে থাকে, পিসিকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছি বলে, আপনি আসুন না, আমার বক্সিংএর রিং-এ। যদি পারেন আমাকে হারিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে নিন না পিসিকে। পারবো না। আমার না উত্তরে বলল পারবেন কি করে, আপনার তো সামান্য পছন্দটুকুর পর পর্যন্ত কোন অধিকার নেই, আপনি দাবি করবেন পূর্ণাঙ্গ মানুষটির অধিকার?

মনে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছে সাবলীল ভাবে। মনে মনে ভাবি, এমন করে বলতে পারে কী করে? কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ কি তার পথরোধ করে দাঁড়ায় না? তারপর যেন কত ব্যস্ত, এমনি দ্রুততায় বলল, কি হল, খুলুন না তাড়াতাড়ি, সময় যে বয়ে যাচ্ছে।

এ সেলিনাকে অস্বীকার করা যায় না। তার দাবি, তার জেদ, তার অভিমান, না মেটা পর্যন্ত যেন রেহাই নেই। আজ সেলিনার উপর কোন দাবি নয়। ও আজ পিসির হয়েই থাকুক। তার শূন্য হৃদয় ভরে উঠুক সেলিনার দুরন্তপনার স্পর্শে, ভালবাসায়, আর শ্রদ্ধায়। বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে, আবার আমার ঘরে এসে বলল, কই চলুন। কোথায়?

এখনো রাত বেশী হয় নি। একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া দরকার। ওকে ওদের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে পিসি এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি পাওয়া গেল একটা ট্যাক্সি। কিছুতেই যাবে না। তারপর অবশ্য রাজী হয়েছে, তবে যাতায়াতে যা হবে তার থেকে ৫ টাকা বেশী দিতে হবে। পিসি তাতেই রাজী। আমার আর যাওয়া হয়না।

সেলিনা বাড়ীতে বেল দিতেই রেহানা দরজা খুলে দিলো। আর সামনে নীলাঞ্জনাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, আপনি? আমাকে চেন কি? না মানে। সরাসরিই বল না আমাকে চেন কি না। ওর অবস্থা তো তথৈবচ। কিছু বলতেই যেন ভয় পাচ্ছে। সেলিনা পাশে এসে

বলল। রেহানা আমার দিদি। সেতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু ও আমাকে চেনে কী না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এত দ্বিধা কিসের? তবুও কোন উত্তর না দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল ভিতরে আসুন। নীলাঞ্জনা ভিতরে ঢুকতেই তাকে পা ছুয়ে প্রণাম করল রেহানা। বলল, চলুন, ভিতরের ঘরে মা আছেন। রেহানা নীলাঞ্জনাকে ভিতরের ঘরে, যেখানে আফরোজ বেগম আছেন সেখানে নিয়ে এসে বলল, আমার মা। সেলিনা সম্ভবত আগেই কিছু বলে থাকবে। নীলাঞ্জনা নমস্কার করতে আফরোজ বেগম বললেন, কি সৌভাগ্য আমার আপনি এসেছেন আমার ঘরে। কেন, আমি কি আসতে পারি না। আপনি এবং আপনার মেয়েরা এত করবেন। আর আমি সামান্য আসতে পারবো না। তা হয় নাকি? রেহানা তখনো দাড়িয়ে আছে দেখে আফরোজ বেগম বললেন, যা তো মা, ওনার জন্য এক কাপ কফি বা চা যা হোক নিয়ে আয়। রেহানা, রান্না ঘরে গিয়ে চায়ের জল বসিয়ে চলে এল নিজের ঘরে, সেলিনাও আছে ও ঘরে। ভীষণ ভাল লাগছে সেলিনাকে। সত্যি সাজলে ওকে এত ভাল লাগে, যা কল্পনাও করা যায় না। রেহানা অকারণ ওকে জড়িয়ে ধরল। সেলিনা একটু হাসল তারপর বলল, আচ্ছা রেহানা, আমি ওখান থেকে আসলে দেখি রোজ আমাকে জড়িয়ে ধরিস, কি পাস এতে। আর কেন যে তুই এত ভীরু, কেন যে তুই তোর দাবি প্রকাশ করতে পারিসনে, কেন যে মিছিমিছি কষ্ট পাস আমি বুঝি না। তারপর বলল, না রেহানা, আমি তোর হয়ে আর এত প্রক্সি দিতে পারবো না। এবার থেকে তোর নিজের জিনিষের দায়িত্ব নিজে বুঝে নিবি। আমার দ্বারা আর কিচ্ছুটি হবে না। আর তাছাড়া আজ প্রান্তিক ভাই যা অপমান করেছেন তাতে আমি আর কোনদিন যাবো না ওর কাছে।

ব্যাথা পায় রেহানা, বলে প্রান্তিক তোকে অপমান করেছে? সত্যি বলছিসতো। সেলিনা বলল তোকে মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ? রেহানা বলল, দাঁড়া খুলিসনা কিছুই, আমি আসছি।

রেহানা চা মিষ্টি, নিমকি বিস্কুট সবকিছু একসঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে আসে যে ঘরে নীলাঞ্জনা আছেন সে ঘরে। ওগুলো সব এক জায়গায় নামিয়ে রেখে পাশে সরে দাঁড়ায়। নীলাঞ্জনা অপলক তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। এত কী দেখছেন কে জানে? লজ্জা পায় রেহানা। নীলাঞ্জনা বলেন বোস এখানে। রেহানা একটু দুরে বসে। নীলাঞ্জনা জানতে চায় তুমি তো প্রান্তিকের সঙ্গে এবার পরীক্ষা দেবে তাই না। রেহানা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। কলেজে যাচ্ছ তো নিয়মিত? হ্যাঁ। শুনেছিলাম তোমার শরীরও বেশ খারাপ ছিল। তা এখন ভাল আছো। হ্যাঁ ভাল আছি। নীলাঞ্জনা বললেন ওতো প্রায় দেড় মাস হতে চলল কলেজে যেতে পারছেনা। তুমি এর মধ্যে একদিনও গেলে না কেন আমাদের ওখানে? কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে রেহানা। অবশ্য তার উত্তর দেওয়ার মতো কিছু ছিলও না। চা খেতে খেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখে নেন নীলাঞ্জনা রেহানাকে। রেহানা বলল আপনি মায়ের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি। তাকে বাধা দিয়ে নীলাঞ্জনা বললেন না শোন। ও দাঁড়ায়। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট এবং একটা গয়নার বাক্স তার হাতে দিয়ে বল্লেন শুধু ছোট মেয়েকে দেব, বড় মেয়েকে দেব না তা তো হয় না মা, এটা নাও। না

করো না। আফরোজ বেগম বাধা দিয়ে বললেন এসব আপনি কি করছেন দিদি। এমন ভাবে ঋণে জড়াচ্ছেন কেন আমাদের। নীলাঞ্জনা খানিকটা আপন মনে বললেন ঈশ্বর আমাকে মা হওয়ার অধিকার দেন নি, ভালই করেছেন, তার যা ইচ্ছে। শুধু তার বিরুদ্ধে একটা মাত্র অভিযোগ, কেন তিনি আমার মাতৃ হৃদয়টাকে বাঁচিয়ে রাখলেন? একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে এরপর রেহানাকে বললেন, না ও মা না করোনা। রেহানা আবার এগিয়ে এসে তাকে প্রণাম করল এবং ওগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো। নীলাঞ্জনা বললেন, এবার যে আমাকে উঠতে হবে দিদি। রাত হয়েছে, প্রান্তিক একা আছে। আফরোজ বেগম জানতে চাইলেন ও কেমন আছে? উত্তরে নীলাঞ্জনা বললেন এখন অনেকটা ভাল। তবে পুরো সুস্থ হতে হয়তো আরো কিছু সময় নেবে। আফরোজ বেগম আপন মনে বললেন আল্লাহ্ তুমি পরম করুণাময়। না আর দেরি নয়। উঠে পড়লেন নীলাঞ্জনা। ওখান থেকে এলেন ওরা দু'বোন যে ঘরে আছে সে ঘরে। নীলাঞ্জনা শুনতে পাচ্ছেন, রেহানা বলছে ছিঃ সেলিনা, এই সামান্য ব্যাপারে কাউকে ভুল বুঝতে নেই। ও মোটেই তোকে অপমান করেনি। গোধুলি সন্ধ্যায় যা ছিল সত্য এবং সুন্দর, অস্ত সন্ধ্যায় তাকে হয়তো তত ভাল বলে মনে হয়নি, বাসি ফুলের মত তাই তাকে ফেলে দিয়েছে। এতে তুই অপমানিত বোধ করছিস কেন? নীলাঞ্জনা বাইরে থেকে ওকে বললেন, সেলিনা আমাকে যে উঠতে হবে মা, তারপর রেহানাকে বললেন, ডাঃ সরকারের চেম্বার তো কাছেই তাই না? চল না রেহানা আমাকে একটু ওই চেম্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

পথে আসতে আসতে রেহানাকে বললেন, মিনতি সেন ফোন করেছিলেন। তোমাকে ও প্রান্তিককে ভীষণ ভাবে যেতে বলেছেন, বিশেষ দরকার। কাল দুপুরে তুমি প্রান্তিককে নিয়ে একবার যেও। আমাকে বলেন নি, কি দরকার, তবে প্রয়োজন এটা বুঝতে পারছি। যাচ্ছ তো? আস্তে রেহানা বলল নিশ্চয়ই যাব। চেন তো আমাদের বাড়ী। অসুবিধা হবে না। আচ্ছা এরপর আর কোন কথা না বাড়িয়ে একটা চলতি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন নীলাঞ্জনা পিসি।

রেহানা বলল, আপনি ডাক্তার সরকারের চেম্বারে যাবেন বললেন যে। না আজ আর হবে না। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বললেন, কাল যেও কিন্তু। নিশ্চয়ই যাব। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল।

দুপুর বেলা, বাড়ীতে এসে বেল দিল রেহানা, আমি শুয়ে আছি, আবারও ডোর বেলটা বাজছে। পিসি নেই। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আমিতো অবাক। কয়েকটা মুহূর্ত্ত মুখে কোন কথা নেই। তারপর বললাম রেহানা তুমি! মৃদু হেসে রেহানা বলল, তুমি বুঝি আমাকে চাওনি না? আমি অভিমান করে বললাম জানিনা। ভিতরে আসব? আসবে না কেন? যদি আমাকে দেখে তোমার ভাল না লাগে, যদি অসুস্থ হয়ে পড়। আমি ওর কথার প্রতিবাদ না করে বললাম, বাজে কথা না বলে ভিতরে এস।

বিছানার চাঁদরটা এলোমেলো। বালিশের ওয়াড় এবং ঢাকনা ঠিক জায়গায় নেই। পড়ার টেবিলটা কবে থেকে জঞ্জাল হয়ে আছে। আমি বিছানায় বসতে গেলে ও বলল,

এই চেয়ারটায় বোস না। কেন? আরে বোস না? আমি চেয়ারটায় বসলে, ও তার অভ্যস্ত হাতে সুন্দর করে বিছানাটা গুছিয়ে দিল। পড়ার টেবিলটাও গুছিয়ে ফেলল এর মধ্যে। বালিশ ওয়াড় ঢাকনা যেমনটা হওয়ার কথা তেমনি করে দিয়ে বলল, এখন শোবে? না থাক বসেই কথা বলছি। রেহানা বলল না, তুমি শুয়েই পড়। আমি বসছি তোমার মাথার কাছে। তুমি শুয়ে শুয়েই কথা বল আমার সঙ্গে। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। ও বলল আমার সঙ্গে কথা বলবেনা? তার পরে বলল এটা রাগ না আমার উপস্থিতি তোমর কাছে বিরক্তি কর লাগছে?

কি যে বলব ওকে। আমি ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, আমি নিষ্ঠুর তাই না? আমি পাষাণ এইতো? হ্যাঁ তাইতো। আর তুমি? কি আমি? এই দেড় মাস কি আমাকে ভুলে যাওয়ার সাধনা করছিলে? তুমি চুপ করবে? কেন চুপ করব? আমার প্রাণ নেই? মন নেই আমার? দেহ কি রক্ত মাংসের নয়? এই সব বুঝি ভাব সব সময়? সত্যি কি ছেলেমানুষ তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ছেলেমানুষ।

রেহানা বলল, থাক ও সব কথা প্রান্তিক। তুমি যেতে পারবে আমাব সাথে? কোথায়? আমার সঙ্গে যাবে তাও প্রশ্ন? না প্রশ্ন নয়। শরীর পারমিট কববে কিনা তাই শুধু ভাবছি। ভাবছ, কিন্তু কেন? আমি তো সঙ্গে রয়েছি। বললাম, হ্যাঁ তাতো আছই। ও বলল আমার প্রশ্নের কিন্তু কোন উত্তর দাও নি এখনো। সব উত্তর দেওয়া যায় না রেহানা। তাছাড়া তুমিতো এই সবে এলে। এখন বলছ, তুমি আমার সঙ্গে আছো, অথচ এই দেড় মাস? তুমিতো একবারও আমার কথা ভাববার সময় পাওনি। ও বলল, কেন বোঝ না? তাছাড়া আমার আসাটাই কি সব? আমি তোমার মন জুড়ে আছি কিনা সেটাই তো আসল কথা? উত্তরে বললাম যদি বলি না নেই। রেহানা বলল, তোমার বলার অপেক্ষায় থাকবনা সেদিন। যেদিন জানতে পারবো, রেহানা নয়, আর কেউ তোমার মন জুড়ে আছে। কোন অনুযোগ বা অভিযোগ জানাব না। এমনিই চলে যাবো। তোমাকে বুঝতেও দেবনা। আমি বললাম, তুমি এমন করে দূরে দূরে থাক কেন? এ তোমার ভুল। আসলে এখনো তুমি আমায় আলাদা করে ভাবো। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, তোমার বুঝি তাই মনে হয়। না বলে একটু হেসে উঠে গিয়ে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে বলল, কই ওঠ। তুমি আমাকে হাত ধরে তোল। তুমি নিজেই ওঠ প্রান্তিক। তবু তুমি কাছে আসবেনা। আসতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে মন তোমার ভীষণ দুর্বল, তোমাকে আমি কোন ভাবেই ছোট হতে দিতে পারি না প্রান্তিক। তুমি যে আমার অহঙ্কার, একি তুমি বোঝনা? কিসে যে কার অহঙ্কার হয় এক দম বুঝিনা। কিন্তু একথা ঠিক, সত্যি বুঝি দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি বুঝি চরম ভাবে পেতে চেয়েছিলাম এমন কিছু, যা ভালবাসার ঐশ্বর্য নয় লুণ্ঠনের সম্পদ মাত্র। বললাম, না রেহানা তোমার অহঙ্কারের কোন অপমান হোক, তা আমি হতে দেবনা। এস, আমার কাছে, ভয় নেই।

রেহানা আস্তে আস্তে এল আমার কাছে। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও নীচু হতেই আমি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে উঠে পড়লাম। ও বলল, জামা কাপড়টা পরে নাও। আমি পরে নিয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। জানতেও চাইলাম না কোথায় যাবে। রাস্তায় এসে

জানতে চাইলাম, তুমি সঙ্গে আছো, তাইতো কোন ভয় নেই। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তাই আমি নিশ্চিন্ত। তবু রেহানা, কোথায় আমরা যাবো তা কি আগে থেকে একবারও বলা যাবেনা? রেহানা বলল, তুমি মুখে যাই-ই বলনা কেন, আসলে তোমার মনের মধ্যে এখনো দ্বিধা। তারপর হেসে বলল, কিন্তু আমি চাইনা প্রান্তিক এ দ্বিধাটুকু মুছে যাক। তাই তুমি তোমার মতো ভাবতে থাক, দেখবে আমরা ঠিক জায়গায় পৌছে গেছি যেখানে তুমিও যেতে চেয়েছিলে। মিনতি সেনের বাড়ী বেল দিতেই মিনতি সেন বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে বললেন একি চেহারা বানিয়েছ প্রান্তিক। মিনতি সেনকে সব কথা খুলে বললাম। তারপর বললাম দাদু কই। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মিনতি সেন। আমি বুঝতে পারছি কি হয়েছে। বললাম, একটা সংবাদ দিতে পারলেন না পিসি। কি করে দেব? আমি তো তোমার বাড়ীর ঠিকানা জানিনা। অফিসে তোমার পিসিকে বেশ কয়েক বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উনিও আসেননি। তারপর বললেন, তোমরা যেদিন গেলে, তার পরের দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাস কষ্ট আরম্ভ হয়। ডাঃ বাবুকে কল দেওয়া হয়। আসেনও, কিন্তু তার আগেই সব শেষ। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন মিনতি সেন। আমিও কেঁদে ফেললাম। রেহানার চোখেও জল। মিনতি সেন নিজের চোখের জল নিজে মুছে নিয়ে আমাদের বললেন কেঁদোনা। একটা বন্ধ খাম দিয়ে গেছেন তোমাকে। যখন তার প্রায় শেষ মুহুর্ত্ত আমি তার মুখের পরে ঝুকে বললাম, কিছু বলবে বাবা। এই বন্ধ খামটা কাঁপা কাঁপা হাতে বালিশের নীচ থেকে বের করে আমার হাতে দিয়েই এলিয়ে পড়লেন, আর কোন সাড়া শব্দ নেই। সব শেষ। খামটা হাতে নিয়ে দেখি তোমার নাম। তুলে দিলেন বন্ধ খামটা আমার হাতে।

আমি বললাম কি আছে ওতে? মিনতি সেন বললেন জানিনা, আমি খুলিনি। তবে বাবা কি বলে গেছেন তোমাকে তা জানবার একটা ভীষণ ইচ্ছে থেকেই তোমাকে বার বার ফোন করেছি, তুমিও আসনা অনেকদিন। পরে জানতে পারি যে তুমি খুব অসুস্থ ছিলে। তোমার পিসিও খুব অসুস্থ ছিলেন।

রেহানা বলল, হ্যাঁ, পিসি, ওনার শরীর এখনো ঠিক নেই। নীলাঞ্জনা পিসিই আমাকে বললেন, আপনার মনে হয় খুব প্রয়োজন তাই যেন, আমি একবার অবশ্যই করে ওকে নিয়ে আসি আপনার এখানে। কিন্তু দাদু নেই, একদম ভাল লাগছেনা। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তাতেই যেন কত আপনার ছিলেন আমার। একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না। অভিমান বেজে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

আমি চিঠিটা খুলে ফেলি। কাঁপা কাঁপা হাতের অক্ষর। দাদু ভাই, আমার বোধহয় দিন ঘনিয়ে এসেছে, হয়তো তোমার সাথে আর কোন দিন দেখা হবে না। দিদি ভাইয়ের সঙ্গেও তাই। তোমাদের দুজনের জন্য আমার হৃদয় নিংড়ানো আর্শীবাদ রইল। অনেক বাধা আসবে তোমাদের জীবনে। সমাজ এখনো তোমাদের মত মানুষদের গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত নয়। তবু আমি সে যুগের ধ্যান ধারণা নিয়েও তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করছি। একদিন তোমরাই এই হতভাগ্য সমাজকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারবে বলে আশা করি। যেখানে ধর্ম নয়, ভালবাসা আর মানবতাই মানুষের শেষ পরিচয়। আর একটা কথা,

আমাব মেয়ে মিনতি। জানি না তোমরা তার কথা জান কি না? যদি জান তা হলে আমার কথাও জান, আমি তোমাদের সেই সব ভয়ংকর কথাগুলো মনে করিয়ে দিতে চাইনা। তোমরা যেখানেই থাক, ওকে একটু দেখ। এই আমার শেষ অনুরোধ। তোমাকে এবং দিদি ভাইকে যেটুকু বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে তোমাদের পেয়ে ও অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারবে। যদি প্রতীমের সঙ্গে তোমাদের কখনো দেখা হয়, তাহলে বলো, সে যেন সব কিছু মেনে নিয়ে মিনতিকে গ্রহণ কবে, জানিনা সে এখন কোথায় আছে, জীবনে তার কেউ এসেছে কি না তাও জানিনা। তোমরা মিনতির ছেলে মেয়ের মতন, তবু কেন তোমাদের এই দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, সে উত্তর জানতে চেও না। শুধু এই বিশ্বাস রেখে যাচ্ছি, মিনতির মায়ের ভুলেব জন্য কিছুতেই তার জীবনটাকে তোমরা নষ্ট হতে দেবে না। তোমরা থাকবে ওর পাশে। যদি কোনদিনও প্রতীমের খোঁজ না পাও। ওর জীবনটা তোমবাই ভরে দিও। হাসি আর আনন্দে কোন দিনও যেন ও না ভাবে, ও বড় একা। দেখেছি তোমাদের পেয়ে ও কত বদলে গেছে। বাবা হয়ে সব সময়ই তো তার এই আনন্দময় জীবন আমি চেয়েছি। দিতে না পাবার জন্য আমার দায়িত্বকে আমি অস্বীকার করি না। আর একটা কথা, মিনতি আমার কোন কিছুই স্পর্শ করে না সেই ঘটনার পরে, তবু আমি তার বাবা। তাকেই দিয়ে গেলাম সর্বস্ব। তোমরা ওকে গ্রহণ করতে বল হতভাগ্য পিতার এই স্নেহের দানকে। সারাজীবনে যা পারলাম না, আজ প্রাক-বিদায় মুহূর্ত্তেও তা পারবো না সাবা জীবন নিজের ভুলের প্রাযশ্চিত করতে চেয়েছি, পারিনি। মিনতি আমায় তার মায়ের ওই ট্যাজিক মৃত্যুর জন্য সমস্ত দোষ আমাব পরে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। আমি তা মেনে নিয়েছি। তবু যে সে আমায় ক্ষমা করেনি, তা বুঝি। যদি তোমাদের কথাও সে না শোনে তবে আমার রেখে যাওয়া যাবতীয় সম্পদকে তোমরা মানবিকতার প্রচারে ব্যয় করো এই আমার শেষ দাবি। মিনতিকে বলে যেতে পারলাম না। নিজের অহঙ্কারের কাছে হার মেনেও জীবনের শেষ দিনেও জিততে চেয়েছি। আশা করবো, তোমরা আমাকে বুঝবে। সময় যে ফুরিয়ে আসছে তাও বুঝতে পারছি। হাত কাঁপছে। কাল চলে যাওয়ার পরে জবার মাকে বললাম, কালি আর কাগজ দাও। ওর কাছ থেকে কাগজ আর কালি নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতের অক্ষরে আমার যা কিছু বলার তোমাকে বলে গেলাম দাদুভাই। তোমাকে হয়তো মুখোমুখি কোন কথাই বলতে পারতাম না। প্রতীম, সব ভুলে ওকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মায়ের মৃত্যু যে জন্য দায়ী তাকে সে কেমন ভাবে গ্রহন করবে? তাইতো তাকে গ্রহণ করতে পারলনা মিনতি। তোমাকে বলে যাচ্ছি, মিনতির মা, একটা ভুলের পিছনে ছুটে নিজের জীবন যেমন শেষ করেছে, তেমনি অভিশপ্ত করে দিয়েছে মিনতির সমস্ত জীবনটাই। আর আজ এই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে বলছি। মিনতির মা সম্পূর্ণ ভুল আশঙ্কায় আমাদের পরিবারটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। আমার এই কথাটা তুমি বিশ্বাস কর দাদুভাই। এত কথায় হয়তো ভাবছ, এত লোক থাকতে তোমাদের বললাম কেন। বললাম এই জন্য, যে মানবিকতা তোমদের ভিতরে আমি দেখেছি তাতে কেবল তোমাদের কাছে রেখে যাওয়া যায় আমার জবান বন্দী।

হয়তো মনে তোমার প্রশ্ন, প্রতীমকে কেন সহ্য করতে পারেনি মিনতির মা। এটা ওর মায়ের ভুল। আবারও বলছি আমার এই কথা তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পার।

আলাদা একটা কাগজে আমি আমার যাবতীয় হিসেব দিয়ে গেলাম। মিনতিকেই দিলাম। বেঁচে থাকতে সে আমার কিছুই ছোঁয়নি। মৃত্যুর পরে ছোঁবে কিনা জানিনা, ভয় হয় যদি নিতে না চায়, ও যেন তোমাদেরই সব দিয়ে যায়, তার প্রতি এই আমার শেষ আদেশ। তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। হতভাগ্য - দাদু।

আমি যতক্ষণ চিঠি পড়েছি রেহানা ও মিনতি সেন তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমার পড়া শেষ হলে দু চোখ ভরে জল নেমে এল। এতে এমন কোন আবেগ মাখা কথা নেই, আছে পিতা ও মেয়ের চরম মান - অভিমানের কথা। যা কখনো বুঝতে পারিনি। চিঠিটা পড়া হলে, ওটা আমি রেহানাকে দিই। রেহানা বলল আমাকে কেন? বললাম আগে তুমি পড়। তারপর পিসিকে দাও। উনি পড়বেন সবশেষে। কারণ শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন উনি। আমার কথা কিছু লিখেছেন? বললাম, সব কথাই আপনাকে নিয়ে, তবু ও আগে পড়ুক। তারপর আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। কিন্তু পিসি, এত ব্যথা কেমন করে গোপন করে এত দীর্ঘ দিন পথ চলেছেন আপনি। ভুলতো মানুষেই করে, তাই বলে, তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে? আপনিতো মা। পারবেন এমন অন্যায় করলে আমাদেরও শাস্তি দিতে? পারবেন আমাদের দেওয়া কঠিন শাস্তি আপনার বাবার মতন গ্রহণ করতে? কেন এমন করলেন পিসি।

মিনতি সেন কোন কথা না বলে, রেহানার পড়া শেষ হলে চিঠিটা এক নিমেষে পড়ে নিলেন। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাকে বুকের পরে তুলে নিয়ে ওনার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। রেহানাকে বললাম, চল আমরা নীচের ঘরে যাই, ওনার এখন একা থাকা দরকার। দরকার ভীষণ ভাবে দরকার কান্নার, তবেই যদি হাল্কা হতে পারেন। রেহানা বলল, কি অদ্ভুত তাইনা। অথচ এত ব্যথা যে দুজনেই বয়ে বেড়াচ্ছেন দেখে বোঝার উপায় নেই। আমি বললাম ঠিক তোমার মত। যা!

অনেকক্ষণ পরে, জবার মা আমাদের ডেকে পাঠালেন উপরে। মিনতি সেন কাঁদতে কাঁদতে একটু শান্ত হয়েছেন, চোখ দুটো লাল। চুল এলোমেলো। শাড়ী অবিনস্ত। তবু যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। রেহানা ওকে নিয়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে একটু বিন্যস্ত করে নিয়ে এলো। উনি বসলেন খাটের রেলিংএ হেলান দিয়ে। তারপর বললেন, তোমরা দু'জনেই বাবার চিঠি পড়ছো? এখন তোমরাই বল আমার কি করণীয়।

আমরা সবাই চুপ করে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। উনি বললেন, কি হলো প্রান্তিক কিছু বল। আমি বললাম পিসি। আজই কিছু করতে হবে, তারতো কোন প্রয়োজন নেই। থাক না কয়েকদিন পর করলেও হবে। আরো কয়েকবার পড়ুন চিঠিটা। তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন কি করা সম্ভব, বা কি করা উচিত। মিনতি সেন বললেন, বাবার বুকে যে এত ব্যাথা জমা ছিল আমি বুঝতে পারিনি। সব সময় মনে হয়েছে মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবাই দায়ী। তাই তার অহঙ্কার আমি মেনে নিতে পারিনি। আর

তাই তার সবকিছুকেই প্রাণপনে এড়িয়ে চলেছি। মায়ের যে কোন ভুল থাকতে পারে মনেই হয়নি কখনো। এখনতো আবার নতুন করে সব কিছু ভাবতে হবে। বললাম, তাই ভাববেন, তার আগে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। মিনতি সেন বললেন, সময়ই সব ঠিক করে দেবে জানি, হয়তো এমনও হতে পারে তোমাদেরও আমি আর সহ্য করতে পারছিনা, তাই আমি বাবার সব কিছু তোমাদের দিয়ে যেতে চাই প্রান্তিক। বললাম তার মানে আপনার বাবার প্রতি অভিমান আজো তেমনি আছে, তার চেয়ে আমি বলি কি, এই মুহূর্তে তার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তো পালিয়ে যাচ্ছিনা। আর তাছাড়া আপনিও কোন দিন পারবেন না আমাদের এড়িয়ে চলতে। মা কি পারে তার সন্তানদের এড়িয়ে চলতে। পেরেছেন কি আপনার বাবা। পারেন নি? তাই কেন এসব ভাবছেন পিসি? অতীতের তিক্ততা মুছে ফেলুন। বরং ভাল করে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে প্রতীমবাবুর কোন জায়গা আছে কি না। যদি থাকে, তাকে গ্রহণ করুন একান্ত আপন করে। তা হয় না প্রান্তিক। কেন হয় না। জানিনা। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই আবেগের বশে নেবেন না। আপনার হিতাকাঙ্খীর অভাব নেই। ব্যারিষ্ট্রার ভট্টাচার্য সাহেব, পুলিশ কমিশনার আপনার কাকাবাবু, এদের সবার সঙ্গে নিজের কথা নিয়ে আলোচনা করুন। তাদের কথা শুনুন। তারপর যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনি নিজেই নিন। আপনার বাবার ব্যাথাটাও বোঝবার চেষ্টা করুন। নিজের জেদটাকে বড় করবেন না পিসি। সত্যিকারের সত্যের আলোকে নিজেকে যাচাই করুন। এরপরও যদি মনে হয়, আপনার জেদটাই বড়, তবে জেদ নিয়েই থাকবেন, শুধু অকারনে কারো প্রতি কোন অবিচার করবেন না, এই আমাদের অনুরোধ। মিনতি সেন তাকালেন রেহানার দিকে, কি রে মেয়ে তুই কিছু বলবিনা?

ফোনটা বেজে উঠলো। আমি গিয়ে ফোনটা ধরলাম। হ্যালো আমি ভট্টাচার্য বলছি, মিস সেন আছেন? হ্যাঁ ধরুন আমি দিচ্ছি। হ্যালো আপনি কে বলেছেন? আমি প্রান্তিক। হ্যালো, ইয়ং ম্যান তোমাকেই দরকার। এতদিন কোথায় ছিলে? খুব অসুখে পড়েছিলাম। আজ একটু ভাল হতেই এখানেই এসেছি? খুব দরকার? হ্যাঁ দরকার তো বটেই। তোমার থেকেও বেশী দরকার রেহানাকে। আমি বললাম ওতো এখানে আছে। যদি বলেন আসতে পারি। দরকার নেই। তোমরা কতক্ষণ আছ? আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই আসছি। মিস সেনকে বলে দিও। মিনতি সেনের সঙ্গে কথা না বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলেন উনি। আমি মিনতি সেনকে সব কথা খুলে বললাম। উনি শুনলেন, কিন্তু কোন কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। জবার মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদিমনি, আপনাদের চা বা কফি দেব? হ্যাঁ দাও।

আধ ঘন্টার আগেই এলেন ব্যারিষ্টার সুরেশ ভট্টাচার্য। বড় এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়েই এলেন। মিনতি সেন বললেন কি ব্যাপার? মিষ্টি নিয়ে যে? হ্যাঁ ভাবলাম, এই ভাল সংবাদটি দেওয়ার জন্য আপনাকেই মিষ্টি খাওয়ানো দরকার। মিনতি সেন বললেন বুঝতে পারলাম না। অনুমান করুন না। কি অনুমান করি বলুনতো আপনাদের জীবন এত বিস্তৃত যে, কোনটা ভাল আর কোনটা ভাল নয় এতো বোঝা মুসকিল। পরে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ইয়ং ম্যান তুমি কিছু অনুমান করতে পার? আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। উনি চোখ ফেরালেন

রেহানার দিকে। বললেন মা আজকের দিনে জবার মায়ের হাতের কফি রুচবে না। বরং তুমিই কফিটা করে নিয়ে এস। মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন ভট্টাচার্য সাহেব। রেহানা বলল, এই আনি কাকাবাবু। ও চলে গেলে, মিনতি সেন বললেন, সংবাদ যে খুবই ভাল বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের এই সংশয়ে রেখে আপনি কি সত্যি আনন্দ পাচ্ছেন? কিন্তু আপনারা যে বুঝতে পারছেন না তাতেই আমার আনন্দটা মাটি হয়ে যেতে বসেছে। তা হলে বলেই ফেলুন বললেন মিনতি সেন। ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, এক নাম্বার ডালিমদের কেসটা যে এত তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হবে বুঝতে পারিনি। ডাক্তার সরকার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে এমন সাক্ষ দিলেন যে বিচারক আর জেরা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি রায়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ডালিমরা প্রশ্নাতীত ভাবে দোষী বলে তিনি মনে করেন। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে তিনি তার রায়ে ১০ বছর সশ্রম দণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ডালিমকে৷ শুধু তাই নয়, দন্ড শেষ হলে, বাইরে এসে তারা যাতে এমন কোন অপরাধ না করতে পারে, তার জন্য পরবর্তী ১০ বছর পুলিশ যেন তাদের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর রাখেন এ আদেশও দিয়েছেন। থামলেন ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্য। তারপর বললেন, তার এই রায়ের পিছনে পুলিশের ভুমিকাও উল্লেখ করার মত। তবে অবশ্য সমস্ত কৃতিত্ব আপনার কাকা মাননীয় পুলিশ কমিশনারের।

রেহানার আনন্দে চোখে জল এসে গেল। মিনতি সেন ওকে বুকের পরে টেনে নিয়ে বললেন, অপরাধের শাস্তি একদিন হবেই এ বিশ্বাস আমার ছিল বলেই ভট্টাচার্য সাহেবকে কেসটি নিতে এমন অনুরোধ করেছিলাম। ভট্টাচার্য সাহেব অবশ্য একটা কথা বললেন, ডালিমরা অপরাধ নিজমুখেই স্বীকার করে নিয়েছে তাই বিচারকের পক্ষে রায় দান অনেকটা সহজ হয়েছে।

'আর ডালিমরা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে' এই একটা কথাতেই কেমন যেন হয়ে উঠলো রেহানা। তারপর অবশ্য সব ঠিক হয়ে যায়। মিনতি সেন বললেন, তাহলে তো মিষ্টি আপনাকেই খাওয়ানো উচিত। সে আর বলতে, তবে এই ভালো সংবাদটা দেওয়ার জন্যই আমি কিন্তু মিষ্টি নিয়ে আসিনি, আমি মিষ্টি নিয়ে এসেছি, আমার মেয়ে শান্তা আজ আমাকে সকালে বাঙালী কৃষ্টি অনুসারে প্রণাম করছে বলে। আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। বলেন কি ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্য। সামান্য একটা প্রণাম এত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তার মত ধ্যক্তির কাছে ভাবতেও অবাক লাগে। মিনতি সেন বললেন এটাতো স্বাভাবিক ভট্টাচার্য সাহেব। জানি এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা যে কত অস্বাভাবিক হতে পারে আপনারা তা বুঝবেন না। আমার নিজেরও একদিন জীবনের সহজ স্বাভাবিকতা মেনে নিতে অসুবিধা হতো। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে। যেদিন রেহানা বিধর্মী হয়েও আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, কি যে হল মিস সেন তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। মনে হল এ যেন যুগ যুগান্ত প্রবাহিত এক স্রোতাস্বিনী ধারা। জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এ যেন এক সঙ্গীতের অনুরনন। মনে হল, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, স্নেতো মায়ের আশীর্বাদ। বিলেতে প্রণামের মর্ম বোঝেনা। এর ভিতর

যে মাধুর্য, সৌন্দর্যের আধারে জীবনকে তা রসায়িত করে। যে প্রণাম করে তাব স্বকীয় অবনমতায ভাস্বর করে তাকে যাকে সে প্রণাম করে। জিজ্ঞেস করলাম শান্তাকে, হঠাৎ প্রণাম কবলি যে। বলল জানিনে কেন করলাম বাপী, এও এক পরিবর্তন মিস সেন যে কোনদিন ড্যাড ছাড়া বলেনি, সে বলছে বাপী, তারপর বলল, হঠাৎ ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস পড়তে গিয়ে মনে হল কোন মানুষই তার মাটির স্পর্শ ছাড়া বড় হতে পাবে না। ঔদার্য্যের সঙ্গে অপরকে গ্রহণ কবা যেতে পারে তাচ্ছিল্য করে নিজেকে অস্বীকাব না করে। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, কি যেন ভাবছে মেয়েটি। একদিন বলল, ডন একদিন আসতে চেয়েছে নিয়ে আসব? ডন মানে যে ছেলেটিকে শান্তা ভালবাসে। আমি বললাম অবশ্যই আনবি। যাকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে চাস তাকে একবার দেখাবিনা। ও ভেবেছিল আমি বোধ হয় প্রতিবাদ করব। তাতে অবাক হয়ে বলল, আমি যাকেই পছন্দ করব তাকেই তুমি মেনে নেবে? বলেছিলাম না নেওয়ার কি আছে? জীবনটা তোমার, তোমার জীবনের সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। আজীবন ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে এসে নিজের মেয়েব ক্ষেত্রে তা মানবনা তাতো হয় না। বলল, যদি তোমার সামাজিক আদর্শের সঙ্গে তার আদর্শের মিল না খায়? বলেছিলাম নাই বা খেল। আমিতো ধর্ম মানিনা মা, সমাজও বোধ হয় আমাকে খুব একটা পছন্দ করে না। তার জন্য মাঝে মাঝে অনুতাপ হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ অহংকার বোধ হয় ভাল নয়। যে মাটিতে আমার জন্ম তার রস না নিয়ে টবের ফুলের মত অন্যের পরিচর্য্যায় বড় হয়ে ওঠা হয়তো আপাত সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটাতে পারে তবে তার অপমৃত্যু হতে বেশীক্ষণ লাগে না। পরিচর্য্যার অভাবে তা শুকিয়ে যায় যে কোন মুহূর্তে, কিন্তু মাটির রসে যে ফুল ফোঁটে তাতে পরিচর্য্যার দরকার হয় না। সঞ্চিত জলধারাই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা তাই। সেতো মাটির নীচে সঞ্চিত জল ধারা। তাকে অস্বীকার করে কখনোই মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

আমি যে আপন কৃষ্টি ও সভ্যতার পক্ষে এত ডিবেট করতে পারি, ও তা ভাবতেও পারেনি। বলল, তোমার কি হয়েছে বলতো ড্যাড? নিজের সভ্যতা কৃষ্টি আচার আচরণকে নিয়ে এত যে ওকালতি করছ, তার মানে কি এতদিন তুমি যা বিশ্বাস করে এসেছো তা ভুল। বললাম ভুল কি না জানিনে মা, তবু একটি মেয়ে সে আমার জাতের নয়। সে আমার ধর্মের নয়, তবু কাকাবাবু বলে সে যখন প্রণাম করল, কি যে হল তোকে বোঝাতে পারবো না। আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে লাগল এক আনন্দের স্রোত ধারা। ও অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে, বলল, দেখ ড্যাড তাকে স্নেহ করতে গিয়ে আবার আমাকে অস্বীকার করো না? হয়তো ঠাট্টাই। কিন্তু ভাল লাগেনি মিস সেন। বলেছিলাম। যদি সে বলে তোকে অস্বীকার করলে সে আমার হবে, জানবি মুহূর্ত্তও লাগবেনা তোকে অস্বীকার করে সেই শূন্যস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও ভয় পেয়ে বলল, ড্যাড! আমি বললাম ভয় পেলিতো, আমার মনে হয়, রেহানা যে আদর্শে বিশ্বাস করে, যদি তার বাবা বা মা তাকে বলে, তোর আদর্শ ত্যাগ না করলে আমাকে হারাবি, সে হয়তো হাসিমুখে রাজী হয়ে যাবে। আমি তোমাকেই হারাবো তবু আমার বিশ্বাস আমার আদর্শ আমি ত্যাগ করতে পারবনা। শান্তা

অবাক হয়ে বলে একটি দিন মাত্র তাকে দেখেছো তাতেই এত। দরকার নেই ডনের তোমার কাছে এসে। তুমি থাক তোমার সেই মেয়েটিকে নিয়ে। একথা বলে অভিমানে আমার কাছ থেকে সরে গেল ও। আমি তাকে ডাকতেই পারলাম না। এতদিন ধরে তার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। ডনও এলো না। হঠাৎ আজ সকালে ও আমার কাছে এসে আমাকে প্রণাম করে বলল, বাপী, আমারই ভুল। সেই অদেখা মেয়েটি জানিনা সে আমার থেকে বড় না ছোট তাকে বল, সে যদি পর হয়ে তোমার হৃদয় জয় করতে পারে আমি মেয়ে হয়ে কেন পারবো না। কি যে ভাল লাগল মিস সেন। ওকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললাম একবার দেখবি সেই মেয়েটিকে? ও রাজী হওয়াতেই আমি ফোন করলাম আপনাকে। এতক্ষনে ভট্টাচার্য সাহেবের কথাগুলো শুনছিলাম আমরা মন্ত্র মুগ্ধের মতন। সুঁচ পড়লেও যেন টের পাওয়া যায়। রেহানাই প্রথম এগিয়ে এলো ভট্টাচার্য সাহেবের কাছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল গুলো সঞ্চালিত করতে করতে বলল, কাকাবাবু আপনাব মনের মধ্যে যে এমন কোন দুঃখ থাকতে পারে সে তো ভাবনারও অতীত। তারপর বলল চলুন, আমি যাব। যাবি মা? যাব না কেন? এমন ভাবে কে আমার হৃদয়ের মর্মস্থলে আঘাত করতে পেরেছেন? আমি এক সামান্য মেয়ে কাকাবাবু, সেই সামান্য মেয়েকে অসামন্যতায় যে মেয়ে দেখতে চেয়েছে সে যে আমারও প্রণাম্য। আবেগে বুঝি কথা বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, সত্যি যাবি মা। তা হলে চল্। মিস সেন, আপনিও চলুন না। আর একটা ভাল সংবাদ দেব, প্রান্তিক তুমিও চল। রেহানা বলল, একটু অপেক্ষা করুন কাকু। কেন রে? ও আস্তে আস্তে বলল, সেদিন আপনাকে প্রণাম করেছিলাম বয়কনিষ্ঠের স্বাভাবিকতায়। আজ একটা প্রণাম করতে দিন শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি হিসাবে। রেহানা প্রণাম করলে ভট্টাচার্য সাহেব নিজের বুকের পরে টেনে নিয়ে কপালে বার বার স্নেহ চুম্বন একে দিতে লাগলেন যেন কোন হারানো মেয়ে ফিরে এসেছে অনেক অনেক দিন পরে তার বাবার বুকে।

কেটে গেছে এর পরে আরো বেশ কয়েকটা মাস। ঈদ ও পূজা কেটে গেছে প্রায় এক সাথে। রেহানাকে একদিন বললাম, আমার সাথে যেতে অসুবিধা হবে নাতো। ও বলল, বার বার তুমি আমায় কি পরীক্ষা করতে চাও প্রান্তিক? পরীক্ষা নয় ভয়? ভয় কেন? তুমি বোঝনা কেন ভয়? আগের মত কি তোমাদের বাড়ী আমাকে মেনে নিতে পারছে? রেহানা ভালভাবে জানে, কথাটা পুরো না হলেও আংশিক সত্য। সেলিনা যেমন অনেক বাঁকা বাঁকা কথা বলে, আফরোজ বেগমও অন্যের সঙ্গে যখন তখন বেরোনো পছন্দ করেন না। আমি এর অর্থ খুঁজে পাইনা। মানুষের কি অদ্ভুত পরিবর্তন। স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন। জীবনের পরিবর্তন গুলো এ ভাবে বিপরীত গামী হয়ে নেমে আসতে পারে। রেহানা বলল, তোমার ব্যাথা বুঝি। আর এও বুঝি, আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করে আমার মনের সন্দেহকে যাচাই করে দেখতে চেয়েছো তাই তো? আজ যারা আমাকে তোমার মাধ্যমে চেনে, তুমি সরে গেলে বলতে পার আমি তাদের কাছে কি মুখ নিয়ে দাঁড়াবো। বললাম, রেহানা ভালবাসা কাকে বলে আমি জানিনে। রূপ বা সৌন্দর্য ভালবাসাকে প্রভাবিত করতে পারে কী না

তাও জানিনে। আমি শুধু জানি প্রান্তিকেব জীবনে রেহানাই একমাত্র সত্য। যদি জানো তা হলে ব্যথা দাও কেন? তোমাকে বুঝতে পারিনা বলে। আজ কাল দুম দাম বলে দাও আমার সময় হবে না, তুমি একা যাওনা লক্ষ্মীটি। কেন বলি সে কি বোঝনা? হয় তো বুঝি কিন্তু মন মানেনা। আগেতো তুমি এমন ছিলে না? না ছিলাম না, কিন্তু তুমি কি ছিলে? কি করে তোমাকে বুঝাবো, রেহানা শুধু তোমার? একমাত্র তোমার, আর কারো নয়।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, দুপুর আড়াইটায় ব্যাবাকপুর লোকাল। টিকিট কেটে অপেক্ষা করব। আচ্ছা বলে ও ক্লাসে চলে গেল। ওই ক্লাসটা আমার নেই। মধুদার চায়ের দোকানে ঢুকেছি, অবাক হয়ে দেখি অশ্রুকণা একা একা চা খাচ্ছে। ও আমাকে দেখে বললে প্রান্তিক অনেক অনেক দিন বাঁচবে তুমি। আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমায় কি তুমি তাড়াতাড়ি মেবে ফেলতে চাও কণা? ও বলল সব তাতেই তোমার বাঁকা বাঁকা কথা? তারপর বলল, আজ প্রিন্সিপাল রেহানাকে ডেকে পাঠিয়েছে জান? বলেনি তো ও কিছু? আজকে ওর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে? হ্যাঁ এইতো ওর সঙ্গে কথা হল, ও ক্লাসে গেছে, আমার কোন ক্লাস নেই তাই মধুদার চায়েব দোকানে এলাম। তারপব চিৎকার করে বললাম, মধুদা দু কাপ চা। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললাম তুমি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এখানে? তোমার জন্য। আমার জন্য? আশ্চর্য ব্যাপার। ও আস্তে বলল, ঠাট্টা নয প্রান্তিক তোমার সঙ্গে সত্যি কথা আছে আমার? আমি আরো অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। বললাম কি ব্যাপাব? ও বলল, যদিও আজ তোমাকে কোথাও ডেকে নেওয়ার অধিকার হয় তো হারিয়েছি তবু চল না, আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটু গঙ্গার পার দিয়ে ঘুরে আসি। বললাম আমার যে ক্লাস আছে? জানি আমি, তবু বলছি চল তোমার সঙ্গে সত্যি কথা আছে এবং তা তোমার শোনা একান্ত দরকার। বেশ চল তা হলে।

দুপুরের গঙ্গা ঘাট, একেবারে নির্জন। বাঁধানো সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে ও বলল, আমায় একটা সত্যি কথা বলবে প্রান্তিক? কি? আজ যদি কোন কারণে রেহানা তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। মানে? আমি তো অনুমানের কথা বলছি, মানে খুঁজছো কেন তবু কারণ তো নিশ্চয়ই কিছু আছে কণা? আছে, কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও? অসম্ভব। কি অসম্ভব? তোমার এই অনুমান। ও একটু ম্লান হেসে আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই প্রান্তিক। তুমি হয়তো জ'ননা, একদিন তোমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য কি না করেছি আমি? আমি ঠাট্টা করে বললাম, আজ কি চাও না আমাকে? না। আমি যদি চাই? তাহলেও না। কেন? ওই যে বললাম জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু তোমার কেন মনে হচ্ছে রেহানা আমার জীবন থেকে হরিয়ে যেতে পারে। পারে না বুঝি? না পারে না। তারপর বললাম তুমি জাননা ও আমার জীবনে কি ভাবে জড়িয়ে আছে। থাকগে সে সব কথা, তুমি তারপর বল? ও বলল, তোমার কথা মেনেও বলছি, সত্যি ও তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারে। আমি চিৎকার করে বললাম কণা? আমার কথা প্রতিধ্বনিত হলো গঙ্গার নিঃশব্দতায়। কেঁপে উঠলো আমার সমস্ত শরীর। ও দুহাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে

ধরে বলল রেহানার অবস্থা তুমি বুঝতে চাইছো না প্রান্তিক। ওকে একটু বুঝবার চেষ্টা কর। আজকাল কলেজে যে সমস্ত আলোচনা হয় তুমিতো তার কিছুই জাননা, জানবার চেষ্টাও কর না। অবশ্য রেহানার এই অবস্থার জন্য তোমার পিসিও কম দায়ি নয়। পিসি? তুমি কি বলছ কণা? আমি ঠিকই বলছি। তোমার পিসি সব কিছু জেনেও সেলিনার প্রতি তার দুর্বার ভালবাসা, সেলিনাকে তোমার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। আমি চিৎকার করে বললাম আমি বিশ্বাস করি না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা। অধৈর্য হয়োনা প্রান্তিক। সেলিনাকে তুমি সত্যিই স্নেহ কর। তাই তোমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু সেলিনা তো মেয়ে। তুমি কোন দিনও তাকে একটা মেয়ে হিসাবে ভাবতে শেখোনি, তাকে তুমি তোমার আপন ছোট বোনের মর্যাদায়, তার সব দাবি মিটিয়ে এসেছো? তোমরা পুরুষরা এখানেই ভুল করো প্রান্তিক। তারপর বলল আজ তোমাকে একজনকেই বেছে নিতে হবে, যা তোমার পক্ষে অসম্ভব। না হলে দুজনার কাছ থেকেই দুরে সরে যেতে হবে। আরো বলল ঠিক জানিনা, শুধু বিশ্বাস করি, রেহানা চাইবে তুমি সেলিনাকে নিয়ে সুখী হও, সে থাকবে তোমার স্বপ্নের মানসী হয়ে। তাইতো সে চলে যেতে চাইবে তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর তাই বলছিলাম, আজ যদি সে তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যায়!

আমি চুপ করে রইলাম। অশ্রুকণার এত কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। জীবনের অনেক ছোট ছোট ঘটনা মনে হতে লাগল। রাগ অনুরাগ-মান, অভিমান-জেদ, ঈর্ষা। হাসপাতালের স্মৃতি, ফুল দুটো ছুড়ে ফেলাতে তার তীব্র অভিমান, সব কিছু চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল একেব পর এক। সেলিনার প্রতি পিসির আলাদা আকর্ষণ। পিসির বাড়ীর সবকিছুর প্রতি তার এক ধরণের অনুভূতি। অশ্রুকণার ইঙ্গিতে যেন নতুন মাত্রা পেল। ও বলল, কি ভাবছ? না ভাবছিনা কিছুই। এতক্ষণতো তোমার কথা শুনলাম। আমাকে একটু ভাবতে দাও। তারপর বললাম, বিশ্বাস কর কণা, আমি আলাদা করে কোনদিনই তোমাদের ভাবতে শিখিনি। তুমি, রেহানা, অনুতপা, টুম্পা, পিঙ্কি, সুমিত, সুব্রত, রাহুল এদের কাউকে বন্ধুত্বের বাইরে গিয়ে কিছু ভাবা ভাবনার অতীত ছিল আমার কাছে। তারপর কেমন করে যে ধীরে ধীরে রেহানা এসে গেল আমার জীবনে, চিন্তায়, মননে, কল্পনায়, কেমন করে যে সে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চারকে আরো গতিময় করে তুলল, সে এক চরম রহস্য। কিন্তু সেলিনার মধ্যে খুঁজে পেলাম আমার কৈশোরে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া বোনের স্মৃতি। তার হাসি ঠাট্টার মধ্যে একটি নারীমন যে ধীরে ধীরে পাখা মেলতে পারে ভাবিনি। ও যখন বাগান থেকে ফুল তুলে আমায় বলতো, দিননা প্রান্তিক ভাই আমার বেনীতে গুঁজে, কখনো মনে হয়নি, তার ভিতর কোন প্রেমিকার আকুতি থাকতে পারে। আমার বোনটিও মাঝে মাঝে বলতো, দে-না দাদাভাই এই ফুলটা আমার চুলে গুঁজে। আমি গুঁজে দিয়ে তাকে বলতাম, তোকে ঠিক রাজকন্যার মত দেখাচ্ছে। সেলিনাকে সে কথা কোনদিন বলতে পারিনি, যদি অন্য অর্থ করে, তবুও ওকে সাজিয়ে দিতে গিয়ে আমার মনে পড়তো আমার বোনের কথা। হাসপাতালে তার কিছু কিছু দুর্বলতা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি কণা, তবু তাকে আমি অন্য কোন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনি। শুধু সেদিনই প্রথম খটকা

লেগেছিল, যেদিন পিসি ওকে পিসির জন্য কেনা আমার পছন্দ করা শাড়িতে সাজিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় ওর খোঁপায় গুঁজে দেওয়া ফুল দুটো অবহেলায় ফেলে দিয়েছিলাম। দেখে ছিলাম সে দিন তার তীব্র অভিমান। রেহানাকে বলেছিল, ওতে নাকি আমি ওকে অপমান করেছি। আমি ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হতে চেয়েছি, কিন্তু সেলিনা যেন কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল আমার জীবনে। সব থেকে অবাক লাগে আফরোজ বেগমের এই পরিবর্তনে। কি চান তিনি আমি জানিনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়তে চাইলাম। ও বলল আরেকটু বোস না। আমি বসলাম। সামনে বয়ে চলেছে গঙ্গা। জোয়ারের জলে কানায় কানায় ভরে গেছে সিঁড়ির খাদগুলো। আর একটু হলে পা ভিজে যাবে। ও তাকালো আমার দিকে । বলল। আমায় বিশ্বাস করতে পারবে প্রান্তিক, বলে ও বলল, আমার মনে হয় রেহানার কাছ থেকেও তোমার কাছে একদিন এ অনুরোধ আসবেই, সেলিনাকে গ্রহণ করার। কি করবে সেদিন? আমার সমস্ত অন্তরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। আমার এই ছোট জীবনে ভালবাসা যে এমন কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হতে হবে ভাবিনি কোনদিন। বললাম, আজ থাক কণা। যদি সত্যি সেদিন আসে, রেহানাকে পাবোনা জেনেও সেলিনাকে মেনে নিতে পারব না কিছুতেই। কেন পারবে না? সেলিনা তোমাকে সতি ভালবাসে প্রান্তিক সেদিনই তা বুঝেছিলাম, যেদিন রেহানার পরিবর্তে ও গিয়েছিল আমাদের ওখানে তোমার সাথে। যদি বুঝেছিলে তবে বললেনা কেন? ভাবতে পারিনি তুমি এত অন্ধ প্রান্তিক। বললাম তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আমি সত্যিই অন্ধ। কখন যে সূর্য গড়িয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে খেয়াল নেই। বললাম, কণা আজ মনে হচ্ছে কি জান? কি? তোমার থেকে বোধ হয় ওরা কেউ আমাকে বেশী ভালবাসে না। অশ্রুকণা আবারও আমার হাতটা তার হাতের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে হাতেই একটা চুমু খেয়ে বলল, তোমার স্বীকৃতিটুকু আমি চিরদিন মনে রাখব প্রান্তিক। যদি কখনো তোমার জন্য আমার প্রয়োজন হয়, বলো, দাঁড়াবো তোমার পাশে এসে, করবনা তোমার বিশ্বাসের কোন অমর্যাদা। তাই বলে প্রত্যাঘাত দিতে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিওনা প্রান্তিক খারাপ লাগবে। আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, মনে রাখব তোমার কথা, এবার বলত কেন প্রিন্সিপাল সাহেব ডেকেছেন রেহানাকে। সে তুমি ওর কাছেই জেনে নিও। তারপর বলল ও হয়তো বলতে চাইবেনা, যা অদ্ভুত চাপা মেয়ে। আর একটা কথা, সেলিনাকে এড়িয়ে চলো না, যত এড়াবে, ততই জড়িয়ে যাবে প্রান্তিক। একেবারে স্বাভাবিক ভাবে ওকে বুঝতে চেষ্টা করো: আমি বললাম তাই হবে কণা। কিন্তু তুমি আমায় একটা কথা বলবে? কি কথা? তুমি এসব জানলে কি করে? তোমাকে জানতেই হবে? হ্যাঁ। অশ্রুকণা বলল, জানতাম আমি একদিন তুমি আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবে। তারপর বলল, দরকার কি প্রান্তিক উৎসকে জানার, বরং অপেক্ষা করো একদিন রেহানাই হয়তো তোমাকে সব বলবে। আর কেউ জানে? হয়তো জানে। কে? মিনতি সেন। মিনতি সেন? মানে পিসি? যিনি রেহানাকে তার মেয়ের মতন ভালবাসেন। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না। তা বলছিনা। কিন্তু আমায় তো উনি কিছুই জানালেন না। অশ্রুকণা বলল, এতো চিন্তিত কেন? হয়তো

তিনি নাও জানতে পারেন। তবে আমার অনুমান তিনি জানেন এবং হয়তো একদিন বলবেনও তোমাকে। আর কেউ? অশ্রুকণা বলল, তোমাকে যা জানাতে চেয়েছিলাম, সবই জানিয়েছি আর কোন প্রশ্ন করোনা। শূন্য হৃদয় একদিন যে ভালবাসার আস্বাদ লাভ করে ছিল, ভেবেছিল এর কোন ক্ষয় নেই। কোন দুর্বল মুহূর্ত্তে তা যে ক্ষয়ে যেতে পারে, মন তা স্বীকার করে না বলেই এত দুঃখ এত বেদনা। ওঠো প্রান্তিক। আমি আকুল হয়ে বললাম, এই তোমার শেষ কথা। না এ আমার শেষ কথা নয়। আমি জানি আবার তুমি আসবে একদিন এই ঘাটে, অথবা অন্য কোথাও, পারলে সেদিন আমি তোমাকে নতুন জীবনের গান শোনাব প্রান্তিক। সেটা কবে? তাতো জানি না। আমি শুধু জানি রেহানার ভালবাসাই একদিন তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, অথবা আমি আসব তোমার কাছে। জানি সেদিন আমাকে ফেরিয়ে দেওয়ার কোন ক্ষমতাই থাকবেনা তোমার। আমিতো আজো তোমাকে ফিরাতে চাইনে কেন তবে ভয় পাচ্ছ? ভয় নয়, হাসল অশ্রুকণা। আমি বললাম, চল ওঠা যাক। ও বলল চল, তাহলে।

ভেবেছিলাম, রেহানাই বলবে, কেন প্রিন্সিপাল তাকে ডেকেছিলেন, কিন্তু বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল ও কোন কথাই বলল না। কেন বলল না আমাকে কি ওর সন্দেহ হয়? না আমাকে আর আগের মত বিশ্বাস করতে পারছেনা। মন জানতে চায় ওর কথা। কিন্তু আমারও যে কি হয়েছে, কে জানে? তবে কি আমিও মনে মনে ওর কাছ থেকে সরে আসতে চাইছি!

একটা অফ পিরিয়ড। ওরও অফ। বললাম চলনা এ সময়টুকু কোথাও থেকে ঘুরে আসি। বলল, তুমি যাও প্রান্তিক আমার ভাল লাগছেনা। কেন কি হয়েছে তোমার? একদিন বাড়ীতে এসো বলব। বাড়ীতে? বাড়ীতে বলতে পারবে? কেন তোমাকে কি বাড়ীতে কোন কথা কোন দিন বলিনি? বলেছ। কিন্তু সেদিনগুলো কি আর আছে আমাদের? কেন নেই কেন? আমার তো মনে হয় না কোন কিছু হারিয়ে গেছে। তাই যেন হয় রেহানা। ও হঠাৎ বলল তোমার কি হয়েছে বলত। কেন? আজ কাল কিছুই জিজ্ঞেস করো না আমাকে। সব সময় কি যেন চিন্তা করো। সেলিনা তোমাকে কিছু বলেছে? সেলিনা আবার আমাকে কি বলবে? কিছুই বলবেনা? ওর কি কিছুই বলার নেই তোমাকে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, এ সব কি বলছ রেহানা। তুমি যেন আমার কাছে ক্রমশঃ রহস্যময়ী হয়ে উঠছো। আমি তো চিরদিনই রহস্যময়ী, শুধু তোমার কাছে কেন সকলেরই কাছে। তারপর নিজেই বলল, তোমার তো এর পরের ক্লাসটা আছে তাই না? হ্যাঁ। ফাঁকি দাওনা। কেন? চলনা ঘুরে আসি কোন জায়গা থেকে। কোথায়? যেখানে তোমার ইচ্ছে। তুমি কি ঠাট্টা করছ? তোমার সঙ্গে যাব এতে আবার ঠাট্টার কি হল? আচ্ছা কোথায় যেতে চাও। গড়ের মাঠে। বেশ চল। তাতে কিন্তু সারাদিনের ক্লাস ফাঁকি দিতে হবে। তাই দেব।

এ এক নতুন রেহানা। এ যেন কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমরা এলাম গড়ের মাঠে, মাথার উপর চড়া রোদ। শীতকাল তাই রোদটা যেন প্রেমিকার কবোষ্ণ পরশ। আমরা শুধু হাটতে লাগলাম। কোথাও যেন আমাদের বসার জায়গা নেই। ও বলল, আর পারছিনা

প্রান্তিক। একটু খানি বসা যাক। বেশ ঐ গাছটার নীচে চল। আমরা পাশাপাশি বসলাম। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন তার সঙ্গীকে বলছে, দেখ কেমন কপোত-কপোতী বসে আছে আর তোমার সবতাতেই লজ্জা। রেহানার কানে যেতেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বলল, চল আর বসবনা। আমি বললাম, এই গড়ের মাঠে হয়তো আরো অনেক কথা শুনতে হবে, তার থেকে চল, তপতী একদিন তোমাকে দেখতে চেয়েছিল ওর ওখানে যাই।

মেয়েলি কণ্ঠস্বর আরো কাছে এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখি তপতী। সঙ্গের ছেলেটি নিশ্চয়ই সৌমেন্দ্র। বললাম তুমি? আবে তুমি প্রান্তিক একদম ভাবতে পারিনি। বাদাম খাবে? বলে অপেক্ষা না করে নিজেব বাদামেব ঠোঁঙাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ওটা নিয়ে বললাম, তোমার ওখানেই যাব ভাবছিলাম। তাই বুঝি। হাসল ও। হাসলে যে। না এমনি। তারপব রেহানার দিকে তাকিযে বলল, তুমি বুঝি বেহানা? রেহানা এর কি উত্তব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে বইল। তপতী বলল, জিজ্ঞাসা করলে না তো ছেলেটি কে? আমি নমস্কার করে বললাম নিশ্চয়ই সৌমেন্দ্র। সৌমেন্দ্র হাসল। তা হলে তুমি চিনতে পেরেছো? বললাম, আমি আমার ভুল স্বীকার করে নিয়েছি তাহলে আবার লজ্জা দেওয়া কেন? সৌমেন্দ্র বলল। চল না গঙ্গাব ঘাটে গিয়ে বসা যাক। আমি বললাম তোমরা যাও, একবাব নিউসেক্রেটারিয়েট যেতে হবে। সেখানে কেন? একজনের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সে অপেক্ষা করবে। তপতী বলল তাব থেকে বল না এই মুহূর্ত্তটুকুকে তুমি হারাতে চাও না। তারপর রেহানাকেই উদ্দেশ্য করে বলল তোমার কথা অনেক শুনেছি। সেলিনাব ওখানে প্রথম প্রথম দু'এক দিন দেখেছিও। কিন্তু তখনতো চিনতাম না। যাবে গঙ্গার ঘাটে? তোমার গল্প শোনা যাবে। ও আস্তে বলল, আমার তো কোন গল্প নেই তপতীদি। ও ঠাট্টা করে বলল সব বুঝি একজনকে সঁপে দিয়েছো। ভাবছিলাম কি উত্তর দেবে একথার। যা চাপা মেয়ে, বলল, সঁপে দিতে আর পারলাম কই? আজও বুঝতেই পারলাম না, ওর মনের মধ্যে আমার কোন জায়গা আছে কি না। আমি অবাক হয়ে তাকালাম রেহানার দিকে। বলে কি? তপতী হাসল। সত্যিইতো, যে ছেলের মন জুড়ে শুধু একজন, তারতো এ সন্দেহ হবেই। না তপতীদি তুমি ঠিক বলনি। ও নিজেও জানেনা ওর মনের মধ্যে সত্যিকারের কাবো জায়গা আছে কি না। তপতী ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কোন কিছু নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে? তবুতো সময় কাটতো, ভুল বোঝাবুঝিটা সত্যি কি না যাচাই করে দেখা যেত। কিন্তু ওতো পাষাণ। ওর মন বা হৃদয় বলে কিছু আছে নাকি? কঠিন ভীষণ কঠিন এ আঘাত।

রেহানা যে এমন কথা কারোর সঙ্গে বলতে পারে তা কল্পনারও অতীত। তাও স্বল্প পরিচিত কারো সঙ্গে। এবার তপতী সিরিয়াস হয়ে বলল কি হয়েছে প্রান্তিক, ব্যাপার কি? ঝগড়া করেছ নাকি। অন্যমনস্ক ভাবে হাটতে হাটতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটা দ্রুতগামী মটর সাইকেল ইচ্ছে করে রেহানাকে চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাগো বলে পড়ে গেল রেহানা। তপতী ও সৌমেন্দ্র এগিয়ে এসে ধরা ধরি করে দেখে এমন ভাবে ধাক্কা দিয়েছে যে ডান হাতটায় প্রচণ্ড লেগেছে। পড়ে যাওয়াতে থেতলে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে। মুহূর্ত্তে অজ্ঞান হয়ে গেছে রেহানা।

সৌম্যেন্দ্র বলল, একটু অপেক্ষা কর। দেখি কোন ট্যাক্সি পাই কীনা। অপেক্ষা করতে হলোনা, একটা দ্রুতগামী ফাঁকা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সৌমেন্দ্র। তারপর হাত ধরা ধরি করে তুলে নিয়ে সোজা হাসপাতাল।

পরীক্ষা করে দেখা গেল আঘাত যতটা কম ভাবা হয়েছিল আসলে তা নয়। পড়ে গিয়ে মাথায ভাল চোট লেগেছে। আব তাতেই জ্ঞান হারিয়েছে। এখন জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছুই বলা যাবে না।

আমি চিন্তান্বিত হয়ে একটা চেয়ারে বসে আছি। তপতী বলল এত ভাবছ কেন? দেখ কিছুই হয় নি। আমার কিছু বলার নেই শুধু ভাবছি মিনতি সেনকে একটা ফোন করতে হবে। সেলিনা নয়, আফরোজ নয়, প্রথমেই যার কথা মনে পড়লে, তার নাম মিনতি সেন। ফোন পেয়ে ছুটে এলেন উনি। এসেই যে কাজটি করলেন, তা হল হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে দক্ষিণ কলকাতার এক বিখ্যাত নার্সিংহোমে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। আর অর্থপেডিকের সব থেকে বড় ডাক্তাব ডাঃ পালকে কল দিলেন। তিনি এলেন দেখলেন, তারপর বললেন, মিস সেন এখনিতো কিছু বলতে পারব না। অন্তত ৭২ ঘন্টাতো অপেক্ষা করতে হবে। যাই হোক মিনতি সেন বললেন তুমি এক কাজ কর প্রান্তিক। ওর মা বা বোনকে সংবাদ দাও। ওদের আসা দরকার।

আফরোজ বেগম এলেন না, কিন্তু সেলিনা এল। বলল, কি হয়েছিল প্রান্তিক ভাই। আমি আনুপূর্বক সব ঘটনা খুলে বলতে, বলল বুঝলাম ডালিমরা ওকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। আমি অবাক হয়ে বললাম ডালিমরা তো জেলে। কি বোকা আপনি প্রান্তিক ভাই। জেলে তাতে কি হয়েছে? ওদের লোকেরাতো বাইরে আছে? তুমি চেনো নাকি তাদের? না চিনি না, তবে ডালিমদের জেল হওয়ার কয়দিন পরে ওর নামে একটা চিঠি আসে। রেহানাকে জিজ্ঞেস করাতে ও চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি ধমক দিয়ে বললাম তোর এই প্যান প্যানানি ভাল লাগেনা রেহানা। এ তোর ভারি খারাপ স্বভাব। সব কিছুতেই হতাশা আর কান্না। কিন্তু প্রান্তিক ভাই চিঠিটা পড়তেই আমার ভিতরে জেগে উঠলো এক তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা। আমি ওকে বললাম তোকে যেতে হবে না আমিই যাব। বললাম সেতো বুঝলাম। কিন্তু কে লিখেছে চিঠি, কি লিখেছে তাতে।

সেলিনা বলল, চিঠিটা ডালিমের লেখা ও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুরের একটা জেলে বদলি হয়ে যাচ্ছে, সেই সময়কার লেখা। সেলিনা বলল নিজের জিনিষ রক্ষা করতে পারেন না অথচ অধিকারের এ অহংকার কেন? আজ যদি ওর কিছু হয়ে যায় কি করবেন? কেউতো আসবে না আপনার জীবনে। মনের অবস্থা খুবই খারাপ, তবু বললাম বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে? না নেই কিন্তু যারা আছে, তারাতো কেউ রেহানা নয়। বললাম, নাইবা হল রেহানা, সেলিনা হতে তো তাদের আপত্তি নেই।

এত বড় শ্লেষ। অথচ কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইল, সেলিনা। বললাম চল, রোগিদের জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বসার ঘরে গিয়ে বসা যাক। সংবাদ পেয়ে এক সময় নীলাঞ্জনা পিসি এলেন। ভাবিনি, সংবাদও দিইনি। মনে হয় সেলিনার কাছ থেকে সংবাদ

পেয়ে এসেছেন। উনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাস করে… শুধু বললেন মিথ্যে চিন্তা করো না প্রান্তিক। আমরা তো আছি। পিসির এই একটি মাত্র কথা কত যোজন দূরত্ব যেন কমিয়ে দিল আমার আর পিসির মধ্যে। আমি ঐ জনসমক্ষে পিসিকে জড়িয়ে ধরে বললাম পিসি। আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কোন রকম চেষ্টা না করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে, কোন চিন্তা করো না।

মিনতি সেন ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেবিয়ে এলেন, এই প্রথম মুখোমুখি দেখা মিনতি সেন এবং নীলাঞ্জনা পিসির। নীলাঞ্জনাই বললেন আপনি মিস সেন? নমস্কার। আমি নীলাঞ্জনা, প্রান্তিকের পিসি। চিনি আপনাকে অবশ্য নামে। একদিন গিয়েছিলাম। বললেন থাক ওসব কথা। ডাক্তার কি বললেন? উনি কিছু বলেননি, তারপর সেলিনাব দিকে তাকিয়ে বললেন তুমিতো সেলিনা? হ্যাঁ একবার এস আমার সঙ্গে। সেলিনা নীরবে তাকে অনুসরণ করলো। ডাক্তারের চেম্বারে লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ আছেন তিনিই কথা বললেন। উনি আই মীন পেশেন্ট আপনার দিদি? হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে আপনি তুমি করেই বলবেন। মিনতি সেন সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই তো। মিঃ চোধুরী, ওতো আপনার মেয়ের বয়সী আপনার মেয়ের মতন, ওকে আপনি তুমিই বলুন। ঠিক আছে বললেন থানার বড়বাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমার কি কোন সন্দেহ হয় এই এক্সিডেন্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত কীনা। আমিতো ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলাম না, তবে যারা ছিলেন, তারা বলেছেন ইচ্ছে করেই মটর সাইকেল ওকে ধাক্কা দিয়েছে। বড় বাবু বললেন যদি তাই হয়, তা হলে তুমি কাকেও সন্দেহ করো? হ্যাঁ করি? কর? কাকে?

সেলিনা তার ব্লাউজের নীচ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বড়বাবুকে দিতে গেলে মিনতি সেন নিজে নিলেন। মিনতি সেন চিঠিটা পড়ে চমকে ওঠে থানার বড়বাবুকে বলেন মিঃ চৌধুরী এই চিঠিটা এখনি আপনাকে দেওয়া যাবে না। এভিডেন্স হিসাবে পরে কাজে লাগতে পারে। আপনাকে বরং একটা জেরক্স কপি দেব। তারপর সেলিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চিঠি তুমি কবে পেয়েছো। বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। আমাকে জানাওনি কেন? যদিও রেহানা তাকে এই চিঠির কথা কাউকে বারবার না করেছেন বলতে, কিন্তু সে সব চেপে গিয়ে সেলিনা বলল, চিঠিটাকে আমি কোন গুরুত্ব দিতে চাইনি তাই আরকি। মিনতি সেন বললেন, ঠিক আছে। বড়বাবু আবার জানতে চাইলেন সেলিনার কাছে তাহলে কাকে তুমি সন্দেহ কর। মিনতি সেন বললেন ও ছেলেমানুষ। উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে তালগোল পাকিয়ে দেবেন না। আরো বললেন, আমার মনে হয়, এর পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করব মিঃ চৌধুরী। আপনার যদি ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে করতে পারেন। না না আর কিছুর দরকার নেই মিস সেন। আপনি বরং কমিশনার সাহেবকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে রাখুন। ওনার কাছ থেকে মুল্যবান ইনস্ট্রাকসান এলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু তার থেকেও আগে দরকার, ওর সুস্থ হয়ে ওঠা। ডাঃ পালকে তাই বললেন, আপনি একটু দেখুন ডাঃ পাল যাতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। ডাঃ পাল বললেন আমি ডাক্তার, আমার

কর্তব্য মানুষের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়। কিন্তু ৭২ ঘন্টা না গেলে আমি কোন কথাই বলতে পারবো না। এটা এমন এক সিদ্ধান্ত যার বিরুদ্ধে সরব হওয়া যায় না।

হ্যাঁ ৭২ ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরেছে রেহানার কিন্তু স্মৃতিশক্তি ফেরেনি। রেহানা কাউকে চিনতেই পারছেনা। শুধু আমি কাছে গেলে আমার হাতটা ধরে চুপ করে থাকে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মিনতি সেন যখনই সময় পান আসেন। কিছুক্ষণ থাকেন। আমাকে ও সেলিনাকে সাহস দিয়ে চলে যান। একদিন এসেছিল অশ্রুকণা। তখন আমি আর সেলিনা পাশাপাশি বসে আছি। সেলিনা বলল সব সময় আপনি এমন চুপ করে থাকেন কেন প্রান্তিক ভাই। এত চিন্তা করেন কেন? বললাম, খুব খারাপ লাগছে। সব সময় শুধু নিজেকেই এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য দোষী মনে হচ্ছে। তাই নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনা। ও বলল এ ভাবে সব সময় ভাবলে যে, আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গভীর হতাশায় বলে উঠি আত্মহত্যা পাপ, তা না হলে যে কোন মুহূর্তে আমি আমার নিজের জীবন শেষ করে দিতাম। ছিঃ প্রান্তিক ভাই এ ভাবে কথা বলতে নেই। আমি বললাম আচ্ছা সেলিনা, কেন এমন হয় বলত। কি? এই যে অভাব বোধ, এই যে শূন্যতা, জীবনের সবকিছু যেন মরুভূমি। মনে হয় এ জীবন নিয়ে কী করব আমি?

সেলিনা বুঝতে পারে সব, বলল ভিজিটিং আওয়ার তো দেরি আছে, চলুননা কোথাও থেকে ঘুরে আসি। কোথায়? যে কোন জায়গায়। আচ্ছা চল। তারপর আমরা যখন বেরিয়ে পড়ব বলে উঠে পড়েছি তখন এল অশ্রুকণা, বলল, তোমরা কোথাও যাচ্ছ? সেলিনা বলল না অশ্রুদি। ভিজিটিং আওয়ারতো দেরি আছে তাই প্রান্তিক ভাইকে বললাম, একটু ঘুরে আসা যাক। বেশ তোমরা ঘুরে আসো। আমি আছি এখানে যদি প্রয়োজন হয়। আমি বললাম, কণা তুমি বরং সেলিনাকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো, আমি থাকছি? সেলিনা বলল, ভিজিটিং আওয়ারের আগেতো কোন প্রয়োজন নেই, বরং আমরা তিনজনেই যাই চল অশ্রুদি, ও বলল তোমরা যাও সেলিনা। আমি কিছু ভাবব না। তারপর বলল, একদিন আমার অসুস্থ শিয়রে ঘন্টার পর ঘন্টা কাঠিয়েছে রেহানা, তার কিছু ঋণ অন্তত শোধ করতে দাও। আমি বললাম, বেশ, তুমি তাহলে থাক এখানে। তবে আমরা না ফেরা পর্যন্ত চলে যেও না। ও বলল আচ্ছা থাকব। অশ্রুকণা কে একা রেখে আমরা বেরিয়ে আসি।

এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আমরা ভিক্টোরিয়ার কাছে চলে এলাম। সেলিনা বলল, যাবেন ভিতরে? না থাক। তাহলে কোথাও বসা যাক। বেশ চল ওই গাছটার নীচে বসবে। চুপ চাপ বসে আছি। কোন কিছুই ভাল লাগছেনা। শুনেছি আফরোজ বেগম রেহানার এই অবস্থার জন্য পুরো পুরি আমাকেই দায়ী করছেন। আমি নিজেও তাই মনে করি। সুতরাং আফরোজ বেগমের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। সেলিনা বলল প্রান্তিক ভাই, আমি হয়তো রেহানা নই, তবু কি আপনার দুঃখ আমি ভাগ করে নিতে পারি না? নিশ্চয়ই পার। উজ্জ্বল চোখে তাকালো সেলিনা আমার দিকে। বলল, তবে কেন আপনার দুঃখের বোঝা আমার উপর নামিয়ে দিতে আপনার এত আপত্তি। কোন আপত্তি

নেই সেলিনা। কিন্তু যদি বুঝতাম এ দুঃখ বয়ে বেড়াবার শক্তি আমার নেই। তারপর বললাম আচ্ছা বলত সেলিনা, সে দিন মিনতি পিসি কি একটা চিঠির কথা বলছিলেন। কি ব্যাপার? আপনি জানেন না? গভীর বেদনায় বললাম আজ কালতো আমি অনেক কিছুই জানিনা সেলিনা। আমাকে জানানো হয় না। কেন জানানো হয় না জানেন? না। তাতে আপনার দুঃখের বোঝা বাড়তে পারে। হঠাৎ করে জানতে চাইলাম আচ্ছা রেহানার এই অবস্থার জন্য তোমার দুঃখ হয় না? কি করে বোঝাব প্রান্তিক ভাই, হয়তো আপনিও কোনদিন বুঝবেন না। হয়তো রেহানার এই অবস্থা না হলে আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিল, আজ আর তা সম্ভব নয়? বললাম কিছুই বুঝতে পারছিনা ব্যাপারটি কি? ও বলল থাক আপনার বুঝতে হবে না প্রান্তিক ভাই। তারপর বলল মিনতি সেনের বাড়ীতে কাল একবার যেতে বলেছেন। কিন্তু আমিতো চিনিনা। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে? আমি অবাক হযে তাকাই ওর দিকে।

এসব কোন কথাই আমি জানিনা। কেন যে মিনতি পিসিও আমার ওপর বিশ্বাস বাখতে পারছেন না কে জানে, তবু বললাম নিশ্চই যাব সেলিনা কখন যাবে তুমি? দুপুরে যেতে বলেছেন, উত্তরে জানায় সেলিনা।

আমরা যখন মিনতি সেনের বাড়ীতে এসে পৌছিয়েছি তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। মিনতি সেন সবে মাত্র ঘরে বিশ্রাম নিতে গেছেন, জবার মা আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন, বললাম পিসী কখন উঠবেন? ডেকে দেবো? না থাক কখন উঠবেন তাই বল না। উনি শুয়েছেন কিন্তু ঘুমাননি, আপনারা বরং উপরে আসুন।

আমরা উপরে গেলাম। মিনতি সেন শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। তারপর সেলিনাকে বললেন, তোমার চিঠিটা ভাল করে পড়েছি। পড়ে তোমার যেমন সন্দেহ হয়েছে আমারও খানিকটা সেই রকম সন্দেহ হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিলাম, তারপর বললাম, পিসি চিঠিটা কি আমি পড়তে পারি? মিনতি সেন চিঠি আমার হাতে এনে দিলেন, বললেন পড়া হয়ে গেলে আমাকে ফেরত দিও। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। তবে তা যে রেহানাকে লেখা হয়েছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। লিখেছে সেদিন তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যে ভাবে তুমি একটি বিধর্মী ছেলের পিছনে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বসে আছো, তাতে ক্ষমা তোমাকে করা হবে না। আমার জেল হয়েছে বলে মনে করোনা আমি শেষ হয়ে গেছি। এখনতো দেখছি তোমরা দুজনেই ছুটেছো এক জনের পিছনে। ছিঃ তোমাদের রুচিবোধের। ঘৃণা করি তোমাদের এই বেলেল্লাপনার। কি আছে ওর মধ্যে। ও ছাড়াকি আর কোন ছেলে নেই। ভাল ভাবে বলছি এখনো সময় আছে। পিছিয়ে এসো না হলে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। না ইতি বা সম্বোধন কোনটাই নেই। চিঠিটা পড়া হলে মিনতি পিসির হাতে দিয়ে বললাম, এ চিঠি দিয়ে আপনি কি করবেন? আবো বললাম, এক কাগুজে বাঘের প্রতিশোধ স্পৃহা ওর কি কোন মূল্য আছে? তার থেকে একটা কাজ কর না পিসি? কি? ডালিমদের ১০ বছরের জেলটা দেখুন না আরো কমিয়ে এনে দু-এক বছরে করে দেওয়া যায় কীনা। অবাক হয়ে মিনতি সেন বললেন কি বলছ তুমি? বেশ ভীত হয়ে বললেন এতটা পৌরুষের

অহংকার ভাল না প্রান্তিক।

আমি বললাম, ওরা আমাকে দুর্বল ভাবে। আপনারাও হয়তো তাইই ভাবেন। সেলিনাতো মাঝে মাঝে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলে যে, ওর বক্সিং রিং-এ গিয়ে ওকে নক আউট করতে। এরা প্রত্যেকেই আমার বাইরের দুর্বলতাটুকু দেখে এসব কথা বলতে সাহস পায়। তাদের আমি এই কথাটা বলতে চাই যে পিসি, ওরা কেউই আমাব ভিতরটাকে চেনে না। আমি সন্ধ্যা প্রদীপ যেমন জ্বালতে জানি, তেমনি জানি সে আগুনে কী ভাবে মশাল জ্বালিয়ে সব কিছু পুঁড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায়। তারপর একটু থেমে বললাম কেউ কেউ বোধ হয় ভাবছে, এবার আমার হারার সময়। কিন্তু পিসি জীবনে কোন ব্যাপারে হারিনি, হারতে আমি জানি না। রেহানা আজ না হয় কাল সুস্থ হয়ে যাবে। ওর স্মৃতিশক্তিও ফিরে আসবে। ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসুক ও ফিরে পাক ওর স্বাভাবিক জীবন। আপনাকে তো সব বলেছি ওর কথা। জীবনের বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে গেছে যে মেয়েটি, যে কিছুই দাবী না করেও আমার সমস্ত দেওয়াটাকে উজাড় করে নিয়ে গেছে, যে মিশে আছে আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে, তাকে কি করে অস্বীকার করব? না তা আমি পারবো না। তাছাড়া তাকে বোঝাবার অবকাশ থাকলেও, আজ আর তা সম্ভব নয়। তারপর প্রসঙ্গ বদলে মিনতি সেনকে বললাম, পিসি ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্য সাহেবকে বলবেন আমি তার অফারটা গ্রহণ করছি?

অবাক হয়ে তাকান মিনতি সেন ও সেলিনা। এ আমি কি বলছি। মিনতি সেন বললেন তুমি কি বলছ তুমি কি তা জান? জানি পিসি, একদিন বুকে তুলে নিয়ে ছিলেন আমাকে এবং রেহানাকে। আজ যদি নামিয়ে দিতে চান, নীরবে সরে যাব কোন প্রতিবাদ করব না, শুধু অনুরোধ পিসি আমার ভালবাসাকে অপমান করবেন না। তারপর সেলিনার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে উঠতে হবে, সেলিনা। চলুন প্রান্তিক ভাই, আমিও আসছি, তুমি যাবে আমার সাথে? সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাই ওর দিকে। বা একথা বলছেন কেন? আমিতো আপনার সাথেই এসেছি। হ্যাঁ এসেছো তাই বলে আমার সাথে যে যেতে হবে এমনতো কোন কথা নেই। মিনতি সেন বললেন আমি বুঝতে পারছি না প্রান্তিক তুমি কি বলতে চাইছো। তোমাকে আমি অপমান করব কেন? তুমি কি বোঝনা, আমার হৃদয়ের কোন জায়গায় তোমার স্থান। তাছাড়া বাবার নির্দেশে তার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী আমি। কিন্তু আমি যদি তা না নিই তা হলে এ সম্পত্তির যাবতীয় অধিকার তোমার ও রেহানার এ তো বাবার আদেশ। তাহলে কিসের জন্য তোমার এই হতাশা। কিসের অভাব তোমার? হ্যাঁ বুঝতে পারছি, তুমি কোন কোন জায়গা থেকে হয়তো এমন ব্যবহার পেয়েছো যা তোমার সমস্ত চিন্তাকে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে, একদিনতো তোমরা ছোট হয়েও আমাকে তোমাদের মায়ের স্থানে বসিয়ে সন্তানের মতন উপদেশ দিয়েছো, আজ কি তবে মনে করব, সে শুধু তোমাদের অভিনয়। আমি তোমাদের কেউ নই? কান্না বুঝি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল ভিতর থেকে তা দমন করে কোন ভাবে বললেন, ঠিক আছে চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে। আর কোন দিন এসোনা আমার কাছে। বাবার আদেশ অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি তার যাবতীয় সম্পত্তির মালিকানার ছাড়পত্র তোমার কাছে পৌঁছে দেব। আবেগ আর অবুঝ

যন্ত্রণায় তার গলা বুজে আসতে চাইছে, কোন ভাবে টলতে টলতে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি তাকে বাধা দিতেও পারলাম না। সেলিনাও কি জানি কোন কিছু না বুঝেই হয়তো চুপ করে ছিল।

হতাশায় ভেঙে পড়ে উঠে পড়েও আবার বসে পড়লাম চেয়ারে। বেচারা সেলিনা। কি যে করবে বুঝতে পারছেনা। বার বার মন চাইছে আমাকে সান্ত্বনা দিতে। কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। কিন্তু কোনটাই করতে পারছে না এ কোন সেলিনা। আমি আস্তে আস্তে উঠে - দরজায় আঘাত করে ডাকি মিনতি সেনকে। পিসি দরজা খুলুন। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না কত গভীর অভিমানে আপনাকে একথা বলেছি আমি? কেন বুঝতে পাবছেন না, আমার অভিমান করার আর কোন জায়গা নেই। একে একে এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর মত আমার সব শিকড়গুলো যে ছিন্ন হয়ে গেছে পিসি। যদি বলেন, না অভিমানেও আপনাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, আমি চলে যাচ্ছি পিসি আর কোনদিনই আসব না। তাই বলে স্বার্থপরের মতো আপনার উপেক্ষার দান আমি গ্রহণ করবো, এ আপনি ভাবলেন কেমন করে? সত্যি করে বলুনতো আমাদের জন্য কি কোন মমতা নেই আপনার হৃদয়ে?

কেন যে অবুঝ কান্না এমন করে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল কে জানে। আমি টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে চাইলে, সমস্ত দ্বিধা এক পাশে সরিয়ে রেখে সেলিনা আমাকে ধরে ফেলে বলল, এভাবে কোথায় যাচ্ছেন প্রান্তিক ভাই। আমি জানিনা কে আপনাকে অপমান করেছেন। যদি কেউ করেও থাকেন, তাই বলে তার অভিযোগ গুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। আমার মা হয়তো আপনাকে অনেক ব্যাপারে আঘাত দিয়েছেন, তার দেওয়া আঘাতটাই কেবল মাত্র সত্যি, আর তার দীর্ঘদিনের ভালবাসার কোন মূল্য নেই? কেন আপনাকে তিনি আঘাত দিয়েছেন আপনি বোঝেন? তারপর নিজেই বলে চলল, না বোঝেন না প্রান্তিক ভাই। একটু খানি থেমে আবারও বলে চলে, যদি কোন মা, আবার তিনি যদি কিছু পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাস করে থাকেন আর দেখেন যে, আপনার সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার মেয়েরা নানা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে, মায়ের কাছে তার সন্তানের থেকে তো বড় কেউ নেই। তাই তাদের মঙ্গলার্থে আপনার সরে যাওয়াটা যদি চেয়েও থাকেন, সেটাই বড? আর সন্তান স্নেহে, নিজের না থাকা ছেলের অধিকারে যখন তার হৃদয়ে আপনাকে স্থান দিয়েছেন, তার কোন মূল্য নেই, একবার তার মনের অবস্থা বুঝতে চাইলেন না কেন? কেন আপনি বুঝতে চাইছেন না তাকে এড়িয়ে যাওয়াটা তার কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া। রেহানা যেমন আপনার কোথায় ব্যথা বোঝে। তেমনি অন্যরাও অনেকেই বোঝে। কিন্তু ফারাকটা কোথায় জানেন? যে সমাজে আমরা বাস করছি। সেই সমাজটাতো এখনো আপনাদের মানসিকতার উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। শুধু ডালিমদের চিঠিটাকে বড় করে দেখছেন কেন? আপনি কি জানেন, কেন প্রিন্সিপাল সাহেব রেহানাকে ডেকে আপনার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলেছেন। আমি জানি তা আপনি জানেন না। জানবেন কি করে, রেহানাতো তা আপনাকে বলবেনা কোন দিন। যদি আপনি আঘাত পান। যদি আপনি

ভুল বোঝেন?

আমি চমকে উঠে বললাম, কি বলছ কি তুমি? কি এমন ঘটনা যা রেহানা আমাকে জানাতে চাইলনা। সেলিনা বলল আপনিতো তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, আপনিতো জানেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলে, যত অসুবিধাই হোক সে আপনাকে সত্যি কথাই বলবে। কিন্তু কেন আপনি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না? আমি ভেবেছিলাম ওই আমাকে বলবে। অনাবশ্যক কৌতূহল আমার নেই। বাঃ অপূর্ব। শ্লেষ ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে। যেদিন ও সত্যি সত্যি আপনার জীবনে আসবে, সেদিনও কি কোন কৌতূহল থাকবে না? না সেদিনও বলবেন ও যদি না বলে, আমার জানার কি দরকার? আর এই মানসিকতা নিয়ে আপনি পথ চলবেন এক সাথে? পৃথিবীতে কেউ কি কোনদিন তা পেরেছে? না প্রান্তিক ভাই। আমি কিন্তু আপনাকে এ ভাবে ভাবিনি। যে ব্যাথা একা বয়ে চলেছে রেহানা কেন আপনি তার ভাগ নিতে চাইলেন না? তা ছাড়া একটা রূঢ় কথা প্রান্তিক ভাই, শুনতে খারাপ লাগবে, তবু বলবো, রেহনাকে কি আপনি বোঝেন? আমার তো মনে হয় শুধু রেহানা কেন, আপনি কাউকে বোঝেন না। তারপর বলল, সব মেয়েরাই চায় তার ভালবাসার পুরুষটি তাকে বুঝতে শিখুক, তাকে আগলে থাকুক, তার ভুলগুলো শুধরে দিক যেমন একদিকে, তেমনি আর একদিক তার ভালবাসার মানুষটি তাকে তার প্রিয় উপহারে সাজিয়ে দিক। হোকনা তা অতি তুচ্ছ, তবু তার ছবিটাতে নন্দিত হোক তার প্রেমিকা, এতো সব মেয়েরই স্বপ্ন প্রান্তিক ভাই। রেহানা সুন্দর, ভীষণ সুন্দর তার অন্তর ও বাহির। কিন্তু কোন দিনই কেন, আপনার প্রশংসায় তা ধন্য হতে পারল না। কেন আপনি ভালবেসে সামান্য কাঁচের চুড়িটাও পড়িয়ে দিলেন না তার হাতে? শুধু লজ্জা? না জীবনের খাতে বয়ে চলেছে অন্য কিছু, যে দ্বিধা কাঠিয়ে উঠতে পারেন নি আজো আপনি। মনে রাখবেন ভাঙতে চাইলেই কিন্তু ভাঙা যায় না। তার জন্য জোরের দরকার। রেহানার জন্য সে জোরতো আজও আমার চোখে ধরা পড়ল না প্রান্তিক ভাই। একটা কথাতো মানবেন, আমার মতো সে তার দাবী প্রকাশ করতে পারে না কোনদিন। অন্য দিকে নিজের সৌন্দর্যে আমি প্রভাবিত করবার চেষ্টা করি অন্যকে। চাই আমাকে কেউ তারমত করে সাজিয়ে দিক। যদি না পাই দাবী করার জোরটুকু দেখাতে পারি। কিন্তু ও তা পারে না। এই না পারাটা আপনি কেন পুষিয়ে দিলেন না।

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, তুমি থামবে? সেলিনা বলল, থামব কেন? আপনার মন যে কখনো কারো প্রতি দুর্বল হয় নি একি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? তারপর বলল শুনুন, ধর্মীয় নেতারা প্রিন্সিপালকে জানিয়ে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে শুধু আপনি নন আপনার প্রিয়জনদের মেলামেশা তারা ভালভাবে নিচ্ছেন না। আপনাকে যেন এই পথ থেকে বিরত করা হয়। আর রেহানার ক্ষেত্রে তাদের আর্জি ছিল, যদি সে আপনার সঙ্গে মেলা মেশা বন্ধ না করে সামাজিক ভাবে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করবেন আমাদের পরিবারের উপর। না হলে প্রিন্সিপালকে বাধ্য হতে হবে রেহানাকে কলেজ থেকে নাম কেটে দিতে অথবা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে। তারপর বলল, যদি আমাদের পরিবার কোন উচ্চবিত্ত পরিবার হতো, হয়তো সবকিছুকে অবজ্ঞা করা যেতো, আমাদের দেশে, আমাদের সমাজ

ব্যবস্থায় বাস করেও এমন যে ২/১টি ঘটনা কোথাও ঘটেনি তাতো নয়, কিন্তু প্রান্তিক ভাই তারাতো কেউ সমাজের উপর নির্ভরশীল নন। তাই সমাজ কিংবা ধর্মীয় ফতেয়া তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু আমরা, আমাদের মত পরিবার, পাশে এসে দাঁড়াবার মতো যাদের কেউ নেই, তাদের তো ধর্মীয় নিয়ামকদের ফতোয়া অস্বীকার করার খুব একটা উপায় থাকেনা। তাছাড়া আমাদের সমাজ তো দেড় হাজার বছরের ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সেখানে আপনার বা রেহানার দাবীতো অনেক বেশী তাই না।

পাশাপাশি ডালিমের চিঠি। কি ভয়ংকর হুংকার। আর কি কুরচিকর ইঙ্গিত। হ্যাঁ প্রান্তিক ভাই আমিও আপনাকে ভালবাসি। সেই যেদিন প্রাচীর পাশের একটি রেষ্টুরেন্টে পর্দা ঘেরা কেবিনে টিফিন খাচ্ছিলাম, সেদিন থেকে ভাল লেগেছিল আপনাকে। মনে মনে চেয়েছিলাম, আপনার সম্মোহনী দৃষ্টি খুজে ফিরুক আমার অন্তরের অন্তঃস্থল। বাইরের রূপ দিয়ে বিচার করলে ডালিম অনেক সুন্দর। তবু ও আমাকে কোন দিন আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু প্রথম দিন থেকে আপনি আমাকে চুম্বকের মত টেনেছেন আপনার কাছে। জানি এ সম্ভব নয়, কিন্তু মনতো মানে নি। তাই যে কোন ভাবে আপনার দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছি আমার দিকে। কখনো নিজের দেওয়া ফুলে বলেছি আমার বেনী সাজিয়ে দিতে, কখনো আপনার দেওয়া ফুলে সাজিয়েছি নিজের করবী। একি শুধুই খেয়াল? কখনো কি চাইনি এসবের মধ্যে আপনার নাগালের মধ্যে আসতে? বুকে হাত দিয়ে বলুনতো কখনো কি আপনার মনে হয়নি এরূপকে ভালবাসা যায়? মনের নাগালতো পাওয়া যায় না প্রান্তিক ভাই? কাছ থেকে তপতীদির সুগভীর ভালোবাসা দেখেছি আমি। পরে অবশ্য জেনেছি আপনাকে না পেয়ে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন, আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছেন, অন্যত্র নিজের সাধনায় নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। কেন অস্বীকার করবো, নীলাঞ্জনা পিসির জন্য যে শাড়ীর রং আপনি পছন্দ করেছিলেন, পিসি সেই শাড়ীতে আমায় শুধু সাজালেন না, আমার পছন্দ করা গয়না দিয়ে সাজালেন আমাকে, বলতে চান সেখানে, আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেপিসির কোন গোপন ইচ্ছে ছিল না? যদি না থাকতো তা হলে কিছুতেই বলতেন না যে ভাবে মডার্ন হয় সেভাবে তো সাজিয়ে দিতে পার। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন সন্ধ্যার ফুল দুটো ফেলে দিয়ে আপনি আমায় ভুলে থাকতে পারবেন? তা হয়না প্রান্তিক ভাই। কেন ফেলে দিয়েছিলেন জানেন আসলে ভীষণ ভীষণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন আপনি, তা না হলে অন্তত বলতেন, সত্যি সেলিনা খুব ভালো লাগছে তোমাকে। যেদিন মিনতি পিসির দেওয়া উপহারে নিজেকে সাজিয়ে এসে ছিলাম আপনার কাছে, বলে ছিলাম কেমন লাগছে বলুনতো। এড়িয়ে গেলেন এই বলে যে, যার দেওয়া উপহারে তুমি সেজেছো, বলার কথা তো তার? হায় অবোধ পুরুষ মন, এমন দুর্বল আপনি ভাবিনি কখনো।

তাও যাক, রেহানার আপনার কাছে আসাতে কেন আপনি চমকে উঠলেন, সেলিনা আসতে পারে বলে? আপনি কি চাননি মনে মনে আমাকে? হয়তো অস্বীকার করবেন, কিন্তু তার দ্বারা কি মনকে ফাঁকি দেওয়া যাবে প্রান্তিক ভাই? যাবে না আর এই দোদুল্যমান মন নিয়েই আমাদের চলতে হবে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বকে মেনে নিতে হবে স্বাভাবিকতায়। ব্যাথায়

ভরে থাকবে হৃদয়ের একটা দিক, তবু হাসতে হবে, আনন্দের ফুলকি ঝরাতে হবে যার সঙ্গে পথ চলছিঁ তাকে নিয়ে। এইতো জীবন। আর এদের হাসি কান্নার ইতিহাসই আজকের পৃথিবী।

প্রথম প্রথম মনে হতো আমার এই গোপন অভিসার কেউ বুঝি জানে না, কিন্তু নীলাঞ্জনা পিসি আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কাউকে কাউকে ফাঁকি দিতে পারলেও সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আর সেটা আরো স্পষ্ট হল, অশ্রুদি যখন বললেন, সেলিনা তোমার হাসি ঠাট্টার মধ্যে চোখ দুটি অমন করুন কেন? কেন এমন করে প্রান্তিককে টানছো তোমার দিকে। বেচারা নিজেই হয়তো হারিয়ে যাবে একদিন।

পুরুষের দাম্ভিকতা আর অহংকারকে যদিও বা এড়ানো যায় মেয়ে মানুষের দৃষ্টিকে কি এড়ানো যায়? ষায় না'প্রান্তিক ভাই। কিন্তু থাক ওসব কথা। এতক্ষণ ক্ষোভ আর আবেগ মিশিয়ে যা বললাম তা আমার নিজের কথা। এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরকার নেই প্রান্তিক ভাই। আবারও বলছি, আমি রেহানা নই, আমি সেলিনা আমার অধিকার আমি বুঝে নিতে জানি। এবার বলুন, কোথায় যাবেন। আর কেনইবা যাবেন। আমি আপনাদের কথায় যেটুকু বুঝেছি, পারবেন কি মিনতি পিসিকে ছেড়ে চলে যেতে? কেন মিথ্যে অহংকারে ভ্রান্ত পথে পা বাড়াচ্ছেন। কেন বুঝতে চাইবেন না মিনতি পিসির জীবনে আপনাদের মূল্য কতটুকু। যদি না বুঝবেন, তবে কোথায় আপনি আলাদা? আপনার যে আলাদ অস্তিত্বকে আমি এতদিন শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়ে এসেছি তার কি কোন মূল্য নেই প্রান্তিক ভাই। ফিরে আসুন। যান পিসির কাছে, বুঝুন তাকে। ভয় নেই, আমার যত কষ্টই হোক, রেহানার কাছ থেকে আপনাকে কোনদিনই কেড়ে নেব না। আমিতো জানি, নিজেকে দিয়েই বুঝি, তাহলে কষ্টটা কত তীব্র হতে পারে।

ও দাঁড়িয়ে আছে আমার ঠিক পিছনে। তার উষ্ণ নিশ্বাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছি আমি। একবার মনে হল, ওর দিকে ফিরে ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলি তোমাকে বুঝি সেলিনা, তোমার দুর্বলতা তোমার ভাললাগা তোমার হাসি কান্না তোমার রাগ-অনুরাগ-মান-অভিমান, কিছুই আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তোমাকে ভালবাসি তোমার থেকেও বেশি করে। তবু রেহানা আছে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে তাকে আমি হারাতে পারবো না।

মন চাইলেও পারলাম না বলতে। পিছনে ফিরে দেখি কখন যেন নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছেন মিনতি সেন। কোন ভাবেই চোখ মেলে তাকাতে পারলাম না তার দিকে।

এগিয়ে এলেন উনি, সেলিনাকে নিজেই তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন তোকে বুঝতে ভীষণ ভুল করেছিলাম, মা। আমায় ক্ষমা করে দিস। সেলিনা বলল, পিসি আমি যদি কোন অন্যায় করি ক্ষমা করো, তোমাকে চিনতাম না দেখিওনি কখনো, কিন্তু শুনেছি তোমার কথা বিভিন্ন ভাবে। যাবে না হাসপাতালে। যাব। কিন্তু মা, পারবি তো নিজেকে সব কিছুর উর্দ্ধে নিয়ে যেতে। পারবি তো প্রান্তিকের ভালবাসাকে সুগভীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ভয় নেই। আমার সর্বস্ব বিলিয়ে দেবো, রেহানা যাতে সুস্থ হয়। কিন্তু কোন ঈর্ষা

তোকে বিপথে চালিত করবে না তো মা। সেলিনা কোন উত্তর না দিয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল মিনতি সেনের বুকের কাপড়

আমরা যখন হাসপাতালে এলাম, তার অনেক আগে থেকে ভিজিটিং আওয়ার আরম্ভ হয়ে গেছে। আজ আগে থেকেই এসেছেন নীলাঞ্জনা পিসি। আমাদের কাউকে না দেখে তিনি একা একা রেহানার পাশে গিযে দাঁড়ালেন। অন্য দিকে ফিরে শুয়ে আছে রেহানা। ডাকলেন, রেহানা। ডাক শুনে এ পাশে ফিরে দেখে নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছে রেহানা কি যেন বিষন্ন দৃষ্টি নিয়ে। নীলাঞ্জনা জানেন, স্মৃতি ফেরেনি ওর, কাউকে চিনতে পারে না। তাই কোন কথা না বলে পাশের টুলটা টেনে নিয়ে ওর বিছানার কাছ বসে ওর একটা হাত টেনে নিয়ে কোন কথা না বলে ছল ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। রেহানা বলে, তুমি কাঁদছ পিসি। চমকে ওঠে নীলাঞ্জনা। বলে তুই চিনতে পারছিস আমায়? বলতো আমি কে? নীলাঞ্জনাকে দুহাতে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, তোমায় চিনতে পারবো না কেন? কি হয়েছে আমার। না রে পাগলি কিছু হয়নি। এখন কেমন আছিস বলতো। কিছু হয়নি তো এমন করছ কেন তুমি। তোমার সঙ্গে আর কেউ আসেনি? কার কথা বলছিস? ও চুপ করে থাকে। নীলাঞ্জনা বলে, প্রান্তিক এসেছে ডাকবো ওকে? ও কোথায়? ও একটা জিনিস আনতে বাইরে গেছে। এখনি এসে যাবে, পাঠিয়ে দেব? না থাক। আর কেউ আসেনি? এসেছে অনেকে। তুই কাকে চাইছিস বল তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেলিনা আসেনি? সে তো এই নার্সিং হোমকেই তার বাড়ী বানিয়ে ফেলেছে। ও, বলে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ভীষণ খিদে পেয়েছে পিসি। কিছু টিফিন আননি? বল কি খাবি? যা এনেছো তাই দাও।

আজ কি মনে হতে, ফল কিনে ছিলেন নীলাঞ্জনা। বেদানা, আঙুর, আপেল বের করে ছুরি দিযে কেটে কেটে দিতে লাগলেন। রেহানা বলল, তোমাদের খুব ভোগাচ্ছি তাই না? মেয়ের কথা দেখ। মেয়ের কাছে আসতে কোন মায়ের কি কষ্ট হয়? হয় না বুঝি? তাই কি কখনো হতে পারে মা। তাই যদি হয়, তবে আমার মা কোথায়? আমার মা আফরোজ বেগম। কথাটা বোঝেন, নীলাঞ্জনা। বলেন, আমি কি তোর মা নই? তুই একটা একটা করে খা, আমি দেখি ওরা ফিরল কি না। না তুমি বোস। অগত্যা বসতে হয় নীলাঞ্জনাকে। নীলাঞ্জনা পালিয়ে যায় কি না সেই ভয়েই বুঝি, নীলাঞ্জনার আঁচলটা চেপে ধরে আছে রেহানা।

কাছে এসে দাঁড়াই আমি সেলিনা ও মিনতি সেন। নীলাঞ্জনা বললেন, এই যে প্রান্তিক তুমি এসেছো কি না জিজ্ঞাসা করছিল। তুমি বোস ওর কাছে, আমি এক পাশে বসতেই নীলাঞ্জনা সেলিনাকে বলল, সেলিনা জিনিষটা বোধ হয় পাসনি, চলতো দেখি কোথায় পাওয়া যায় নিয়ে আসি। তারপর মিনতি সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিও চলুন মিস সেন। বলে নীলাঞ্জনা উঠে দাঁড়াতেই, রেহানা বলল না তুমি যাবে না পিসি। নীলাঞ্জনা বললেন, পাগলামি করে না রেহানা, আমি আসছি, ওরাতো পায়নি, আমি না গেলে হয়? তুমি প্রান্তিকের সঙ্গে কথা বল। আমরা আসছি। প্রায় জোর করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নীলাঞ্জনা।

আর এই প্রথম, কি যে এক গভীর আনন্দে ওকে বুকের পর টেনে নিতে ইচ্ছে করছিল, তা বোঝাতে পারবো না। বহু কষ্টে তা দমন করে বললাম, এখন কেমন আছ রেহানা। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আমার উপর তুমি রাগ করেছো? কেন? তা হলে এত দেরি করে এলে কেন? কি যে হয়েছে প্রান্তিক, প্রতি মুহূর্ত্তেই শুধু তোমাকে চেয়েছি। আর তোমাকে না পেয়ে আমি যেন কেমন বোবা হয়ে যাচ্ছিলাম। বললাম একটা ভীষণ কাজ ছিল। আর কোন দিন এ ভুল হবে না। দেখ এবার থেকে আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব। সত্যি? সত্যি। তা হলে আমাকে ধরে তুলে বসিয়ে দাও। বললাম, বসতে পারবে তো? হ্যাঁ গো পারবো।

আমি ওকে আস্তে তুলে বসিয়ে দিলাম। বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে, তবু মনের জোরে বসল। বলল, তুমি কখন খেয়েছো? এইতো দুপুরের পরে। কোথায়? মিনতি পিসির ওখানে। উনি এসেছেন? আমি হ্যাঁ বলতেও বলল, তা হলে একবার ডেকে দাওনা। বললাম ওরা একটু বেরিয়েছে এখনই আসবেন।

ও বলল জান প্রান্তিক, আমার কেবলি মনে হয় আমি বোধ হয় তোমাকে আর আগের মত ভালবাসিনা। কি করে বুঝলে? বা আমি তোমাকে ভালবাসি কি না আমি তা বুঝবনা? তুমি কি করে বুঝবে? তবে কে বুঝবে? আমি বুঝব। আমি জানি, আমাকে তুমি খুব-খুব ভালবাস।

ও একটু ম্লান হাসল। তারপর বলল, আচ্ছা আমি যদি কখনো হারিয়ে যাই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে? তোমাকে হারাতেই দেবো না। বা তাই হয় নাকি? আমি কি টাকা কড়ি, যে লুকিয়ে রাখবে যাতে কিছুতে না হারিয়ে যাই। তুমি আমার অহঙ্কার রেহানা, তোমাকে সব সময় নিজের কাছে রাখা যে আমার আরো বড় অহঙ্কার। ও আবার হাসল, তারপর বলল, তোমার সবটাতেই বেশী বেশী। সেতো তোমার জন্যই রেহানা। তা হলে আমার এরকম মনে হয় কেন? সে তোমার মনের ভুল, বাস্তব সত্যি নয়।

ও হঠাৎ করে বলল, তুমি সেলিনাকেও খুব ভালবাস তাই না? সেলিনার মত মেয়েকে ভাল না বেসে পারা যায়? তুমিই বলো না? সে তো আমার বোন বলে। তোমার বোন কি আমার বোন নয়? তবে ওরা যে বলল! ওরা কারা! তাতো জানিনা, কবে যেন দেখেছি ওদের, কিন্তু তবু কিছুতেই মনে করতে পারছিনা। কি বলল ওরা! ওরা বলল, সেলিনাকে তুমি ভীষণ ভালবাস। শুধু আমার জন্য, সে কথা তুমি বলতে পারছনা। ওর মত মেয়েকে ভালবাসবে, তাতে আমার কি বলার আছে? ও তারপর হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, সেলিনা খুব ভাল মেয়ে, জান ও আমার থেকেও তোমায় বেশী ভালবাসে, ওকে তুমি গ্রহণ করবে তো।

এবার আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, ধমক দিয়ে বললাম তুমি চুপ করবে? ও বলল, খুব মায়া হয় ওর জন্য না? আচ্ছা কেন ওর খোঁপায় ভালবেসে যে ফুল গুঁজে দিয়েছিলে তা ফেলে দিলে? বললাম আমার ইচ্ছেয় তাকে সাজিয়ে ছিলাম, ভাল লাগেনি তাই ফেলে দিয়েছি। তা হলে তো আমাকে সাজিয়েও যদি কখনো ভাল না লাগে তা হলে

নিশ্চয়ই ফেলে দেবে? আমি অভিমানে বললাম জানিনা। তুমি এমন কথা বললে আমি আর থাকব না তোমার কাছে? কোথায় যাবে? সেলিনার কাছে? আমি রাগ করে বললাম হ্যাঁ তাই যাবো। তোমার চোখের ওপর ওকে আমি ভালবাসব, ওকে আদর করব, ওকে নিয়ে বেড়াতে যাবো, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব, দেখবে তখন মজাটা? ও হেসে বলল, ঈশ পারবে না তুমি। কেন পারবো না, কেন? কি করে পারবে? ওকে আদর কবতে গিয়ে যদি আমার মুখ দেখে শিউরে ওঠো পারবে ওকে আদর করতে? আমি বললাম আচ্ছা রেহানা কে তোমার মাথায় এই সমস্ত দুবুর্দ্ধিগুলো ঢুকিয়েছে বলতো। ও নির্বিকার ভাবে বলল তুমি। আমি? হ্যাঁ তুমি। কখন? এইতো বললে, ওকে তুমি ভালবাসবে। ওকে তুমি আদব করবে, বল নি?

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা ওকি সুস্থ? এর সঙ্গে আর বেশী কথা বলা ঠিক হবে না। ও বলল, কি হল আর কথা বলবে না? তুমি বল আমি শুনি। আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে? কোথায়? তোমাদের গ্রামে। সেই অনেকদিন আগে একবার বলেছিলে, যাবে তো? নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো? সেখানে কি কি আছে? বললাম, মাথার উপর খোলা আকাশ পায়ের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেত। আকাশে অনেক তারা। নদী পারে হলুদ সর্ষে ক্ষেত। আর পুকুব ভরা মাছ। কোন ফুলের বাগান নেই তোমাদের গ্রামে? তাও আছে। তবে গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ীতেই তো আছে ফুলের বাগান। তাই আলাদা করে শুধু ফুলের জন্য ফুলের বাগান কোথাও নেই। ও বলল তোমাদের বাড়ীতে ফুলের বাগান আছে? হ্যাঁ আছে। কি কি ফুল ফোটে। অনেক জানা না জানা অসংখ্য নামের ফুল ফোটে সেই বাগানে। চন্দ্রমল্লিকা ফোটে না? জান আমার চন্দ্রমল্লিকা ভীষণ ভাল লাগে। লাল নীল হলুদ সাদা অসংখ্য বকমের চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে যেন আমি নিজেকে খুঁজে পাই। একটু হেসে বললাম তাই বুঝি। তারপর বললাম, তুমি যখন আমাদের গ্রামে আমাদের বাড়ীতে যাবে, অসংখ্য পাখ-পাখালীর ডাকে তোমার যখন ঘুম ভাঙবে, তোমাকে নিয়ে যাবো, সেই চন্দ্রমল্লিকার বাগানে।

মনে মনে ভাবি কি আকুল তৃষ্ণা। এমনি অভিযোগের আঙুল তুলে এইতো একটু আগে মিনতি পিসির বাড়ীতে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিল সেলিনা। অবিকল সেই কথা গুলো এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এল রেহানারও মুখ দিয়ে। আমি আবেগে ভাসতে ভাসতে বললাম, সত্যি তোমাকে বুঝিনি রেহানা। বোঝনি? না। তা হলে এই নাও চিরুনি সুন্দর করে দাও আমার খোঁপা। আর যে শাড়ীটা পরে তোমার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, আছে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও পরিয়ে দাওনা সুন্দর করে আমাকে। আমি অবাক হয়ে বললাম আমি পরিয়ে দেব তোমাকে শাড়ি? কেন পারবে না? তারপর করুণ ভাবে বলল, আমিতো নিজে পারবো না পরতে, তবে কে আমাকে পরিয়ে দেবে? সেলিনা আসুক আমি ওকেই বলব। তবু তুমি পারবে না এটাতো কেবিন, কেউ তো নেই এখানে, তবে অসুবিধা কোথায়? আমি বললাম, অসুবিধাটা যে কোথায় তা আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাই? ও হতাশ ভাবে বলল জানি পারবে না তুমি, তবে কেন মিথ্যে স্বপ্ন দেখাও প্রান্তিক? আমিতো হেরে গেছি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, হৃদয় এবং মনে আমি শক্তিহীন। তুমি চলে যাও প্রান্তিক

ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে, তুমি না গেলে ওরা কেউ আসবে না। ওদের আসতে দাও। বললাম থাক না ওরা বাইরে। আজ শুধু আমি থাকি তোমাব কাছে? কেন মিথ্যে দুঃখের রেশ কাড়াবে? কি দেখবে তুমি আমার মধ্যে রূপ? হারিয়ে ফেলেছি। মন? বাসী হয়ে গেছে। হৃদয়? প্রাণহীন পাথর মাত্র। আর যে দুটি উজ্জ্বল চোখের মায়ায় পড়েছিলে একদিন, ধূসর হয়ে গেছে তাহলে কি দেখবে তুমি আমার মধ্যে?

বললাম রেহানা, যত পার আঘাত দাও, কিন্তু ভুলে যেও না আমার শিরায় শিরায় কেবল তোমার উপস্থিতি। দাঁড়াও দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। কেন? তোমাকে সাজাবো বলে? কি ভাবে সাজাবে। বললাম আমার ভালবাসার রঙে।

চিরুনি চালিয়ে ওর অবিন্যস্ত চুলকে বিন্যস্ত কবলাম। তারপর দু হাতে ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমার অদক্ষ হাতে পরিয়ে দিলাম ওর আকাঙ্খিত শাড়ী। তারপর বললাম, তুমি পারবে দাঁড়াতে? কেন গো? আমার সাজানো যে পূর্ণ হয়নি রেহানা, আমি যাব আব আসব। পারবে না দাঁড়াতে? পারবো।

আমি দ্রুত বেরিয়ে গেলাম। বাইরে তখনো অপেক্ষা করছো ওরা। আমি সেলিনাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললাম, আজ আর ঠাট্টা করোনা সেলিনা। একবার শুধু একবার আমাকে জিততে দাও। সেলিনা কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। বললাম আমি দাঁড়িয়ে আছি। গেটের বাইরে ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে ফুলওয়ালী। আসার সময় দেখে এসেছি বিভিন্ন রং এর মিশ্র চন্দ্রমল্লিকা, নিয়ে আসবে একটা? ও বলল, এখনি আনছি। আর একটা কথা? বলুন। সবুজ টিপ আছে তোমার কাছে আর চওড়া লাল গার্ডার। হ্যাঁ আছে? দেবে আমাকে? দেব। ও দ্রুত গেটের বাইরে গিয়ে চন্দ্রমল্লিকা কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, আমি কৃতজ্ঞ প্রান্তিক ভাই আপনার কাছে। জয় হোক আপনার।

দ্রুত ওর কাছে এসে দেখি সত্যি তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে রেহানা। বললাম কষ্ট হচ্ছে না? না। আমি পরম মমতায় চওড়া লাল গার্ডার পরিয়ে দিলাম ওর হাতের রিষ্টে। কপালে সবুজ টিপ পরালাম। তারপর বললাম, আস্তে আস্তে হেটে যেতে পারবে আয়নার কাছে।

ও এগিয়ে এল। দেখত আয়নায় চিনতে পার কিনা। চকিতে আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি ভীষণ দুষ্টু। আমি ওকে মুহূর্তে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম সত্যিই তাই। ও আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল তুমি শুধু আমার প্রান্তিক, শুধু আমার। আমি এই অবসরে চন্দ্রমল্লিকাটা ওর খোঁপায় গুঁজে দিয়ে চোখের পর চোখ রেখে তাকালাম ওর দিকে। বলল কি দেখছ অমন করে? বললাম, হেলায় হারিয়েছি যে অতীত, হিসেব মিলিয়ে দেখছিলাম তাকে ফিরে পেলাম কি না। পেলে? বললাম জীবন নিয়েতো অনেক বড়াই করো, বলতে পারো উত্তর মিলল কি না। কাল বলব। কেন আজ নয় কেন? এখনো যে নিজের অংক মেলাতে পারিনি। এটুকু সময় আমাকে দেবে না? আবার ওকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, আমি অনন্ত কাল তোমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব রেহানা।

এবারে ছাড়। ভিজিটিং আওয়ার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ওরা সবাই অপেক্ষা করছেন। ওরা আসবেন না?

রেহানা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ভিক্ষে চাইবো না। যদি মনে হয় সুন্দর, প্রতিদান দেবে না? আবেগে থর থর করে কাঁপছে হৃদয় মন শরীর সব কিছু। বললাম দেব। এস তোমাকে শুইয়ে দিই।

মনে হয় সত্যিই ক্লান্তি লাগছিল। বাধা দিল না। যেভাবে নিজের হাতে সাজিয়েছি ওকে সেই ভাবে আস্তে ওকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে ও আমার হাতটা মুহূর্তে ধরে ফেলে বলল তুমি মিথ্যেবাদী। আমি হাসলাম ওর চোখে চোখ রেখে বললাম প্রতিদান তো? চোখের ভাষায় ও বলল হ্যাঁ। কি যে হল কে জানে সমস্ত সংযমকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে নিজের মুখটাকে নামিয়ে নিয়ে এলাম ওর মুখের ওপর এবং আলতো চুম্বন দিয়েই পালিয়ে এলাম। দ্রুত দরজা খুলে একবার ওর দিকে তাকাতেই ও হাসি হাসি মুখে বলল, কাল আসছো তো?

আজ ওকে ছেড়ে দেবে। সেলিনাকে বললাম চল, ওকে নিয়ে আসি। বলল, আপনি যান প্রান্তিক ভাই, কেন তুমি যাবে না? ও শুধু হাসল। মিনতি পিসি বলেছেন, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব গেটে গাড়ী থাকবে। গাড়ীর নাম্বারটা আমায় দিয়েছিলেন। আফরোজ বেগমকে বললাম, আপনিতো একদিনও গেলেন না মাসিমা, আজ চলুন। আপনাকে দেখলে ওর ভাল লাগবে। উনি অকারণে চোখের জল ফেলে বললেন, না বাবা তুমি যাও। কতদিন পরে মেয়েটা আসবে বাড়ীতে। ওর জন্য বহু দিন পরে ও যা ভালবাসে দেখি তার কোন বন্দোবস্ত করতে পারি কি না।

গতকাল রিলিজ অর্ডার এবং নার্সিং হোমের সমস্ত পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিয়েছেন মিনতি সেন। বললাম, আপনি আসবেন না, উনি বললেন, দেখি যদি সময় করতে পারি। বুঝতে পারছি কেউ আসবে না। একদিন যেমন সেলিনাকে একাকী আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল, আজও রেহানাকে হয়তো একাকীই নিয়ে যেতে হবে। ভীষণ আনন্দের মাঝেও কি যেন বিষন্নতার সুর বাজছে আমার একতারাতে। এমন নিবিড় করে ওকে তো আর কখন কাছে পাবো না।

আজ ১০ দিন হলো ওর স্মৃতি ফিরে এসেছে। এই দশদিন ও যেমন নিঃস্ব করে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে আমার কাছে এত দীর্ঘদিনে তা কোনদিন করেনি। কত স্বপ্ন। কত কল্পনা কত অতীত স্মৃতির গভীর সাগরে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে অস্তিত্ব খুঁজে ফিরেছি। এই দশদিনে মাত্র একদিন এসেছিল সেলিনা। বলেছিলাম ওকে, তুমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছ? অবাক হয়ে বলেছিল প্রতিশোধ? কার উপর প্রান্তিক ভাই? আমার উপর? কেন কিসের প্রতিশোধ? বলেছিলাম তাহলে যাওনা কেন ওখানে? ও বলল, গানের ছন্দপতন ভাল লাগবে? আবার তো সেই অন্ধকার দিন, সেই একঘেয়েমি তীব্র বাস্তবের মুখোমুখি। মধুর বাঁশীর সুর বিলীন হতে তো সময় লাগবে না। এই সময়টুকু শুধু আপনাদেরই থাকুক। বলেছিলাম, সত্যি তোমাকে আজো বুঝতে পারলাম না আমি। তারপর বললাম তুমি কেন

বোঝনা সেলিনা তোমারা না গেলে আমার ভাল লাগতে পারে না। ও বলল, ওটা অন্তরের কথা নয়। আপনাদের কোন এক কবি বলেছেন না 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতা শূন্য থাক।' হ্যাঁ ওমর খৈয়াম। সেলিনা বলল ওই কবিই বোধ হয় আরেক জায়গায় বলেছেন, প্রিয়ার ডাগরচোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা। আমি বললাম, তুলনাটা ঠিক হল না সেলিনা। আসলে এই বৈপরীত্যের জন্য দায়ী তোমার অন্তর। না গিয়ে কি তবে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে চাও। না, তাহলে? ভাবছি। কি ভাবছো? ভাবছি আপনার কথা? আমার কথা? হ্যাঁ প্রান্তিক ভাই আপনার কথা? কি? যদি আপনাকে রেহানার কাছ থেকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাই, কেমন লাগবে ওর। আমি হাসতে হাসতে বললাম, এরকম অবস্থায় ঠিক তোমার যেমন লাগবে। আপনি আমাকে এমন দুর্বল ভাবেন কেন বলুনতো? ওকে বাধা দিয়ে বললাম ওসব কথা থাক। কেন তুমি যেতে চাওনা ওখানে? কারণ আমার উপস্থিতি আপনাদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তার থেকে এই ভাল। আপনি আর দেরি করবেন না যান।

কথা বাড়ায়নি আর। আসতে আসতে ভাবছিলাম, সেই প্রথম যেদিন ওর কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছিলাম সেদিন বলেছিলাম হিসেব মিলল কি না? বলেছিল সে, উত্তর কাল দেব। পরের দিন বলেছিল, না প্রান্তিক, আজো মেলেনি উত্তর। তবে মেলাতে আমাকে হবেই। তারপর দুষ্টুমি মাখা হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, কি পাগল তুমি, উত্তর মেলানোর হিসাব চাইছ তুমি আমার কাছে, নিজেই তো মিলিয়ে নিতে পার। পার না?

রহস্য ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ও আমার দিকে। রেহানা সুস্থ হয়ে উঠছে দ্রুত। ডাঃ পালও ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। এত দ্রুত এই আঘাত থেকে সেরে ওঠার কথা নয়। আমি বললাম, রোজ রোজ আর এখানে আসতে ভাল লাগেনা। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও। সুস্থতা কি আমার হাতের মধ্যে। তোমারই মধ্যে। তোমার মনের জোর, তোমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করবে রেহানা। আবার সেই চতুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললে আমার সুস্থতায় তোমার লাভ হতে পারে, কিন্তু আমার তাতে যে ভীষণ ক্ষতি? সে আবার কি রকম?

ও তাকালো ঘরের চারদিকে তারপর বলল, এখানে যে তুমি আমার, একান্ত আমার, এমন করেতো তোমাকে এর বাইরে গিয়ে পাবোনা। গভীর আবেগে বললাম, নিভৃত মনের কোন সে গোপনে এত ভালবাসাকে তুমি নির্বাসিত করেছিলে রেহানা। ও বলেছিল ভালবাসাতো মনের গহনে লুকিয়ে থাকে। সমুদ্রের মত অতলান্ত আবার উত্তাল তরঙ্গ মালার মধ্যেও সত্যি কারের ডুবুরি কেবল তাকেই খুঁজে পেতে পারে যা সে খুঁজতে চায়। আমি তো মেকি ডুবুরি। তাই বুঝি? তা হলে কেমন করে খুঁজে পেলে তুমি সেই অমূল্য মুক্ত? পেয়েছি কি? পাওনি বুঝি। আমি হাসলাম। ও খুব আস্তে বলল কাছে এসো। কেন? যদি না পেয়ে থাক নিজের হাতে তুলে দেব তোমাকে। কোন দুঃখ থাকবে না। পায়ে পায়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছি ওর দিকে। ঝড়ের মত ঢুকলো সেলিনা। আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে হৃদস্পন্দন বেড়ে চলেছে দ্রুত। বললাম, তুমিতো আসবে না বললে? বলেছিলাম।

তবে কি খুব প্রয়োজন? কেন আমার আসায় আপনাদের কি কোন ক্ষতি হয়েছে? রেহানা বলল এভাবে কথা বলছিস কেন? তুই থাম রেহানা। তারপর আমাকে বলল, একবার বাইরে আসতে পারবেন প্রান্তিক ভাই। রেহানা বলল, এখানে বলা যায় না। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। না যায় না। বললাম চল। তারপর রেহানার দিকে তাকিয়ে বললাম আমি আসছি।

বাইরে এলে সেলিনা বলল, আজ আপনি বিকালে এখানে আসবেন না প্রান্তিক ভাই। কেন? আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমি যে না বলছি এটাই কি যথেষ্ট নয়? একদিন সে কথা মেনে নিতে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু সে বিশ্বাস তুমি নিজেই নষ্ট করেছো। মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি প্রান্তিক ভাই? কি বলতে চাইছি তাতো তুমি আমার থেকেও বেশি জান। ও কোন কথা না বাড়িয়ে বলল, আপনার দুটি পায়ে পড়ি প্রান্তিক ভাই, আপনি আজ আসবেন না। পরে তার জন্য যে শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে নেবো। কিন্তু আপনি এলে আমার ভীষণ বিপদ হবে। তা হলে কি করব। শুধু একটু অভিনয়। অভিনয়? হ্যাঁ প্রান্তিক ভাই অভিনয়? কার সাথে? আমার সাথে?

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল ভীষণ। বললাম, তোমার সব অভিযোগতো মাথা পেতে নিয়েছি। আবার কোন খেলা খেলবে আমাকে নিয়ে। তারপর বললাম বেশ অভিনয় করতে কোথায় যেতে হবে? কোথাও না। এই ওয়েটিং রুমে আমরা শুধু পাশাপাশি বসে থাক্‌বো। ব্যাস। অভিনয় শেষ? কোন ভালবাসার কথা নেই, নেই কোন মান অভিমান, এমন নিরামিষ অভিনয় আমি করতে পারবো না সেলিনা। চোখে তীর্যক দৃষ্টি এনে বলল নিরামিষকে আমিষ করার দায়ীত্ব আমার তখন বাধা দেবেন না তো? বেশ তাই হবে।

কি হয়েছিল জানিনা। ওযে কি খেলা খেলতে চেয়েছিল তাও জানিনা। ওয়েটিং রুমে বসে আছি আমরা। বুঝতে পারছি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি আমি, নিজের মনে আগে যে জোর ছিল তাও যেন কেমন কমে আসছে। কোন কিছুই স্বাভাবিক ভাবে ভাবতে পারছিনা। হঠাৎ ও আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, তুমি কেন বুঝতে চাওনা, কি চাই আমি তোমার কাছে। আমি অবাক হয়ে বললাম ছিঃ সেলিনা! এসব কি হচ্ছে? ও বলল কি নেই আমার প্রান্তিক, যার জন্য এমনি ভাবে এড়িয়ে চল। ও আমার কাধের পরে একটা হাত রেখে আরো কাছে এগিয়ে এল। বললাম, আমি রক্ত মাংসের মানুষ, কেন চাইছো রেহানার কাছ থেকে আমাকে এভাবে সরিয়ে নিয়ে আসতে। আমি তোমাকে ভালবাসি, ওর থেকেও আমি তোমাকে বেশী সুখী করতে পারব তাই। আরো কয়েকজন লোক এলেন ওয়েটিং রুমে বসবার জন্য। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, বললাম চল এখান থেকে ওঠা যাক। কেন লজ্জা করছে তোমার? এটা শুধু লজ্জার নয়, এটা অশ্লীলতার প্রশ্ন। জীবনটাতো শুধু শ্লীলতা দিয়ে বিচার হয় না প্রান্তিক, কখনো কখনো তা অশ্লীল, আর তাই বলে অশ্লীলতাকে একেবারে অস্বীকার করো না। সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে অশ্লীলতাকেও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। আমার দৃষ্টি দিয়ে দেখ প্রান্তিক, আমি যা চাইছি, তুমিও তাই চাইছো, শুধু পরিস্থিতির মাপকাঠিতে তোমার তা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

ও আমার কানের কাছে মুখ এনে আরো নীচুস্বরে ফিস ফিস করে কি যেন বলল, কোন কথাই বুঝতে পারলাম না। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে আছি দেখে বলল, তা হলে আমার অপমান তুমি দেখতে চাও? দেখতে পাচ্ছি দুটি ছেলে, বয়স আমারই মত হবে, কয়েকবার এই ঘরে উঁকি মেরে যাচ্ছে। এবার তারা একটু নিরাপদ দূরত্বে এসে বসল। যেহেতু ভিজিটিং টাইম, তাই এ ঘরে লোকজনের আনা গোনা বেশী নেই। যারা এসে বসেছিলেন তারাও মিনিট পাঁচেক আগে চলে গেছেন। সেলিনার ওই গায়ে পড়া ভাব, আর ছেলে দুটির ওই ভাবে মাঝে মাঝে তাকিয়ে জরিপ করা, সব কিছু নিয়ে আমার প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল সেলিনার উপর। মনে হতে লাগল, হাতের পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিই ওর হাসি হাসি মুখে। ও কিন্তু নির্বিকার। চোখের ভঙ্গিমায় অনুরাগের দ্যোতনায় অধিকারের জবরদস্তিতে অকারণ বুক থেকে মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃত আঁচল খসে পড়া, সব কিছু নিয়ে আমাকে যখন ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রেরিত করছে তখনি বলল, জানি আমার ডাকে তোমাকে সাড়া দিতেই হবে। কতদিন আর এড়িয়ে চলবে। তাই বলছি চল না প্রান্তিক, আমার সব ব্যবস্থা করা আছে। পার্ক হোটেল, ১৪ নং ঘর, সারা রাতের জন্য বুক করা হয়েছে। এবার খুশীতো আনন্দে উজ্জ্বল দুটি চোখ থেকে যেন সীমাহীন তৃষ্ণার লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসছে।

ছেলে দুটি তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, কি হ্যাংলামো দেখেছিস? আরেক জন বলল আরে ছেড়ে দে, এসব কেসের পরিণতি তো জানা। চল আমরা একটু ঘুরে আসি।

ওরা বেরিয়ে গেল। সেলিনা তখনো আমার হাত ছাড়েনি। তবে কাঁধের হাতটা নামিয়ে সামান্য দূরে সরে বসেছে। আমি একটু জোর করেই হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, তুমি কি লাজ্ব লজ্জার মাথা খেয়েছো? খিল খিল করে হেসে উঠলো সেলিনা। চোখ দুটির তীর্যক দৃষ্টিকে বাইরের রাস্তার দিকে ফিরিয়ে, বললাম তোমার হাসতে লজ্জা করছেনা? ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। যারা রোগী দেখতে এসেছিলেন তারা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন সব। রেহানাকে আজ কেউ দেখতে আসেনি। আমি যে সত্যি সত্যি আসব না তাও তো ওকে বলে আসা হয়নি। বুঝতে পারছি, কি তীব্র অভিমান নিয়ে কাল পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সেলিনা বলল, না লজ্জা করছেনা প্রান্তিক ভাই। প্রান্তিক ভাই! আবারও চমকে উঠলাম আমি। এ কোন কুহকিনী! ও বলল, বিশ্বাস করুন, এ অভিনয়টুকু না করে আমার কোন উপায় ছিল না। যে সমস্ত কথা বলেছি, তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করে দেবেন। জীবনের পাতা থেকে আজকের এই মুহূর্ত্তটুকু কালো কালি দিয়ে কেটে দেবেন। চলুন এবার। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, একবার যাবে না রেহানার সঙ্গে দেখা করতে? বলল, জানি খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার, ওর ও যে কি হচ্ছে সেতো আমি ভুক্ত ভোগী হিসাবে জানি তবু শুধু একটা দিন এটাকে মেনে নিন প্রান্তিক ভাই। আমি বললাম, তুমি বক্সিংএর মেয়ে, রিংএ কাকে কিভাবে নক আউট করবে, সেটা তুমিই জান। তবু একটা কথা বলবে, এমন

চরম অভিনয় তুমি করলে কেন? তুমি কেন বুঝতে চাইলেনা, আমিও রক্তমাংসের মানুষ, হঠাৎ পতন হলে কি উত্তর দেব তোমাদের কাছে? আবারও সেই উপচে পড়া হাসি। হাসতে হাসতেই বলে আমাদের কাছে? তার থেকে বলুননা, আমার কাছে। ধর তাই। কোন উত্তর দিতে হবে না প্রান্তিক ভাই। যদি না বুঝতাম আপনাকে, এই নৃশংস অভিনয় করতে যেতাম না। আজ কোন উত্তর চাইবেন না। যে জন্য এ অভিনয় দরকার হয়েছিল, তা যদি কৃতকার্য্য হয় জানাব আপনাকে, অন্তরের কৃতজ্ঞতাও উজাড় করে দেব সেদিন। আজ থাক প্রান্তিক ভাই। আজ শুধু মিথ্যে এ অভিনয়টুকুর জন্য ক্ষমা ভিক্ষে চাইছি।

অদ্ভুত, কি অদ্ভুত মেয়ে এই সেলিনা। বিপদের আঁচ আমি পাইনি। হয়তো ও পেয়েছে, বা স্থির জেনেছে। বিশ্বাস, নিজের জন্য এ অভিনয় সে করেনি। যে কোন চরম র্দুঘটনা থেকে সে বাঁচাতে চেয়েছে আমাকে ও রেহানাকে। কিন্তু কিসের সন্দেহে সে একাজ করল জানিনা। হাজার অনুরোধে ও বলেনি।

এতদিনের মেলা মেশায় বুঝি অশ্রুকণাকে, তপতীকেও বুঝি, বুঝি নীলাঞ্জনা পিসি, মিনতি সেনকেও। কিন্তু বুঝতে পারিনা এই অদ্ভুত মেয়ে সেলিনাকে। যে কোন কিছু চাইবার ক্ষেত্র যেমন স্পষ্ট, পিছিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি স্পষ্ট। কোন মায়াবী অবগুন্ঠন নেই, নেই কোন ভনিতা। জানিনা এমন মেয়েকে ভালবাসা যায় কি না।

আজ সেই রিলিজের দিন। আমি একাই এসেছি। অফিস ঘরে ঢুকেই দেখলাম কেউ নেই। কি ব্যাপার? ওরা তো সবাই এক সঙ্গে বেরিয়ে যায় না। কাগজগুলো যে আমার দরকার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি এলাম রেহানার কেবিনে, সেখানে ডাক্তার পাল, সিস্টার আরো অনেকে আছেন। একি? ছোট খাট ভিড় দেখে মনে খটকা লাগল কিছু কি হয়েছে রেহানার? কিন্তু না জেনেও মন এত কু-গাইছে কেন? ভিতরে ঢুকলাম। ওরা আমাকে পথ করে দিলেন। আমি বললাম রেহানা কোথায়? ওরা চুপ করে আছেন দেখে অবারও বলালম, ওর কি কিছু হয়েছে, কথা বলছেন না কেন? ডাক্তার পাল একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন এতে সব লেখা আছে। মিসেস সেনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি এখনি আসবেন।

জানিনা কি আছে চিঠিতে। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে কাঁপছে। বারবার ভেবেও চিঠিটা পড়তেও পারছিনা। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তো পড়েছেন, কি আছে ওতে। ওরা বললেন, ওতে দুটো চিঠি আছে। একটা খাম বন্ধ করা, ওপরে আপনার নাম লেখা। আরেকটা এখানকার ম্যানেজমেন্টকে লেখা। ম্যানেজমেন্টকে লিখেছেন, এই নার্সিং হোম তাকে যে যত্নের সঙ্গে এবং দক্ষতার সঙ্গে সুস্থ হতে সাহায্য করেছেন, তার জন্য যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাকে আলাদা কেবিন এবং স্বাভাবিক স্বাধীনতা দিয়ে তার শূন্য হৃদয়টাকে যে ভাবে ভরে দিয়েছেন, শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের কাউকে উনি ছোট করতে চান না। জীবনে যা কিছু চেয়েছেন, তার পূর্ণতা দিয়েছে এই ছোট্ট কেবিনের নির্জনতাটুকু। কোন অবস্থাতেই জীবন থেকে তিনি তা মুছে ফেলতে পারবেন না। কিন্তু সঙ্গে তিনি ভয়ও পেয়েছেন, হয়তো এই সুখ তার জীবনে স্থায়ী হতে দেওয়া হবে না। তাই

তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই পরিচিত গন্ডী থেকে তিনি দূরে চলে যাবেন, যাতে তার জীবনের একাকী নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলোতে এই স্মৃতিটুকু বেঁচে থাকে। আর একটা অনুরোধ জানিয়ে গেছেন, মিস সেনকে তিনি যেন কোন অবস্থাতেই তাকে খোঁজার চেষ্টা না করেন, আর এই ম্যানেজমেন্টকে তারা যেন কোন ভাবে কাউকে দায়ী করে কাঠগড়ায় দাঁড় না করান। এই সঙ্গে লিখে গেছেন, আলাদা করে একটা চিঠি খাম বন্ধ করে দিয়ে গেলাম। ম্যানেজমেন্টের [illegible] এই বিশ্বাস রেখে যে, এটা শুধু প্রান্তিককেই দেওয়া হবে আর কাউকে নয়।

আমি অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিলাম। মনে মনে বললাম রেহানা এ তুমি কি করলে। কেন করলে এমন কাজ? কেন তোমার মনে এই ভয় জন্মাল যে, তোমার জীবনে এই সুখটা স্থায়ী হতে দেওয়া হবে না। তুমি একটু বিশ্বাস রাখতে পারলেনা আমার উপর? এত অবিশ্বাস আমাকে? আমার সমস্ত শরীরটা শিহরিত হয়ে উঠলো, আমি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম।

মিনতি সেন এসে দাঁড়ালেন পাশে। তিনি শুনে নিয়েছেন সব কথা। চরম বিস্ময়ে তারও কথা যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। একি করল মেয়েটা কাকে ও ভয় পাচ্ছে? তবে কি সেলিনার প্রতি চরম অভিমানে সে এই পথ বেছে নিল।

আমার কাছে আসতেই আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। যেন আমার একমাত্র আশ্রয় স্থল মিনতি সেন ছাড়া আর কেউ নেই। উনি আমাকে কাঁদতে দিলেন। তারপর আমার হাত থেকে মুখ বন্ধ করা খামটা নিজের হাতে খুলে নীরবে পড়তে লাগলেন, 'প্রান্তিক', কতবার হিসাবের অংক মেলাতে বলেছো আমাকে। বলতে দ্বিধা নেই। মেলেনি আমার অংক। হয়তো অংকে বরাবর কাঁচা ছিলাম বলে মেলাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম একদিন, কি পাবে এই অংক মেলানোয়। জীবনের অংক মেলেনা কোনদিন। তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি বলে বার বার বলেছি ঠিক মিলিয়ে দেব একদিন। কিন্তু জানতাম না, আমার অংকের উত্তর তোমার উত্তরের সঙ্গেও মিলবে না।

এই কেবিন আমাকে কি দিয়েছে, এখানকার ম্যানেজমেন্টকে তা বলে গেছি আলাদা ভাবে, তোমাকে তা আর নতুন করে কি বলব। আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমার এই যাওয়াটাকে জানি তোমরা হঠকারী সিদ্ধান্ত বলে ভাববে। তা ভাবতে পার। কিন্তু যে পূর্ণতায় আমি পরিপূর্ণ, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো তাকে ক্ষয় হতে দিতে পারি না।

আমার কাছে তুমি কতটুকু তা নিজের মুখে বলে নিজেকে যেমন ছোট করতে পারবো না, তেমনি পারবো না তোমাকেও ছোট করতে। তুমি অনেক বার বলেছো, রেহানা তোমার ভালবাসার কাছে আমি তুচ্ছ। আমি যা নই তেমনি এক বিরাটত্বের মাঝে আমাকে উত্তীর্ণ করে, তুমি নিজে সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছো। পারলাম না মেনে নিতে বলে আমায় তুমি ক্ষমা করো।

জানিনা, মিনতি পিসি, তোমার পিসি, সেলিনা এমনকি আমার মা পর্যন্ত আমাকে

ক্ষমা করতে পারবেন কিনা কিন্তু এও জানি প্রান্তিক তুমি পারবে। তোমার ভাষায় তুমি অতি ক্ষুদ্র। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তাই আমার এই তুচ্ছ সিদ্ধান্ত তোমার মতো ক্ষুদ্রের পক্ষেই ক্ষমা করা সম্ভব।

কেন চলে যাচ্ছি, জানতে চেওনা। খুঁজবারও চেষ্টা করোনা আমাকে কোথাও। পাবে না। তবে তোমাকে যতই ভয় দেখিয়ে থাকি না কেন, তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবো না কোনদিনও। তোমার ওপর এই বিশ্বাস নিয়েই পথে নামলাম। একদিন এই পথ হয়তো তোমার কাছে আবার আমাকে পৌঁছিয়ে দেবে।

কাল তুমি আসবে। অনেক ভেবেছি, এ ভাবে তোমাকে আঘাত দেওয়ার কি অধিকার আছে আমার? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, আঘাত যদি সইতে না পারবে, তা হলে কিসের অহংকার তোমার ভালবাসার। কিসের জোরে ফিরিয়ে দিতে পার তুমি তপতীদির আত্ম নিবেদন, অশ্রুকণার বেদনা ভরা একনিষ্ঠতা, আর সব থেকে নিষ্ঠুর ভাবে ফিরিয়ে দিতে পারো না বলা আত্ম নিবেদিত সেলিনাকে। অথচ সেই তুমি কি মরমীস্পর্শে আমার সব অবহেলাকে সরিয়ে রেখে বুকে তুলে নিলে আমার বিষন্নতাকে। কেমন করে পারর, ওদের অত ভালবাসাকে নিজের ক্ষুদ্র সাজিতে ভরে নিতে।

একদিন না একদিন কোন মনোমালিন্য হতেই পারে। আমিও মানুষ। কোন দেবী নই, নই কোন পরী। সেদিন ওদের ওই আত্মত্যাগ অনেক বড় হয়ে তোমাকে যখন আমার বিরুদ্ধে বলতে কিছু বাধ্য করবে, যে ঈশ্বর রূপে তোমাকে কল্পনা করেছি তার যে মৃত্যু হবে। পারবো কেন তা সইতে।

আর পারবো না বলেই, পূর্বাকাশ লাল হয়ে ওঠার আগে বেরিয়ে পড়ব। একটু আগে প্রস্তুতি শেষ করেছি। যাওয়ার আগে ভীষণ ভীষণ ভাবে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে প্রান্তিক। শুধু একবার তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে, তুমি যেওনা রেহানা। আমার জীবনে রেহানা ছাড়া যে আর কেউ নেই এই বিশ্বাসটুকু রাখ।

হায়রে নারীমন। মৃত্যুতেও তোর শান্তি নেই। রাত যত শেষ হয়ে আসছে, ততই দুর্বলতা আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। শুনেছি যেকোন বিপদে, ভক্ত তার ঈশ্বরকে ডাকে। আমিও তো বারবার আকুল ভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমার ঈশ্বরের কাছে, তুমি আমায় দুর্বল করে দিওনা, তুমি আমায় শক্তি দাও।

তোমার মাধ্যমে একটা আবেদন রেখে যাচ্ছি মিনতি পিসির কাছে, একবার যেন মা বলে ডাকার অধিকার দেন। কতটুকুইবা পরিচয় তার সঙ্গে, তবু কেন যে বারবার তাকে মা বলে ডাকতে মন চায়। কিন্তু কেন? জানিনা প্রান্তিক কিছুই জানিনা। সময় শেষ হয়ে আসছে। কালের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ভেবো না আমার জন্য। প্রার্থনা করি, আমার অংক নাই বা মিলুক তোমার উত্তর যেন মিলে যায়, 'রেহানা।'

মিনতি সেনের হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ল। ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, ওরে পাগলি মেয়ে, তোর মুখের মা ডাক শোনার জন্য কি অপরিসীম তৃষ্ণা ছিল আমার। একবারও

বুঝলি না। চোখ দিয়ে জল অবিরল গড়িয়ে পড়তে লাগলো ওই প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী, প্রভাবশালী নারীর। এক সম্পর্কহীন বিধর্মী মেয়ের মুখে মা ডাক শোনার জন্য কি অধীর প্রতীক্ষা।

বুক যেন ব্যথায় আটকে যেতে চাইল। ডাঃ পাল বললেন, এ ভাবে ভেঙে পড়বেন না মিস সেন। আপনি চিন্তা করবেন না আমরা যেখান থেকে পারি ওকে খুঁজে এনে আপনার কাছে তুলে দেব। পুলিশকে আমরা প্রাইমারী ইনফরমেশান দিয়েছি। ডিটেইল দিতে গেলে যে মিস রহমান কি লিখেছেন ওটাও দরকার। মিনতি সেন বললেন, কোন দরকার নেই ডাঃ পাল। এত সব করে ওর শান্তিকে বিঘ্নিত করে লাভ নেই। একদিন ও ফিরে আসবে, আসতেই হবে। সে দিন মিটিয়ে নেব আমাদের মান অভিমান আর দেনা পাওনার হিসাব। আপনাদের তরফ থেকে আর কোন চেষ্টাই করতে হবে না।

তারপর নিজের আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে বললেন, এখন কি করবে প্রান্তিক। আমি বললাম, তুমি বলে দাও আমি কি করবো। আমি বলে দেব? তুমি ছাড়া কে বলবে মা? মা। এ তুই কি বলছিস, প্রান্তিক। কেন, কোনদিনই কি চাওনি রেহানার মত আমিও তোমাকে মা বলে ডাকি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ওরে পাগল ছেলে, কি করে বোঝাব তোদের? তোদের মা ডাক শোনার জন্য আমার আকাঙ্খার কথা। আমি বললাম, জানি। আজ সেটা ওর চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে গেল। তুমিতো এগিয়ে এসেছিলে আমাদের বুকে তুলে নিতে। ভুল আমাদেরই। আজ সেই ভুল বুঝতে পেরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। কাছে টেনে নেবে না? মিনতি সেন বললেন মায়ের কাছে সন্তানের ভুল কোন ভুলই নয়। প্রান্তিক চল এবার আমার সাথে। কোথায়? বাঃ এতবড় দুঃসংবাদটা একবার দিতে হবে না ওদের। থানা থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট আমাকে বলেছে। ওরা হয়তো এখনি এসে যাবে। কিন্তু এদের সামনে কি করে মুখ দেখাব, বলবই বা কি? তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলবার ম্যানেজমেন্ট বলবে। তারপর ওদের যা করণীয় করবে। এতে কি ওদের দূরে সারিয়ে দেওয়া হবে না? ওরা যদি দূরে সরে না গিয়ে কাছে আসতে চায়, টেনে নেবো কাছে। মায়ের বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দেব ওদের ক্ষত। চল নিচে গিয়ে বসবি ততক্ষণ। একবার নীলাঞ্জনা পিসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি ফোন করে দেব, উনি যেন আসেন একবার আমাদের বাড়ীতে।

আফরোজ বেগম আসেন নি, এসেছেন নীলাঞ্জনা পিসি ও সেলিনা। সেলিনা কেঁদে উঠে বলল, প্রান্তিক ভাই এ আমারই দোষ, সব দোষ আমার। রেহানা নেই, একদিন নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে আমার অপরাধের মুক্তি হবে কি করে? ক্ষমা আমার ওর কাছ থেকে পাওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাব তাকে বলে দিননা প্রান্তিক ভাই। এই প্রথম আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও কেঁদে ফেলল। পারলাম না ওকে আমার বুক থেকে সরিয়ে দিতে। আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, ছিঃ সেলিনা আমিতো তোমাকে জানি, পৃথিবীর কারো কাছে কোন অন্যায় তুমি করতে পার না। এ মিথ্যে দিয়ে আমাকে ভুলাবেন না প্রান্তিক ভাই। ও যদি থাকতো, ওর কাছে মাথা নীচু করে আমি ক্ষমা

চাইতাম। সেতো নেই, তাই আপনার পায়েব কাছে আমার প্রণতি জানিয়ে বলছি, প্রান্তিক ভাই তার হয়ে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। সত্যি সে ওর মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এলো আমার পায়ের পরে। বললাম, একি করছ সেলিনা, ওকে তুলে নিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার মতো মেয়ের এ পাগলামি সাজেনা ভাই। কেউ তোমাকে বুঝবে কি না আমি জানিনা, কিন্তু আমি যে তোমাকে বুঝি, তা তুমি ভুলে যাও কেন? বোঝেন যদি তবে রেহানাকে আটকাতে পারলেন না কেন? ওর উত্তরতো আজ দিতে পারবো না ভাই। তবে এও তোমার ভুল, যে ভাবে তুমি নিজেকে দায়ী করছ রেহানার চলে যাওয়ার জন্য। আমি যে শান্তি পাচ্ছিনা প্রান্তিক ভাই, আমি কি করব। আমায় পথ বলেদিন বলে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, সেলিনা।

এ এক নতুন সেলিনা। জীবনের বাঁক গুলো আঘাতে আঘাতে কি ভাবে পরিবর্তন হয়, তাই শুধু ভাবছিলাম। না, নীলাঞ্জনা পিসি, না মিনতি সেন কেউ সেলিনার আবেগকে বাঁধা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেননি। মিনতি সেন বুঝি কিছু বলতে চাইছিলেন, নীলাঞ্জনা বললেন, থাক মিস সেন, ভিতরের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দিন ওকে, তাতে ও হাল্কা হবে, ওটা ওর ভীষণ প্রয়োজন।

এক সময় জবার মা এসে বলল, সকাল থেকে তো কিছু খাওয়া হয়নি দিদিমনি, কিছু মুখে দিয়ে নিন, ওদেরও কিছু মুখে দিতে বলুন। তারপর আপন মনে বলল, কেন যে রেহানাদি একাজ করলেন, কে জানে।

নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, ঠিকই বলেছেন আপনি, ওদের কিছু মুখে দেওয়া দরকার। চলুন আমি যাচ্ছি রান্না ঘরে, দেখি এদের জন্য কিছু করা যায় কিনা।

সময়ের থেকে বড় ওষুধ আব কিছু নেই। যে ক্ষতকে মনে হয়েছিল, তা কখনো শুকাবেনা, যে আঘাতকে মনে হয়েছিল আব বুঝি ওঠা যাবে না, সময়ের হস্তক্ষেপে, একদিন তা স্বাভাবিক হয়ে এলো। মিনতি সেনকে মেনে নিয়েছেন নীলাঞ্জনা পিসিও। অদেখা সম্পর্ক দীর্ঘ মেলামেশায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয় একদিন। আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতা নেমে আসে প্রায় সকলের মধ্যে। ব্যতিক্রম কেবল আফরোজ বেগম। কোন ভাবেই ক্ষমা করতে পারেননি তিনি আমাকে। পরিবারের সমস্ত দুর্যোগের মুলে যে আমি এ বিশ্বাস থেকে তাকে টলানো যায়নি।

একদিন সেলিনা বলেছিল, জানি প্রান্তিক ভাই, মা ইদানীং যে ভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন আর বিষোদ্‌গার করছেন, তাতে আপনাকে কিছু বলার আমার মুখ নেই। কিন্তু কি করব বলুন, মা তো। আমার অবস্থা একটু বুঝুন। বড় একা হয়ে যাচ্ছি। কতকিছু ঝড় যে আসে চারপাশ থেকে, অতিষ্ট হয়ে যাই। আগে তবু আসতেন মাঝে মাঝে। হয়তো কোন কিছুর সমাধান হতো না। কিন্তু মনে জোর পেতাম। ইদানীং তাও যান না, কি যে নিঃসঙ্গ লাগে, কাকেও কিছু বলতে পারি না। তারপর বলল, জানি আপনি কেন যান না। কিন্তু আমি কি করব বলুনতো? আমি যে আর পারছিনা প্রান্তিক ভাই। বুঝতে পারি কত অসহায় আজ সেলিনা, তাইতো তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি যে তোমার মনের অবস্থা বুঝি, আমারও তোমাদের

ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না, তা নয়, রেহানাকে ঘিরে কত স্মৃতিইনা তোমাদের ওখানে আছে। আছো তুমি। নিজে এক নগণ্য মানুষ আমি, তবু তোমার সঙ্গে কথা বলে রেহানার স্পর্শ পাই যেন, আমিও যে বড় নিঃসঙ্গ আর একাকী। কি ভাষায় তোমায় সান্ত্বনা দেব। আর কেমন করেই বা দেব বল। সেলিনা বলল জানি, বুঝি না যে তাও নয় প্রান্তিক ভাই, তবু আছে আপনার বাইরের দুনিয়া, আছেন নীলাঞ্জনা পিসি, মিনতি পিসি, অশ্রুদি, তপতীদি আছে অগণিত বন্ধু বান্ধব। কিন্তু আমার কে আছে বলুন? কি জানি কেন, সেই নির্জন কৃষ্ণচূড়ার নীচে বসে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, এরা তো তোমারও আপনার। তুমি আসতে পার না এদের কাছে? কি করে আসব বলুন। মা যে একদম ঘর থেকে বের হতে দেননা। মাঝে মাঝে ভেবেছি, মাঝের এই স্মৃতিটুকু ভুলে গিয়ে ফিরে যাব বক্সিং এর দুনিয়ায়। ওখানে গেলে অন্তত এই ব্যক্তিগত দুঃখ মান অভিমান ভুলে গিয়ে একটা জেদ তৈরি হয় চ্যালেঞ্জ নেওয়ার। কিন্তু তাওতো পারিনা। মায়ের সেই এক কথা অনেক হারিয়েছি। আর হারাতে চাইনে। আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, চল ওঠা যাক। হ্যাঁ চলুন। ওর হাতটা ছেড়ে দিলাম। ও বলল, আবার সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আর বন্ধ ঘর, সঙ্গে মায়ের সেই অভিযোগের পর অভিযোগ, দেখবেন প্রান্তিক ভাই, আমিও একদিন হারিয়ে যাব ঠিক রেহানার মতন। আমি বললাম ছিঃ সেলিনা এভাবে বলতে নেই। তোমাকে ভালবাসারতো লোকের অভাব নেই। সেই জন্যইতো আর পারছিনা। ভীষণ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে নীলাঞ্জনা পিসিকে, মিনতি পিসিকে আরো আরো অনেককে, কিন্তু যে কঠিন শাসনে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি, মানে বাঁধতে হয়েছে, সেই যন্ত্রণাটুকু আপনি বোঝেন কি প্রান্তিক ভাই? আমি ধীরে ধীরে বললাম বুঝি সেলিনা বুঝি। বোঝেন? হ্যাঁ বুঝি। বোঝেন যদি, তবে এ থেকে এই কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার একটা পথ বলে দিতে পারেন না? ওর আকুল তৃষ্ণাকে উপলব্ধি করে বললাম, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, কারণ কেবল মাত্র সময়ই পারে এর থেকে মুক্তি দিতে। জানি বিভিন্ন দিক থেকে বাঁধা আসবে, তবু ফিরে যাও সেলিনা তোমার অতীত জীবনে। বক্সিংএর রিং এ নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হও, ফিরে যাও তোমার চঞ্চলতায়, তোমার স্বাভাবিকতায়। ওইটেই তোমার স্বাভাবিক জীবন। স্বাভাবিকতার মধ্যেই নিজেকে ঠিক মত চেনা যায় সেলিনা। তারপর জানতে চাইলাম, কেন পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছো, কেন পরীক্ষা দেবে না বলে ঠিক করেছো? এটা ঠিক নয় সেলিনা, একটা কথা মনে রেখো সব সময় হতাশার মাঝে মুক্তি নেই। হতাশা আরো হতাশাকে ডেকে নিয়ে আসে। নিজে যা সত্য বলে মনে করবে তাতে প্রত্যয়ী হও। নতুন স্বপ্ন দেখতে শেখ। ভেঙে পড়োনা। আঘাতে জর্জরিত না হয়ে দুহাতে আঘাতকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চল সামনের দিকে। একদিন জয় আসবেই সেলিনা। আসতেই হবে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি মুগ্ধ শ্রোতার মতো ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কি জানি কি নেশায় পেয়েছিল ওকে এত কথা বলার। তবে কি এর মাঝ দিয়ে আমি আমার নিজের হতাশা কাটাতে চেয়েছি? হবে হয়তো।

নীলাঞ্জনা পিসি, কাল বলেছেন, তোমাকে এত দুর্বল কোনদিন ভাবিনি প্রান্তিক।

কলেজেতো যাওয়া ছেড়েই দিয়েছো। অবশ্য এখন ক্লাশ নেই, কিন্তু বইয়ের সঙ্গেও তো সম্পর্ক নেই তোমার দীর্ঘদিন। এসব ভালো নয় প্রান্তিক। মনে হচ্ছে তোমার ভালবাসার একনিষ্ঠতায় কোথায় যেন ছিদ্র আছে, তা না হলে, এ ভাবে নিজেকে তুমি নিঃশেষে শেষ করে দিতে চাইছো কেন? আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, কি করব পিসি? কি করবে, সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে? তোমার মনের সেই জোর কোথায় গেল? যে জোরের মধ্যে দিয়ে একদিন দুর্বলকে দেখিয়েছো বাঁচার স্বপ্ন। অতীতের ব্যর্থ স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখাতে অনুপ্রাণিত করেছো। সেই জোরটাকি তোমার মরে গেছে প্রান্তিক? আরো বললেন তোমার সেই মনের জোরটাইতো একদিন আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। তোমার সেই উদ্যম সেই প্রাণবন্ত জীবন কোথায় আজ? অবশেষে বললেন, জীবনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো। তুমি কৃতি পুরুষ। দুর্বল নারী নও। ভালবাসা থাকুক তোমার অন্তরের সম্পদ হয়ে। আর পৌরুষকার হোক তোমার বিশ্বের দ্বার। কার অপেক্ষায় বসে আছো ঘরের মধ্যে? এখানেতো কেউ নেই অপেক্ষা করে যে তোমাকে অনুপ্রাণিত করবে। বেরিয়ে এস প্রান্তিক ঘরের দমবন্ধ করা আবহাওয়া থেকে। দাঁড়াও এসে রাজ পথে। খোলা আকাশের নীচ দিয়ে চলে গেছে যে রাজপথ সেটাই কিন্তু এক মাত্র পথ নয়। আরো হাজারো পথ তোমায় বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায়। হয়তো সে সব পথের কোন একটাতেই পেয়ে যাবে তোমার স্বপ্নের বাস্তবতা। তাই আলসেমি নয় প্রান্তিক। নিজেকে প্রস্তুত করো ভবিষ্যতকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।

না, এভাবে নীলাঞ্জনা পিসি আমায় কোন দিন উদ্বোধিত করেনি। আর তার সেই উন্মাদনার রশ্মিচ্ছটা বুঝি আজ ছড়িয়ে দিতে চাইলাম সেলিনার অবসন্নতায়। চুপ করে রইল ও, বলল, চেষ্টা করব প্রান্তিক ভাই। কিন্তু আপনাকেও একটা কথা দিতে হবে। কি? বলুন দেবেন? না শুনে বলি কি করে? ও অভিমানে বলল, রেহানাকেও কি এই একই উত্তর দিতেন? আবার সেই রেহানা। বললাম, দেব। ও চুপ করে রইল। আমি বললাম, কই বল। ও বলল, আপনাকেও নতুন করে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে প্রান্তিক ভাই। আপনাকে সার্থক ভাবে প্রস্তুত করতে হবে আগামী পরীক্ষার জন্য। রেহানার স্বপ্নকে সঠিক ভাবে পূর্ণ করতে হবে আপনাকেই। পারবেন না? আমি আবারও ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, পারবো সেলিনা, আমাকে পারতেই হবে। আনন্দে চিক্‌চিক্ করে ওঠে ওর দুটি চোখ। তারপর বলল, আপনার নির্দেশিত পথে চলতে আমিও পারবো প্রান্তিক ভাই। প্রমিজ করছি, নিজে যেমন হারব না, আপনাকেও হারতে দেব না।

সেলিনা এবারেও বক্সিংএ ক্লাব প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অক্ষুন্ন রেখেছে। একাডেমিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। আর তারই জন্য শ্রদ্ধা জানাতে আফরোজ বেগমের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে ও এসেছে অনেক দিন পরে নীলাঞ্জনা পিসির বাড়ীতে। পিসি ওকে দুহাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলেন তার কপাল। তারপর বললেন বোস মেয়ে আমি আসছি। তুমি কোথায় যাবে? বোসনা। নীলাঞ্জনা পিসি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। আমি আর সেলিনা

একাকী। হাসতে হাসতে বললাম বহুদিন পরে মা মেয়েতে দেখা। আমার দিকে তাকাবার সময়ই নেই। তা নাইবা থাকলো, আমি কিন্তু ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছি, আর এই খুশির দিনে তোমাকে কি দিয়ে আমার খুশিকে প্রকাশ করি বলত। আমি যা চাইবো তাই দেবেন? হ্যাঁ তাই দেব, যত কঠিনই হোক তুমি চাইতে পারলে আমি তোমাকে তাই দেব। ও হাসল মৃদু ভাবে তারপর বলল, না প্রান্তিক ভাই, আজ কিছু নিতে আসিনি, এসেছি দিতে। দিতে? হ্যাঁ দিতে। বলতে বলতে আস্তে আস্তে ও এগিয়ে আসে আমার কাছে, একেবারে কাছে তারপর মাথা নীচু করে ও আমার পায়ে হাত রেখে বলল, আপনার আর্শীবাদ চাইছি প্রান্তিক ভাই। আমি ওকে দু হাতে তুলে দিতেই দেখি বাইরের দরজায় কখন যেন নীলাঞ্জনা এসে দাঁড়িয়েছেন, তাকে যেন দেখতে পাইনি, এমনি ভাবেই বললাম, পাগলি মেয়ের কাণ্ড দেখ। আরে বোকা মেয়ে আমার আর্শীবাদে কি কিছু হয়? আশীর্বাদ নিতে হলে মায়ের কাছ থেকেই নিতে হয়। মা! হ্যাঁরে পাগলি মা। হঠাৎ যেন নীলাঞ্জনাকে দেখতে পেলাম, তাই আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলাম এই দেখ পিসি তোমার পাগলি মেয়ের কাণ্ড ও চাইছে আমার কাছে আর্শীবাদ। মা যেখানে দুহাতে ওকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়েছেন, সেখানে আমার আর্শীবাদ তো তুচ্ছ, তাতে কাজের কাজ কিছু হবে কেন? নীলাঞ্জনা মৃদু হেসে বললেন, হবেরে হবে। মাতো ওকে মন প্রাণ দিয়ে আর্শীবাদ করেছেন, তার সঙ্গে তোমারও আশীর্বাদ ওর খুব প্রয়োজন প্রান্তিক। কি জানি কেন আকারণ আমার চোখে জল এসে গেল। বললাম, এই দেখ মা-মেয়ের এক কথা। নিজের অশ্রুকে গোপন করতে বুঝি পালিয়ে গেলাম নিজের ঘরে। কেন যে এমন হয়, কিছুতেই বুঝতে পারি না।

মিনতি সেন ফোন করে জানিয়েছেন, তিনি ভিতর থেকে সংবাদ নিয়েছেন, স্নাতক পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় হয়েছি। যিনি প্রথম হয়েছেন, তিনি আমার থেকে মাত্র এক নাম্বার বেশী পেয়েছেন। নীলাঞ্জনা পিসিকে বলেছেন, আমিই আসছি তোমাদের ওখানে। ওকে সংবাদ দিতে হবে না। ওকে বরং বলে দাও, ও যেন অশ্রুকণা ও সেলিনাকে যেভাবে পারে তোমাদের ওখানে আসতে বলে। ফোনটা ছেড়ে দেন মিনতি সেন।

অশ্রুকণার বাড়ীতে গিয়ে সংবাদটা দিলাম আর ওকে বললাম, তুমি সেলিনাকে সংবাদটা দিতে পারবে তো? কেন, তুমি পারবে না? তারপর নিজেই বলল, আমার যেতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রান্তিক, ওর মা যাইই করুক, ও বড্ড আঘাত পাবে। যত অসুবিধাই হোক তোমার যাওয়া উচিৎ। আমি বললাম। ঠিক আছে তাই হবে।

অশ্রুকণা ও সেলিনা এসেছে একটু আগে। মিনতি সেন এলেন গাড়ী করে এক হাড়ি মিষ্টি আর দুই সেট ফুলের ডালা নিয়ে। এই দ্বিতীয় বার এলেন মিনতি সেন এ বাড়ীতে। ফুলের ডালা আমার আর অশ্রুকণার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আমার আশীর্বাদ তোমাদের কৃতকার্যতায়। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে। উনি শুধু হাসছেন, কিছুই বলছেন না। আমরাও বুঝতে পারছিনা। ফুলের ডালা ধরে দাঁড়িয়েই আছি। কি করব বুঝতে পারছিনা। নীলাঞ্জনা পিসি ফুলের ডালা দুটো আমাদের হাত থেকে তুলে নিয়ে বললেন, উনি ফোনে জানিয়েছিলেন যে, উনি না আসা পর্যন্ত যেন সংবাদটা তোমাদের না দেওয়া

হয। আমবা আরো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি পিসির দিকে। পিসি বললেন অশ্রু, তুমি স্নাতকে প্রথম শ্রেণী পেয়েছো। আর প্রান্তিক তুমি শুধু প্রথম শ্রেণী পাওনি, তোমার উপরে মাত্র ১ মার্ক বেশী পেয়ে একজন প্রথম হযেছেন, তুমি হয়েছো দ্বিতীয়। আনন্দ না বেদনা জানিনা, কান্না এসে গেল চোখে। মাথা নীচু করে প্রণাম করলাম মিনতি সেন ও পিসিকে। অশ্রুকণাও তাই করল। আমাদের দুজনকেই তার বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মিনতি সেন। একটা ঘোরে কেটে গেল সারাটা বিকেল। শুধু বুকের মাঝখানটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল রেহানার জন্য। জানিনা কোথায় আছে ও। বেঁচে আছে কি না তাও জানিনা। শুধু মনে মনে বললাম, তুমি যেখানেই থাক রেহানা, আমার এ কৃতিত্ব তোমাকেই দিলাম।

জীবনে কোন পরীক্ষায় ব্যর্থ হইনি, কিন্তু এমন সাকসেস। মাত্র ১ মার্কের জন্য প্রথম না হতে পারা, এ যে অকল্পনীয়। মিনতি সেন বললেন, ভবিষ্যতে কি করবে তোমরা ঠিক করেছ। অশ্রুকণা প্রথম শ্রেণী পেয়েছে এ যেন সে ভাবতেও পারছেনা। কিন্তু আমার জন্য ওর যে কি আনন্দ হচ্ছে, সে, ওর চোখের ভাষা দেখে বুঝতে পারছি। আর সেলিনা। আমি জানি, আমার এই সাকসেসের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবীদারতো ও। তবু কোন কথা সে বলছে না কেন? তবে কি একেবারে প্রথম না হওয়ার জন্য একটু খানি দুঃখ রয়ে গেছে তার। ওকি চেয়েছিল আমাকে প্রথম হতে হবে? যদি সে তাইই চেয়ে থাকে, তাহলে বলবো এটা তার একটু বেশীই চাওয়া।

মিনতি সেন বললেন, এবার উঠতে হবে। চল তোমাদের যার যার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাব। সেলিনা বলল, তুমি যাও পিসি, এটুকু পথ আমি হেঁটেই চলে যাবো। নীলাঞ্জনা বলল, ও থাকুক মিস সেন, আপনি বরং অশ্রুকে নামিয়ে দিয়ে আসুন, পরে না হয় প্রান্তিক এটুকু পথ ওকে হেঁটেই এগিয়ে দিয়ে আসবে। মিনতি সেন বললেন, তাই হোক। এরপর মিনতি সেন যখন বেরিয়ে যাবেন, সেলিনা বলল, একটু দাঁড়াও পিসি। কেন রে? বলে দাঁড়ালেন। সেলিনা ওকে প্রনাম করতে মিনতি সেন বললেন হঠাৎ প্রণাম করলি যে মেয়ে। ইচ্ছে হল তাই, বলেই পালিয়ে গেল।

আফরোজ বেগমের অবস্থা ধীরে ধীরে আরো খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। মিনতি সেন বললেন, ওর তো চিকিৎসার দরকার, তুমি ওকে সব থেকে বড় ডাক্তার দেখাও। বললাম তা সম্ভব নয়। কেন? উনি একদম আমাকেই শুধু নয় আমার সম্পর্কিত কাউকে সহ্য করতে পারছেন না। অবাক মিনতি সেন প্রশ্ন করে জানতে চান কেন? তুমি কি কিছুই জাননা? জানলে তোর কাছে জানতে চাইব কেন? আমি বললাম, রেহানার হারিয়ে যাওয়া সহ ওদের পরিবারের যাবতীয় দুর্যোগের জন্য উনি আমাকে দায়ী করেন। বেচারা। তারপর মিনতি সেন বল্লেন, হতেই পারে, মায়ের মনতো। তাই বলে তুই এড়িয়ে গেলে রেহানা তোকে ক্ষমা করবে কেন? আমি অভিমানী কণ্ঠে বললাম, আর রেহানা। সেতো এমনিতেই আমায় ক্ষমা করেনি, আর নতুন করে কি ক্ষমা করবে। মিনতি সেন বললেন, পাগলামি করিসনে প্রান্তিক। মনে বিশ্বাস রাখ একদিন ওকে ফিরে আসতেই হবে। আসবেও। সেদিন যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোর কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে, কি উত্তর দিবি? আমি আর কোন

কথা না বাড়িয়ে বললাম, কি করব তা হলে। আমি কলকাতার মেডিসিনের সব থেকে বড় ডাক্তার ডাঃ মুস্তাফিকে পাঠাচ্ছি। তুই ওকে নিয়ে যা। আর সেলিনাকে বলবি, আমার আদেশ, ডাঃ মুস্তাফি যা বলবেন, তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়।

যখন মুস্তাফিকে নিয়ে ওদের বাড়ী গেলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ীতে অনেক লোক। একটা জটলার মতন। আমি যেতেই, একটা স্বস্তির ভাব যেন দেখা দিল ওদের মধ্যে। সেলিনা দরজা খুলে দিতেই বললাম, মিনতি সেন পাঠিয়েছেন, ডাঃ মুস্তাফিকে। ওকে নিয়ে যাও মায়ের কাছে। সেলিনা ওকে পথ দেখিয়ে আফরোজ বেগমের কাছে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এল। তুমি ফিরে এলে যে, ডাক্তার বাবু যদি কিছু জানতে চান। অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন। সারাদিন আপনাকে খুঁজছি। কেন? জানিনা, মা দুপুর থেকে শুধু আপনাকেই খুঁজছেন। আমাকে? হঠাৎ? তাতো জানিনা প্রান্তিক ভাই। ওখানে আমার যারা রক্তের সম্পর্কিত আপন তার সবাই আছেন, যান না একবার প্রান্তিক ভাই। যাব? যদি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। হোলেনই বা, কিন্তু যখন খুঁজেছেন তখন একবার যান না। আমি বললাম, বেশ চল। ডাঃ মুস্তাফির তখন রোগী দেখা শেষ। গম্ভীর মুখে উঠে পড়লেন। তারপর আমাকে সামনে পেয়ে বললেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি ওনার সঙ্গে বাইরে এলাম। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু কালকের মধ্যে যদি আমার নার্সিং হোমে নিয়ে আসেন, আমি শেষ চেষ্টা করতে পারি।

ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকালেন আফরোজ বেগম। আফরোজের ছোট বোন রসিদা বললেন, আপা কিছু বলবি? বলে ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। আফরোজ বেগম অস্পষ্ট হলেও শোনা যায় এমন ভাবে বললেন। সেলিনা ওকি এসেছে? সেলিনা তার মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, কার কথা বলছ মা। বিড় বিড় করে বললেন, তার মানে আসেনি। পারল না আমাকে ক্ষমা করতে। সেলিনা আবারও বলল, কার কথা বলছ মা। আফরোজ বেগম ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, আরো একবার যা সেলিনা, যেখান থেকে পারিস ওকে ধরে নিয়ে আয়। ওর সঙ্গে দেখা না করে যে আমি কোন শান্তি পাচ্ছি না। সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাই আপনি আসুন না। আফরোজ বেগমের যে পাশে সেলিনা আছে, আমি তার অন্য পাশে বসে, আফরোজ বেগমের মুখের কাছে মুখ এনে বললাম, আপনি আমায় ডেকেছিলেন মাসিমা? যেন দূর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর - বললেন কে? আমি প্রান্তিক? ও তুমি এসেছো? হ্যাঁ এসেছি মাসিমা। জানতাম তুমি আসবে। তারপর বললেন, তুমিতো আমার মতন ছোট নও ছেলে, তুমি অনেক বড়। আমি বাধা দিয়ে বললাম, ওসব কথা থাক মাসিমা। ডাক্তার মুস্তাফি এসেছিলেন, তিনি বলেছেন এমন কিছু নয়। ওর নার্সিং হোমে কয়েকদিন থাকলেই সুস্থ হয়ে যাবেন। ম্লান হাসলেন আফরোজ বেগম। বড় করুণ সে হাসি। বললেন তোমাদের সঙ্গে আরো কয়েকটি দিন কাটিয়ে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। কিন্তু রোজ কেয়ামতে আমার জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বাপ। তাই স্বার্থপরের মতে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। সেলিনার চোখে জল ভরে উঠল। তবু চুপ করে রইল। আমার একটা হাত তার শীর্ণ হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, আমার পাপের

কোন ক্ষমা নেই ছেলে। রোজ কেয়ামতে আমার কি বিচার হবে তাও জানিনা, কিন্তু বাবা আমাকে যে একটা কথা দিতে হবে? বলুন। উনি শীর্ণ হাতে সেলিনার একটা হাত তুলে নিয়ে আমার হাতের পরে রেখে বললেন, আমি যখন থাকবনা, একে তুমি দেখবে কথা দাও। সেলিনা চিৎকার করে উঠল মা। আমি বললাম মাসিমা। উনি স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, ভয় নেই বাবা। যে পাপ করেছি তারই শেষ নেই, তাইতো আবার নতুন পাপে তোমাকে জড়াতে চাইনা। তোমার জীবনে রেহানার যে জায়গা, ওকে আমি সেই জায়গায় তোমাকে গ্রহণ করতে বলিনি বাবা। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তা হলে? যতদিন না ও নিজের পথ খুঁজে পায় ততদিন তুমি ওকে দেখ। এই আমার শেষ অনুরোধ। আমি বললাম ওর মা আছেন, তিনি ওকে বুকে তুলে নেবেন। আপনি চিন্তা করবেন না। তারপর বললাম আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন? আপনাকে তো বাঁচতে হবে। জলও যেন শুকিয়ে গেছে আফরোজ বেগমের চোখ থেকে। বললেন, জানি তোমার পিসি ওকে মেয়ের মতন ভালবাসেন। আমি বললাম মেয়ের মতন নয় মেয়ে হিসেবেই ভালবাসেন। কথা জড়িয়ে আসতে লাগল, আফরোজ বেগম বহুকষ্টে তবু বললেন, তাই যেন হয়। তবু আমি তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি ওকে। তুমি শুধু কথা দাও ওকে তুমি দেখবে? কথা দিলাম। উঃ খোদা রহমানে রহিম, আমি নিশ্চিন্ত। আর কোন পিছুটান রইলনা। এবার হে খোদাতাল্লা, কখন আসবে তোমার ডাক। আমি যে তারই প্রতীক্ষায় আছি। চোখ বন্ধ করলেন আফরোজ বেগম। রসিদা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, আপা, আমরা কি তোমার কেউ নই? সেলিনা তাকে তুলে দিয়ে বলে খালা, চুপ করো। সেলিনাকে বুকের পবে টেনে নিয়ে বললেন আমাদের উপর তোমার এতটুকু বিশ্বাস নেই? কেন বিশ্বাস থাকবেনা খালা আমিতো তোমাদেরই মেয়ে। না আফরোজ বেগম আর চোখ মেলে তাকাননি। ভোর রাতের দিকে তিনি আরেকবার চোখ মেললেন, দেখলেন, আমি সেলিনা আর ডাক্তার সরকার ছাড়া আর কেউ নেই। রশিদা বেগম, ঘন্টা খানেক আগে ঘুমাতে গেছেন। আফরোজ বেগম যেন স্বাভাবিক। ডাক্তার সরকারকে বললেন, ডাক্তার ভাই। বলুন দিদি আমাদের সমাজকে তো জানেন, কষ্ট করে একটা কাগজ কলম নিয়ে আসবেন? সেলিনা কাগজ আর কলম নিয়ে এলে আফরোজ বেগম বললেন, আমি বলছি আপনি লিখে নিন। বলুন। আমার অর্বতমানে সেলিনা ওর জীবনের অন্য কোন পথ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওকে আমি প্রান্তিকের কাছে রেখে গেলাম। ওর পিসি নীলাঞ্জনা, ওর মায়ের মত। সেলিনা যদি স্বেচ্ছায় ওদের অবাধ্য না হয় তাহলে ওর জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নীলাঞ্জনা দেবী ও প্রান্তিকের। লেখা হলে আফরোজ বেগম বললেন। দিন আমি সই করে দিচ্ছি। আপনি সাক্ষী থাকুন। ডাক্তার সরকার বললেন, আমি অরাজী নই কিন্তু আপনার কোন আত্মীয় স্বজন সাক্ষী থাকলে ভাল হয় ভাবী। আফরোজ বেগম সেলিনাকে বললেন, একবার খালাকে ডাকতো মা। রশিদা এলে, তাকে পড়ে শোনান হয়। প্রথমে গররাজি হলেও পরে উনি সই করে দেন। তারপর আফরোজ বেগম বল্লেন এটা আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার ভাই, দেখবেন মেয়েটা যেন ভেসে না যায়।

যে স্বাভাবিকতায় তিনি কথা বলছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল হয়তো আবার সুস্থ জীবনে ফিরে আসবেন উনি। কিন্তু একি হলো সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে থর থর করে কাঁপতে থাকেন আফরোজ বেগম। এমন করে কাঁপছেন কেন উনি। ডাক্তার সরকার ত্বরিত পরীক্ষা করলেন। কয়েকটা হিক্কা উঠলো। শুধু শোনা গেল হায় আল্লাহ্‌। ধীরে ধীরে নিথর হয়ে গেল শরীরটা। ডাক্তার সরকার আবার পরীক্ষা করতেই সব শেষ। সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল আফরোজ বেগমের দেহ। কান্নায় আছড়ে পড়ল সেলিনা আফরোজ বেগমের বুকের উপরে। আমি ওকে কিছু বলতে গেলে ডাঃ সরকার ইঙ্গিতে না করলেন।

প্রথমে কিছু বাধা এলেও সেলিনা চলে এসেছে নীলাঞ্জনা পিসির কাছে। নীলাঞ্জনা পিসিরও দীর্ঘ দিনের শূন্য মাতৃত্ব যেন, কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেলিনার জীবনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, আগের মত সে আমাকে আর ঠাট্টা করে না। রেহানার কথা আজকাল বেশী ওঠে না। ধীরে ধীরে রেহানা যেন কেবল আমার হয়ে গেছে। আমার একার। না নীলাঞ্জনা পিসি না মিনতি সেন, কারও মুখ দিয়েই ঐ হতভাগ্য মেয়ের নামটা যেন আর উচ্চারিত হয় না। জানিনা কেন?

দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়িয়ে আসে নতুন বছর। আজ রেহানার জন্মদিন। সেই কবে গোপনে রেহানার একটা ছবি তুলেছিলাম। কেউ জানেনা। আজ তাকেই বড় করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে টাঙিয়ে দিলাম, আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে। ধুপ কাঠি জ্বেলে, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখলাম রেহানার ছবির নীচে।

মনটা ভারাক্রান্ত। কি দ্রুত গতিতে ভুলে যাই আমরা অতীতকে। নীলাঞ্জনা বা মিনতি সেন হয়তো তার জন্মদিন নাও জানতে পারেন। কিন্তু সেলিনাতো জানে। কই সকাল থেকে একবারও তো তার মুখ দিয়ে রেহানার জন্মদিনের কথা, বা রেহানার কথা কিছুই উচ্চারিত হলো না। আমার ঘরে পারত পক্ষেও সেলিনা আসে না আজকাল। নীলাঞ্জনা পিসি। একান্ত প্রয়োজন না হলে এ ঘরে তারও পদার্পণ ঘটেনা।

মনে মনে ভাবি এ একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। রেহানাকে আরো বেশী করে ভাববার অবকাশ পেয়েছি। তবু আমি তো মানুষ। সেলিনা এবং নীলাঞ্জনার এই ভাবে আমাকে এড়িয়ে চলাকে কেমন যেন উপেক্ষা বলেই মনে হয়। নীলাঞ্জনার মাতৃত্বের অভাব যেমন মিটেছে তেমনি সেলিনারও মিটেছে নতুন করে মা কে খুঁজে পাওয়া। আমার আর দরকারটা কোথায়?

হঠাৎ দরজায় খটখট শব্দে তাকিয়ে দেখি ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে সেলিনা। সকালে স্নান করেছে। পরেছে একটা আনকোরা নতুন শাড়ি। বেনীতে জড়িয়েছে যুঁই ফুলের মালা। হাতে মিষ্টির থালা। আমি অবাক হয়ে বলি, কি ব্যাপার? এত সকালে সেজে গুজে কোথায় চললে? আমার কোন কথায় আজকাল আর রাগেনা সেলিনা। হঠাৎ ওর চোখটা আটকে যায় দেওয়ালে। এনলার্জ করা রেহানার ছবি। তার মানে তার জন্মদিনটা পর্যন্ত ভোলেনি প্রান্তিক ভাই। বলল, আপনাকে ওর জন্মদিনে একটা প্রণাম করতে এসেছিলাম। ভেবেছিলম অবাক করে দেব। কিন্তু আপনি নিজেই যে আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। বললাম, আজকাল কোন ব্যাপারে কি আর অবাক হও সেলিনা? না হইনা। কারণ নিজের

জীবনের পরিবর্তনগুলো যে মেনে নিয়েছি। তাতে যখন অবাক হইনা, তখন আর অন্য ব্যাপারে অবাক হওয়ার সময় কোথায়? যাক নিজেকে সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছো বলে খুব ভাল লাগছে সেলিনা। সেলিনা বলল, আমারও ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। তারপর নিজের থালা থেকে একটি মিষ্টি তুলে দিয়ে বলল, ভাববেন না, আমি এনেছি। পিসি, সকালে বাজার থেকে মিষ্টি, এই মালা এসব এনে বললেন, আজ তো রেহানার জন্মদিন তাইনা? যাতো একবার প্রান্তিকের ঘরে। দেখ ও কি করছে? আমি অবাক হয়ে বললাম, পিসি বলেছে আজ রেহানার জন্মদিন? সত্যি ভীষণ ভীষণ অবাক হচ্ছি আমি। সেলিনা বলল, সব ব্যাপারে অবাক হতে নেই প্রান্তিক ভাই। তারপর হঠাৎ একটা প্রণাম করে বলল, কেন প্রণাম করলাম জানতে চেয়ে ঠাট্টা করবেন না।

তারপর একটু থেমে আবারও বলল, পিসি বলছিলেন বহুদিন আপনি গ্রামের বাড়ীতে যান না। আমাকে বলেছেন আপনার যদি অসুবিধা না থাকে, তাহলে আগামী শনিবার পিসি যেতে চান। বললাম, বেশতো চল। আমারও মনটা চাইছে। বহুদিন যাই না। একবার পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা হলে ভালই লাগবে।

শুনে মিনতি সেন বললেন, আমিও ঘুরে আসি তোমাদের সাথে কি বল প্রান্তিক? তুমি যাবে? কি যে আনন্দ হচ্ছে তা বোঝাবার নয়। বললাম, শনিবার ৪টেয় ট্রেন শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে। নীলাঞ্জনা পিসিকে মিনতি সেনের কথা বলতে, তারও খুব আনন্দ হয়। বললেন সত্যি যাবেন উনি? তাইতো বললেন।

আমরা যখন গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হতে অল্প বাকি। প্রথমেই পড়ে নীলাঞ্জনা পিসিদের বাড়ী। ওখানে থেকে আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়, তবু যেতে সঙ্কোচ হতে থাকে, পিসি কিছু ভাবেন কি না। নীলাঞ্জনা বললেন, তুমি মিস সেনকে নিয়ে আগে বাড়ীর সকলের সাথে দেখা করে এস, আমি পরে সেলিনাকে নিয়ে আসছি। আমি বললাম আজ যদি যান, তা হলে তো এক সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। উনি মৃদু হেসে বললেন, বেশতো তোমার যখন তাইই ইচ্ছে তাহলে চল আজই যাওয়া যাক। অবশেষে আমরা সকলে এক সঙ্গে এলাম আমাদের বাড়ীতে।

শুধু বাড়ীটা নয়, গোটা গ্রামটা যেন উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে। উপলক্ষ আমার ভাল রেজাল্ট। কয়েকদিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। ফিরে আসার আগে হেডমাষ্টার মশাইকে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাকে কয়েকটা কথা বলব প্রান্তিক? নিশ্চয়ই বলবেন। বলুন কি বলবেন? উনি ধীরে ধীরে বললেন, আমি জানিনা তোমাকে বলা ঠিক হবে কি না, তবু বলছি! কেন স্যার এ কথা কেন বলছেন আমাকে বলা ঠিক হবে কিনা। আমাকে কি আপনি সন্দেহ করছেন? কারণ আছে বাবা। থাক তা হলে মাষ্টারমশাই। কি দরকার অস্বস্তি বাড়িয়ে? হেড মাষ্টারমশায় বললেন, হয়তো কথার খেলাপ হয়ে যাবে, তবু তোমাকে বলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। আমি উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি উনি কী বলেন তা শোনার জন্য। উনি বললেন কিন্তু একটা কথা দিতে হবে প্রান্তিক আমি না বলা পর্যন্ত আমার একথা তুমি কাউকে বলবেনা। আমি বললাম তাই হবে মাষ্টার

মশাই। কিন্তু অবাকও হলাম ভীষণ, কী এমন গোপন কথা বলতে চান তিনি আমাকে।

উনি বললেন, গেজেটে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। তোমার কৃতকার্য্যতায় সারা গ্রাম উৎসব মুখর। ঠিক সেই সময়ে একটি মেয়ে, হ্যাঁ তোমার বয়সী হবে, একেবারে আটপৌরে পোষাকে পায়ে পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার একটা প্রণাম করে বলল, আপনিতো হেডস্যার তাইনা? কথায় কোন জড়তা নেই। নেই কোন অস্পষ্টতা। আমি বাধা দিয়ে বললাম তার কথা শুনে আমার কি লাভ মাষ্টারমশাই? লাভ লোকসানের হিসাব জানিনা প্রান্তিক, তোমাকে বলা প্রয়োজন বলে বলছি, শোনা না শোনা তোমার ব্যাপার। মেয়েটির প্রশ্নের, উত্তরে বললাম হ্যাঁ আমি প্রধানশিক্ষক কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম, মেয়েটি যখন আমার কাছে জানতে চাইল, আপনি কি স্যার বলতে পারবেন, প্রান্তিকদের বাড়ী এখানে কোনটা। আমি চমকে উঠে বললাম। প্রান্তিক? তাদের বাড়ীতে তোমার কি দরকার? মেয়েটি একটু হাসল, তারপর বলল, ঠিক এই ভয়েই এখানকার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি পাছে, অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আপনি প্রধানশিক্ষক, একটি অসহায় মেয়ের মর্যাদা আপনিই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাসে, আপনাকে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলা যায়। মনে হল মেয়েটিকে বিশ্বাস করা যায়। বললাম তুমি প্রন্তিকদের বাড়ী যেতে চাও? ওকে তুমি চেন? হ্যা চিনি? তা হলে ওকে নিয়ে এলেনা কেন? বলল, সে সব অনেক কথা। আপনি একবার নিয়ে যাবেন ওদের বাড়ীতে? কি পরিচয় দেব। যা হোক একটা পরিচয় দেবেন? আপনার যেমন সুবিধা, আমি কিছু মনে করবনা। কি যে হল প্রান্তিক কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু মনে হতে লাগল এ মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত। হয়তো কোন চরম অভিমানে তোমার কাছ থেকে সরে এসেছে। আমি ওকে বললাম বাড়ী চল। তোমার কথা সব শুনবো। তারপর নিয়ে যাবো ওদের বাড়ীতে। ওকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

এই অবসরে মেয়েটি বলে গেল তার কাহিনী। তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা। কেন চলে এলো, কেন চরম আঘাত দিতে তোমাকে বাধ্য হল, এই সব কথা। আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, যে কোন নামে আপনি আমায় ডাকতে পারেন মাষ্টারমশাই। সেদিন আর যাওয়া হল না কিন্তু পরের দিন তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলাম ওকে। তোমার মাসিমাও ছিলেন। তোমার বাবা মাকে ও প্রণাম করলে, আমার কাছে জানতে চাইলেন, কে এই মেয়েটি। আমাকে একটা মিথ্যে পরিচয় দিতে হল ওর অনুরোধে। আমি জানিনা প্রান্তিক, কেন সে তার সত্য পরিচয় গোপন করতে চেয়েছিল। ২ দিন ছিল আমার এখানে। তৃতীয় দিন যাওয়ার সময় প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল, আমি যেন তার কোন কথা কাউকে কোনদিন না বলি। আর বিনিময়ে আমিও তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলাম, আরেক বার যেন সে আসে আমার কাছে। আরো বললাম, মা তুমিতো সবই বললে শুধু তোমার নামটা ছাড়া, নামটা কি একেবারেই বলা যাবেনা। হাসল মেয়েটি। বলল বলব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবেন। বেশ তাই হবে, এবার বল। ও বলল আমি রেহানা। নামটা উচ্চরণ করেই দ্রুত মিলিয়ে গেল ও। ট্রেনের কোন কামরায় যে উঠলো, আর খুঁজে পেলাম না। দেখা হলো না আর। গাড়ীটা তখন দ্রুত বেগে

ছুটে চলেছে। আমি তো অবাক!

রেহানা এখানে? এই আমাদের গ্রামের বাড়ীতে? অনেক দিনের স্বপ্ন তার গ্রামে আসার। সেই তো এলে, তবু আমাকে কাঁদালে কেন? আমি মাষ্টারমশাইকে বললাম আপনি, ঠিক বলছেন তো। থর থর করে কাঁপতে লাগলাম আমি। প্রান্তিক কি হয়েছে তোমার এমন করছ কেন? কে এই রেহানা? আমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বললাম, ও আমার সব মাষ্টারমশাই ও আমার সব। ও আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার বেদনা, আমার মান, আমার অভিমান, আমার ব্যর্থতা, আমার সার্থকতা, আমার দ্বেষ; হিংসা আর উজ্জ্বলতা। আমার বিষন্নতা এবং পূর্ণতা, আমার প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি, আমার হাহাকার, আমার জীবনের ঝংকার। একবার বলুন মাষ্টারমশাই ও কেমন আছে?

মাষ্টারমশাই বললেন তোমার প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই। ও যখন দ্রুত মিলিয়ে গেল, এমনি একটা কিছু সন্দেহ করেছিলাম প্রান্তিক। কিন্তু আর তো তাকে খুঁজে পেলামনা। আমি বললাম, সেদিন সে কেমন ছিল। সেদিন তার শরীর ভাল ছিল তো। ঠিক মতো হাঁটতে পারছিল তো। তারপর মাষ্টারমশায়ের হাত ধরে বললাম। কোথায় ওকে খুঁজে পাব বলতে পারেন মাষ্টারমশাই। তুমি শান্ত হও প্রান্তিক ও কথা দিয়ে গেছে, ও আরেক দিন আসবে। সেদিন তোমাকে জানাতে ভুল করবো না।

আধো অচেতন মনের মধ্যে যে মেয়ে বেঁচেছিল, সে যে কেমন করে এক ঝটিকায় এমন ভাবে চেতনাকে নাড়া দিয়ে হৃদয়কে হাহাকারে ভরে দিয়ে গেল কি করে তার ব্যাখ্যা করব। মাকে বললাম, একটা মেয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তোমরা তো আমাকে বলোনি? মা অবাক হয়ে বললেন, কে দেখা করতে এসেছিল? কই কিছু মনে পড়ছে না তো! বাবা ছিলেন কাছে, বললেন, তুমি আমার ঘরে এস। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে বাবা যে ঘরে থাকেন সে ঘরে গেলাম। বললাম বল। তুমি কার কথা বলছ? কে দেখা করতে এসেছিল? মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে কেউ আসেনি বাড়ীতে? হ্যাঁ এসেছিল তার কথাতো কিছু বললেনা। কি জানতে চাও তার কথা। সে কে? কেন এসেছিল? কিছু বলে গেছে কি না তোমাদের এই সব। বাবা বললেন মাষ্টারমশাইয়ের আত্মীয়া। সেখানে এসেছিল, ওরা নিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। এসব কথা তোমাকে বলার কি আছে?

আমি ছল ছল চোখে বললাম, হয়তো তোমার কথাই ঠিক বাবা, কিন্তু আমার কাছে ঐ মেয়েটি যে অনেক বড়। তাই যদি হয় তাহলে, তার সাথে কি এমন হয়েছে যার জন্য তোমাকে ছেড়ে তার চলে যেতে হল। কিছুই হয়নি। তুমি ঠিক বলছ না প্রান্তিক। তারপর বললেন হ্যাঁ একটি মেয়ে এসেছিল। প্রথম দিন ওনাদের সঙ্গেই এসেছিল। পরের দিন একাই এসেছিল। আমাকে বলল, আমি একা এসেছি বলে অবাক হচ্ছেন নাতো? অবাক হব কেন? কাল এসেছিলে তুমি, আজতো চেনা বাড়ীতে এসেছো। এটা গ্রাম, এখানে মানুষ অনেক সহজ সরল, অবাক হওয়ার প্রশ্ন নেই। হয়তো সময় কাটছেনা, তাই চলে এসেছো। কিন্তু মা, তোমার যেন কিছু.বলার আছে মনে হচ্ছে? না না কিছু বলার নেই। আমি বললাম তোমার মাসিমাকে ডাকি। ও বলল, না থাক, সময় মত আমিই যাব ওনার কাছে, আমি

কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললাম, আমার মতো বৃদ্ধের সাথে আর কতক্ষণ কথা বলবে মা বরং আমার ভাইঝি ইতিকে ডাকি। ওঠিক তোমার বয়সী নয়, তবে ওই এবাড়ীর এক মাত্র মেয়ে, তোমার থেকে কয়েক বছরের ছোট হবে। ও বলল, দরকার নেই বাবা, ওর হঠাৎ বাবা ডাক শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, কি বললে মা। বাবা। তারপর বলল, আপত্তি থাকলে ডাকব না, কি জানি কেন আপনাকে দেখে আমার বাবা ডাকতে ইচ্ছে হল। তারপরে বলল, বাবাতো নেই তাই হঠাৎ মুখ দিয়ে ওই ডাকটা মনে এল। এ সময় তোমার মা এসে বললেন, মেয়েটির সাথে তখন থেকে এত কি কথা বলছ, ওকে তো কিছু খেতে দেওয়ার কথা বলবে? মেয়েটি লজ্জা পেয়ে বলল না মা, আমার খিদে নেই। এই তো দুপুরে খেয়েছি। তোমার মা বললেন, সেতো দুপুর আর এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে বেশী বাকি নেই। তুমি বস মা, আমি তোমার জন্য নারকেল, গুড় আর মুড়ি নিয়ে আসছি। আমাদের এখানে এর থেকেতো বেশী কিছু পাওয়া যাবে না। মিষ্টি পেতে গেলে হাটে যেতে হবে, সে তো অনেক দূর। মেয়েটি আমার দিকে তাকাল তোমার মাকে বললাম, তুমি এঘরেই পাঠিয়ে দাও। তারপর আমি ও যেখানে কথা শেষ করেছিল, সেখান থেকে আরম্ভ করে বললাম খুব দুঃখের মা। আমাকে তুমি বাবা বলেই ডেকো। ও ছলছল চোখে অকারণে আমাকে একটা প্রণাম করে বলল, মনে রাখবেন কিন্তু, আমাকে আপনি মেয়ে বলে মেনে নিয়েছেন। হ্যাঁ তাতো নিয়েছি। কিন্তু মেয়ে কি বাবাকে আপনি করে বলে? বলে না বুঝি? ওর কথা শুনে কি যে হল প্রান্তিক, আর ওর কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল আমি জানিনা। মনে মনে ভেবেছিলাম, মেয়েটির পরিচয়, মাষ্টারমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, তারপর ভেবে দেখব আমার ইচ্ছে পূরণ করা যায় কি না। আমি বললাম, তারপর? আরো দুই একটি কথা বলে, মেয়েটি উঠে যাওয়ার সময়ে আবারও প্রণাম করে বলল, আপনি কিন্তু আমাকে মেয়ে হিসাবে মেনে নিয়েছেন, অস্বীকার করবেন না কিন্তু। আমি হাসতে হাসতে বললাম মেয়েকে কি কোন বাবা অস্বীকার করে। ও একটু হাসল তারপর চলে গেলো। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার মনটাকে যে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরের দিন মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ীতে গেলাম। কি যে মায়ায় বেঁধে গেল মেয়েটি। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলাম, ও চলে গেছে। আমি বললাম তাতে কি। ও আবার কবে আসবে, আমি একবার ওদের বাড়ী যেতে চাই। মাষ্টারমশাই বললেন আমিতো ওদের বাড়ী চিনি না সীতাংশু বাবু। আশ্চর্য হয়ে বললাম সেকি মাষ্টারমশাই, আপনি যে বললেন, আপনার আত্মীয়া। হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু আর কিছু জানতে চাইবেন না। তারপর বললেন মেয়েটি স্বপ্নের মত এসেছিল, আমাদের এখানে, আবার হারিয়েও গেল স্বপ্নের মত। তবে ও কথা দিয়ে গেছে সীতাংশু বাবু আবার ও আসবে। আসলে আপনার কাছে নিয়ে যাব।

আমি আর কি বলব। কেন সে এসেছিল, কেন সে এমনি ভাবে নিজেকে গোপন করে আবার চলেও গেল কোন উত্তরই জানিনা। ভেবেছিলাম সেলিনা, মিনতি সেন বা নীলাঞ্জনা পিসি কে বলব। কিন্তু ভাল লাগলনা। বলতে ইচ্ছেও করলনা। ফিরে এলাম কলকাতায়। সেলিনাকে একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল আমাদের গ্রাম।

তাও করা হল না।

আবার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিলাম। মনে বিশ্বাস, কোথাও না কোথায় রেহানার সাথে আবার আমার দেখা হবে। শ্রুতিকণা বলল, আজ বাবা আসছেন। যাবে আমাদের বাড়ীতে? আমি রাজী হয়ে ওদের বাড়ী যখন গেলাম তখন রাত হয়েছে। ওর বাবা প্রমথ বাবু, শ্রুতিকণাব বিয়ের ব্যাপারে বেশ কিছুদিনেব ছুটি নিয়ে এসেছেন।

আজ ওকে দেখতে এসেছেন সজল রায়, প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাকে দেখে অবাক হয়ে বললাম, কেমন আছেন? ভদ্রলোক যেন হাতড়িয়ে ফিরছেন কে আমি? তারপর চিনতে পেরে বললেন, হ্যালো ইয়ংম্যান, তোমার গবেষণার কি হলো? ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি গবেষণা করছিলে। তোমার ইনটারভিউ নেওয়া শেষ? এত তাড়াতাড়ি কি শেষ হয়? তবে প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি। খুব ভাল। তোমাব থিসিস্ জমা দেওয়ার আগে আমাকে একবার দেখিও তো। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে। নিশ্চয়ই দেখাব। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম সজল বাবু কি আপনার ওখানে কাজ করেন? হ্যাঁ। খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

স্নেহময়ী দেবী আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি ওঘরে গেলে শ্রুতিকণা বলল, ভদ্রলোককে তুমি চেন নাকি? হ্যাঁ চিনি, তবে সজল বাবুকে চিনিনা। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, ইউ আর এ ভেরি লাকি উওম্যান। ও কথায় ঠেশ দিয়ে বলল, বেহানার থেকেও। আমি বললাম, রেহানা এক হতভাগ্য মেয়ে, কেন তাকে বারবার টেনে নিয়ে আস কণা। আমার একদম ভাল লাগে না। যথেষ্ট অনুতপ্ত কণ্ঠে অশ্রুকণা বলল, আমি ঠিক ওভাবে বলিনি, বিশ্বাস কর। স্নেহময়ী দেবী বললেন, সত্যিইতো অশ্রু কেন ওকে তোরা আঘাত দিস। ওকে তোদের একটু বোঝা উচিৎ।

এরপর সজলবাবুদের মেয়ে দেখার পালা সাঙ্গ হল। ওদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। সজলবাবুর তরফে প্রতীমবাবু বললেন, একদিন আসুন আপনারা আমার ওখানে। ওর মা বাবা নেই। বলতে গেলে আমিই ওর অভিভাবক। প্রমথবাবু বললেন, আমি যখন মেয়ের বাবা, তখন যেখানে যেতে বলবেন সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমার কোন অমত নেই। আর যেহেতু ওর বাবা মা নেই, তখন তো পাকা কথা আমরা এখনি বলে নিতে পারি। প্রতীমবাবু বললেন, তা হয় না প্রমথ বাবু। আমার ওখানে যেতে আপত্তি থাকলে ওর ওখানেই যাবেন। বিয়ে বলে কথা, একবারতো দেখা দরকার, ও কি চাকরী করে, কোথায় থাকে? আপনার মেয়ের যোগ্য সমাদর সে করতে পারবে কি না। অবশেষে ঠিক হয় আগামী রবিবার ওখানে যাওয়া হবে। প্রমথবাবু বল্লেন, তুমি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে প্রান্তিক।

কিন্তু যাওয়া আর হল না। কারণ অশ্রুকণা বেঁকে বসেছে, তার এক কথা সে এখন বিয়ে করবে না। তাকে অনেক বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত থেকে তাকে নড়ানো গেল না। স্নেহময়ী দেবী একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে বোঝাতে বলেন। আমি বললাম মাসিমা, আপনারা যেখানে বুঝিয়েছেন সেখানে আমি আর নতুন কথা তাকে কি বলব। তবুও তিনি বল্লেন যে, তোমার উপর তার আস্থা আছে, তুমি একটু বোঝাও না।

আমি তাকে বললাম, সজলবাবুতো অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, কেন তুমি অমত করছ কণা। তুমি আমাকে কণা নামে ডাকবে না, আমার সারা শরীর জ্বালা করে। জ্বালা করলেও আমার কিছু করার নেই। কারণ আমি অন্য নামে তোমায় ডাকতে পারবো না। কেন পারবে না। আমার নামতো কণা নয় অশ্রুকণা। জানি। তবে প্রত্যেকের কাছে এক একটা নাম এমন হয়ে যায় যে, তার অন্যথা করার কোন উপায় নেই। তুমি আমাকে কণা বলে ডাক কেন? ঐ নামে তুমি আমায় ডাকতে বলেছিলে। তারতো মৃত্যু হয়ে গেছে। গেছে বুঝি। জানিনা তো! তাহলে?

আমি বললাম দেখ কণা আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। তবে কেন এসেছো? সেতো তুমি জান কেন এসেছি? কেন এমন ছেলেমানুষি করছ কণা। আমি ছেলেমানুষি করছি না ছেলেমানুষি করছ তোমরা? কি অধিকার আছে আমার জীবন নিয়ে তোমাদের ছিনিমিনি খেলার? আমি তো বলেছি, আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না। কিন্তু কেন পারবেনা তার কারণ বলনি। দেখ কণা সব বাবা মায়ের স্বপ্ন থাকে। তাদের সেই স্বপ্নকে এই ভাবে ভেঙে দেওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। সজলবাবুকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে সে কথাতো বলতে পারো। দেখ প্রান্তিক বেশী জ্ঞান দিওনা। বাবা মায়ের স্বপ্ন থাকে আর আমার কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না? ওরা হয়তো বোঝে না কিন্তু তুমিও কি বোঝ না? যদি না বোঝ আমার কাছ থেকে চলে যাও, আর কোনদিন এসো না। নিজেকে এত শ্রেষ্ঠ ভাব কেন তুমি? কিসের অহংকার তোমার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, সত্যি কণা আমি তোমাদের বুঝি না। আর যখন চাওনা তখন কথা দিচ্ছি আমি আর কোন দিন আসবনা তোমার কাছে। নিজের জীবন নিয়ে নিজের মত করেই স্বপ্ন দেখ। আমি আর কিছুটি বলতে আসবো না। হ্যাঁ তাই দেখবো। এসোনা আর কোনদিন। তুমিতো একটা দুর্বল মানুষ। তোমার কথা শুনতে হবে এমন দিব্যিতো আমি দিইনি।

জানিনা অশ্রুকণার কি হয়েছে, সে কেন এমন করে কথা বলছে কিছুই জানিনা। শুধু মনে হচ্ছে বিচিত্র এই নারী হৃদয়। কেন যে এত মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম। স্নেহময়ী দেবীকে বললাম, না মাসিমা, আমি ওকে রাজী করাতে পারলাম না। মিথ্যেই আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস স্থাপন। প্রমথবাবু বললেন, বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা বাবা। কিন্তু এখন কি করি বলত। ও যদি স্পষ্ট করে বলতো কেন সে বিয়ে করবেনা তা হলে এই অপমানের মধ্যে পড়তে হতো না। এখন আমি যে কি করি। আর ওদেরই বা কি বলব। বললাম আমাকে যদি কিছু করতে হয় নির্দ্ধিধায় বলতে পারেন। ওদের তো একটা সংবাদ দিতে হয়। কি ভাবে যে দেবো তাইতো ভাবছি। বললাম, চিন্তা করবেন না। সংবাদ দেওয়ার দায়িত্বটা না হয় আমার পরে ছেড়ে দিন। তাই দিলাম, যা ভালো হয় তুমি করো। আমি আর কিছু ভাবতে পারছিনা।

নির্দিষ্ট দিনের ২ দিন আগে প্রতীমবাবুর অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। উনি বললেন প্রান্তিক ২ দিন আগে যে হ্যাঁ আসতে হল। কি ব্যাপার? তোমার গবেষণার জন্য আবার

কিছু জানতে চাও নাকি? না। তবে? আমি বললাম, একদিন আপনি আপনার জীবনের অনেক কথা বলেছিলেন আজ ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে সেই জীবনের স্বপ্নগুলোকে, আবার কি ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না? হঠাৎ থমকে গিয়ে তাকালেন আমার দিকে তারপর বললেন করলেই কি আর হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন গুলোকে ফিরে পাওয়া যায়? জানিনা যায় কি না। তবে চেষ্টা করতে আপত্তি কোথায়? তুমি কি বলতে চাইছো। না কিছু বলছিনা। গবেষণা করতে গিয়ে মনে হল জীবনে এত যার সাকসেস তিনি কেন তার একান্ত জীবনে এত ব্যর্থ। উনি হাসি মুখে বললেন, হয়তো ব্যর্থ বলেই কর্মজীবনে তা সার্থক হয়ে উঠেছে। আমি বললাম তাহলে কি বলতে চান যা হারিয়ে গেছে তা যদি ফিরে পান, তাহলে কর্ম জীবনের এই যে শিখর চূড়ায় আরোহণ তা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে সে জন্যই অতীতকে আর ফিরে পেতে চান না? তাকিয়ে দেখি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন উনি।

আমার কথা শোনার পরে খুবই চিন্তিত মনে হল প্রতীমবাবুকে। ধীর, শান্ত ভাবে বললেন, হয়তো তোমার কথা ঠিক অথবা ঠিক নয়। আসলে ঐ ভাবে কিছু ভাবিনি প্রান্তিক আর তাছাড়া আমার কথা তোমাকে বোঝাতেও পারব না। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জানতে চাইলাম অবসর সময়ে পরিচিতদের বাড়ীতে বেড়াতে যান না ? কেন বলত। না এমনি জিজ্ঞাসা করছি? হ্যাঁ তা যাব না কেন তবে আসুন না একদিন আমাদের বাড়ীতে। এই অফিসের চৌহদ্দিতে আপনাকে তো ঠিক মত পাওয়া যায় না। উনি বললেন ঠিক আছে যাব একদিন। সত্যি? কেন? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না না বিশ্বাস হবে না কেন। তাহলে কবে যাবেন বলুন। তুমিই বল কবে যাব। আচ্ছা আগামী রবিবার। আগামী রবিবার? কিন্তু ওদিনতো তোমাদের আসার কথা। আমার যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই ভাবে বললাম দেখুন তো নিজের গবেষণা নিয়ে এত ব্যস্ত যে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। উনি বললেন কি কথা? ওই দিন আমদের আসা হচ্ছে না। উনি অবাক হয়ে বললেন কেন? আমি ধীরে ধীরে বললাম, দেখুন, অনেক সময় মনে হয় এটা না হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার জীবন নিয়েই ধরুন না, আপনি কি ভেবেছিলেন এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে? কিন্তু ঘটনাকে তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু ধরুণ না, যার উপর আপনার আমার কারো হাত নেই। উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলাম। ঠিক আছে তাই হবে। আমি বললাম, তা হলে ঐ কথাই রইল। আগামী রবিবার আপনি আসছেন আমাদেয় বাসায়। তোমাদের ওখানে আর কে কে আছেন? আমি আমার পিসি এবং তার মেয়ে সেলিনা। সেলিনা? হ্যাঁ সেলিনা, কিন্তু অবাক হচ্ছেন যে। না অবাক নয়। এবার নিয়ে পর পর দুবার এই নামের একটি মেয়ে ক্লাব বক্সিংএ প্রথম হয়েছে না? হ্যাঁ, সেলিনা রহমান। আমার পিসি নীলাঞ্জনার মেয়ে। কি যেন ভাবলেন প্রতীমবাবু, তারপর বললেন, সেলিনা রহমান অথচ তোমার পিসি নীলাঞ্জনার মেয়ে ঠিক বুঝতে পারছিনা। এখানে বসেই সব যদি বুঝবেন তা হলে ওখানে গিয়ে কি বুঝবেন। হেসে ফেললেন প্রতীমবাবু। বললেন, তোমার এই কথার পিঠে কথা আমাকে ভীষণ অবাক করে দেয়। ঠিক আছে আমি যাব। সে দিন কি আর কেউ আসবেন? না এমনি কাউকে তো বলিনি, তবে হঠাৎ করে

যদি কেউ এসে পড়েন আলাদা কথা। তা হলে উঠি। উঠবে? কেন কিছু বলবেন? না বলব না। তবে তোমাকে না জানিয়ে আমি লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছি। বললাম খুব ভাল করেছেন। সত্যি খুঁব খিদে পেয়েছে।

নীলাঞ্জনা পিসি রবিবারে মিনতি সেনকে নিমন্ত্রণ করেন। আমার ইচ্ছা ছিল অশ্রুকণাকেও বলা হোক। যদি খোলামেলা কিছু আলোচনার ভিতর দিয়ে তার মনের কোন পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোন দিক থেকে তার নাম না ওঠায় আমিও বেশী কিছু বলিনি।

প্রতীম চৌধুরী এলেন সন্ধ্যার একটু আগে। মিনতি সেন তখনো আসেন নি। সেলিনা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মানে তাকে প্রণাম করলে নীলাঞ্জনা বলেন, আমার মেয়ে। ও তুমি সেলিনা। তুমিতো বিখ্যাত লোক। খুব ভাল লাগছে তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। ও একটু লাজুক হেসে বলল, কেন লজ্জা দিচ্ছেন, আমিতো সামান্য একটা মেয়ে আমার যা কিছু কৃতিত্ব তা আমার মা আর প্রান্তিক ভাইয়ের। নীলাঞ্জনা হাসি হাসি মুখে তাকালেন ওর দিকে। প্রতীমবাবু বললেন, আন্তর্দেশীয় প্রতিযোগিতায় নামবে না? ভাবছি, বলল সেলিনা। ভাবছি কেন? অবশ্যই আন্তর্দেশীয় প্রতিযোগিতায় নামবে। আমি বললাম, ও চাইছেনা আর আমাদের ওপর নির্ভর করে কোন কিছু করতে? কেন? তোমরা তো ওর আপনার লোক, তোমাদের উপর নির্ভর করতে ওর লজ্জা কোথায়? কলিং বেল বেজে উঠলো।

তার মানে মিনতি সেন এসেছেন? সেলিনা এগিয়ে যেতে চাইলে, আমি বললাম, তুমি কথা বল আমি দেখছি। আমি দরজা খুলেই বললাম, এত দেরি হল যে। আমার জন্য খুব চিন্তা করছিলি? তা তোর পিসি বারবার করে বললেন, আজ যেন অবশ্য একবার আসি, তা তোদের এখানে কি কোন উৎসব অনুষ্ঠান আছে নাকি? কই নাতো। তারপর বললাম, এস ভিতরে এস।

ভিতরে এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন মিনতি সেন। ভদ্রলোককে ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে কে ইনি? আমি বললাম, তুমি ভিতরে এস বলছি। মিনতি সেন অন্য ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। নীলাঞ্জনা সে ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন। কি ব্যাপার? আপনি ওঘরে না গিয়ে এ ঘরে এলেন যে। না এমনি, বললেন মিনতি সেন, তারপর বললেন উনি কে? ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। নীলাঞ্জনা বললেন আসুননা ও ঘরে। কি জানি কেন, মনে হল মিনতি সেন যেন হাফাচ্ছেন, তিনি যে প্রতীমবাবুকে চিনতে পারেননি তা নয়, কিন্তু উনি এখানে কি ভাবে? আর কেনই বা এ ব্যাপারে তাকে অন্ধকারে রাখা হল।

কতবছর হয়ে গেছে। মনের অবচেতনায় কখনো তাকে ভুলে যেতে পারেননি মিনতি সেন। জুলপির কাছে পাক ধরেছে। সুন্দর ভাবে গোফ দাড়ি কামানো। সুঠাম সুন্দর শরীর। ব্যক্তিত্ব যেন ঠিকরে পড়ছে সমস্ত অবয়ব থেকে। আর আমি? ওর আকুলতাকে দু হাতে ঠেলে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আর কোন দিন আসবেন না আপনি। বলেছিলেন, আসবো না মিস সেন। শুধু যদি জানতাম কি আমার অপরাধ? বলেছিলাম, অপরাধ ভাগ্যের তবু আপনি আসবেন না। বিনা কারণে আমাকে এই ভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে শান্তি পাবেন কি

মিস সেন? পারবেন এক নিরাপরাধ যুবককে এই ভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে? কখনো কি মনে হবে না কি অপরাধ আমার? কেন ওকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি? আমার কিছু বলার নেই মিঃ চৌধুরী। তবু আপনি আসবেন না। তা আসব না, কিন্তু অপেক্ষা করব, যতদিন না আমাকে আপনার গ্রহণ করার মানসিকতা জন্মায়। তারপর ঐ ছোট্ট চিঠি। আজো তা বয়ে নিয়ে চলেছি। কিন্তু কেন? এখনো কি মনের অবচেতনায় বেঁচে আছে প্রতীম নামে ঐ সৌম্য চেহারার মানুষটি। কিন্তু আজ কিছুই তো জানিনা ওর সম্পর্কে। মনে মনে তাকে খুঁজেছি কিনা তাও জানিনা। কিন্তু এ কথাতো অস্বীকার করতে পারবোনা যে মানুষটিকে আমি আজো ভুলতে পারিনি।

আমি বললাম, যাবে না মা ও ঘরে, উনি একা বসে আছেন। হ্যাঁ যাই, কিন্তু একে তুই খুঁজে পেলি কোথায়? আর পেলিই যদি আমাকে কেন আগে বললিনা। সেটা হয়তো আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন যা তুমি করছ তাতে তো আমার নিজেকে অপমানিত মনে হচ্ছে? চলনা ও ঘরে।

মিনতি সেন এলেন আমার সঙ্গে। বললাম, আমার মা, মিনতি সেন। উনি যে ভীষণ অবাক হয়েছেন, তা ওর চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে? নমস্কার করে বললেন, তোমার মা? হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস না হওয়ার কথা নয় প্রান্তিক, তুমি বলনি কেন তাই ভাবছি। আমি বললাম তোমরা কথা বল মা; আমি আসছি। প্রতীম চৌধুরী বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। মিনতি সেন বসলেন। প্রতীমবাবু বললেন, বহু দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। কেমন আছেন? ভালো, আপনি? ভালো, তা আপনি একা কেন? প্রান্তিকের বাবা কোথায়? তাকে নিয়ে এলেন না। ভীষন লজ্জিত হলেন, মিনতি সেন। বললেন উনি নেই। সরি অকারণে আঘাত দেওয়ার জন্য। আপনার সঙ্গে যে এ ভাবে আবার দেখ হবে ভাবিনি। প্রান্তিককে আপনি আগে চিনতেন? আগে চিনতাম কি না, হ্যাঁ তা চিনতাম বৈকি? ও কি একটা গবেষণা করবে বলে আমার অফিসে একদিন গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার দেখা হয় ওর বোধ হয় বন্ধু হবে, অশ্রুকণা নামে একটি মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলাম আমার অফিসের এক সহকর্মীর জন্য। ছেলেটি খুব ব্রিলিয়ান্ট নাম সজল রায়। খুব ভাল। অশ্রুকণাও খুব ভাল মেয়ে, প্রথম শ্রেণীর স্নাতক। তাতে কি হবে, ওতো এ বিয়েতে রাজী নয়। কেন? এত ভাল ছেলে, রাজী নয় কেন? তাতো বলতে পারবোনা। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রান্তিক গত পরশু দিন আমার অফিসে গিয়েছিল। ও নিমন্ত্রণ করল তাই চলে এলাম। কিন্তু আমার একটা জিনিষ খুব অবাক লাগছে। আপনি ওর মা, অথচ ও আছে ওর পিসির কাছে। হিসাব মেলাতে পারছিনা। মিনতি সেন বললেন সব হিসাব মেলেনা মিঃ চৌধুরী। এতো সেই সিঁড়ি ভাঙা অংক। মনে হয় যেন মিলে যাবে, কিন্তু সামান্য ভুলে আরো কয়েকটি সিঁড়ি তৈরি করে দেয় মাত্র। যাকগে সে সব কথা আপনি একা এলেন কেন? এটাই ভাগ্য। কিন্তু ওসব কথা থাক খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। প্রান্তিকের মত এক উজ্জ্বল রত্নের আপনি মা এটা যে কত বড় গর্বের তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

ওদের কথার মাঝে. সেলিনা এলো কফি এবং কিছু টিফিন নিয়ে - মিনতি সেন

বললেন, তুই বোস মা, আমি দেখি, তোর মা কি করছে। ও বলল তুমিই বোসনা। আমি মাকে একটু সাহায্য করছি। ও চলে গেল। প্রতীম চৌধুরী বললেন, ভীষণ ভাল মেয়ে এই সেলিনা। আপনি ওকে আগে চিনতেন নাকি। নামে চিনতাম। আজই প্রথম পরিচয়। তা আপনার বাবা কেমন আছেন? উনি নেই। উনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, সরি, ভেরি সরি। তারপর বলেন দেখুন না যে কটা কথাই জানতে চাইলাম তার উত্তরে সরি না বলে উপায় নেই। খুব খারাপ লাগছে।

প্রতিম চৌধুরী যেন কথা হারিয়ে ফেললেন, আর কি বলবেন। তার এতদিনের স্বপ্ন যা তিনি একান্ত গোপনে লালন করে এসেছেন তা যেন মুহূর্ত্তে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। যার জন্য তিনি এই দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষায় ছিলেন, তিনি থেকেও নেই, তার স্বপ্নে না তার কল্পনায়। আর প্রান্তিক কখনই বলেনি কে তার মা, কে তার বাবা। হঠাৎ কেন যেন প্রতিমের মনে হয় প্রান্তিক জানে তার মায়ের কথা এবং আমাকেও জানে। কেন যে নীলাঞ্জনা এসে বল্লেন, তুমি যাও মিনতি সেলিনা তোমাকে ডাকছে?

নীলাঞ্জনা বসলেন সামনের একটা চেয়ারে। বললেন, আপনার মতো একজন স্বনামখ্যাত ম্যানেজার আমার এখানে এসেছেন, কি যে ভাল লাগছে? আমারও ভাল লাগছে আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে। তা হলে তো মাঝে মাঝে আসতে পারেন। দেখি। কফির পেয়ালা শেষ করে, প্রতীম বাবু বললেন, আমাকে যে এবার উঠতে হবে? এত তাড়াতাড়ি তো ওঠার কথা ছিল না। তাছাড়া আপনার জন্য আমার মেয়ে যে এত রান্না করল সে গুলো কি হবে? আমি খাবো সে কথাতো ছিল না। তা হয়তো ছিল না, কিন্তু প্রান্তিক আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবে তা আপনি ভাবলেন কি করে? তারপর জানতে চাইলেন এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে আপনার। না না অসুবিধা কিছু নয়। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে? বলুন। যতদূর জানি প্রান্তিকের মা এই কলকাতাতেই থাকেন, তা হলে ও আপনার কাছে থাকে কেন? একটু হাসলেন নীলাঞ্জনা, বললেন, মিনতিকে জিজ্ঞাসা করেননি? না জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কেন? আর তাছাড়া বললেন যে যতদূর জানি। ওর মা এই কলকাতাতেই থাকে, আগে চিনতেন নাকি ওকে। প্রতীম চৌধুরী বললেন বলা কি ঠিক হবে? অতীততো অতীতই তাইনা নীলাঞ্জনা দেবী। সব অতীত, অতীত নয় মিঃ চৌধুরী বললেন নীলাঞ্জনা আরো বললেন, কোন কোন অতীতকে মনে হয় সব সময় তা বর্তমান। আমি বরং ওকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওকেই জিজ্ঞেসা করুন। ওর ছেলে কেন আমার কাছে থাকে। না থাক। থাকবে কেন? মনে হচ্ছে কী যেন লুকাচ্ছেন? কিছুই লুকাচ্ছিনা। আমি শুধু ভাবছি? কি ভাবছেন? আর একদিন বলব। কেন আজকে বলা যায় না? হয় তো যায় তবুও থাক। সেলিনা এসে বলল, মা, ওনাকে নিয়ে ও ঘরে এস। তুই যা, আমরা আসছি। নীলাঞ্জনা দেবী বললেন চলুন ওরা আপনার জন্য বসে আছেন। সত্যি খেতে হবে? নীলাঞ্জনা স্মিত হেসে বললেন, জোর দবরদস্তি করা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু আপনি কিছু না খেলে, মনে হবে, আপনার আমাদের পছন্দ হয়নি। এই দেখুন, এই আপনাদের এক দোষ। আমাদের দোষ? আপনি আমাদের মতন কাউকে চেনেন নাকি। আর কথা না বাড়িয়ে

প্রতীম বাবু বললেন, না চলুন।

সেলিনা বলল, তোমরা বোস মা, আমি পরিবেশন করছি। তুই বোস মা, আমি পরিবেশন করি। প্রতীম চৌধুরী বললেন, আমার মনে হয়, আমরা সবাই এক সঙ্গে বসতে পারি, তাতে তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি বললাম সেই ভাল। মা, তুমি বসবে না কেন? পিসি বলনা মাকে বসতে, মিনতি সেন বললেন, তোর সব কিছুতেই জবরদস্তি। প্রতীম চৌধুবী বলেন, মিনতি দেবী, ওতো ঠিকই বলেছে। আপনারা আমাকে আপনার না ভাবলেও ও কিন্তু আমাকে আপন ভেবেই একথা বলেছে। যদি আমাব সঙ্গে এক সাথে বসতে আপত্তি থাকে, তাহলে অবশ্য থাক। তারপর সেলিনাকে বললেন, সেলিনা, তুমি যা দেওয়ার দিয়ে দাও। আমাকে তো আবার যেতে হবে অনেকটা পথ।

এরপর মিনতি সেনের আর প্রতিবাদ করা চলে না। বললেন ঠিক আছে, তা হলে সেলিনা একসাথে সবাইকে দিয়ে দে। নীলাঞ্জনা পিসি এবং সেলিনা বাজার করেছে রান্না করেছে, যা কিছু আয়োজন সব তাদের ইচ্ছেয়। আমি শুধু নীলাঞ্জনা পিসিকে বলেছিলাম, মিনতি সেনের একটা অতীত আছে, যাকে নিয়ে সেই অতীত, তিনিই প্রতীম চৌধুরী। দীর্ঘদিন ওদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। দেখনা, যোগাযোগটা তুমি ঘটিয়ে দিতে পার কিনা। মানে ঘটকালিটা আমাকে করতে হবে, বলেছিলেন নীলাঞ্জনা পিসি। না পিসি, সে এক বেদনাময় অতীত। তারপর তাদের সম্পর্কে যা জানি সব বললাম পিসিকে, এমনকি মিনতি সেনের বাবার চিঠিটা পর্যন্ত। নীলাঞ্জনা সব শুনলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য না করে বললেন, উনি কবে আসবেন? রবিবার।

প্রতীম চৌধুরী বললেন, সেলিনা এত আয়োজন করেছো কিন্তু এত কিছু খাওয়ার অভ্যেস তো নেই। বোঝতো, নিজের হাতে না হলে হোটেলের খাবারে পেট ভরাতে হয়। এত কি খাওয়া যায়? নীলাঞ্জনা বললেন, এ আপনার ভারি অন্যায়। বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব, কাউকে কি আপনার পছন্দ নয়? আমার পছন্দ নয় কথাটা ঠিক ওরকম নয়। বরং উল্টো আমাকেই কারো পছন্দ নয়। এ আপনার মিথ্যে অভিযোগ, যদি রাজী থাকেন, আমি কিন্তু ঘটকালি করতে পারি। দেখতে পাচ্ছি মিনতি সেন মুখ নীচু করে খেয়ে যাচ্ছেন, কারো কোন কথার বিশেষ কোন উত্তর দিচ্ছেন না। প্রতীম চৌধুরী বললেন ধন্যবাদ নীলাঞ্জনা দেবী। আর এই বয়সের ঘটকালি করার দরকার নেই। এতদিনেও যখন জীবনে কেউ আসেনি। বাকি দিনগুলো নাইবা কেউ এলো। তারপর হঠাৎই মিনতি সেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি যে কোন কথাই বলছেন না মিনতি দেবী। মিনতি সেন বললেন, আপনারা বলছেন, আমি শুনছি। সবাই যদি বলি তা হলে শুনবে কে? তা অবশ্য ঠিক।

একসময় খাওয়া শেষ হয়। মিনতি সেন আর ও ঘরের দিকে পা মাড়াননি। নীলাঞ্জনাই এলেন এ ঘরে। প্রতীম চৌধুরী বললেন, আপনাদের আতিতেয়তা আমার মনে থাকবে। আজ তবে উঠি। আচ্ছা, আবার কবে আসবেন? দেখি সময় সুযোগ হলে আসব একদিন। নীলাঞ্জনা বললেন প্রান্তিক, প্রতীমবাবুকে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো। আমি কাছে এসে দাড়ালে প্রতীমবাবু বললেন, আশা করি তোমার গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,

একদিন এস তোমরা সবাই, ভীষণ ভালো লাগবে। বললাম যাব একদিন, হঠাৎ প্রণাম করলাম ওকে। এই প্রথম। উনি আর্শীবাদ করে বললেন, তোমার মত ছেলে যেন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মায়। এরপর উনি আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। আমি সেলিনাকে নিয়ে আমার ঘরে এলাম। শুনতে পাচ্ছি নীলাঞ্জনা বলছেন, তুমি এমন ব্যবহার করলে কেন মিনতি। আমার কান সজাগ হয়ে আছে ওদের কথা শোনবার জন্য। মিনতি সেন বললেন কি করলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে এত যে দূরত্ব রচনা করলে, বুকে হাত দিয়ে বলত এ দূরত্ব কি তুমি চাইছিলে? মিনতি সেন বললেন আমি কি চাইছিলাম তার থেকেও বড় কথা, আমার কি করা উচিত? কেন? ভুলে যাচ্ছ কেন নীলাঞ্জনা, আমি শুধু মিনতি সেন নই, আমি প্রান্তিক ও রেহানার মা। মেয়েটা কি যে অভিমানে কোথায় চলে গেল জানিনা, ছেলেটাকেও তবে কি হারাতে বল? বুকের মধ্যে যতই কষ্ট হোক তা আমার পক্ষে সম্ভব নয় নীলাঞ্জনা। তারপর বললেন, আমি তো মেয়ে, মেয়ে মানুষের সব দূর্বলতা দিয়েই তো আমি তৈরি। এ দূরত্ব তাই আমার নিজের সৃষ্টি, এটা না করে আমার উপায়ও ছিল না। তুমি এতে অন্য কিছু মনে করো না। কিন্তু মিনতি, মেয়েদের কাছে কেবল মাত্র মাইতো তার একমাত্র পরিচয় নয়। সে তো কারো স্ত্রী, কারো বোন, কারো প্রেমিকা, তাকে অস্বীকার করবে কি করে? মিনতি সেন বললেন, হয়তো দুঃখ পাবে কিন্তু তবু বলব, সেলিনার মা হয়ে আজ তোমার যে মর্যাদা, তুমি কি তা অন্য কোন ভাবে পেতে পারতে, না পেয়েছো কোনদিন?

নীলাঞ্জনা ভাবলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন, তোমার কথা হয়তো ঠিক। তবু হোক না তা মিথ্যা, একদিন তো স্বপ্ন দেখেছিলাম, ডুবেছিলাম আকন্ঠ ভালবাসায়। সেদিনের সেই প্রাপ্তিটুকু কি জীবন থেকে একেবারে মুছে যাবার? হয়তো মুছে যাওয়ার নয়, কিন্তু আজ যেমন তুমি আর সেই অতীতে ফিরে যেতে পারবে না, আমার পক্ষেও সম্ভব নয় নীলাঞ্জনা। এই মাতৃত্বের অহঙ্কার থেকে নিজেকে নির্বাসিত করা। এটাই তোমার শেষ কথা? শেষ কথা বলে কারো জীবনে কিছু নেই। হয়তো নতুন যুগে নতুন কথা আসতে পারে পুরনো হয়ে যেতে পারে আজকের সত্যি, নতুন সত্যের আলোকে আবার যদি নতুন পথের ঠিকানা খুঁজে পাই। আজকের ইতি এখানেই টানা যাক, কি বল। বেশ তুমি যখন চাইছো না, আমি আর তোমায় কি বলব।

যাই যাই করেও যাওয়া হয়নি। ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্জ সাহেব একদিন এলেন মিনতি সেনের বাড়ী। আমাকে দেখে বললেন হ্যালো ইয়ংম্যান, কেমন আছো? ভাল। আপনি? ফাইন, তোমাদের মত ছেলেদের দেখলে আরো ভালো লাগে। তারপর বললেন, আজকের কাগজ দেখেছো? না, বিশেষ কোন সংবাদ আছে? মিনতি সেন বললেন ভট্টাচার্য সাহেব আপনি যখন কথা বলেন, তখন সব কিছু কেমন রহস্যে ঢাকা থাকে। কি সংবাদ আছে আজকের কাগজে যাকে আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভট্টাচার্য সাহেব বললেন কি জানি, আপনাদের কাছে কোন সংবাদ বিশেষ আর কোনটা নয়। আমি আইনের লোক। বহু সময় পয়সার বিনিময়ে মিথ্যেকে সত্য বলে চালাতে চাই যুক্তির জাল বুনে। কিন্তু বিশ্বাস করুন মনে মনে কিন্তু চাই অপরাধী যেন শাস্তি পায়। মিনতি সেন বললেন,

তবুও খোলসা হল না। জানতাম তা হবে না। তবু বলছি, আপনাদের ডালিমের কথা মনে আছে? আমি উৎসুক হয়ে তাকালাম ভট্টাচার্জ সাহেবের দিকে। মিনতি সেন বললেন, তার কথা মনে থাকবে না? আমাদের জীবনে সে তো অভিশাপ। তার কোন কঠিন শাস্তি হোক আপনারা চান না। কি বলছেন ভট্টাচার্য সাহেব। চাইনে মানে? ওরই জন্য মেয়েটি আমার কোথায় হারিয়ে গেল। কিন্তু কঠিন শাস্তিতো তার হয়েছে। না হয়নি। সেকি কথা, তার ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, এবং তারপরে আরো ১০ বছর পুলিশের শ্যেনদৃষ্টির ভিতরে থাকাকে কি আপনি কম শাস্তি মনে করেন? তবে কি সে ছাড়া পেয়েছে? হ্যাঁ, মিস সেন ও মুক্তি পেয়েছে? বলেন কি? আঁতকে ওঠেন মিনতি সেন। আমি অবাক হয়ে বলি, তাহলে কি হবে ভট্টাচার্য কাকু। ও তো এখন রেহানাকে পাবে কি না জানিনা, কিন্তু সেলিনার উপর যে প্রতিশোধ নিতে চাইবে। মিনতি সেন বললেন আপনি যা হয় একটা কিছু করুন ভট্টাচার্য সাহেব, কণ্ঠে আকুল আর্তি। ভট্টাচার্য সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, তাইতো বলছিলাম, আপনাদের কাছে কোনটা বিশেষ কোনটা অবিশেষ তাইতো বুঝতে পারিনা। আপনি ঠাট্টা করছেন, কণ্ঠে তার আসন্ন বিপদের উদ্বেগ।

ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, আমার মত নগন্য ব্যারিষ্টার তার আর কি করবে। মুক্তি পেয়ে সেতো এখন সব বাঁধনের উর্দ্ধে। মিনতি সেন বলেন, এখনো আপনি রহস্যময়। সত্য কথাটা বলুনতো কি হয়েছে? মুক্তি পেয়ে সে কি আরো সাংঘাতিক কিছু করেছে? না মিস সেন আসলে বিচাবক তাকে সঠিক শাস্তি দেননি। মানবিক বুদ্ধিতে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিচারকেরও বিচারক যিনি, তিনি তা সইবেন কেন? সেই যে কথায় আছে না, তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না করেন নি, ডালিমের ক্ষেত্রেও করেন নি। তাই তার বিচার নেমে এসেছে একান্ত গোপনে চরম আত্মশোচনায়। আমি ও মিনতি সেন বললাম বুঝতে পারছি না। আমিও বুঝতে পারিনি প্রান্তিক, তারপর ধীরে ধীরে সেই বহু প্রতীক্ষিত সংবাদকে উন্মোচন করে বলেন, ডালিম আত্মহত্যা করেছে। আমরা বললাম আত্মহত্যা। হ্যাঁ আত্মহত্যা, এবং তার জন্য ও সুইসাইড নোটও লিখে রেখে গেছে। এই একটি কাজ সে সত্যিকারের ভাল কাজ করেছে। আর সেই ভালো কাজের জন্য, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের কাছে তার মুক্তির সুপারিশ করা যেতেই পারে। সুইসাইড নোটে ও লিখে রেখে গেছে, জীবনে জিৎতে চেয়েছিলাম। ছলে বলে কলে কৌশলে যেকোন ভাবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছি। সবশেষে বাজিতেও হেরে গেছি আমি। বুঝতে পারছি এই পৃথিবীর আলোবাতাস কোন শয়তানদের জন্য নয়। আমি আমার দোষ মহামান্য আদালতের কাছে স্বীকার করে আবার পৃথিবীর আলো বাতাসে ফিরে আসার ছাড়পত্র চাই। শাস্তির ১০ বছর মেয়াদ শেষে মনে হয় বিচারক বোধ হয় আমাকে প্রতিশোধের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই স্বল্প শাস্তি দিয়েছেন। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভিতরের যে শয়তানটি ক্ষণিকের জন্য মানবিক হয়ে নিজের দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই আবার সহস্রগুন ভয়ংকর হয়ে প্রতিশোধ নিতে মেতে ওঠে, কিন্তু প্রতিটি বাজিই আমি হেরে যাই। ভয়ংকর হতাশা নেমে আসে জীবনে। বাঁচার ইচ্ছেটুকু যায় নষ্ট হয়ে। নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য

প্রস্তুত হই। এবার শাস্তির মেয়াদ যাতে বাড়ে তার জন্য যা যা বেআইনি কাজ তাই করতে আরম্ভ করি। সবশেষে তাই ভাবি, না এভাবে হবে না। আমাকে স্থির সংকল্প হতে হবে। অবশেষে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারারক্ষী ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বশীভুত করে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে নিই বাইরে থেকে। আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী দিন আর পৃথিবীর আলো দেখতে চাইনা আমি। তাই যতগুলো ঘুমের ওষুধ আনিয়েছিলাম সব এক সঙ্গে খেয়ে রোজ কেয়ামতের, বিচারের অপেক্ষায় রইলাম। হায় আল্লাহ, তুমি আমার ক্ষমা করো। আমার নিষ্ঠুরতায় যারা জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাদের নতুন পথের সন্ধান দিও। আমার মৃত্যুর জন্য কেবল মাত্র আমিই দায়ী। আমার জন্য যেন কাউকে কোন হয়রানি হতে না হয় সেই অনুরোধ রেখে গেলাম। হায় খোদা! ডালিম।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম ডালিমের লেখা সুইসাইড নোট। হায় হতভাগ্য ডালিম মৃত্যুতেই তোমার সত্যিকারের জয় হল। মিনতি সেন কোন কথা বললেন না। ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, আমি জানি ওই হতভাগ্যের জন্য আপনারাও সমব্যথী হয়ে উঠবেন। কি আশ্চর্য তাই না? এরই কিন্তু মৃত্যু কামনা করেছিলাম আমরা সবাই। আর আজ মনে মনে বলছি, দূর্ভাগ্য ওর ভিতরের মানুষটাকে ঠিক সময়ে ঠিক পথে চালিত করতে পারেনি। একথা আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, তার নিষ্ঠুরতায় যাদের জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, অন্তর দিয়ে তাদেব সে ভালবেসে ছিল, তা না হলে সুইসাইড নোটে ও বলতে পারতো না আমার নিষ্ঠুরতায় যারা জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছে তাদের নতুন পথের সন্ধান দিও। জীবনের এই মানবিক দিক তাকে মৃত্যুতেও মহান করে তুলেছে। তাই তার সমাধি সাধারণ কয়েদির মত না হয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়েছে। পুলিশের একাজ আমি সমর্থন করি। আর প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে জীবনের ভুল পথে চলতে গিয়ে যারা ডালিম হয়ে গেছে তুমি তাদের ওরই চেতনায় উদ্বোধিত করো। হয়তো সেটাই হবে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

একটা থমথমে অবস্থা নেমে এল সমস্ত ঘরটয়। হতবাক মিনতি সেন, বিস্ময়ে অভিভূত আমি। মনে মনে বললাম, ঈশ্বর একি সত্যিই তোমার বিচার? যে মানবিকতার বরমাল্য তুমি তাকে দিলে, কয়েকদিন আগে দিলে না কেন? তা হলে তো এমনি একটা অমূল্য জীবন পৃথিবী থেকে ঝরে পড়তো না। আবার ভাবলাম, কার কাছে আবেদন? নিষ্ঠুর ঈশ্বরের কাছে? ওর নিষ্ঠুরতায় তো হারিয়ে গেছে আমার রেহানা। সে তো কোন অপরাধ করেনি, তবে কোন পাপের শাস্তি দিতে তুমি তাকে পথে নামিয়ে এনেছো? এই যদি তোমার বিচার, তবে কিসের ন্যায় বিচারক তুমি।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা, যেন সূঁচ পড়লেও টের পাওয়া যায়। সেই গভীর নিঃশব্দতাকে প্রভাত আলোর পদধ্বনির মতো স্পষ্ট করে ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, মিস সেন জবার মাকে অন্তত বলুন এক কাপ কফি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিনতি সেন বললেন, সরি ভট্টাচার্য সাহেব, এই আনি। কেন জবার মা? আজকে ওকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

যাকে মা হিসাবে মেনে নিয়েছি, স্থান দিয়েছি মনের নিভৃত অন্দরে, সন্তান হয়ে তাকে

প্রেমিকা রূপে দেখার ঔচিত্য অনৌচিত্যের প্রশ্নে মন দোলা খায় যখন, তখন একদিন প্রতীমবাবুর ওখানে এসে উপস্থিত হই। উনি আমাকে বললেন, অনেক দিন পরে এলে কিন্তু। কেমন আছো? তোমার মা ভালো আছেন তো। বললাম হ্যাঁ, কিন্তু একটা কথা আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি। বলুন আমার মাকে আপনি চেনেন একথা আগে বলেননি কেন? বুঝতে পারছি গভীর প্রচেষ্টায় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাইছেন প্রতীমবাবু। বললেন, তুমিতো কখনো তোমার আসল পরিচয় দাওনি। তাছাড়া আমি ঠিক বুঝতে পারিনি তুমি মিনতি দেবীর ছেলে? বললাম সে কথা থাক। আমি তো বড় হয়েছি। অবাক হয়ে আমি যখন দেখলাম, আমার মাকে দেখে আপনি চমকে উঠেছেন, আমার মাও ভীষণ ভীষণ অবাক হয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। যতক্ষণ ছিলেন স্বাভাবিক হতে পারেন নি। হয়তো আপনিও স্বাভাবিক হতে পারেন নি। এই দ্যোদুল্যমানতায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বল। সত্যি উত্তর দেবেন? উনি বললেন দেখ তুমি আমার ছেলের মতন। যে সত্য যতটুকু তোমার কাছে প্রকাশ করা যায় তার বেশী জানতে চেওনা। উত্তর দিতে পারবো না। বললাম, এমন তো হতে পারে আপনি যা জানেন, তা সত্য নয়। মানুষের জীবনে প্রেম ভালবাসা স্নেহ মমতা এতো কোন সামাজিক বন্ধনে বাধা যায় না। যায় কি? বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছো। বললাম, জীবন অভিজ্ঞতা আপনার আমার থেকে অনেক গুন বেশী। যা আপনি বিশ্বাস করেন, মনের মধ্যে যে স্বপ্নকে আপনি এই দীর্ঘ বছব গুলোতে লালন করে এসেছেন, আজ যদি হঠাৎ দেখেন, কোন এক উত্তাল ঝটিকায় তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। আপনি কি পারবেন, আপনার সেই বিশ্বাসকে সরিয়ে নিতে? উনি বললেন, জানিনা তুমি কি বলতে চাইছো। এইটুকু বুঝতে পারছি, খুব সাধারণ ভাবে তুমি এসব কথা বলছনা। তোমার বক্তব্যের মধ্যে আছে এমন এক অসাধারণত্ব যা শ্রোতাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। এটা আপনার আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা। উত্তর নয়। তোমার উত্তর তো আমার জানা নেই প্রান্তিক। তা হলে কি বিশ্বাস করতে হবে এত দীর্ঘদিন ধরে যে বিশ্বাসকে আপনি গভীর মমতায় বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন, তাকে মেরে ফেলতেও আপনার কোন দ্বিধা নেই। প্রতীম বাবু বললেন, স্বপ্ন বা বিশ্বাসকে এ ভাবে মারা যায় না প্রান্তিক। তারা বেঁচে থাকে। আমি বললাম তাই বলুন, তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কি? যে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমার মা এখনো বয়ে চলেছেন, আপনি কি পারেন না সেই নিঃসঙ্গতাকে গভীর মমতায় মুছিয়ে দিতে? আমি? কি বলছ প্রান্তিক? কে আমি? কি অধিকার আমার? যদি কোন অধিকার নেই তা হলে অমন চমকে উঠলেন কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতীম বাবু বললেন, সে তুমি বুঝবেনা। বললাম, আপনি আমাকে যত ছোটই মনে করুন আমি আমার ছোট্ট অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, যে নিঃসঙ্গ জীবন আপনি বয়ে চলেছেন, সে আমার মার জন্য, বলুন অস্বীকার করতে পারবেন?প্রতীমবাবুর চল্লিশ উর্দ্ধ জীবনে এমন তীব্রভাবে ভেতরটাকে বুঝি কেউ আঘাত করেনি। তাই খানিকক্ষণ বাক রুদ্ধ হয়ে রইলেন। পরে বললেন, জানিনা, কেন তুমি এভাবে বলছ। যা ছিল স্মৃতি তাকে স্মৃতিতেই থাকতে দাও প্রান্তিক। জীবনের অনেক সাধ, আকাঙ্খা,

স্বপ্নই তো পূরণ হয় না, তার জন্য দুঃখ করলে বাকী জাবীনটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর বললেন হ্যাঁ, তোমার মায়ের একটা স্মৃতি আজো আমার মনের মণিকোঠায় বেঁচে আছে বলেই। দীর্ঘ ২৪ বছর পরেও তোমার মাকে আমার চিনতে ভুল হয়নি। তোমার মারও হয়তো ভুল হয়নি। না হলে অমন পালিয়ে যেতেন না। কিন্তু প্রান্তিক, এসব কথা থাক, তুমি বরং অন্য কথা বল। বললাম, আমি কিন্তু অন্য কথা বলতে আসিনি। আমি আমার নিঃসঙ্গতা দিয়ে আমার মার নিঃসঙ্গতা বুঝি। হয়তো আপনারটাও কিছু বুঝি। প্রতীমবাবু জীবনের এই গোপনতাকে যেন এড়িয়ে যেতে চাইছেন বুঝতে পারছি। বললেন, আমার ভীষণ ভাবে মনে থাকবে তোমার কথা। অনুরোধ প্রান্তিক এ প্রসঙ্গ বন্ধকর। জীবনের দূর্বল দ্বার খুলে কি লাভ। বরং খুলতে গেলে তা ভেঙে যেতে পারে। বললাম বুঝতে পারছি এক তীব্র অভিমানে আপনি অতীতকে ভুলে যেতে চাইছেন। উনি খানিকক্ষণ আবার চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, যে অতীতকে তুমি এত গুরুত্ব দিচ্ছ, সে রকম কোন অতীত কিন্তু আমার জীবনে নেই। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার কোন পূর্ব পরিচিতি ছিল না, যে পরিচিতির সোপান বেয়ে অমূল্য স্মৃতি তৈরি হতে পাবে। ছিলনা কোন আবেগও। কারণ ভাল লাগার কোন মুহূর্ত তৈরি হয়নি ভালবাসাতো দূরের কথা। শুধু একটা গভীর ট্রাজেডির ঘটনা ঘটে গিয়েছিল আর তার জন্য আমার নিজেকে দায়ী মনে হয়েছিল। আর সেই জন্যই দায়ীত্বটুকু গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং তুমি যে অভিমান জাত স্মৃতির কথা বলছ তা কিন্তু ছিল না। হাসলাম আমি, বললাম, তবু আপনি প্রতীক্ষা করেছেন, প্রতীক্ষা হয়তো আমার মাও করেছেন। অস্বস্তি বোধ করছেন প্রতীম বাবু। বারবার বলছেন থাক তোমার মায়ের কথা, তোমার কথা বল। বললাম, আমার মাকে না চিনলে আমাকে চিনবেন কি করে? কি করে চিনবো তোমার মাকে। আজ তো চেনার সমস্ত রাস্তাগুলোই বন্ধ। আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, এ আপনার ভুল। ভুল? হ্যাঁ ভুল।

তারপর আমার পকেট থেকে আমাকে লেখা দাদুর চিঠিটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, আমার দাদুর মৃত্যুশয্যার চিঠি। চিঠি যদিও আমাকে লিখেছেন, কিন্তু এর প্রতিটি লাইন জুড়ে আছেন আমার মা। পড়ুন। উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, বুঝি জানতে চাইছেন পড়ব? বললাম, ওচিঠির সত্ত্বাধিকারী তো আমি। আমি তো বলছি পড়ুন। জানতে পারবেন, আমার মায়ের আসল পরিচয়। কিন্তু। কোন কিন্তু নয়, আপনি পড়ুননা। আমাকে বুঝতে হলে আমার মাকে বুঝতেহলে আমার দাদুর এ চিঠিটা পড়া আপনার একান্ত দরকার। তারপর চিঠিটা আমি টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, আমি আধ ঘন্টা পরে আসছি। আশা করি আমার মায়ের আসল যন্ত্রণা ও পরিচয় ততক্ষণে পেয়ে যাবেন। কিন্তু তোমার লাঞ্চ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, এখনো সময় হয়নি। এসে লাঞ্চ করব।

রাস্তা দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ভাবছি, আমি কি ঠিক করলাম? মিনতি সেনের সত্যিকারের যন্ত্রণা কি আমি জানি? এমনও তো হতে পারে শুধু মাত্র মায়ের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে চরম অভিমানে বাবার সব কিছুকে অস্বীকার করেছেন। এখনও তো

বাবার বলতে যা কিছু তার কিছুতেই হাত দেননা। যদি ক্ষমা করতে পারতেন তাহলে কি এমন হতো? প্রতীম বাবুর জন্য সামান্য দরদ নাও থাকতে পারে। শুধু ভরসা, প্রশ্নের মুখোমুখি হলে অন্তত বলতে পারবো, তা হলে কিসের আশায় তুমি আজো প্রতীম বাবুর ঐ ছোট্ট চিঠিটা বয়ে নিয়ে চলেছো?

আধঘন্টা পরে ফিরে এলাম। ততক্ষণে লাঞ্চ এসেছে। আমাকে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে বললেন, আমাদের অহংকার কত ভঙ্গুর তাইনা প্রান্তিক। আমার মাকে চিনতে পারলেন? পেরেছি। পেরেছেন? আনন্দে আমার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললাম, তা হলে মাকে কি বলব। কিছুই বলতে হবে না প্রান্তিক। যদি প্রেক্ষাপট কিছু বলার অবস্থা তৈরি করে, বলো, তার মাতৃত্বের অহংকারকে আমি শ্রদ্ধা করি। কোন ভাবেই তাকে ছোট করতে পারবো না। জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত দুর্বলতাই সব নয় প্রান্তিক। দুর্বলতা তৈরি হয় সকলকে নিয়ে পূর্ণতার জন্য। আমি শুভার্থী হিসাবে থাকবো তোমাদের পাশে, তোমাদের প্রয়োজনে আমাকে পাবে সবসময়। তোমার মাকে বলো, আমার শ্রদ্ধা রইল তার জন্য। একান্ত সমব্যথী হিসাবে সব অতীতকে মুছে দিয়ে যদি তোমাদের পাশে প্রয়োজন হয় আমাকে পারে সব সময়। তবু। না কোন তবু নয়। হয়তো আমি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ। তবু আর যাতে ছোট না হতে হয়। সে দায়িত্ব তোমার? লাঞ্চ হয়ে গেলে, বললাম এবার আমাকে যেতে হবে। আচ্ছা এস। আর একটা কথা, যে কোন প্রয়োজনে, যতবড় কঠিন প্রয়োজন হোক, তোমার দাবী নিয়ে আমার কাছে এস। দাবী? হ্যাঁ দাবী, ভালবাসার দাবী, স্নেহের দাবী, অধিকারের দাবী। আমি বললাম, তাই হবে। আমি তবু দাঁড়িয়ে আছি, দেখে বললেন কিছু বলবে? না। আমি চলে এলাম, পিছন ফিরে দেখলাম, পাহাড়ের সহিষ্ণুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীমবাবু। তখনো স্থির অপলক। কি যে খারাপ লাগছিল ভাবার নয়।

না কোন প্রেক্ষাপট তৈরি হয় নি, ভাবাও হয়নি। ওদিকে ধীরে ধীরে অশ্রুকণাকে নিয়ে বাড়ীতে এক সমস্যা তৈরি হয়েছে। সজলবাবুর মত ছেলেকে প্রত্যাখান করার পরও বাবা-মা ওর জন্য আলাদা পাত্রের সন্ধানে আছেন। কিন্তু অশ্রুকণার একই কথা সে তার সিদ্ধান্তে অনড়।

একদিন ও এসেছে মিনতি সেনের বাড়ীতে। মিনতি সেনকে বলছে আমার একটা উপকার করবেন পিসি? বল। আগে করবেন কি না বলুন, তারপর বলব। আমি সামনে ছিলাম। বললাম, মা না জানলে বলবেন কি করে যে তিনি পারবেন কি না, তার ক্ষমতা আছে কি না? তুমি চুপ কর প্রান্তিক, আমিতো তোমাকে কিছু বলিনি। মিনতি সেন বললেন, তুই এখান থেকে যা প্রান্তিক, দেখি ও কি বলে? ও কি বলে জানতে ইচ্ছে হলেও, আমি চলে এলাম। মিনতি সেন বললেন বল কি বলতে চাইছো? আপনারতো বহুলোকের সঙ্গে জানা শোনা আছে, আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন? যত ছোটই হোক, শুধু বেঁচে থাকার মতো হলেই হবে। কি ব্যাপার অশ্রু, বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি। ও চুপ করে থাকে। আবার বললেন, কি হল, উত্তর দাও। পিসি বাবা-মা এখন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছেন। আঁতকে উঠে মিনতি সেন বললেন, ছিঃ অশ্রু ওকথা বলতে

নেই। তুমি কেন বাবা-মায়ের কষ্ট বোঝনা? ওনারা কি আমার কষ্ট বোঝেন? সন্তানের কষ্ট বাবা-মা বোঝেন না একি হয়? আসলে তোমার কি কষ্ট তাকি বলেছো বাবা মাকে? ওনাদের সে সময় নেই। আসলে ওনারা চান তার মেয়েকে রাজরানী করতে। মিনতি সেন বললেন সব বাবা-মাই তাই চান। কিন্তু আমি তো তা চাই না। তাহলে কি চাও তুমি? একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বাঁচতে। তুমি সে কথা বলতে পারতে। বললে শুনছে কে? তাদের এক কথা আমরা যা বলব তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে। অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য করব না। সে না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু প্রান্তিকের সম্পর্কে এমন সব কথা বলল, আমার মাথা গরম হয়ে গেল, বললাম, তোমরা তোমাদের স্বপ্ন নিয়ে থাকো, আমাকে তোমাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য পাবেনা কোন দিন। এ কথা বলে বেরিয়ে এসেছি এক বস্ত্রে, বলে এসেছি এখন থেকে আমাকে ফিরাতে বৃথা চেষ্টা করোনা। তোমাদের অহংকারের কাছে মাথা নত করতে পারবো না। মিনতি সেন শিউরে উঠে বললেন, একি করেছিস অশ্রু, এ পাগলামি কেন করতে গেলি। জানিনা পিসি। কিন্তু আমি আর ফিরে যাবো না। আপনি বললেও না। আচ্ছা ঠিক আছে তাই হবে। আমাকে একটু ভাবতে দে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ মিনতি সেন ও অশ্রুকণা। খানিক পরে অশ্রুকণা মিনতি সেনের বুকের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, আমাকে তাড়িয়ে দেবে নাতো পিসি। আমার যে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। মিনতি সেন ওকে কাঁদতে দিলেন। তারপর বললেন, যা চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। তারপর খেয়েছিস কখন? কাল রাতে। সেকি! তোর বাবা-মা তোকে খাওয়ার জন্য বলেনি। সে কথা থাক পিসি, ওদের কাছে আমার তো কোন মূল্য নেই, যা কিছু মূল্য তা ওদের দম্ভ, অহঙ্কার আর ঐশ্বর্য্যের জন্য।

মিনতি সেন আমাকে বললেন, যাতো দোকানে দেখ ভালো ডিনার কিছু পাওয়া যায় কি না। আজকেও জবার মা আসেনি, আমাকেই যেতে হবে রান্না ঘরে। আমি টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এর মাঝে মিনতি সেন কফি করে নিয়ে খেতে খেতে বললেন। একটা কথা বলবি? বলুন প্রান্তিককে খুব ভালবাসিস তাইনা? জানিনা। বল না। আমি তো প্রান্তিকের মা। জানি। তা হলে আমাকে বলতে লজ্জা কেন? না পিসি, আমি জানিনা, কিছু জানিনা, বলে পালিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি ডিনার নিয়ে এসে দেখি মিনতি সেন একাই বসে আছেন। বললেন ওটা রান্না ঘরে রেখে এসে আমার কাছে একবার আয় তো। আমি তার কাছে এসে বসলাম, উনি আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বললেন, আমার একটা কথা রাখবি প্রান্তিক? বল। রেহানা ফিরে আসবে কি না কে জানে? তার ভালবাসার স্মৃতি বয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিবি? এর দ্বারা কি সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা হবে তাকে? আমি অবাক হয়ে বললাম এ তুমি কি বলছ মা? কি করে আমি রেহানাকে ভুলে যাবো। আমি তাকে ভুলে যেতে বলিনি, কিন্তু কবে সে ফিরবে তার জন্য সারাটা জীবন অপেক্ষা করবি? আদৌ ফিরবে কি না তারও তো ঠিক নেই। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললাম তোমার কাছ থেকে এসব কথা আশা করিনি মা। একদিন আমি ও রেহানা তোমার মাঝে খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম মাতৃত্বের পূর্ণ আস্বাদ।

আজ এমন কি হল যে একজনকে তুমি সরিয়ে দিতে চাইছো। নারে পাগল ছেলে সরিয়ে দিতে চাইবো কেন? কোন মা পারে যে সন্তান হারিয়ে গেছে তাকে ভুলে থাকতে? তুমিতো তাই চাইছো। আমি যে মা। মায়ের শূন্যতা তুই কি করে বুঝবি। আমার বোঝার দরকার নেই। বুঝতে পারছি একদিন তুমি আমাকেও ভুলে যেতে চাইবে।

কখন যেন পাশে এসে দাঁড়ায় অশ্রুকণা। চোখ ফোলা ফোলা, বোঝা যায়, এতক্ষণ কাঁদছিল। মিনতি সেন উঠে পড়ে বললেন, তোরা আয় আমি ডিনারটা টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছি।

টেবিলে একটা কথাও বলেনি অশ্রুকণা আমার সাথে। আমি কিছু বলতে গেলে তাও উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছে।

রাত হয়, আমাকে এখন যেতে হবে? আবার কবে আসবি। তুমিতো এক মেয়ের অভাবে আর এক মেয়েকে পেয়েছো, আবার আমার অভাবেও নিশ্চয়ই কাউকে খুঁজে পাবে, আমাকে হয়তো আর কোন দিন দরকার হবে না। প্রচণ্ড অভিমানে কথাগুলো বলে হন হন করে বেরিয়ে এলাম। মিনতি সেন পিছন থেকে বারাবার ডেকে বললেন, শোন প্রান্তিক, শুনে যা আমার কথা।

অশ্রুকণা বলল, আমিও যাই তা হলে, ও যখন চায় না যে আমি এখানে থাকি, বলে ও বেরিয়ে আসতে চাইলে মিনতি সেন বললেন তোরা সবাই এভাবে পাগলামি করলে আমি সামলাই কি করে বলতো।

বেশ কিছুদিন যাইনি মিনতি সেনের বাড়ী। হয়তো অশ্রুকণা এখনো ও বাড়ীতেই আছে। এর মাঝে একদিন এসেছিলেন প্রমথবাবু। অশ্রুকণার খোঁজে। আমি যেটুকু শুনেছি তার ভিত্তিতে বললাম, আপনার মেয়ে কোথায় গেছেন সেকি আমার জানার কথা? এইটুকু বলতে পারি আমাদের এখানে আসেনি। নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, এভাবে কথা বলছ কেন প্রান্তিক। ও বাড়ী থেকে না বলে বেরিয়ে গেছে। ও তো তোমার বন্ধু, জানতে ইচ্ছে করে না, ও কোথায় গেছে? না করে না। তারপরে বললাম আমি কারোর কেউ নই পিসি। আমি শুধু আমারই। আমি নাকি ওনার মেয়েকে বদ মতলব দিয়েছি, ভুল পথে চালিত করেছি, কি ভাবেন ওনারা? ঐশ্বর্য্যের দাম্ভিকতায় যা মনে হয় বলা যায়? অবাক হয়ে শোনেন আমার কথা, নীলাঞ্জনা পিসি ও সেলিনা। প্রমথবাবুর বোধ হয় কিছু বলার ছিল না। এরপরে আর কিছু জানতে চাওয়াও সম্ভব নয়। মাথা নীচু করে যখন চলে যাচ্ছেন, নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, শুনুন। উনি দাঁড়িয়ে গেলে পিসি বলতে থাকেন, অশ্রুকণা আমার মেয়ের মত, অনেকবার এসেছে আমাদের এখানে। খুব খারাপ লাগছে শুনে যে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আর ফিরে যায়নি। প্রান্তিক ছেলেমানুষ, ওরতো বাবা-মায়ের যন্ত্রনার কথা বোঝা সম্ভব নয়। তাই হয়তো মুখে যা এসেছে বলে ফেলেছে। ওর ব্যবহারের জন্য ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। উনি বললেন না না, সে কি কথা। ও হয়তো আমাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছে তার জন্য আমিই দুঃখ প্রকাশ করছি। পিসি বললেন, সে যাই হোক, অশ্রুকণা আমাদের এখানে আসেনি। আমরাও দেখছি ও কোথায় গেছে, কেন গেছে? আর সংবাদ পেলেই জানাব আপনাদের।

ধন্যবাদ জানিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন।

পিসি দীর্ঘ সময় কিছু না বলে রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে জানতে চাইলেন তুমি কি জাননা প্রান্তিক ও কোথায় গেছে? ওর সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে? বললাম কেন ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে? তা হলে ওর বাবাকে তুমি ও ভাষায় কথা বললে কেন? তুমি তো এরকম ব্যবহার করতে না কখনো। কাল গিয়ে ওর বাবা মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসবে। একটা কথা মনে রেখো ধীরে ধীরে যে উচ্চতায় পৌছেছো এক ঝটকায় তা থেকে মাথা মুড়ে পড়ে যেওনা। আমি চুপ করে রইলাম, কিছুই ভাল লাগছেনা। নাইট বাল্ব জ্বালিয়ে শুয়ে আছি, ঘুম আসছেনা। শুধু এ পাশ ও পাশ করছি। হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে ঘর ভরে গেল। ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে এল সেলিনা। আমি অবাক হয়ে বললাম তুমি? হ্যাঁ আমি, মা পাঠালে। তোমাকে পাঠিয়েছেন পিসি? কৈন? বলছি। বল। তুমি কি শুয়ে শুয়ে শুনবে প্রান্তিক ভাই। এতে যদি অসুবিধা হয় বসতে পারি। না দরকার নেই তুমি শুয়ে শুয়ে শোন। বল? অশ্রুদি কোথায় গেছে তুমি জান না? আমি কি করে জানব? আমি কি করে জানব নয়, জান কিনা তাই বল। হ্যাঁ বা না? আমি রেগে গিয়ে বললাম, আমি কি আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে বলতে হবে হ্যাঁ বা না। হ্যাঁ দিচ্ছ। মায়ের আদালতে তুমি সাক্ষ দিচ্ছ আর আমি উকিল হয়ে তোমাকে জেরা করছি। বল অশ্রুদি কোথায় গেছে তুমি জান কি না? না জানিনা। মিথ্যে কথা। কি মিথ্যে কথা? তুমি জান যে সে কোথায় গেছে। জানলেও বলতে হবে? এবার হেসে ফেলল সেলিনা, বলল এবার পথে এসেছ প্রান্তিক ভাই। তবে জানলেই যে বলতে হবে এমন কোন দিব্যি নেই, আমার জানার দরকার ছিল তুমি জান কিনা। বললাম জানতাম না, তবে ঘটনা চক্রে জেনে ফেলেছি। মানে? হঠাৎ দেখি উনি মিনতি সেনের ওখানে উপস্থিত। আমার সঙ্গে কথা হয় নি, মিনতি সেনকে ও কি বলেছে আমি জানিনা। কিন্তু মিনতি সেন আমায় জিজ্ঞেসা করে জানতে চেয়েছেন, অশ্রুকণাকে আমি ভালবাসি কীনা, রেহানার শূন্য জায়গায় তাকে, প্রতিষ্ঠিত করা যায় কীনা ইত্যাদি। রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে তাই চলে এসেছি। এর বেশী আমার কিছু জানা নেই। আমি বলতেও পারবো না কেন সে গেছে ওখানে? এখনো আছে কি না? কিছুই জানিনা। সেলিনা বলল, এই সহজ সত্যটা তুমি বললে না কেন? জানিনা বলে কেন গোপন করলে? আমি জানিনা। তুমি না জানলেও আমি জানি প্রান্তিক ভাই। আমি জানিনা আর তুমি জান? হ্যাঁ জানি। তাহলে বলতোকেন? অশ্রুদি তোমায় ভালবাসে, রেহানার থেকেও হয়তো বেশী ভালবাসে। তুমি বাস কিনা সেটা বড় কথা নয় তবে অশ্রুদি বাসে। আর তাইতো সে অস্বীকার করতে পারে তার বাবার যে কোন প্রচেষ্টাকে। তুমি যে তা জাননা। তা নয়। হয়তো আমার থেকে বেশী জান। কিন্তু প্রান্তিক ভাই, এ ভাবে পালিয়ে গেলে চলবে কেন? শুধু রেহানার ব্যথা বেদনা বুঝবে। অশ্রুদির কষ্টটা বুঝবেনা? শুধু রেহানাই থাকবে তোমার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে, আর অশ্রুদির জন্য সাজিয়ে রাখবে দুঃখের পশরা? এ হতে পারে না প্রান্তিক ভাই। তারপর বলল তুমি কেন বোঝ না, কি গভীর ভাবে ভালবাসলে এমনি করে সব কিছুকে উপেক্ষা করে সে পথে নামতে পারে। না প্রান্তিক ভাই, এতটা নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। তোমার

মধ্যকার এই নিষ্ঠুর মানুষটাকে আমি দেখতে চাইনা প্রান্তিক ভাই। অশ্রুদিকে বুঝতে চেষ্টা করো। রেহানার জায়গায় তাকে বসাতে পারবে কিনা সেটা অন্য কথা। তাই বলে তার ব্যাথার জায়গাটা তার অসহায়তাকে কেন গুরুত্ব দেবেনা। এটাই কি তুমি চাও? আর যদি সত্যি সত্যি তাই চাও, তাহলে আমাদের কথাও শুনে রাখ, আমরা কিন্তু তা চাই না।

আমার যেন কিছুই বলার নেই। এরা নিজেরা যেমন রেহানাকে ভুলে যেতে চাইছে তেমনি আমার জীবন থেকেও মুছে দিতে চাইছে তার সমস্ত স্মৃতিটুকু। তোমরা তোমাদের নিজেদের মত করে কথা বলছ, আমাকে বুঝতে চাইছো না, দুঃখ এখানেই সেলিনা। কেন তোমারা বুঝতে পারছো না আমার জীবনে অন্য কোন মেয়ের জায়গা নেই। হয়তো বুঝি প্রান্তিক ভাই। কিন্তু তুমিতো শুধু একা রেহানার নও, তুমি তো আমাদেরও। রেহানা তোমার জীবনের যতটাই অধিকার করে থাকুক না কেন, আমাদের সম্মিলিত অধিকারকে দাঁড়িপালায় ওজন করলে কি, রেহানার একার ওজনের থেকে ভারি হবে না? এও এক অবুঝ অভিমান সেলিনা। সত্যি বলছি আমি তোমাদের বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছনা, না বুঝতে চাইছো না? তোমার যা ভাললাগে তাই তুমি মানে করতে পারো। আমি শুধু বিশ্বাস করি ও কথা দিয়েছে ও আসবে আমার কাছে। আমাকে সেই অপেক্ষাটুকু করতে দাও সেলিনা। এইটেই তোমার শেষ কথা? হ্যাঁ এটাই আমার শেষ কথা। সেলিনা বলল তুমি কেন বুঝছো না প্রান্তিক ভাই, রেহানা যদি সত্যিই আসত তা হলে ডালিমের মৃত্যুর পরেই আসতে পারতো। ও তো তোমাকে ডালিমের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও সে চেয়েছিল, ডালিম যেন তার নিষ্ঠুর আক্রমণে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত না করে। আমি বললাম, এমনও তো হতে পারে ডালিমের মৃত্যু সংবাদ সে জানেই না। সেলিনা ধীরে ধীরে বলল এ তোমার বিশ্বাসের কথা। বাস্তব নয়? বাস্তব নয়? না। তবে কোনটা বাস্তব? সেলিনা বলল বাস্তব সব সময় সুন্দর হয় না প্রান্তিক ভাই। ডালিমের সুইসাউড নোট পড়েছো? হ্যাঁ পাড়ছি। কিছুই কি বুঝতে পারনি? না বোঝার কী আছে। হয়তো আমার মতো করে আমি বুঝেছি? সেলিনা হেসে বলল তোমার মত করে বোঝা হলেই তো তা বাস্তব হয় না? বাস্তব থাকে আরো গভীরে। ডালিম নিষ্ঠুর, ডালিম হিংস্র শুধু নয়, সে শয়তান, কিন্তু তার মানবিক গুন গুলো যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ তো তার সুইসাইড নোট। তারপর বলল ভুল ক্ষণিকের, উত্তেজনার আগুন তাকে দাউ দাউ করে জ্বালায় মাত্র, কিন্তু সেই ভুলে কেউ যদি মমতার পরশ বুলিয়ে দিতে, সত্যি কারের ভালবাসা নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াতো হয়তো ডালিম এতবড় ভুল করতো না। লুণ্ঠনে তৃপ্তি নেই, তাকে যদি একথাটা কেউ প্রথমেই পরম মমতায় বুঝিয়ে দিতো, তাহলে হয়তো ওর পথ অন্য রকম হতো। একটু থেমে বলল তোমাকে বললাম না প্রান্তিক ভাই, ডালিমের সুইসাইড নোট প্রমাণ করে প্রতিশোধের স্পৃহায় তাকে পাগল করেছিল, তাই সে একের পর এক প্রতিশোধ গুলো নিতে চেয়েছে, যদি সার্থকতা আসতো, তাহলে হয়তো আরো নতুন নতুন নেশায় মেতে উঠতো, হারিয়ে যেতো যা কিছু পুরোনো। কিন্তু ব্যর্থতা তাকে একটা জায়গায় আটকে রেখেছিল। আর এই হতাশার মধ্যেই মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলো সে।

সেলিনা বলল, কি ভাবছো প্রান্তিক ভাই। না কিছু না। কিছুনা যদি তাহলে এমন চুপ করে আছো কেন? কি বলব বল। কিছু তো একটা বলতে হবে? তুমিই বল আমি কি করব, আমার কি করা উচিৎ? আমি বলব? অবাক করলে প্রান্তিক ভাই। তোমার ভাগ্যকে পরিচালিত করবে তুচ্ছ সেলিনা? এ তুমি ভাবলে কি করে? আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম কেন পারবে না? নিজের মনের আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রেহানার জায়গায় তুমি কেন অশ্রুকণাকে এগিয়ে দিতে চাইছো? তারপর বললাম দেখ সেলিনা আমিও মানুষ। রক্তমাংসেরই মানুষ। ব্যথা বেদনা কামনা বাসনা মান অভিমান রাগ অনুরাগ সবই আমার আছে। আমিও চাই, কেউ আমার পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ দিক, আমাকে পথ দেখাক, ভুল করলে ভুল ভেঙে দিক। যে শুধু মাত্র দূরের নক্ষত্র হয়ে থাকবে না। সে আমার বাগানে ফুল হয়ে ফুটবে। কখনো বা তাকে সাজাবো আমার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে বুঝবে আমার হৃদয়কে, সে আমার ভালবাসাকে দেবে মর্য্যাদা, কর্ম ক্লান্ত প্রান্তিকের পাশে এসে বসবে সে, প্রয়োজনে তার আঁচলের হাওয়ায় মুছিয়ে দেবে ক্লান্তি, সে আমার ঘুমহীন চোখে গুন গুন সুরে সূচনা করবে ঘুমের আগমন আবার ভোরের সূর্য ওঠার আগে সেইই জানাবে আমায় নতুন দিনের বার্তা। আবেগে কাঁপতে থাকে আমার কণ্ঠ তাতে আরো আবেগ ঢেলে আমি জানতে চাই পারবেনা সেলিনা, আমার হৃদয় ক্ষতকে তোমার মরমী স্পর্শে শুকিয়ে দিতে পারবে না, শ্রান্ত আর ক্লান্ত প্রান্তিককে তোমার গানের সুরে ঘুম পাড়াতে, পারবেনা আমার জীবনের সমস্ত আগুনকে নিভিয়ে দিয়ে, কেবল তোমার ভালবাসার প্রদীপ জ্বালাতে? গভীর আবেগে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললাম, একদিন রেহানাও চেয়েছিল, তোমার ভালবাসার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিতে। আজ আমি সত্যি ক্লান্ত, সত্যি একটু খানি আশ্রয়ের যে আমার ভীষণ প্রয়োজন। আরো বললাম চার দিক থেকে যে ঝঞ্ঝা আসছে, হয়তো সে ঝঞ্ঝায় কোনদিন হারিয়ে যাব, তার আগে দেবে আমায় একটু আশ্রয়? তোমার ভালবাসায়, তোমার মমতায় তোমার কল্যাণ কামনায়, জন্ম হোক নতুন প্রান্তিকের, যে শুধু তোমার আর কারো নয়। রেহানা ছবি হয়ে জায়গা নিক দেওয়ালে। অশ্রুকণা খুঁজে নিক নতুন ঠিকানা। আমি শুধু তোমার মধ্যেই নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে ধন্য হতে চাই। বল সেলিনা বল, পারবেনা আমার বোঝা বইতে। গভীর আগ্রহ নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাই ওর দিকে, তারপর এক সময় সজোরে ওকে বুকের পরে টেনে নিই এক নিমেষে।

না কোন বাধা দিল না সেলিনা, শুধু চোখের জলে আমার বুকের জামা ভাসিয়ে দিল। আমি ওকে বুক থেকে তুলে নিয়ে বললাম, ছিঃ সেলিনা তুমি কাঁদছো? ও বলল আমাকে ছাড়, মা জেগে আছেন, আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। ও ধীরে ধীরে পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসল, নিশ্চল নিঃশব্দ এক প্রতিমুর্ত্তি যেন।

নিজের কাছে নিজেরই খুব অস্বস্তি হচ্ছে। আমি এত দুর্বল তাতো আগে জানা ছিল না। কি করে ভুলে গেলাম রেহানার উজাড় করা ভালবাসাকে। কি করে ভুলে গেলাম আফরোজ বেগমের সেই শেষ কথা গুলো, তোমার জীবনে রেহানার যে স্থান সে স্থানে,

সেলিনাকে জায়গা দিতে বলছিনা বাবা। অথচ আমি? তাহলে কোথায় আমি আলাদা ডালিম থেকে? ও ওতো ভালবেসে ছিল রেহানাকে, কিন্তু চেয়েছিল সেলিনা তার হোক। আমিও তো তাই, সে লুণ্ঠনে যা পেতে চেয়েছিল আমি আত্ম নিবেদনের মাধ্যমে তাই পেতে চেয়েছি। মাধ্যম যাই হোক উদ্দেশ্য তো এক। সেলিনা কিছু না বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো বললাম চললে? হ্যাঁ। কিছু বলবেনা? আজ কিছু বলার নেই প্রান্তিক ভাই, তুমি এই মুহূর্তে ভীষণ ভীষণ দুর্বল। তুমি এখন ঘুমাও। আমি মাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বললাম, আমি তো তা চাইনি, আমি চেয়েছি তোমাকে, জানি। তাহলে? তা হয় না প্রান্তিক ভাই। এই মধ্য রাতের মুহূর্তের আবেগ প্রভাতের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে দূর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। তখন তুমি না পারবে আমার চোখে চোখ মেলে তাকাতে, না পারবো আমি তোমার সামনে দাঁড়াতে। তার থেকে নিঃশব্দ আধারের ভেতর দিয়ে যে সত্যের আলোকে আমি তোমাকে দেখলাম, তোমার যে রূপ আমার মনে তার চিরস্থায়ী আসন গেড়েছে, বিলীন হয়ে যাক তা এই অন্ধকারের বেলাভূমে। এটাও স্মৃতি হয়ে যাক প্রান্তিক ভাই। এর বেশি কিছু আমি চাইনা। সেলিনা। এগিয়ে এসে আবারও ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। ও এবারও কোন বাধা দিল না শুধু বলল বল। তুমি কি আমায় বুঝতে চাইছো না? ও বলল আমার থেকে তোমাকে কেউ বেশী বোঝেনা প্রান্তিক ভাই। কিন্তু আমার জীবন নিয়ে যা কিছু করার বা বলার অধিকারতো শুধু তোমার আর মায়ের। তোমরা যা বলবে, অবাধ্য না হলে, আমি তাই করতে বাধ্য? বল কি করতে হবে? আমি চমকে উঠে দূরে সরে গিয়ে বললাম, তুমি এতদূর থেকে কথা বলছ কেন সেলিনা। মনে হয় সহস্র যোজন দূর থেকে তোমার কণ্ঠ ভেসে আসছে। ও বলল, এ তোমার ভুল ধারণা প্রান্তিক ভাই। আমিতো তোমার পাশেই আছি। তুমি শুধু চিনতে ভুল করছ? তাই হয়তো হবে। নিজের অহঙ্কারে আমি প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, আমি যেমন নিজেকে বুঝতে পারি এমন বুঝি কেউ পারে না। সেলিনা এবারও চুপ করে রইল। আমি বললম, তুমি কি কোন কথাই বলবেনা? ও বলল বল কি জানতে চাইছো? একদিন যে জোর বা অধিকার এবং দাবী ছিল তোমার আজ কি তা নেই। না নেই। কেন? সেদিনের যেকোন জোরের পিছনে আমি জানতাম, আমার কোন দুর্বলতাই তোমাকে স্পর্শ করবেনা, আমার আত্ম নিবেদন এবং ভালবাসা দিয়েও আমি তোমার নাগাল পাব না। তাই অবলীলায় বলতে পারতাম, বলুনতো এই পোষাকে কেমন লাগছে আমাকে। অথবা নিজে ফুল তুলে এনে আপনার হাতে দিয়ে বলতে পারতাম, দিনতো আমার বেনীতে গুজে, অথবা ফুলের বাগানে আপনাকে দেখে বলতে পারতাম সব থেকে সুন্দর ফুলে আমাকে সাঁজাতে ইচ্ছে করে না? আমার চোখের তীব্র আহ্বানকেও আপনি সেদিন অবহেলায় ফিরিয়ে দিতে পারতেন, তাই সেদিন যা সম্ভব ছিল আজ আর তা নেই। আজ আমি জানি, আমার সেদিনের ছেলেখেলা তোমার মনে আরেক ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আজ তুমি এক অন্য মানুষ দুর্বলতাই যার একমাত্র সত্য। না প্রান্তিক ভাই এ ভাবে তুমি আমাকে চেওনা, তাতে তুমি নিজে না পাবে মর্য্যাদা না পারবে আমাকে মর্য্যাদা দিতে তার চেয়ে অন্য কোন আশ্রয় খুঁজে নাও প্রান্তিক ভাই। আর

আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার অতীত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু কেন এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছি বলত সেলিনা? কেন মনে হচ্ছে আমার পাশে কেউ নেই, কেন এই মুহূর্তে বেশী করে মনে হচ্ছে আমাকে যদি সব থেকে কেউ বেশী আঘাত দিয়ে থাকে তবে সে রেহানা। কেন মনে হচ্ছে সে আর কোন দিনই আসবেনা আমার জীবনে। সেলিনা আস্তে আস্তে বলল, যে কারণটা তোমাকে আঘাত দিতে পারে আমি জানি। জান? হ্যাঁ জানি। বল না কারণটা কি? বললে হয়তো আমার অহংকারের কথা হয়ে যাবে তবু প্রান্তিক ভাই, যে কথা একটু আগে বলেছি, আমার থেকে বেশী করে তোমাকে কেউ বোঝেনা। তুমি কতটা বিশ্বাস করবে জানিনা, তবু একথা সত্যি যে আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি আমার চঞ্চলতায় আমার চটুলতায় আমার চপলতায়, আবার কখনো বা আমার বক্সিং এর রিং এ। আবার একান্ত ভাললাগার অনুভূতির ভেতর দিয়েও তোমাকে যেমন করে কাছে পেতে চেয়েছি এক তপতীদি ছাড়া তেমন করে কেউ তোমাকে কাছে পেতে চায় নি এবং বুঝবারও চেষ্টা করেনি। তাই বলছি, যে দেবত্বের আবরণে নিজেকে তুমি আচ্ছাদিত করতে চেয়েছো, ওরা চেয়েছে সেই দেবতার পায়ে শ্রদ্ধা জানাতে, ভালবাসাকে তারা অর্ঘ্য হিসাবে অঞ্জলি দিতে চেয়েছে। চেয়েছে তোমার দেবত্বই বড় হোক মনুষ্যত্ব নয়। আমি চেয়েছি প্রতি মুহূর্তে তোমার মানবিক রূপ। কামনা বাসনাময় জীবন্ত মানুষ। ওরা চেয়েছে মনুষত্ব থেকে দেবত্বে তোমার উত্তরণ ঘটুক। কিন্তু আমিতা চাইনি। আমি সব সময় চেয়েছি তোমার মধ্যেকার সেই রক্তমাংসের মানুষটাকে যার দুঃখ আছে, বেদনা আছে, আছে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার। তাই তোমার আজকের এই আচরণে কোন লজ্জা নেই। তুমি মানুষ এটাই তোমার আসল পরিচয়। তাই চেয়েছিলাম, রেহানা থাক তার ভক্তির অঞ্জলি নিয়ে, সে তোমার এই মনুষ্যত্ব রূপে দেখে হয়তো আঘাত পাবে, মনে হবে তার দেবতার এ পরিণতি অসহ্য। তোমার ভিতরের দুর্বলতাকে যে সে বোঝেনা তা নয়, তবু অবুঝ মন, যে ভাবে স্বপ্ন দেখে, সে ভাবেই দেখতে চায় বাস্তবকে। রেহানার কাছে তুমি দেবতা হয়েই থাক, কিন্তু অশ্রুদির জন্য তোমার মানবিকতাই জয়ী হোক, তুমি ওকে ফিরিয়ে দিওনা, মা বা পিসি অন্তত তাইই চায়।

আমি বললাম আর তুমি? আমার কথা থাক প্রান্তিক ভাই। রেহানার জায়গায় তুমি আমাকে স্থান দিতে চেওনা, তাতে শুধু আমাকে অপমান করা হবে না, অপমান করবে তুমি আমার মা আফরোজ বেগমকে। আর সব থেকে অপমান করবে রেহানাকে। এ ভাবনা থেকে তুমি সরে এস প্রান্তিক ভাই। আমি বললাম তোমাকে আমি বুঝিনি কোন দিন, আজো বুঝতে পারলামনা। কিন্তু একটা কথা আমাকে দেবে সেলিনা? বল। যতদিন না রেহানা ফিরে আসে ততদিন তুমি থাকবে আমার পাশে। যদি তোমাদের দাবী মেটাতে অশ্রুকণাকেও জায়গা দিতে হয়, তবুও তুমি থাকবে আমার পাশে, বল থাকবে? কথা দাও সেলিনা।

শুনতে পাচ্ছি, অস্পষ্ট উচ্চারণে সেলিনা বলছে, হায় ঈশ্বর একি পরীক্ষা তুমি আমাকে দিয়ে করতে চাইছো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, এ কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমায় ফেলতে চাইছো কেন? যে দুর্বলতায় তুমি আজ ভাস্বর আমাকে পাশে রেখে, তুমি কি তা

থেকে মুক্তি পাবে? না পাব না জানি আর সত্যি কথা বলতে কি মুক্তি তো আমি পেতে চাই না। অবাক হয়ে সেলিনা বলল, তা হলে? আমি চাই জ্বলতে। জ্বলতে জ্বলতে ভিতরটা আমার ছাই হয়ে যাক, আর আমার সেই জ্বালা তোমাকে জ্বালায় কি না তাই শুধু দেখতে চাই। তারপর বললাম, নিজেকে তুমিও অনেক বড় মনে কর সেলিনা। ভাব জ্বলতে যদি হয়ই, তবে তুমি একাই জ্বলবে। আমি তাই দেখতে চাই জ্বলার ক্ষমতা তোমার কতটা। তুমি যদি ভেবে থাক বক্সিংএর রিং এ আমাকে তুমি হারিয়ে দেব, হয়তো তা তুমি পারবে সেলিনা, কিন্তু জীবনের রিং এ তোমাকে আমি কিছুতেই জয়ী হতে দেবনা। দেখতে চাই তোমার দৌড় কতটা। আমার কথা শুনে সেলিনা একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। বলে কি প্রান্তিক? তবু, সেলিনা, রেহানা, অশ্রুকণা বা তপতী নয়, সে সেলিনা, তাই সে বলে, বেশ তাই হবে। তাতেই যদি তোমার ভিতরেব আগুন নেভে, আমি রাজী। কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে প্রান্তিক ভাই, কি? আমাব বুকে যত আগুনই জ্বলুক, কোন অবস্থাতেই তুমি তা নেভাতে চেষ্টা করবেনা, যদি তা কর, সেদিন থেকে কিন্তু আর আমাকে পাবেনা তোমার পাশে, সেদিন জানবে রেহানার মতো সেলিনাও হারিয়ে গেছে।

কি কঠোর এবং কঠিন শাস্তি! দেখতে পাচ্ছি বেরিয়ে যাচ্ছে সেলিনা, ভেজানো দরজা খুলে বাইরে পা দেবে, আমি আবার ডাকলাম সেলিনা! ও ঘুরে তাকালো আমার দিকে! বলল, বল! রাত কি সত্যি শেষ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, ভোরের আযান ভেসে আসছে মস্‌জিদ থেকে। বললাম, একটু বোস। কেন? বোসনা। ও আমার সামনে এসে বসল। আমি পূর্ব দিকের জানালা খুলে দিলাম। ভোরের নরম বাতাস আবছা আঁধারে ধুসর হয়ে আছড়িয়ে পড়লো ঘরেব মধ্যে। আমি ওকে বসিযে রেখে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিলাম, তারপর রাতের পোষাক বদলে এসে বললাম, যাবে আমার সাথে? কোথায়? একবার ভোরের রাজপথে তোমাকে পাশে নিয়ে হাটতে চাই? ও চমকে উঠে বলল, স্বপ্ন! না বাস্তব! বললাম দেখতে পাবে চল, ও বলল, দাঁড়াও প্রান্তিক ভাই, মাকে বলে আসি। পিসিতো ঘুমাচ্ছেন। জানিনা, তবু ঘুম থেকে উঠে যদি না দেখতে পান, চিন্তা করতে পারেন। আচ্ছা।

সেলিনা গিয়ে দেখ নীলাঞ্জনা তখনো না ঘুমিয়ে বসে আছেন। বলল তুমি ঘুমাওনি? না ঘুম আসেনি। তুমি আমাকে ডেকে পাঠাওনি কেন? ইচ্ছে করেই। না ঘুমিয়ে তোমার যদি শরীর খারাপ করে? করলই বা, তোরাতো আছিস! সেলিনা যেন কি বলতে চেয়েও বলতে পারল না। ও ওর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সারারাতের বাসি পোষাক ছেড়ে অন্য পোষাকে নীলাঞ্জনার সামনে এসে দাঁড়ালো। কোথাও যাবি? প্রান্তিক ভাই ভোরে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলছে, তুমিও চল না মা। নারে তোরা যা। অফিস আছে, কাজ আছে। সেলিনা বলল, তা হলে আসি। নীলাঞ্জনা বললেন, হ্যাঁরে সেলিনা, এত কঠিন শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছিস কেন? লজ্জায় মুখে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল মুখে দিয়ে চুপ কর রইল সেলিনা। কি উত্তর দেবে। প্রতি রাতে একটি কথাই তাকে বলে নীলাঞ্জনা, তুই আবার হারিয়ে যাবিনা তো আমার জীবন থেকে? কোথায় যাব মা। তোমাদের ছেড়ে আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তা হলে তুই আমার স্বপ্নকে এভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিস কেন? তা হয়না মা।

কেন হয় না। তুই কি ভাবছিস আমি তোর মনের কথা জানি না? আমার মনের কথা সব নয় মা। আরেক জনকে তো আমাকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। আর তাছাড়া, রেহানার শূন্যস্থানে? না মা তা হয় না।

কিন্তু এখন কি বলবে, প্রান্তিকতো এগিয়ে এসেছে। এখন যদি নীলাঞ্জনাও আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসেন কি উত্তর দেব? কিরে চুপ করে আছিস কেন? তারপর বললেন, তোরা বোধহয় আমার কথা ভাবসিনে, তাই না। মা এ তুমি কি বলছ? দেখ তোদের সব কথা আমি শুনেছি, হ্যাঁ শ্রুতিকণার কথা আমিও বলেছিলাম। তার কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল রেহানাকে বাদ দিয়ে ও কোন দিনও অন্য কারো কথা ভাবতে পারবেনা। কিন্তু ও আমার মনের কথা নয়। কত ছোট কালে ওকে আদর করতাম। তারপর তো এলো একদিন আমার কাছে। যৌবনের দ্বার প্রান্তে এসে থাক সেদিনের সে সব কথা। দেখতে দেখতে আমার জীবনটাও কেমন যেন মরুভূমি হয়ে গেল একদিন, এর মাঝে তুই এলি মরুতৃষ্ণাকে কানায় কানায় ভরে দিয়ে। আমার জীবনে অতীত শুধু অতীত। আজ তোকেই নিয়ে আমার বাস্তব, তোকেই নিয়ে আমার স্বপ্ন। তোকে যে আমি কোন ভাবেই চোখের আড়াল করতে পারবো না মা। কেন আমাকে চোখের আড়াল করবে? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তাই কি হয় পাগলি মেয়ে। তারপর বললেন, এক যদি প্রান্তিকের কথায় রাজি হতিস তা হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু তার দেওয়া শাস্তিই শুধু মাথা পেতে নিলি, তাকে নিলি না। মা হয়ে আমার এসব ভাল লাগে? সেলিনা তখনো স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছে কি বলবে সে। নিজের জীবনের শূন্যতা? মায়ের স্বপ্ন! প্রান্তিকের আকষর্ণ সবইতো তাকে টানে তবু সে পারছে না কেন? যে হয়তো কোনদিনই আসবেনা, তারই জন্য জীবনের সব সাধ আহ্লাদকে বিসর্জন দিতে হবে? কিন্তু কেন?

প্রান্তিক এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, বলল, চলনা পিসি তুমিও। নীলাঞ্জনা বললেন, নারে প্রান্তিক, তোমরাই যাও। আমার কাজ আছে। সেলিনাকে বললাম, আকাশ লাল হয়ে গেছে, আযানের সুর শেষ, এখনি হয়তো কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠবে মন্দিরে মন্দিরে, তাড়াতাড়ি চল। সেলিনা বলল চল। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাড়ালাম।

এতদিন প্রমথ বাবু জানতে পারেনি, অশ্রুকণা মিনতি সেনের বাড়ীতে আছে। অনুতপাই সংবাদটি দিয়েছিল। এসেছিলেন একদিন স্নেহময়ী দেবী ও প্রমথবাবু। মিনতি সেন, তাদের আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে এলেন। এ কয় দিনে চেহারা অনেকটা ভেঙে গেছে ওঁদের। মিনতি সেনের কাছে কাতর আবেদন জানালেন, আমাদের একমাত্র মেয়ে, ওকে আমাদের সঙ্গে ফিরে যেতে বলুন।

ওরা এসেছেন জেনেও অশ্রুকণা আসেনি ওঁদের কাছে। মিনতি সেন বললেন, কেন পাগলামি করছিস অশ্রু, বাব-মায়ের কষ্টটা একটু বোঝবার চেষ্টা কর। ফিরে যা ওদের সঙ্গে , ওর সেই এক কথা, না পিসি, আপনার যদি অসুবিধা হয় আমিই চলে যাব, তবু যে বাড়ী ছেড়ে এসেছি, আর সেখানে ফিরে যাব না। আপনি ওদের চলে যেতে বলুন। কথাগুলো মোটেই আস্তে বলেনি অশ্রুকণা। সবই শুনতে পেয়েছেন ওর বাবা ও মা। ব্যর্থ হয়ে যখন

মিনতি সেন ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রমথবাবু বললেন, না আপনাকে কিছু বলতে হবে না মিনতি দেবী। যা শোনার আমরা শুনে নিয়েছি। বাবা মা হওয়া যে কি কষ্টের আপনাকে বোঝাতে পারবো না, তবু আপনার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ, ওকে আপনি দেখবেন। উঠে পড়েন প্রমথবাবু এবং স্নেহময়ী দেবী। স্নেহময়ী দেবী শুধু একবার বললেন, একবার শুধু চোখের দেখা দেখব কোন কথা বলব না, কিছু জানতেও চাইবো না। চোখ ফেটে জল আসতে চাইলেও কাঁদব না, শুধু একবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়াক ও, তারপর চলে যাব, আর কোনদিন আসব না বিরক্ত করতে।

না মিনতি সেনকে এ অনুরোধ করতে হয় নি। অশ্রুকণা নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। তারপর বলেছে, দেখাতো হয়েছে, আর কোন দিন আসবে না আমার কাছে, আমার খোঁজও নেবে না। তোমাদের কোন কিছুব পরে আমার কোন লোভ নেই। ইচ্ছে করলে তোমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য যাকে খুশী দিয়ে যেতে পারো। কথাগুলো বলে, যেমন এসেছিল তেমনি ঢুকে গেল ভিতরে, যেন একটা দমকা বাতাস এল এবং মিলিয়ে গেল।

জীবন নাট্যের যবনিকাপাত যে কিভাবে হয় কেউ তা জানে না। আসলে আমরা যে খেলার পুতুল মাত্র সে কথাই ভুলে যাই। আমাদের নিজেদের পরে অধিকার যে কত ভঙ্গুর তা যদি জানতাম, অনেক অহংবোধ থেকে মুক্ত হতে পারতাম। মিনতি সেন বললেন, এ তুই কি করলি অশ্রু, এভাবে কেউ বাবা-মাকে আঘাত দেয়? অশ্রুকণা উত্তরে বলে, আঘাত যে ওদের পেতেই হবে পিসি। কেন? বিনা কারণে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইলে, সেই কাঠগড়ায় আগে নিজেদের দাঁড়াতেই হয় এটা তাদের জানা দরকার। কেন তুই বিনা কারণে এ সব কথা বলছিস? তোর কি কোন দোষ নেই? আমি তো আমার দোষকে অস্বীকার করছি না পিসি। আমাকে যে কোন কথা বলার, আমাকে বিনা কারণে শাস্তি দেওয়ারও হয়তো ওদের অধিকার আছে, কিন্তু তাই বলে যার কোন দোষ নেই, যে কেবল তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে যথাসাধ্য করেছে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কোন ভাবেই মেনে নিতে পারব না পিসি। বুঝতে পারছি তোর মনের অবস্থা। কিন্তু তোকেও তো বুঝতে হবে ওদের মন, ওরা কি চান? ওদের কোথায় ব্যথা। ওদের ব্যথাকে আপনি যতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন, আমার ব্যথাকে কি সেই ভাবে ভাবছেন? কেমন করে বুঝলি যে তোর কথা আমি ভাবছি না। যদি ভাবতেন তাহলে একটা কিছু করতেন এতদিন। কি করতাম বল! অশ্রুকণা বলল আমিতো প্রথম দিনই বলেছিলাম পিসি, যত ছোট হোক আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিন। হাসলেন মিনতি সেন, বললেন, একটি চাকরি পেলে তোর সব কষ্ট যন্ত্রণা মিটে যাবে? যা তুই চাস সব পেয়ে যাবি? পারবি ভুলে যেতে প্রান্তিককে? এভাবে বলছেন কেন পিসি। প্রান্তিককে ভোলা না ভোলা সে তো সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। আমি ভুলে গেলাম কি গেলাম না তাতে তো কারো কিছু যায় আসে না।

তাই বুঝি বেরিয়ে এসেছিস ঘর থেকে? তারপরে বললেন, সত্যি করে বলতো, পারবি হাসিমুখে প্রান্তিককে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে? এসব কথা থাক পিসি। কেন থাকবে কেন? তোর চাওয়ার ওপর তোর কোন অধিকার নেই? অধিকারতো এভাবে পাওয়া

যায় না। আমাকে তো বুঝতে হবে যে অধিকারের বড়াই আমি করছি, তার ওজন আছে কি না! মানে? আপনিও যদি মানে না বোঝেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই পিসি। তোরা সবাই বড্ড হেয়ালী কথা বলিস। আসলে তোরা সোজাসুজি কথা বলতে পারিস না তার কারণ, তোরা জানিসই না তোরা কি চাস? অশ্রুকণা বলল, আমি চাইলে পাব? পাওয়ার মত চাইলে, না পাওয়ার তো কোন কারণ নেই। মনে থাকবে পিসি। দেখব সত্যিকারের মনের জোর আমার আছে কি না?

অশ্রুকণার মনের জোর ছিল কি না জানি না, কিন্তু একদিন সে সত্যি সত্যি বলল, আমার ভিতরের সত্যটা তুমি কবে দেখতে পাবে প্রান্তিক? আমি চমকে উঠেও বললাম, আমার ভিতরের সত্য যেদিন আমি দিনের আলোর মত পরিস্কার দেখতে পাব। তার মানে? আসলে কি জান কণা, এত মানুষের সংস্পর্শে এসে তোমাদের এত ভালবাসা পেয়ে আমি নিজেই বুঝতে পারি না, সত্যি করে আমার ভিতরে কোন ভালবাসা আছে কি না। এ তোমার হেয়ালী, আসল কথাটা বল৷ আসল কথা তুমি জান না? কি? তারপরে অবশ্য বলল রেহানা ফিরে আসবে তোমার কাছে এই তো? ধর প্রান্তিক সে কোনদিন এলনা, এমন এক মুহূর্তে তুমি যদি নিজেকে বুঝতে পার, পারবো কি সেদিন তোমাকে কিছু দিতে? দিতেই হবে, এমনকি কোন কথা আছে।

অভিমানে ঠোঁট ফোলায় অশ্রুকণা বলে, আমি যে সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছি তোমার জন্য প্রান্তিক! এ তুমি ভুল করেছো কণা। যদি ভুলও করে থাকি, আমার যে ফেরার কোন পথ নেই। নীরবে একটা হাত তুলে নিয়ে বলে, বিশ্বাস কর, আজ যদি রেহানা থাকতো, আমি তোমার জীবন থেকে সরে যেতাম, কোন ভাবেই তোমাকে আমি বিব্রত করতাম না। আমি জানি, রেহানার জন্য তোমার কষ্টটা কত। আর সব চেয়ে বড় কষ্ট, এই ভাবে তার চলে যাওয়া। সামনে গঙ্গা বয়ে চলেছে, চটি খুলে পা দুটো জোয়ারের জলে ভিজিয়ে দিয়ে বললাম জানিনা, আজ রেহানার জন্য কোন কষ্ট হয় কি না। রেহানা যদি আমাকে বলে যেতো, অথবা রেহানা যদি বলতো, আমি যা বলেছি সব ভুল, তোমার জন্য রেহানার কোন দরদ নেই, হয়তো প্রথম প্রথম কষ্ট হতো কিন্তু তারপর এক সময় ঠিক হয়ে যেতো। মনকে সান্ত্বনা দিতম, রেহানা অন্তত দ্বিচারিতা করেনি।

রেহানা যদি অন্য কাউকে ভালবেসে চলে যেতো মনকে বোঝাতে পারতাম, নিজের জীবনের সুখ কিনে নেওয়ার অধিকার তার আছে, কিন্তু একি সে করল, আজ কতদিন হয়ে গেল না এলো সে, না এলো তার কোন সংবাদ।

অশ্রুকণা চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। একদিন তো তার হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমি সরে গিয়েছিলাম। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ কণা! কৃতজ্ঞ মানে? মানে কিছু নেই, কিন্তু সে কথা থাক। তোমাকে একটা কথা বলব কণা? বল। জীবনের মানে তুমি এই ভাবে খুঁজতে চেয়েছো কেন? কেমন ভাবে! এই যে ভাবে, নিজের জীবনকে তুমি তিল তিল করে ক্ষয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছ, ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছ, কি পাবে এর দ্বারা? যদি বুঝতাম কি পাব যদি লাভ লোকসানের হিসাব কষতাম, তাহলে হয়তো উত্তর

দিতে পারতাম। আমিতো লাভলোকসানের হিসাব নিয়ে তোমার কাছে আসতে চাইনি, আমি শুধু চেয়েছি, তোমার শূন্যতাকে বুঝতে! যে ভাবে বুঝতে চাইছো সে ভাবে কি পারবে বুঝতে? জানিনা পাবব কিনা, তবু তোমাকে বুঝতে চাইবো, রেহানার না ফেরা পর্য্যন্ত।, তারপর বলল, তোমাকে কথা দিচ্ছি প্রান্তিক. রেহানা যদি ফিরে আসে, বা তার খোঁজ পাই, তার হাতেই তোমাকে সঁপে দিয়ে আমি ফিবে যাবো। কোথায়? তাতো জানিনা, তবে তোমায় বিড়ম্বনায় ফেলব না, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিচ্ছি। জীবনকে কি তুমি খেলার পুতুল মনে কর কণা? জীবনতো খেলারই পুতুল। না এ তোমার ভুল, ইচ্ছে হলেই খেলার পুতুল ভেঙে দেওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি জীবনকে ভেঙে দেওয়া যায়? যায় না। তাই তোমাকে বার বার বলছি, এই ভাবে জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল না কণা।

গভীর অভিমানে হৃদয়টা ওর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, আর তারই ফলে বুকের ওঠানামাটা সাগরের তরঙ্গমালার মত এই ভাসছে এই ডুবছে। হয়তো আমি হারিয়ে যাব ঐ তরঙ্গ মালায়। ভয় হচ্ছে এখনি বুঝি ডুবে যাব আমি। বললাম, দেখ সূর্য ডুবে গেছে, এখনি গভীর আঁধার নেমে আসবে এই গঙ্গার বুকে, সেই অন্ধকারে হয়তো পথ খুঁজে পাবো না, চল ওঠা যাক। ও বলল, হারিয়ে যেতে তোমার খুব ভয় তাই না? তোমার ভয় নেই? না। কেন ভয় থাকবে, আমিতো হারাতে চাই। একবার শুধু একবারের জন্য আমাকে হারাতে সাহায্য করো। কণা। বল। এ ভাবে আমায় দুর্বল করে দিওনা! আমাকে সাহস দাও, বাঁচতে দাও নিঃশ্বাস নিয়ে।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠল ও, না। তোমার মনের জঙ্গলে এমন কোন গহন অন্ধকার নেই, যেখানে হারিয়ে গেলে আর পথ খুঁজে পাবনা, তার থেকে চল ওঠা যাক। চল। আমরা উঠে এলাম গঙ্গার ঘাট থেকে।

হাঁটতে লাগলাম গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ভিক্টোরিয়ার সামনে এসে যখন থামলাম, সামনে এসে দাঁড়ালো এক ফুলওয়ালী। ফুল নেবেন না বাবু? অশ্রুকণা তাঁকালো আমার দিকে, তারপর ফুলওয়ালীকে বলল, কি হবে ফুল দিয়ে? আমি ওকে বাধা দিয়ে ফুলওয়ালীকে বললাম, মালা নেই, যুঁই ফুলের মালা! না বাবু শেষ হয়ে গেছে। তাহলে কি আছে? ভালো গোলাপ আছে নেবেন বাবু? অশ্রুকণা বলল, তুমি চল প্রান্তিক, রাত হয়ে যাচ্ছে। বললাম দাঁড়াওনা। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে বললাম, তোমার গোলাপ কত করে? বলল, এক টাকা ডজন। বেশ এক ডজন দাও। আমি গোলাপ নিয়ে ফিরে এলাম অশ্রুকণার কাছে। বললাম, আমার কাছে এসোতো। কেন? কেন আবার কি, যেখানে যা শোভা পায় তাকেতো সেখানে রাখতে হবে। ও বাধা দিয়ে বলল, না প্রান্তিক, এ ভাবে সাজতে আমার ভাল লাগেনা। ভাল লাগেনা? না, একদম ভালো লাগেনা। আমারও ভাল লাগেনা, বলে, সমস্ত ফুলগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলাম রাস্তার চারিদিকে! আমার ঐ কাণ্ড দেখে ও অবাক হয়ে বলল, এ তুমি কি করলে প্রান্তিক! যা করা উচিত তাই করেছি, তারপর একটা চলতি ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে উঠে পড়লাম, সোজা মিনতি সেনের বাড়ী। পথে একটিও কথা বলিনি ওর সাথে। ও-ও বলেনি। মিনতি সেনকে

বললাম, মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে গেলাম। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অনেক কষ্টে খুঁজে এনে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলাম। দেখ, আবার যেন পথ হারিয়ে না ফেলে, বলে আর কোন অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মিনতি সেন ডাকলেন প্রান্তিক শোন! বল? অনেক দিন আসিস না, একটু বোস না, কতদিন তোকে দেখিনা! আজ না মা, ভীষণ তাড়া আছে, কাল আসব।

পরের দিন অশ্রুকণা বলল, আপনার ছেলে আসবে, আমি থাকলে ওর অস্বস্তি হবে, আমি বরং ঘুরে আসি। কোথায় যাবি? দেখি অনুতপা বাড়ী আছে কি না যদি না থাকে, তাহলে ন্যাশানাল লাইব্রেরী থেকে ঘুরে আসব। অনেকদিন লাইব্রেরীতে যাওয়া হয় না। মিনতি সেন বললেন তুই চাস না, ও আসুক আমার কাছে? পিসি! কণ্ঠে ওর অনুতাপের ছোঁয়া। আমি কি তাই বলেছি? না তা বলিসনি, কিন্তু বলতো অশ্রু, সেই কবে কি এক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে চলে গেল, আর এলো না, এর মাঝে কি ভাবে তোর সাথে দেখা হয়েছে, আর কোথায় হারিয়ে গিয়ে ছিলি কিছুই জানিনা। কতদিন পরে এলোও যেমন বেরিয়েও গেল তেমনি ঝড়ের মত। যদি বা বলল আজ আসবে, তুই পালাতে চাইছিস। তার মানে আর কোনদিন হয়তো আসবে না। তুই কি চাস ও যেন না আসে?

অশ্রুকণা বোকা নয়, এ আঘাত যে কত বড় তা সে বোঝে। আবার এও বোঝে, মিনতি সেনের মাতৃত্বের হাহাকার। সত্যিই তো। আমি আমার খেয়ালে নিজের ভাগ্যকে এখানে নিয়ে এসেছি। এ দোষ আমার। মিনতি সেন আমাকে থাকতে দিয়েছেন, তাই বলে প্রতিদানে আমি তার সব কিছু কেড়ে নেবো এ হয় না। বললাম, না পিসি আমি সেভাবে বলিনি। দেখলেন না কেমন ব্যবহার করে চলে গেল। আজও যদি আবার আমাকে দেখে এমনি ভাবে চলে যায়। নিজেকে ক্ষমা করব কি করে? তাই বলছিলাম, তাকে থামিয়ে দিয়ে মিনতি সেন বললেন, থাক তোকে আর বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলব। বরং আজকের রান্নাটা তুই করনা মা! আমি? কেন পারবি না? কোনদিন তো করিনি। নাইবা করলি, আজকেই না হয় হাতে খড়ি হোক।

আমি এলাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার ঠিক আগে। সেলিনার বায়না, সেও আসবে আমার সঙ্গে পিসি বললেন ও যখন যেতে চাইছে, তখন ওকে নিয়ে যাও প্রান্তিক। আমি খুব একটা না করতে পারলাম না। রাস্তায় বেরিয়ে ও বলল, আমাকে নিয়ে যেতে তোমার আপত্তি আছে? কতদিন দেখিনা পিসিকে। অশ্রুদির সঙ্গে দেখা হয় না অনেক দিন। তাইতো আসতে এত জোর করলাম। আমি বললাম, তোমার যখন ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে, তুমিতো এক দিন নিজেও যেতে পারতে। তা হলে ফিরে যাই! হ্যাঁ তাতো যাবেই, তা না হলে আর আমাকে অপমান করার ষোলকলা পূর্ণ হবে কেন? সব ব্যাপারে তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? আমি গেলে সত্যিই কি তোমার কোন অসুবিধা হবে? তুমি কি বলতে চাইছো, বলত? আমি যা বলতে চাইছি তাতো তোমার না বোঝার কথা নয়। অশ্রুদি কি আমায় তোমার সাথে দেখলে অস্বস্তি বোধ করবেন? ভীষণ রাগ হয়ে গেল ওর উপর, বললাম, সেলিনা, ভুলে যাচ্ছ কেন, আগে তোমার যাই পরিচিতি থাকুকনা কেন, এখন তুমি নীলাঞ্জনা

পিসির মেয়ে, আর তিনি আমার পিসি। এতটা রেগে যাব বোধ হয় ভাবতে পারেনি সেলিনা। বলল, জানি, আর এও জানি, তুমি তা মানতে চাওনা। মানে? মানে তোমাকে তুমি নিজেই জিজ্ঞাসা কর।

বুঝতে পারছি সেলিনা সেদিন রাতের সেই আবেগ দুর্বলতার কথার দিকে ইঙ্গিত করছে। আমরা যখন শিয়ালদা স্টেশানে এসেছি একটা ফুলের দোকানে এসে থেমে গেল সেলিনা। বলল, দেখ কি অপূর্ব যুঁই ফুলের মালা, কিনব? তোমার পছন্দ? ভীষণ! আচ্ছা কেন তাহলে! কোন মালাটা কিনবো! যেটা তোমার পছন্দ! তোমার পছন্দ নেই? আমার একটাও পছন্দ নয়। দোকানদার বলল, সে কি বাবু এত সুন্দর সুন্দর মালা আপনার পছন্দ নয়? সেলিনা বলল থাক কিনতে হবে না! কেন? তোমার পছন্দ কোনটা বল না? আমারও পছন্দ নয় একটাও। চল, এখানে দেরি না করলে আগের ট্রেনটা পেয়ে যাব। আমি বললাম, বিনা কারণে রাগ করছ সেলিনা। ঠিক আছে আমিই পছন্দ করছি। তারপর ভালো দেখে একটা মালা পছন্দ করলাম, আমি দাম দিতে যাব, সেলিনা বলল, একটা নয় প্রান্তিক ভাই দুটো কেনো। কেন দুটো দিয়ে কি করবে। কেনই না। অবশেষে দরদাম করে দুটো মালা কিনলাম, ভালো করে প্যাকেট করে ওর হাতে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, রাতে কাউকে পরাবে বুঝি! লজ্জায় ওর কান লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, দেখি যদি কেউ আসে। মালার প্যাকেটটা সেলিনা, তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। ভিড়ের মধ্যে চাপা পড়ে ও আমার কাছ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, আমি বললাম, স্টেশনে ঢোকার আগেই নেমে পড়ার জন্য এগিয়ে এস, ও বলল আচ্ছা।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে যখন আমরা নামলাম, সে প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ভিড়ের চাপে ওর শাড়ীর ভাঁজ কুচকে একাকার। কপালের টিপ যে কার হাতের ঘসায় কোথায় চলে গেছে কে জানে! আঁচলের নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেলিনার ব্লাউজের উপরের বোতামটা খুলে গেছে কখন। সে দিকে ওর খেয়াল নেই। নামতে যে পেরেছে এইটাই যথেষ্ট। আমি দেখেও কিছু বলতে পারছি না।

কোন ভাবে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে রিক্সায় উঠলাম। ও বলল এইটুকু রাস্তাতো হেঁটেই যেতে পারতাম। হ্যাঁ, তা পারতাম। কিন্তু ধাক্কাধাক্কিতে এত ক্লান্তি লাগছে যে আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। ও প্রতিবাদ করে বলল তার থেকে বল না আমার সঙ্গে হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আমি বললাম দুটোই সত্য। ও রেগে গিয়ে বলল, তা হলে তুমি রিক্সায় যাও, আমি হেঁটে যাচ্ছি। আমি বললাম সেই ভাল. তবে হেঁটে যাওয়ার আগে ভিড়ে কোঁচকানো শাড়ীর আঁচলটা ঠিক করে নিও, পথচারীদের দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। কথার পিঠে কথা বলা ওর স্বভাব। বলল, তোমার দৃষ্টিকটু না লাগলেই হলো। মুখে যাই বলুকনা কেন, দৃষ্টি কিন্তু ফিরালো বুকের আঁচলের দিকে। আর নিজের অবস্থা যে সে বুঝতে পারেনি এর জন্য ওর নিজের পরে রাগে চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করতে লাগল। কিন্তু বোতামটাই যে ছিঁড়ে গেছে। কি করবে। শাড়ীর আঁচলটাই যথা সম্ভব বুকের পরে ভাজ দিয়ে দিল, আর

নিজের চোখ দুটি রাখল পায়ের দিকে আলতো করে। বললাম, তাহলে রিক্সায় যাবে না হেঁটে যাবে। ও আমার কোন উত্তর না দিয়ে রিক্সায়ালাকে তাড়া দিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি কর ভাই।

মিনতি সেনের বাড়ী এসে, ব্যাগটা কোন ভাবে টেবিলের ওপর রেখে ও বাথরুমে ঢুকে গেল। মিনতি সেন বললেন, কি হল প্রান্তিক, ওর শরীর খারাপ নয়তো। কখন বেরিয়েছিস? এইতো ঘন্টা দেড়েক আগে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সেলিনা। মিনতি সেনকে প্রণাম করে বলল, কেমন আছ পিসি? ভাল। তোর মা কেমন আছে? ভালো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল অশ্রুদিকে দেখছিনা, অশ্রুদি কোথায়? মিনতি সেন বললেন রান্না ঘরে, যানা ওর কাছে? এই যাই বলে নিজের ব্যাগটা নিয়েই ও রান্নাঘরে ঢুকে গেল, পিছন থেকে অশ্রুকণার চোখ বন্ধ করে বলল, বলতো আমি কে? হঠাৎ না বলে কয়ে চোখ বন্ধ করাতে ও চমকে ওঠে, তারপর গলার স্বরে চিনতে পেরে বলে, রান্না করতে করতে যার কথা ভাবছিলাম, তুমি সেই এবার ছাড়তো মেয়ে! অশ্রুকণার চোখ ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো সেলিনা, বলল মিথ্যে কথা অশ্রুদি, তুমি আমার কথা একবারের জন্যও ভাবোনি। অশ্রুকণা আঁচটা কমিয়ে দিয়ে ওর দিকে ফিরে বলল, ভাবিনি মানে, বিশ্বাস কর, প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথাই ভেবেছি, তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যার জন্য সেলিনার পক্ষে অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না। বলল তোমার কথা বিশ্বাস করছি অশ্রুদি। কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন? কি হয়েছে তোমার! না কিছু হয়নিতো। তারপর আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভিতরের ঘরে যাও সেলিনা, আমার হয়ে গেয়ে প্রায়। হোক এক সঙ্গেই যাব। বাঃ তুমি এসেই রান্নাঘরে ঢুকলে ওরা কি ভাববে? কেউ কিছু ভাববে না। তাছাড়া পিসি তো আমাকে তোমার কাছেই পাঠালেন। তারপর বলল তুমি যাও সেলিনা, আমি আসছি। আমি থাকলে তোমার রান্নায় অসুবিধা হবে, না? তোমার রান্নার নিয়ম কানুন শিখে ফেলি কি না তার জন্য তাড়াতে চাও। অশ্রুকণা হেসে ফেলে বলে, না ভাই তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। পেরে কাজও নেই অশ্রুদি, জীবনে তো আর আমার সঙ্গে ঘর করবেনা যে আমার সঙ্গে পারতে হবে। কিন্তু যার সঙ্গে ঘর করবে বলে সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছো তার সঙ্গে পারবে তো। চোখে দুষ্টু হাসি ঝিলিক মেরে যায় সেলিনার। কিন্তু সেলিনার এই ঠাট্টাও অশ্রুকণার মনে কোন নাড়া দেয় না। সে চুপ করে থেকে রান্না করতে লাগল। সেলিনা বলল কি হল অশ্রুদি, তোমার মনের মানুষকে নিয়ে অন্যদের ঠাট্টার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চাও নাকি! অশ্রুকণা আবারও আঁচটা কামিয়ে দিয়ে সেলিনার দিকে ফিরে বলল, কেন এরকম অসম্ভব ঠাট্টা কর সেলিনা। কার জন্য আমি ঘর ছেড়ে এসেছি, কে আমার মনের মানুষ। অশ্রুকণার এই হঠাৎ প্রতিবাদে অবাক হয়ে যায় সেলিনা। বলে, আমি জানিনা অশ্রুদি এতদিনে তোমার মনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। আমি জানিনা, সত্যি তুমি কেন চলে এসেছো। না জেনে তোমায় যদি সত্যি আঘাত দিয়ে থাকি, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। অশ্রুকণা ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, ছিঃ সেলিনা, তুমি তো সত্যি কিছুই জান

না। বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, উনুনের আঁচটা বাড়িয়ে রান্নায় মনসংযোগ করে অশ্রুকণা। সেলিনা বলল একটা কথা বলব অশ্রুদি? বল। কি হয়েছে তোমার? না কিছুই হয়নি তো। কিছুই যদি না হবে, তা হলে আজকের তুমি আর সেদিনের তুমির মধ্যে এত ফারাক কেন? সেতো সেলিনা, তোমার মধ্যেও সে ফারাক রয়েছে। হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে নিশ্চই কারণ আছে? কি কারণ। সব থেকে বড় কারণ অশ্রুদি, রেহানার ঐ ভাবে চলে যাওয়া। আমার মায়ের মৃত্যু, এবং তারপর তার ইচ্ছেনুসারে আমার নিজের মতামতকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া। শুধু এই, আর কিছু নেই? সেলিনা বলল, জানিনা আর কিছু বলতে তুমি কি মীন করছ। তবে বয়সের সাথে সাথেতো অনেক কিছু পরিবর্তন হয় অশ্রুদি। একদিন হয়ত মনে হতো আমার আচরণে কোন দোষ নেই, কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন প্রতিটি আচরণকে মেপে চলতে হয়, পাছে লোকে কিছু ভাবে। যাকগে সে কথা, তোমার আর কত দেরি। হয়ে গেছে তুমি একটা কাজ কর সেলিনা, কফিটা হয়ে গেছে পিসি ও প্রান্তিককে দিয়ে এসো না। বাঃ শুধু ওদের জন্য কফি হবে, আর আমাদের হবে না? তুমি আর আমি এখানে বসেই খাবো। ওদের মা-ছেলের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা, মান-অভিমান ছাড়াও নিজেদের কত কথাই থাকতে পারে। কি দরকার তার ব্যঘাত ঘটিয়ে। কি জানি কি ভাবল সেলিনা। বলল, এতো তোমার স্বাভাবিক কথা নয় অশ্রুদি, কি হয়েছে আমায় বলবে না? জানিনা তোমার কোন উপকার করতে পারবো কি না, কিন্তু আমি আমার সহানুভূতিতো জানাতে পারবো। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে অশ্রুকণা বলল, থাক ওসব কথা। আমার ভাগ্যের জন্য তো আমি দায়ী, তাকে তো কেউ গ'ড়ে দিতে পারবে না। এরপর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, রেহানার কোন সংবাদ পেলে? অবাক হয়ে সেলিনা বলল, রেহানার সংবাদ পেলে তুমি তা জানবে না, এ আবার কবে থেকে ভাবতে আরম্ভ করলে অশ্রুদি! তারপর নিজেই বলল, প্রান্তিক ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? বিষয়টাকে হালকা করার জন্য বলল ঝগড়া হলে আনকোরা হাতে রান্না করতাম না। সেলিনা বলল, ঝগড়ার সঙ্গে রান্নার কোন সম্পর্ক নেই, আর রান্নাতো তুমি নিজের ইচ্ছেয় করছ না, পিসির শরীর খারাপ আর জবার মা আসেনি তাই। কি জানি, বলে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সেলিনাকে তাড়া লাগিয়ে বলল যাও সেলিনা এটা দিয়ে এস না। দাও বলে সেলিনা কফি এবং তার সঙ্গে টিফিন খাওয়ার জন্য অশ্রুকণা যা তৈরি করেছে তাই নিয়ে মিনতি সেনের ঘরে আসে। ঐ ঘরে বসেই তখন আমি মিনতি সেনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মিনতি সেনের শেষ কথা শুনে ফেলে সেলিনা। মিনতি সেন বলছিলেন, তাহলে ঐ কথা রইল প্রান্তিক, তুই কাল একবার যাবি ওখানে। কাগজে ওরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি কি, বিজ্ঞাপন কি লোক দেখানো না সত্যিকারের ভালো ছেলে মেয়েদের ওরা মেধার ভিত্তিতে নিতে চায় ঠিকই তবে একটু বাজিয়ে। আমি বললাম, কিন্তু তোমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করে কি বলব? কিছু বলতে হবে না। মানে? মানে তোর ভয় নেই, যে পরিচয় তুই আমাকে দিলি, তাতে তোকে তুই নিজে জিজ্ঞাসা না করলে, কোন কিছু বলবে না। আমি বললাম এই যে দেখা হওয়ার পরেও তোমার কথা যদি কিছু জানতে না চান, তোমার কষ্ট হবে না মা! পাগল ছেলের কথা দেখ।

আমিতো মা! এক তুই যদি কষ্ট না দিস তাহলে আমার কিসের কষ্ট? আর তা ছাড়া যার কথা তুই বলছিস, সেতো তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আমার অহংকারকে, মর্য্যাদা জানিয়েছেন আমার মাতৃত্বকে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিমুহূর্তে পাশে থাকার। একটি মেয়ের কাছে এর থেকে তো আর বেশী কিছু পাওয়ার নেই। আমি তবু বললাম, সব জেনেও জানতে চাইছি এতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না? পাগল ছেলে কোথাকার। এরপর আমাকে তার কোলের পরে টেনে নিয়ে বললেন, তুই শুধু আমায় কোন আঘাত দিসনা, আমি কষ্ট পেতে পারি এমন কিছু করিসনে। তাহলে কোন কষ্টই আমার কাছে কষ্ট বলে মনে হবে না।

ঠিক সেই সময় সেলিনা কফি নিয়ে এসে দাঁড়ালো সামনে, বলল, মা ছেলের কথায় ব্যাঘাত ঘটালাম নাতো! আমাকে ছেড়ে দিয়ে মিনতি সেন বললেন, তুই আমার মেয়ে না? অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, সে আর হতে পারলাম কই পিসি, আপনি বুড়ো খোকাকে আদর করছেন, আর আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। কফির সরঞ্জাম সামনের টেবিলে রাখল সেলিনা, মিনতি সেন তখনো খাটে বসে আছেন, সেলিনা ওগুলো রাখা মাত্র সেলিনাকে টেনে নিয়ে তার কপালে পরপর কয়েকটি চুমু খেয়ে বললেন, রাগ পড়েছে মেয়ের? আমি কেন রাগতে যাব, ঐ দেখুন না আপনার ছেলে আমাকে আদর করছেন বলে কেমন বড় বড় করে তাকাচ্ছে, বলে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত পালিয়ে গেল।

অশ্রুকণা তখনো অপেক্ষা করছে সেলিনার জন্য। আসার পরে নিজেরা কফি খেয়ে নিয়ে সেলিনাকে বলল, মাংসটা তুমি রান্না কর না সেলিনা। আমি? হ্যাঁ তুমি, দেখ আমি কোনদিন রান্না করিনি। ভেবেছিলাম পিসি বুঝি দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু একবারও রান্না ঘরে আসেন নি। আমি কয়েকবার জিজ্ঞাস করাতে বললেন, তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর। মেয়েরা নাকি জন্মের পরদিন থেকেই রান্না করতে পারে। বাজে কথা সবই শিখতে হয়। অশ্রুকণা বলল, তা হলে তুমি এই মাংসটা রান্না করতে আমায় সাহায্য কর।

হঠাৎ বুঝি মিনতি সেনের খেয়াল হয় সেই যে অশ্রুকণা রান্না ঘরে ঢুকেছে একবারও বাইরে আসেনি। ওতো বলেছিল কোনদিনই রান্না করেনি। আমিই ওকে সাহায্য করব বলেছিলাম, অথচ আমি একবারও রান্না ঘরে না গিয়ে বলেছি যা পারিস তাই কর। কি জানি কি করছে খাওয়ার মত হবে তো।

সেলিনা তখন মাংসের হাঁড়িটাতে সব কিছু, পরিমান মত দিয়ে চাপাতে যাচ্ছে মিনতি সেন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তুইতো আর কিছু বললি না, অথচ বললি রান্না করতে জানিস না। হঠাৎ অশ্রুর মনে হল সে একেবারে অপাংক্তেয় এবাড়ীতে। কাজের লোক ছাড়া যেন কিছুই নয়। বহু কষ্টে অদম্য কান্নাকে চাপা দিয়ে বলল, আপনি ব্যস্ত ছিলেন, তাই আর কি। মেয়েদের রান্না না জানাটা যে কত কষ্টের আগে বুঝতে পারিনি, মাংসটা তাই সেলিনাকেই করতে বলেছি।

অশ্রুকণা যে কথাটা বলতে পারেনি, সেই অব্যক্ততা যেন আঘাত করল মিনতি সেনকে। বললেন, যা অশ্রু, এবার বাথরুমে গিয়ে হাতেমুখে সাবান দিয়ে পরিস্কার হয়ে

নে। তুইও যা সেলিনা। রাত হয়ে যাচ্ছে তোদের তো আবার যেতে হবে। সেলিনা কোন ভাবে চোখে মুখে সাবান দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু অশ্রু কণার সমস্ত শরীর যেন ব্যথায় টনটন করছে। কি জানি কেন যে তার এত অপমান লাগছে সে নিজেই বুঝতে পারছেনা। তবে একথা ঠিক যে সে সেলিনার আসার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। না সেলিনাকে সে এই মুহূর্ত্তে মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেনা।

প্রথমে ভেবেছিল ভাল করে হাতে মুখে সাবান দিয়ে বেরিযে আসবে, কিন্তু অবশেষে পূর্ণ স্নানই সে করল। ঘরে এসে সব থেকে কম দামের আটপৌরে শাডীটা পরে নিল। মাথায় কোন ভাবে চিরুনি বুলিয়ে হাত দিয়ে আধো খোঁপার মত চুলটা বেঁধে নিল। মুখটা সাবান দেওয়ার জন্য খস্ খস্ করাতে ক্রিম বুলিয়ে নিল। সব সময় যে সরু চেনটা পরে থাকে, তা কি খেয়াল হতে খুলে ফেলে হাল্কা একটা কিছু পরে নিল। তারপর এল সে সেই ঘরে যেখানে ওরা সবাই আছে একসঙ্গে। ওকে দেখে চমকে উঠে সেলিনা বলল অশ্রুদি? অশ্রুকণা ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রান্তিককে বলল, অনেকক্ষণ এসেছো, তোমাদের কাছে আসতে পারিনি বলে কিছু মনে করো না। আসলে জবার মা আজ কয়েকদিন ধরে আসছেনা তো, তাই পিসির অনুরোধে ওর কাজটা আজ আমাকেই করতে হল, আর সেদিন তুমি কথাচ্ছলে বলেছিলেনা, যাকে যে কাজ মানায়, তাকে সে কাজই করা উচিত, আর তার পোষাকটাও সেই রকমই হওয়া উচিত না হলে সামঞ্জস্য থাকে না। অবশ্য কথাটা তোমার নিজের ক্ষেত্রেই তুমি বলেছিলে, কিন্তু আরো বলেছিলে তুমি বিশ্বাস কর, তোমার এ মতটা সার্বজনীন। আমিও তাই কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করেছি। এতেও যদি ভুল হয়, বলে দিও ভবিষ্যতে আবার কোনদিন এরকম অবস্থায় সম্মুখীন হতে হলে যাতে অস্বস্তিতে পড়তে না হয়।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, বলে কি অশ্রুকণা। ওকি অপমান করতে চাইছে? আমার এবং মিনতি সেনের ভাবনাটা অন্তত সে রকম কিছু। ওর অভিমানটাকে বুঝি, বুঝতে পারে সেলিনাও। সে উঠে এসে অশ্রুকণাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় যে ঘরে আপাতত থাকে ও। বলে, অশ্রুদি আমাকে একটা সত্যি কথা বলতো, আমি তোমার ছোট বোনের মতন, কি হয়েছে তোমার? মিনতি পিসি বা প্রান্তিক ভাই তোমাকে কি কোন অপমান করেছেন? কি ভাবে যে কান্না দমন করছে অশ্রুকণা, তা দৃষ্টি এড়ায়না সেলিনার। বলে, দুঃখকে এভাবে চেপে রেখোনা অশ্রুদি, তাতে আরো বেশী কষ্ট পাবে। বলনা কি হয়েছে? অশ্রুকণা বলে কিছু হয়নি সেলিনা, তোমাদের তো যেতে হবে, চল ও ঘরে। যাব, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে কি হয়েছে তোমার? কার বিরুদ্ধে তুমি প্রতিবাদ জানাচ্ছ? অশ্রুকণা বলে প্রতিবাদ জানাবার জন্য অধিকার থাকা চাই, যাদের উপর সে অধিকার ছিল প্রতিবাদ করে তাদের কাছ থেকে চলে এসেছি, এবারতো আর প্রতিবাদ করা চলে না ভাই। নিজের পায়ের নীচের মাটি আগে খুঁজে নিতে হবে, যতদিন তা না পাচ্ছি ততদিন আমিতো একটা পরগাছা মাত্র। পরগাছার আবার অধিকার? যাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের পরে তারতো কোন স্বপ্ন থাকতে নেই, নেই কিছু পাওয়ার আশা করতে। যতদিন বাবা-মায়ের

কাছে ছিলাম, ততদিন বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন ভালো করে বুঝতে পেরেছি আমার মূল্য কতটুকু। তাই থাক এসব কথা সেলিনা, দেরি হয়ে যাবে তোমাদের। হোক দেরি, তবু তুমি বল অশ্রুদি। বলতে পারলে দেখবে অনেক হাল্কা লাগছে। অশ্রুকণা বলে, না আর কিছু বলার নেই। নতুন পথে চলতে চলতে যদি নতুন সত্যের কিছু সন্ধান পাই, আর কাউকে না জানালেও তোমাকে জানাব সেলিনা। সেলিনা বলে তুমি কি এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? দেখি, সেদিন যখন এসেছিলাম, কেন এসেছিলাম জানতাম না। আবার যখন চলে যাব, কেন চলে যাব, তাও হয়তো বলতে পারবো না, তবু যেতে হবে। কেন? না হলে মা ও ছেলের বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, আমি কি তা চাইতে পারি? যার পর নাই বিস্মিত হয়ে সেলিনা বলল, কি বলছ অশ্রুদি। যা ঠিক তাই বলছি, তা না হলে তুমিতো জান আমি আজ কতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি, অথচ প্রান্তিক সেই যেদিন প্রথম এসেছিলাম সেদিনের পরে আর একদিনও আসেনি। কাল আমি ওর সঙ্গে নিজেই দেখা করেছিলাম, হয়তো রাত হয়ে যাওয়াতে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে পিসিকে বলল, তোমার মেয়েকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলাম। অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দেখ আবার যেন হারিয়ে না যায়। সে যে কি তীব্র অপমান তুমি হয়তো বুঝবেনা। অশ্রুকণা বলে চলে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, পিসি বার বার বলল, কতদিন আসিস না, একটুখানি বসে যা প্রান্তিক। বলল, আজ না কাল। সেই কাল আজ সেলিনা। থাকতে চাইনি। দাঁড়াতে চাইনি প্রান্তিকের সামনে, আবার কি অপমান করবে কে জানে। কিন্তু পিসির অনুরোধে থেকে যেতে হল শুধু নয়, যে রান্না জানিনা, কোনদিনই করিনি, তারই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। কোন দুঃখ ছিল না সেলিনা যদি প্রান্তিক অপমান না করতো। কি দরকার ছিল, তারই পয়সায় কেনা, তার প্রিয় ফুলগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়ার? আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না এই তো। বলতে পারতো সে কথা। বা একথাও বলতে পারতো যে, এ বাড়ীতে তার একটা পূর্ণ অধিকার আছে। আমার জন্য সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন? আর আমিই বা তাকে বঞ্চিত করব কোন অধিকারে? না সেলিনা পারবো না। একদিন তোমাকে বলেছিলাম তোমার মনে আছে কি না জানিনা, ওই অতি সাধারণ ছেলে কি অসাধারণ চৌম্বক আকর্ষণে যে আমাকে টানে, তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু না, ওর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কোনদিনই আমার দুর্বলতার কাছে সে ধরা দেয়নি। তাইতো ওকে রেহানার হাতে সঁপে দিতে ভিতরটা কাঁপেনি। রেহানার অবর্তমানে আমার ভিতর জন্ম নিল যে নতুন স্বপ্ন, তা হয়তো স্বপ্নই থেকে যেতো, যদি না মিনতি পিসি, আমাকে, জোর বা দাবীর কথা অমন করে মনে না করাতেন। মা হয়েও মিনতি পিসি জানেন না প্রান্তিক কি চায়? অপমানটা আমার সেখানেই বেশী করে বাজছে। রেহানাকে জানি, কোনদিনই সে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেনা, অথচ না চেয়েও হৃদয় তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। আর আমি কানা গলিতে হোঁচট খেলাম বার বার হোঁচট। একটা মেয়ে হয়েও, এই যে অপমান, আজ না বুঝলেও একদিন তুমি বুঝবে সেলিনা, কারণ আমি জানি, রেহানার থেকেও অনেক অনেক বেশী ভালবাস তুমি প্রান্তিককে। রেহানা যেখানে

ভালবেসে একা পথে নামতে পারে তার ভালবাসার কি হবে এটা না জেনেও, তুমি তা পারবে না সেলিনা। তুমি উদ্দেশ্যহীন পথে ভেসে গিয়ে আরেক জনের কি হবে তানিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। তোমার ভালবাসার বর্মে তুমি তাকে ঢেকে রাখতে চাইবে। কোন ভাবেই তুমি পারবে না তোমার ঈপ্সিতকে অন্যের হাতে তুলে দিতে। তোমাকে যতটুকু বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে তুমি ভালবাসবে, ঝগড়া করবে, অভিমান করবে, কথা বন্ধ করে দেবে, কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারবেনা। তোমার প্রলম্বিত ছায়ার নীচে একদিন তাকে আসতেই হবে, এই বিশ্বাসে তোমার পথ চলা। তুমি রেহানা নও, তাই পথেই তুমি ঠিকানা খুজে নিতে চাও না, তুমি চাও পথ চলা যেন শেষ হয়, তোমার হৃদয় মন্দিরে এসে। তাকে ফেরাতে প্রয়োজন হলে তুমি আঘাত দেবে, চরম অভিমানে তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রতীক্ষায় থাকবে এই বুঝি এলো সে। হঠাৎ সে আসতে পারে, এই বিশ্বাসে, খোলা রাখবে তোমার দরজা, খুলে দেবে দখিন ও পূবের জানালা, একটা দিয়ে ঢুকবে ভোরের বাতাস, আরেকটায় লাল সূর্যের আভা।

আমি রেহানা হতে পারবো না, যে গভীর ভালবাসায় সে পথে নামতে পারে তা আমার নেই, আবার তোমার বিশ্বাসও আমার মধ্যে নেই। আমি প্রতিমুহূর্তে চেয়েছি প্রতিদান, মিথ্যে হোক, তবু যদি একবারও ও বলতো কণা আমি তোমায় সত্যিই ভালবাসি, সব অভিমান জল হয়ে আমি হয়তো নতুন স্বপ্নের আলোকে পথে নামতে পাবতাম। কিন্তু সেলিনা, আজ আমি নিঃস্ব, কিছু নেই আমার। তবু আমি হারতে চাই না, একদিন না একদিন আমার জয় আসবেই, আর সেদিন হয়তো তোমাদের কথাই মনে পড়বে ভীষণ ভাবে। রেহানা, তুমি, প্রান্তিক, তোমাদের আবার নতুন করে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবো। একটু থামলো অশ্রুকণা, তারপর বলল, এত কথা বলার অন্য কোন কারণ নেই সেলিনা, কারণ আমার প্রতি মুহূর্তের ভয় তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো। তাই তোমার ছাড়পত্র আগে থেকেই আদায় করে নিতে চাই।

এতক্ষণ ধৈর্য্যের সঙ্গে সেলিনা শোনে অশ্রুকণার ক্ষোভ অভিমান, রাগ আর তার ক্ষত-বিক্ষত জীবন কাহিনী। কি উত্তর দেবে সে। যা সে বলেছে তার সম্পর্কে, কোন দিন সেলিনা ভেবে দেখেনি, তা কতটা সত্য, কতটা কল্পনা। কিন্তু তাই বলে প্রান্তিকের সঙ্গে কথা না বলে, কোন ভাবেই অশ্রুকণার যাওয়া হতে পারে না। তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাধা সে দেবেই। ধীর ধীরে বলল, তোমার সব কথাই শুনলাম অশ্রুদি, অংকের মত হিসাব করে ভালবাসার নিক্তিতে মেপেছো জীবনের দেনা পাওনা। ওভাবে জীবনের অংক মেলেনা অশ্রুদি। আর পরগাছার কথা বলেছো। জানিনা কেন এই ভয়ংকর শব্দ তোমার মুখে উচ্চারিত হল। বুঝতে পারছি আঘাতের তীব্রতা তোমায় কোথায় নিয়ে পৌছে দিয়েছে। তবুও অশ্রুদি তোমায় বলব, ছোট খাট ২/১টা ঘটনা দিয়ে জীবনের বিচার করোনা, অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধর। নিজেকে জানার চেষ্টা করো সবার আগে। ভাব কি চাও তুমি, তারপর না হয় নতুন ঠিকানার খোঁজ কর। এখন চল। সত্যিই রাত হয়ে যাচ্ছে, মা চিন্তা করবেন।

নিজের আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে অশ্রুকণা বলল, বেশ চলো। ভেজানো দরজা

খুলে বাইরে বেরোতেই দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মিনতি সেন।

যখন বাড়ী ফিরে এসেছি তখন প্রায় রাত ১২টা, কলকাতার রাস্তায় পারত পক্ষে কোন বাস নেই। ট্যাক্সিতো নেইই। মিনতি সেন বার বার বলছিলেন আজ থেকে যা প্রান্তিক, আমি নীলাঞ্জনাকে যে কোন ভাবে সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এত রাত হবে বুঝতে পারলে হয়তো, আসতাম না, কে জানতো ওভার হেড তারে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য ট্রেন প্রায় দেড় ঘন্টা লেট করবে।

একেবারে ফাঁকা রাস্তা। বললাম মনে হচ্ছে হেটে যেতে হবে। সেলিনা বলল, তাই চল। দাঁড়াও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। অবশেষে বেশী পয়সার টোপ ফেলে একজন টানা রিক্সাওয়ালাকে ম্যানেজ করা গেল, তার দাবি অতরাতে ওতো আর এখানে ফিরতে পারবেনা, তাদের বারান্দায় বা অন্য কোথাও রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিলে সে যেতে রাজী। তাতেই রাজী হয়ে উঠে পড়লাম।

রিক্সায় আসতে আসতে ফেলে আসা অতীতকে নিয়ে ভাবছিলাম। অশ্রুকণা একটা কথাও বলেনি আমার সাথে। মিনতি সেনও কেমন যেন ব্যপারটিকে খুব ভালভাবে নেননি। অথচ অশ্রুকণারতো এই মুহূর্তে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ওকে নিয়ে কিছু একটা করতেই হবে। সেলিনা বলল, কি ভাবছো। বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে, ফাঁকা রাস্তা, শাড়ীর আঁচল গায়ে বেশী করে জড়িয়েও ও যে শীতে জড়সড় হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। বললাম, না এমন কিছু ভাবছিনা, শুধু নিজের অক্ষমতা নিয়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছে? তোমার তা হলে কষ্ট হয়? একথা বলছ কেন? না আমার মনে হতো তোমার স্থান এত উঁচুতে যে, তোমার কোন কষ্ট হতে নেই। ঠাট্টা করছ? পাগল তোমাকে ঠাট্টা করব? তারপর হয়তো দেখবো, পছন্দ করে যে মালা দুটো কিনেছো, তাই হয়তো টুকরো টুকরো করে এই পথেই ছড়িয়ে চলেছো।

সত্যি মনে ছিল না, যাওয়ার সময় দুটো সুন্দর যুঁই ফুলের মালা কিনে ছিলাম অবশ্য ও কিনতে বলেছিল তাই। ও নিয়ে ছোট্ট একটা ঠাট্টাও করেছিলাম কিন্তু তারপর ওটা আমার চিন্তায় আর আসেনি, কিন্তু সেটা আলাদা কথা, ও যে মালা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা বলেছে, এর পিছনে আছে নিশ্চয়ই অশ্রুকণার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তার ইঙ্গিৎ। তাই বললাম, আমি বুঝি পয়সা খরচ করে কিনে ছিলাম টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য? তা হয়তো কেনোনি, তবে কেন কিনেছিলে সেটা কি জান? আমি চুপ করে রইলাম। ও বলল হয়তো বলবে আমার ইচ্ছেয় তাইতো! কিন্তু প্রান্তিক ভাই, কাল যে গোলাপগুলো কিনেছিলে তা কিন্তু তোমার ইচ্ছেয় কিনেছিলে তবে তা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললে কেন? কেন বুঝলে না ওই অবস্থায় সবাইতো আর সেলিনা নয় এটা তোমার বোঝা উচিৎ ছিল। হয়তো একরাশ লজ্জা এসে ফুলের সাজে সাজতে তাকে বাধা দিয়েছিল বলেই সেটা সে চায় নি? পারতে না, অন্য কোন অবকাশে যা তুমি চাইছিলে সেই ভাবে সাজিয়ে দিতে তাকে? তাতে কি তোমার খুব কষ্ট হতো? তুমি যে এভাবে কাউকে সাজাওনি তাতো নয়? সাজিয়েছো বলেই তুমি কি তাদের কাছে ধরা দিয়েছো? ছি: প্রান্তিক ভাই ছি:! কি পরিমাণ আঘাত তুমি অশ্রুদিকে দিয়েছো জানো? আর তাছাড়া অশ্রুদির যদি সত্যি কোথাও যাওয়ার

জায়গা থাকতো হয়তো মিনতি পিসির ওখানে আসতেন না। কিন্তু অশ্রুদির আসার পরে তুমি যে ব্যবহারটা করেছো তাতো আমি ভাবতেও পারছিনা। বললাম আমি খারাপ ব্যবহার করেছি? করোনি? আজ দেড় মাস হতে এল অশ্রুদি মিনতি পিসির ওখানে এসেছে, কিন্তু এই দেড় মাসের একদিনও কেন আসোনি এখানে? কেন অশ্রুদির সঙ্গে দেখা করনি একদিনের জন্যও? সেই যখন তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে তোমার সঙ্গে দেখা করল, মিথ্যে সান্ত্বনাও তো দিতে পারতে? ভাবলে নিজেব আসল পরিচয়টাই সব! আর কারো কোন পরিচয় নেই? কারো কোন মূল্য নেই?

আমি বললাম, থাক সেলিনা ওসব কথা, তার চেয়ে কলকাতার এই ফাঁকা রাস্তা আর উপরের নীল আকাশ দেখ। কলকাতার এই চেহারাতো দেখনি কোনদিন! তুমি বুঝি বার বার দেখেছো? দেখেও আঁশ মেটেনি বলে আবারও দেখতে চাইছো?

আমি বুঝতে পারছি সেলিনা প্রচণ্ড রেগে আছে আমার ওপর। মনে মনে ভাবছি। যত তাড়াতাড়ি পথটা শেষ হয় ততভাল। ফাঁকা রাস্তায় কুকুরের পাল, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করছে, আর সেই মুহূর্তে রাতের এই নিঃশব্দতা খান খান হয়ে নিজেদের বুকে শিহরণ জাগাচ্ছে।

এক সময় পৌছে গেলাম বাড়ীতে। নীলাঞ্জনা পিসি ঠায় দরজা খুলে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন বারান্দায়। হয়তো বকাবকি করবেন। কিন্তু না, নীলাঞ্জনা পিসি কোন কথাই বললেন না। শুধু সেলিনাকে বললেন, একটা সংবাদ যে কোন ভাবে পাঠিয়ে দিয়ে থেকে যেতে পারতিস তো। সেলিনা বলল, ট্রেনটা বিগড়ে যাবে ভাবতে পারিনি, তাই রাত হল, তুমি খেয়েছো? না খাওয়া হয় নি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়, বেশ খিদে পেয়েছে।

খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পিসিকে কষ্ট দেওয়া হবে, তাই ডাইনিং টেবিলে এসে বসলাম, খেলামও। ঘুমোতে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সকাল নটা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি সেলিনা। কি ব্যাপার তুমি? সে কথা পরে হবে প্রান্তিক ভাই, কিন্তু তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়েছো কেন, চোর আসার ভয়ে? মিটি মিটি হাসছেও। বললাম যা হয় একটা ভেবে নিও। আচ্ছা পরেই না হয় ভাববো, আপাতত মায়ের ঘরে চল, প্রায় ২ ঘন্টা হলো মিনতি পিসি এসেছেন, আর তখন থেকেই তোমাকে ডাকছি। বাব্বাঃ ঘুমোতেও পার বটে।

আমি অবাক হয়ে বললাম মা! এত সকালে, কিন্তু কেন? সে তুমি ও ঘরে গেলেই জানতে পারবে, তুমি তাড়াতাড়ি এস। আমি চা নিয়ে আসছি।

নীলাঞ্জনা পিসির ঘরে এসে দেখি বিমর্ষ চিন্তান্বিত মিনতি সেন, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন। বললাম কি হয়েছে মা, এত সকালে? মিনতি সেন কোন কথা না বলে একটা চিঠি তুলে দিলেন আমার হাতে। অশ্রুকণার লেখা, মিনতি সেনকে লিখেছে, "পিসি, গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার পথে নামলাম। বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া

সম্ভব নয়। আপনার কাছে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য একটা ছোট্ট চাকরি চেয়েছিলাম, হয়তো আমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আপনি রাজী হননি। কিন্তু আমার জন্য আপনার ও আপনার ছেলের মধ্যে কোন ব্যবধান তৈরি হোক চাইনি। আর হ্যাঁ, না বলে আপনার কিছু টাকা নিয়ে গেলাম, অবশ্য টাকাটা বাইরেই পড়েছিল। চোরেও চুরি করতে পারতো। আমাকে না হয় তাই ভাববেন। আপনার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমার আজীবন মনে থাকবে। অশ্রুকণা।

অনেকবার পড়লাম চিঠিখানা, তারপর তা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম তুমি বাড়ী যাও মা, আমি দেখছি। সেলিনা চা নিয়ে এল। মিনতি সেন বললেন কিছু খেতে ইচ্ছে করছেনা মা। তুই চা-টা নিয়ে যা। সেলিনা বলল, তুমি বাড়ী যাবে না অফিসে? না ভাবছি কমিশনার কাকার সঙ্গে একবার দেখা করব, তারপর দুপুরে এখানেই ফিরব। কিন্তু মেয়েটা যে কোথায় গেল? আমি বললাম, তুমি চিন্তা করোনা! সেকি প্রান্তিক চিন্তা করবনা? তুই বলছিস কি? আচ্ছা তুমি চিন্তাই কর। আমি আসছি। চা-টা শেষ করে জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে হয়েছিল, কলকাতা ছাড়ার আগে ভোরের গঙ্গাঘাটে একবার আসতে পারে ও, যদিও তখন আর ভোর নেই, তবুও একবার এসে পড়লাম সেই গঙ্গা ঘাটে। কিন্তু না, এখানে ও নেই। তপতীর সঙ্গে ওর পরিচয় নেই সেভাবে, তবে চেনে তাকে। জীবনের কঠিন সংগ্রামে তপতী তার পথ খুঁজে পেয়েছে। তার অনেক কথাই শুনেছে সেলিনার কাছে। অশ্রুকণার কথাও হয়তো শুনেছে তপতী। অনেকদিন যোগাযোগ নেই ওর সাথে। ওরতো বদলী নিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল, যদি চলে না গিয়ে থাকে, একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে এলাম ও যেখানে কাজ করে সেখানে। অফিসে জেনে নিলাম, ও ডিউটিতে আছে। একমনে কাজ করছে কেউ নেই। আমি যে এতক্ষণ ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ পিছন ফিরে আমাকে দেখে চমকে উঠে বলল, আরে প্রান্তিক তুমি! তারপর বলল তোমার কথাই ভাবছিলাম না শুধু, ভীষণ ভাবে তোমাকে চাইছিলাম। আমি অবাক হয়ে বললাম কেন? তুমি বোধ হয় জানো না সৌমেন্দ্র পরীক্ষা ড্রপ করেছে। না জানি না, কিন্তু কেন? ও বলল দেখ এজন্য তোমাকে চাইছিলাম না। তবে? এর মাঝে আমি বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তারপর তোমার বাবার সাথে দেখা হয়েছিল। তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন। তুমি রেহানা নামে কোন মুসলিম মেয়েকে ভালবাস কি না এটাও জানতে চাইছিলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কি বললে? আমি কিছুই বলিনি, তবে তোমার উপর যে তোমার বাবার প্রচণ্ড অভিমান, এটা বুঝে এসেছি। কতদিন আগে গিয়েছিলে? তা বেশ কিছু দিন হল, বলল তুমি নাকি গিয়েছিলে অথচ রেহানার কথা কিছুই বলনি। আমি বললাম রেহানার কথা, কি বলব তুমিই বল? আমি বুঝি তোমার অবস্থা। কিন্তু আমার অবাক লেগেছিল, রেহানার সম্পর্কে অত কথা তিনি জানলেন কি করে? আমিও কম অবাক হচ্ছিনা, তোমার কথা শুনে। তপতী বলল, তোমার একবার গ্রাম থেকে ঘুরে আসা উচিত প্রান্তিক! তাছাড়া চিঠিপত্রও লেখনা। ওখানেই শুনলাম তোমরা গিয়েছিলে। যাকগে সে কথা, তুমি কি আমার কাছে এসেছো? তোমার কি মনে হয়? আমার? থাক আমার কথা, তবে

যদি আজ না এসে অন্যদিন আসতে, ভাবতাম আমার কাছেই এসেছো! তবে আজ নয় কেন? বলব, তুমি একটু বোস, চলে যেওনা আমি আসছি।

মিনিট পাঁচেক পরে ও ফিরে এল, এসেই বলল চল। কোথায়? বা যে জন্য এসেছো, সেখানে যাবে না? আমি বুঝেও না বোঝার ভান করে বললাম, তোমার হেঁয়ালি কথা ছাড়। একটু সোজাসুজি বল। বলছি, এসো না আমার সাথে। না আমার সাথে যেতেও অসুবিধা। বললাম সৌমেন্দ্র কোথায়? বাড়ীতে গেছে। কথা বলতে বলতে মিনিট কয়েকের মধ্যে ওর কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলাম, এর আগে হোস্টেলে ছিল, অল্পদিন হলো কেয়ার্টার পেয়ে চলে এসেছে। আমাকে একটা দরজা দেখিয়ে বলল, ভিতরে গিয়ে বস। আমি পোষাকটা বদলে আসি।

ভেজানো দবজা ঠেলে ঢুকলাম, আব ঢুকেই চমকে উঠলাম। অশ্রুকণা খাটের রেলিংএ একটা বালিশে ঠেস দিয়ে আজকের কাগজ পড়ছে। ও বোধ হয় বুঝতে পারছে না, আমি এসেছি, ডাকলাম কণা!

অতি পরিচিত কণ্ঠ স্বরে আর ওই নামে, যে নামে, ওকে আর কেউ ডাকেনা, আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত চোখ তুলে তাকালো। তারপর বলল, ভয় নেই প্রান্তিক তপতীদিকে বলেছি মাত্র একটা দিন যেন আমাকে আশ্রয় দেয়। এইটুকু দয়া তুমি কর প্রান্তিক!

যেন ব্যথার সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে অতি করুণ এক সুর। আমি আস্তে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলাম। ও বাধা দিল না। বললাম. কেন এত ব্যথা দাও সকলকে! চল আমার সাথে। কোথায়? সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না কণা, আমি যেতে বলছি, তুমি যাবে। কোন উত্তর না করে চুপ করে রইল। আমি আবারও বললাম, এতো দেরি করোনা। ওরা সবাই তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। ও অবাক হয়ে বলল, ওরা মানে? বা, ওরা মানে মিনতি সেন, নীলাঞ্জনা পিসি, সেলিনা। ও তাই বল। ওদের জন্যই তুমি এসেছো। কিন্তু আমি যাব না প্রান্তিক। আমি আর ফিরে যাবো না। আমি আবেগ মথিত কণ্ঠে বললাম, তুমি কাউকে বুঝতে চাওনা কেন বলত। না আমি কাউকে বুঝতে চাই না, আসলে নিজেই নিজেকে বুঝিনা। এবার ওর একটা হাত ধরে বললাম, কণা, সত্যি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। বড় মুখ করে ওদের আমি কথা দিয়ে এসেছি, ওদের কাছে আমাকে ছোট করে দেবে!

দেখতে পাচ্ছি, ওর চোখ দুটি জলে ভারাক্রান্ত, এখনি বোধ হয় টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়বে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিন কাপ চা নিয়ে ঢুকলো তপতী। হাসতে হাসতে বলল, ঠিকতো প্রান্তিক, তোমাকে একটু আগে বলেছিনা, আজ না এলে হয়তো ভাবতাম তুমি আমার কাছে এসেছো। আমি অশ্রুকণার হাত ছেড়ে দিয়ে তপতীর কোন উত্তর না দিয়ে তপতীকেই বললাম, সকাল থেকে বলতে গেলে চা খাওয়াই হয়নি। তারপর বললাম শুধু চা? কিছু টিফিন হবে না? কি খাবে বল। যা হোক একটা কিছু দাও। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে। তপতী বলল, চাটা খেয়ে নাও দেখছি কি আছে?

কিছু নেই, তাই চা-ই ওদের সঙ্গে খেতে হল। খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, তপতী

তুমি তো বহুদিন থেকে বলছ পিসির ওখানে একবার যাবে। যাওনি, আজ চল। না আজ থাক। সৌমেন্দ্রের আজ আসার কথা, কোথায় গেছি হয়তো ভাবতে পারে। হাসলাম একটু। তারপর বললাম ওটা অজুহাত। তুমি ভালভাবেই জান, সৌমেন্দ্র আজ আসবে না। ও অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে, তারপর বলল এটা মিথ্যে অজুহাত নয়, ও সত্যিই আসবে। ঠিক আছে, চল। কিন্তু অশ্রুকণা কিছুতেই রাজী নয়। ও বলল, কেন মিথ্যে পিছু ডাকছ প্রান্তিক। আমি আর ফিরে যেতে চাইনা। আমি বললাম বেশ, তুমি চলে এস, কিন্তু এখন আমার সঙ্গে চল, একবার অন্তত আমার কথা রাখ। তার কোন দরকার নেই প্রান্তিক, তুমি বরং তপতী দিকে নিয়ে যাও, কথা দিচ্ছি আমি এখানেই থাকবো।

তপতী বলল, অশ্রু কেন এরকম করছ? আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত। তোমার কাছে যেটুকু শুনেছি, আমি কিছু না শুনে না জেনেও, তোমার থেকে বেশী জানি ভাই। মিথ্যে অভিমান করে কাকে আঘাত দিতে চাইছো? বরং প্রান্তিককে তোমার কিছু বলার থাকলে বলে নাও এই বেলা, আমি শাড়ীটা বদলে আসছি। তপতী সত্যি সত্যি শাড়ী বদলাতে অন্য ঘরে চলে গেল।

অশ্রুকণা বলল, তুমি কি করে জানলে আমি এখানে এসেছি? আমি বললাম, আমার মন বলছিল আমার সঙ্গে দেখা না করে তুমি কোথাও যেতে পার না। তাই প্রথমে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে যখন পেলাম না, তখন ভাবলাম, এখানে আসতে পার। এরকম ভাবলে কেন? ভাবনাটা মনে এসে গেল তাই। কিন্তু ওসব কথা থাক। এবার ওঠ কণা। ও বলল, তুমি কি বিশ্বাস কর তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যেতে পারি না! আমার বিশ্বাস থাক কিন্তু তুমি বলত, আমাকে না জানিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে? জানিনা। জাননা যখন, তখন ওঠ। তপতী কি ভাবছে বলত!

শেষ পর্যন্ত এল ও আমাদের সাথে। তবে তাকে কথা দিতে হয়েছে, আজকেই সে ফিরে আসবে তপতীর সঙ্গে। আমি বললাম তাই হবে।

মিনতি সেন অশ্রুকণাকে জড়িয়ে বলল, এ পাগলামি তুই কেন করতে গেলি অশ্রু। আমাকে যদি একটুও ভাল না বাসিস কেন গিয়েছিলি আমার কাছে? এবার চল আমার সাথে! অশ্রুকণা মিনতি সেনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তা হয় না পিসি। আমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে দিন। উনি বললেন, ওরে পাগলি মেয়ে, আমার সর্বস্ব চুরি করে ভাবছিস তুই পথ খুঁজে পাবি? কোন দিন পাবি না। যদি আমার সঙ্গে না যাস তা হলে তোকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শিউরে উঠবি। মনে রাখিস আমি তোর বাবা-মা নই, যে হাজার অপরাধ করলেও তোকে ক্ষমা করতে হবে! অশ্রুকণা চুপ করে রইল। আমি চলে গেলাম আমার নিজের ঘরে। ও ঘরেই একটু পরে এল তপতী, সেলিনা এবং নীলাঞ্জনা পিসি। সেলিনা বলল চা খাবে তপতীদি! নীলাঞ্জনা বললেন কতদিন পরে তোকে দেখছি, পথে ঘাটে দেখা হলে আমিতো চিনতেই পারতাম না। এত কাছে থাকিস অথচ একবারও এলি না ব্যাপার কি বলতো। তপতী বলল, পথে ঘাটে দেখা হলে আমিও তোমায় চিনতে পারতাম না। সেই কত ছোটবেলায় তোমাকে দেখেছি। প্রান্তিকের কাছ থেকে তোমার ঠিকানাও নিয়েছি,

কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠেনি। সেলিনা চা নিয়ে এল। নীলাঞ্জনা বললেন, সকাল থেকে এরা কিছু খায়নি। মিনতিকে কতবার বললাম, প্রান্তিক যখন বলেছে ওকে যেখান থেকে হোক ফিরিয়েই নিয়ে আসবে, যা হোক কিছু মুখে দাও ভাই। কিন্তু ওর ওই এক কথা। ও না আসা পর্যন্ত আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না। কিন্তু তপু তোর ওখানে ও গেল কি করে? আর গেলইবা কখন? তপতী বলল, ও আগে কোথাও গিয়েছিল কি না জানিনা, প্রান্তিকের যাওয়ার ঘন্টা ২/৩ আগে ও আমার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর নিজেই বলে, তপতীদি একটা রাত আমি তোমার কাছে থাকব, তুমি আমায় ফিরিয়ে দিওনা, বলে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর ওকে নিয়ে আমি আমার কোয়ার্টারে এলাম, শুনলাম ওর কথা। তারপর বললাম, অশ্রু, দিদি বলে যখন ডেকেছো, তখন একটা রাত কেন, যতদিন তোমার থাকতে ইচ্ছে করে তুমি থাক। এরপর ওকে ঘরে রেখে আবার আমি ডিউটিতে চলে যাই, কিছু জরুরী কাজ ছিল। সেটা যখন তাড়াতাড়ি সাবছি তখন গেল প্রান্তিক। ওর কথায় বুঝেছি ওর যাবতীয় অভিমান প্রান্তিকের উপর।

আমার আর কি বলার থাকতে পারে। চুপ করে আছি। মনে গভীর বিশ্বাস, একবার যখন ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, তখন মিনতি সেনের কাছ থেকে ছাড়া ও আর পাবে না। তপতীর কথার উত্তরে সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাই অশ্রুদির সঙ্গে যা ব্যবহাব করেছে তাতে তো অভিমান হতেই পারে, আমার সঙ্গে প্রান্তিক ভাই ওরকম ব্যবহার করলে আমি শুধু অভিমানে ঘর ছাড়তাম না, প্রান্তিক ভাইকেও রাস্তায় নামিয়ে ছাড়তাম।

তার রাগের আঁচ পেয়ে আমি শুধু শব্দহীন হাসলাম। তপতী বলল তা তুমি পার সেলিনা, তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তোমার পক্ষে সবই সম্ভব। সেলিনা বলল, এটা সম্ভব অসম্ভবের কথা নয় তপতীদি। এটা অধিকারের কথা। আমাকে প্রান্তিক ভাইয়ের ভাল না লাগতে পারে, তাই বলে আমাকে অপমান করার অধিকার তার নেই। তবে প্রান্তিক ভাই বলতে পারে উনি যা করেছেন, তাতে অপমানের কিছু নেই, কিন্তু মান অপমানের সংজ্ঞাতো সবার কাছে সমান নয়। কেউ মেনে নিতে পারে, কেউ পারে না। অশ্রুদি পারেনি, তার জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমিও পারতাম না, তাই বলে, আমি নিজে রাস্তায় না নেমে প্রান্তিক ভাইকে রাস্তায় নামিয়ে ছাড়তাম।

অত্যন্ত কঠিন প্রতিবাদ। সেলিনার জেদি মনোভাবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কিন্তু এখন ও যা বলল, এর দ্বারা ও কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম না। নীলাঞ্জনাও সম্ভবত বুঝতে পারেননি। তপতী শুধু ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছ সেলিনা, তুমি তপতী বা অশ্রু নও, প্রান্তিকের সাধ্য কি তোমাকে অপমান করার। তারপর নীলাঞ্জনাকে বলল, পিসি সকাল থেকে তো কিছুই খাওনি এবার চল যা হোক কিছু খাবে। রান্না করেছো? হ্যাঁ সেলিনা করেছে।

অশ্রুকণা রাজী হয়েছে মিনতি সেনের সঙ্গে ফিরে যাওয়ার, তবে মিনতি সেনকেও রাজী হতে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি অশ্রুর যে কোন একটা ব্যবস্থা উনি করবেন। যাওয়ার সময় মিনতি সেন বললেন, প্রান্তিক আগামী রবিবার একবার আসিস তো। আচ্ছা। আর

শোন, তার আগে শুক্রবার একবার ওখানে যাবি। সবকিছু ভালো করে জেনে আসবি। আমি বললাম আচ্ছা। মিনতি সেন অশ্রুকণাকে নিয়ে চলে গেলেন।

তপতী বলল, আমাকেও যে যেতে হবে প্রান্তিক। নীলাঞ্জনা বললেন, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, আজ থেকে যা না। তপতী আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, না পিসি, ওরতো রাতে ডিউটি আছে। তপতী বলল, আরেকদিন আসব পিসি। আমিতো দেখে গেলাম, বরং তোমরা সবাই একদিন এস না, আমার কোয়ার্টারে। ওখানে আর কে কে থাকে জিজ্ঞাসা করলেন পিসি। তপতী বলল, আমি একাই থাকি। একার পক্ষে কোয়ার্টার যথেষ্ট বড়। বল কবে যাবে? সেলিনা বলল, তপতীদি তুমিতো কোয়ার্টার আজকে পাওনি বেশ কিছুদিন আগেই পেয়েছো। আমাদের চেনোনা তাতো নয়, তবুতো তোমার গৃহপ্রবেশে বলনি, আজকে হঠাৎ লজ্জায় বলছ নাতো।

সেলিনা চিরদিনই এই রকম যা বলে সোজাসুজি বলে। তপতী বলল, না ভাই ঠিক তা নয়। আসলে তুমি বোধ হয় জাননা, আমার বদলীর অর্ডার এখনো বহাল। যেতে কিছুদিন দেরি হবে বলে কোয়ার্টারটা নিয়ে নিতে হল। এটা ঠিক হোস্টেলের এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার মতন। তুমি যেভাবে বলছ, সেভাবে মনেই হয়নি। তাহলে এবার গৃহপ্রবেশটা করেই নাও বলল সেলিনা। তপতী বলল, বল কবে যাবে, তোমরা যেদিন যাবে সেদিনই আমার গৃহপ্রবেশ! কণ্ঠে বুঝি কোন এক না জানা অভিমানের সুর বাজে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। তপতী বলে, প্রান্তিক চল একটু বাসে তুলে দিয়ে আসবে। বললাম চল।

মিনতি সেনের আদেশ, তাকে অমান্য করার কোন উপায় নেই। একদিন এলাম প্রতীম চৌধুরীর অফিসে। দেখি ঘরে আছেন সজল বাবু। আমি নমস্কার করতে উনিও নমস্কার করলেন, সৌজন্য বিনিময়ের পরে তিনি চলে গেলেন। প্রতীমবাবু বললেন, খুব তাড়াতাড়ি এলে, তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমার কথা? কেন? হ্যাঁ বলছি, তুমি বোধ হয় দেখেছো আমাদের কোম্পানী কয়েক জন জুনিয়র ম্যানেজার নেবেন। তুমি যদি দরখাস্ত কর, অবশ্য তুমি যদি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতে চাও তাহলে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিও। আমি বললাম, আপনি যে আমার কথা মনে রেখেছেন, তার জন্য খুব ভাল লাগছে, আমি এই ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছিলাম। সত্যি? হ্যাঁ সত্যি! তা হলে দরখাস্তটা পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেই আমার চাকরি হবে? না হওয়ার তো কোন কারণ নেই। আপনাদের রিটেন, পার্সোনালিটি টেষ্ট পাশ করতে না পারলেও। তুমি ফেল করবে এটা ভাবছো কেন? পাশ করব এ গ্যারান্টিতো নেই। না তা অবশ্য নেই। যদি তাইই হয় তা হলে তো হবে না। আমি বললাম, তার মানে আপনারা চাইলেও হবে না। আমরা শুধু পার্সোনালিটি টেষ্টে কিছু কনসিডার করতে পারি, কিন্তু রিটেন টেষ্টে তোমাকে পাশ করতে হবে প্রান্তিক। ঠিক আছে আমি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবো। তবে আমি আপনার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। আমি শুনেছি আপনাদের কোম্পানী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি স্কুল চালায়। সেই সমস্ত স্কুলে শিক্ষক চেয়েও আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হ্যাঁ দিয়েছি।

তুমি কি স্কুল শিক্ষকতা করবে? করব কিনা জানিনা কিন্তু দরখাস্ত করতে আপত্তি কি? না আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তুমি মনে হয় বিজ্ঞাপনটা ভাল করে দেখোনি। দেখলে দেখতে পেতে আমরা শুধু মহিলা প্রার্থীর জন্য আবেদন পত্র চেয়েছি, কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা চেয়েছি প্রথম শ্রেণীর স্নাতক। বললাম দেখেছি। তা হলে? আমি ভনিতা না করে বললাম একটা ফর্ম দেবেন? উনি হেসে বললেন দেব। তোমার ক্যান্ডিডেটটা কে? বললাম আপনি তাকে চেনেন। আমি চিনি? অদ্ভুত কথাতো। আমি যদি চিনি তবে আমার কাছে এলোনা কেন? ওদের তো কোন রিটেন টেষ্ট নেই। শুধু মাত্র ওরাল ইনটারভিউ। আপনি থাকবেন বোর্ডে। না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না। তুমি তার নাম ঠিকানা দিয়ে যাও।

আমি অশ্রুকণার নাম ও ঠিকানা দিতেই উনি চমকে উঠে বললেন, অশ্রুকণা। আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। যে মেয়েটিকে আপনারা সজল বাবুর জন্য দেখতে গিয়েছিলেন।

কি যেন ভাবলেন প্রতীমবাবু। তারপর বললেন, কিন্তু ওখানে কি ওর ভালো লাগবে? বললাম ভালো না লাগার দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু বাকী দায়িত্বতো আপনাকে নিতে হবে। উনি বললেন তা না হয় নিলাম, কিন্তু আমি একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝতে পারছিনা। আমি সোজাসুজি বললাম, আসলে ও বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে এসেছে।। মা প্রথমে ওকে হঠাৎ খেয়াল এরকম একটা কিছু ভেবে খুব একটা গুরুত্ব দেননি, এবং এই অবহেলার জন্য, আমার মায়ের সঙ্গে অভিমান করে বাড়ী থেকে চলেও যায়। যদিও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু কথা দিতে হয়েছে তার জন্য মা চেষ্টা করবেন।

প্রতীমবাবু বললেন, আমার কাছে যে এসেছো সে তোমার নিজের ইচ্ছেয়। হ্যাঁ আমার নিজের ইচ্ছেয়, তবে মায়ের যে এ ব্যাপারে কোন ছ্যুতমার্গ নেই তা আপনাকে হলফ করে বলতে পারি। উনি আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, ওদের দরখাস্ত আমাদের অফিসে পৌঁছাবার শেষ তারিখ আজ। আজ হয়তো পারবে না কিন্তু কাল দশটার আগে তুমি নিজে এসে আবেদন পত্রটা আমার হাতে জমা দিয়ে যেও। আরেকটা কথা, আগামী বুধবার আমরা ইন্ট্যারভিউ নেবো। যদি মনোনীত হয়, তবে তাব এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে, পারবে তো? আমি বললাম নিশ্চয়ই পারবে।

হাতে সময় নেই। বিকেলেই মিনতি সেনের ওখানে এলাম। উনি বাড়ী নেই। জবার মা দরজা খুলে দিলেন। বললাম মা, নেই? না উনিতো ফেরেন নি। তাহলে? দিদিমনি আছেন। আপনি আসুন।

উপরে গিয়ে দেখি অনুতপা আর অশ্রুকণা কথা বলছে। বহুদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা। ও বলল, আজকাল দেখছি চিনতে পার না। না চিনতে চাও না। যা তোমার ভাল মনে হয়। তা কেমন আছো? ভাল। তুমি এখন বাড়ী থেকে? না ঠিক বাড়ী থেকে নয়, আবার বাড়ী থেকেও বলতে পার। বড্ড হেঁয়ালি কথাবার্তা। আগেতো এভাবে কথা বলতে না। আগে কি তুমি বলতে এ ভাবে কথা। বললাম আমি? অশ্রুকণা বাধা দিয়ে বলল, তুমি

কি ঝগড়া করবে নাকি, সোজা উত্তর দিতে পারনা। কোথা থেকে আসছ?

আমি বললাম, থাক ওসব কথা। তোমরা কথা বল, আমি বরং জবার মাকে বলি, যদি চা বা কফি খাওয়াতে পারে। অশ্রুকণা বলল, তুমি বোস আমি নিয়ে আসছি। অনুতপা বলল আমি উঠিরে অশ্রু। আমি অনুতপাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, অনুতপা, শুধু অশ্রুকণা তোমার বন্ধু নয়, আমিও তোমার বন্ধু। তুমি মান সে কথা? না মানার কিছু হয়েছে কি? হয়নি বলতে চাও? অশ্রুকণা কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে, চলে যাসনে কিন্তু, আমি কফি নিয়ে আসছি। ও চলে গেলে অনুতপা বলে চলে, এ বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীতো বেশী দুরে নয়, বরং এবাড়ী আসতে গেলে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়েই আসতে হয়, কিন্তু গেছো একদিনও? অথচ বন্ধুত্বের বড়াই করছ? না হয় অশ্রু, রেহানারা তোমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। আমাকে না হয় ভিন্ন হৃদযের বন্ধু হিসাবে ক্ষমা ঘেন্না করতে। বলে হেসে উঠলো। হেসে উঠলেও ওর অভিযোগকে অস্বীকার করতে পারি না, তা যেন হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। বললাম, সত্যি ভুল হয়ে গেছে অনুতপা। আমি প্রমিজ করছি এ ভুল আর হবে না। অনুতপা বলল, আমিও প্রমিজ করছি আরেকদিন এসে চা খাব, আজ সত্যিই আমার কাজ আছে। অশ্রুকে বলে দিও। তুমি বলে যাওনা। ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ঠিক আছে তোমাকে বলতে হবে না।

অশ্রু কফি নিয়ে এসে দেখে অনুতপা নেই। বলল, ও চলে গেলো? আমাকে একবার বলে গেলো না? ওতো বলল তোমাকে যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছে, বললাম আমি। কিছুটা বিরক্তি সহকারে অশ্রুকণা অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, এখন এই অতিরিক্ত এক কাপ কফি কে খাবে? আমি বললাম এর জন্য বিরক্তির কি আছে কণা। হয় এসো আমরা ভাগ করে খাই, না হয় ফেলে দাও। ফেলে দেবো? তাছাড়া আর কি করবে? ভাগ যদি করতে না চাও ফেলে দিতেই হবে। ফেলে দেওয়ার অভ্যেস যে তোমার আছে সে আমি জানি। আমিও জানি ভাগ তুমি করতে পারবে না।

এই শেষের কথাটা বোধ হয় অফিস থেকে ফিরে মিনতি সেনের কানে যায়। বলে কি ভাগ করবি, আর কিইবা ফেলে দিবি। বরং আমাকে দে, তোদের ভাগও করতে হবে না, ফেলতেও হবে না। অশ্রুকণা যেন আমার সঙ্গে একা কাটাবার দ্বিধা থেকে মুক্তি পেল।

কফি খেতে খেতে মিনতি সেনকে বললাম, তোমার মেয়েকে বল, এই ফর্মটা যেন এখনি ফিলাপ করে আমাকে দিয়ে দেয়। ফর্ম জমা দেওয়ার শুধু নয় ওখানে পৌঁছাবার শেষ তারিখ আজ। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কাল দশটার আগে ওটা ওদের হাতে পৌছে দিতে হবে। মিনতি সেন উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, তা একথা ওকে বলতে পারলি না। কাকে বলব, ও আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাইছেনা। তারপর না জানি কি কথা শুনতে হবে।

এত বড় অভিযোগেরও কোন উত্তর দিল না অশ্রুকণা। মিনতি সেনের কাছ থেকে ফর্মটা নিয়ে যেখানে যেখানে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের দরকার, সেখানে সেখানে স্বাক্ষর করে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, পিসি আপনার ছেলেকে বলবেন বাকিটা পূরণ করে নিতে। বলেই ও

উঠে চলে গেল। মিনতি সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, শুধু আমাকে বললেন তোঁদের এই ভুল বোঝাবুঝি মিটবে কবে প্রান্তিক!

জীবনে বুঝি ভুল বোঝাবুঝির কোন শেষ নেই। তা না হলে সেলিনা অমন করে বলবে কেন, প্রত্যেককে অপমান করতে করতে প্রান্তিক ভাই এটা তোমার একটা নেশা হয়ে গেছে। বলিহারি এদের অপমান বোধ। সেদিন ছিল সেলিনার জন্মদিন, কাউকে বলা হয় নি, মিনতি সেনের দেওয়া শাড়ী ও গয়না পরে ও যখন স্নান করে ভোরে আমাকে প্রণাম করতে এল, সত্যি ওকে অপূর্ব লাগছিল। বলেছিলাম, সেলিনা, তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে আমার অন্তরের ভালবাসা, তোমার জন্মদিনের সৌন্দর্যে পাক তার পূর্ণতা। কেউ ছিল না ঘরে। সম্ভবত: লজ্জায় পালিয়ে গিয়েছিল ও।

নীলাঞ্জনা পিসি মেয়ের জন্মদিনের মিষ্টি নিজে নিয়ে এসে আমাকে দিলে বলেছিলাম আজতো পিসি তোমার জন্মদিন নয়, যার জন্মদিন মিষ্টিটাতো তার হাত দিয়েই আসা উচিত ছিল। আর আমার এই সাধারণ কথার এই উত্তর হয়।

আঘাত সাধারণত আমি পাইনা। কিন্তু ইদানীং যে ভাবে আমাকে লক্ষ করে চারপাশ থেকে বজ্রের ন্যায় অভিযোগের তীর ছুটে আসছে, বুঝতে পারছি তার থেকে বাঁচতে হলে আমাকে পালাতে হবে একদিন। কিন্তু পালাব কোথায়?

যে সেলিনা সকালে করল অপমান, সেই এল গভীর রাতে একা ক্ষমা চাইতে! আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমাদের বোঝা সত্যি দুঃসাধ্য সেলিনা।

মাত্র কদিন আগে, মেদিনীপুরের এক আধা মফস্‌ল শহরে স্কুলের চাকরি নিয়ে চলে গেছে অশ্রুকণা। মিনতি সেন বার বার অনুরোধ করেছিলেন, মেয়েটিকে এগিয়ে দিযে আসার। কোনদিন মিনতি সেনের অবাধ্য হইনি, সেদিন কিন্তু হয়েছিলাম। বলেছিলাম মা, কি ভাব তোমরা আমাকে বলত। আমি কি রোবট? আমার কি রক্তমাংস নেই, অনুভুতি নেই? না আমি তা পারবো না। কিছুতেই পারবো না। মিনতি সেন চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে তোর যেতে হবে না। আমিই যাব, আর কোন দিনই ফিরে আসব না। ওর কাছেই থাকব। যদি কোনদিন আমার কথা মনে পড়ে গিয়ে নিয়ে আসিস। নিজের মান-অপমান, রাগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা কত কথাইতো বললি? ওগুলো কি আমার নেই? আমার কোন স্বপ্ন থাকতে নেই? কেন একটা মেয়েকে তুই স্বপ্ন দেখালি? বুঝলি যদি অসম্ভব, তবে এড়িয়ে না গিয়ে আবো ভালবেসে ভুলটা ভেঙে দিলি না কেন? অশ্রুকণা বলল, পিসি, এ আপনি কি সব বলছেন। আমি নিজেই যেতে পারবো। আপনাকে যেতে হবে না পিসি। মিনতি সেন বললেন হ্যাঁ একাইতো যাবি? তা না হলে আর আমাকে অপমান করা সম্পূর্ণ হবে কেন? মিনতি সেন উঠে চলে গেলেন। আমিও উঠতে যাব, অশ্রুকণা বলল, একটু দাঁড়াও প্রান্তিক। বল। তোমার কি আমার সঙ্গে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব। করুণ ভাবে তাকালো ও আমার দিকে। আমি বললাম, আমাকে একটু ভাবতে দাও কণা! ভাবতে তোমাকে হবে ঠিকই কিন্তু তোমার ভাবনার থেকেও যা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে তা হচ্ছে আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস। তারপর একটু থেমে বলল, সত্যি কি আমাকে একদমই বিশ্বাস করা যায় না?

৲ আমি যে কি বলব বুঝতে পারছি না, বললাম, আমি কি কখনো বলেছি তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি। না মুখে বলনি ঠিকই, কিন্তু তোমার প্রতিটি আচরণ আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না। এটা তোমার ভুল! তাহলে সত্যটা কি? তোমাকে জানতে হবে? যদি না বলতে চাও, আমার হয়তো এমন কোন জোর নেই, যাতে তোমাকে আমি বাধ্য করতে পারি। আসলে কণা, নিজের প্রতি বিশ্বাস আমি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছি। এটা তোমার অজুহাত। না অজুহাত নয়, তুমি কেন বুঝতে চাইছো না, আমিও মানুষ, আমিতো দোষ ক্রটির উর্দ্ধে নই। এই জন্য তোমার ভয়? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি প্রান্তিক, এরকম কোন অবস্থার সৃষ্টি হবে না। বরং এই অজুহাতে যদি তুমি আমাকে এড়িয়ে যাও, আমার অপমান কি পরিমান হতে পারে, তা কি বুঝতে পারছ? আমি বললাম তোমার কথাইতো সব নয়, আমার ভিতবেব দুর্বলতাগুলোকে আমি বন্ধ করব কি করে? অশ্রুকণা বলল, তুমিতো এত দূর্বল নও প্রান্তিক। তুমি নিজেকে যত দূর্বলই মনে করোনা কেন তোমার সৌজন্য বোধ তোমার সীমাবদ্ধতা এতদিন তোমাকে যেমন রক্ষা করে এসেছে আজও তেমনি ভাবে করবে। বললাম জানিনা, কিন্তু কণা, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তোমাদের পরিচিত প্রান্তিকের যে মৃত্যু হয়ে গেছে সেকি তুমি জান? পবম দুঃখে কেঁপে উঠে বলল, প্রান্তিক! আমি ওকে বললাম, ভয় পেলে কেন কণা? আমিতো দেবতা নই, হতেও চাইনি কোন দিন। দোষেগুণে মানুষ। হযতো তুমি আমার উপর অনেক ভুল ধারণা করেছো, আমাকে না বুঝতে পেরে রাগও করেছো, অভিমানে দূরে সরে যেতে চেয়েছো। অথচ আমাকে বোঝার কোন চেষ্টাই করলে না কোনদিন।

অশ্রুকণা বলল, তোমাকে এ ভাবে ভাবিনি কখনো, আজো ভাবিনা, যা তুমি বলছ, ওই দুর্বলতা সবারই আছে আর আছে বলেই আমরা কেউ দেবতা নই। দুর্বলতা কি আমার ভিতরে নেই প্রান্তিক? তুমি জান না? কি তীব্র ভাবে তোমাকে আমি চেয়েছি? চেয়েছি আমার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার করে। তবু কি পেরেছি তোমাকে আচ্ছন্ন করতে? আমি জানিনা, তোমাকে নিজের কথা আর কোন দিন বলতে পারবো কি না। তবু একটা অনুরোধ, বল আমাকে ফিরাবে না।

আবেগে ওর গলা যেন কেঁপে ওঠে। বললাম, বল। আগে কথা দাও তুমি আমায় ফেরাবে না। দিলাম। তা হলে চল আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। জীবনের অনেক কথা যা অনেক বার তোমাকে বলতে চেয়েছি, একটু খানি সময় দিতে পারবে না কণা। ও কি প্রান্তিক, তুমি এমন থর থর করে কাঁপছ কেন? ও এগিয়ে এসে আমাকে ধরল তারপর বলল, খুবই কি আঘাত দিয়েছি? আমি বললাম, না, আঘাত আজকাল আর পাইনা। আমারও অনেক কথা বলার আছে তোমাকে। ও বলল, চা খাবে? বললাম, না থাক। কখন তোমার ট্রেন? কাল সকাল ৮ টায়। ঠিক আছে আমি যাবো। আসি তা হলে। আমি চলে আসতে চাইলে ও বলল, একটু শুয়ে থাক প্রান্তিক। তোমার শরীরটা সত্যি ভাল নেই। উঠোনা কিন্তু আমি আসছি।

ও চলে গেল। এ আমার কি হল। সমস্ত পৃথিবীটা কেন আমার চোখের সামনে

ঘুরছে। আমি যে কথা দিলাম পারবো কি মর্য্যাদা রাখতে? অশ্রুকণা যে বিশ্বাস রাখতে চাইছে পারবো কি আমি হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে।

আমার এই কলকাতা জীবনে প্রথম যে মেয়েটি এসেছিল তার ভালবাসার ডালি নিয়ে সেতো এই অশ্রুকণা। কিন্তু তবুতো একে আমি উজাড় কবে নিজেকে দিতে পারলাম না, সেকি আমার দোষ না অতি সাধাবণ হয়ে অতবড় উঁচুতে হাত বাড়ানো ঠিক হবে না ভেবে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছি, জানিনা। এল রেহানা। তার ফুলের মত কোমল সৌন্দর্য নিয়ে ধীরে ধীরে ও আমাকে তার দিকে টেনে নিল। সর্বস্ব উজাড় করে তাকে দিলাম আমার সবটুকু, তবু কেন বুকে ব্যথা বাজে। অশ্রুকণা তার অভিমান দিয়ে আমাকে জয় করতে চেয়েছিল, মনে হয় তার মানে বুঝতে পারিনি। আজো কি পেরেছি?

কফি নিয়ে এল অশ্রুকণা, বললাম মা কোথায়? শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন? মানে শরীর খারাপ? শরীর হয়তো তত খারাপ নয়, তবে মনে খুব আঘাত লেগেছে। তুমি কফিটা খেয়ে একবার যাও তার কাছে। আমি বলে এসেছি প্রান্তিক কফি খেয়ে আসছে আপনার কাছে।

আমি বললাম, কণা, একটা কথা বলব? বল ও তার ভেজা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি আস্তে আস্তে বলতে থাকি, আমি যে সত্যিই তোমাকে ধীরে ধীরে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, যদি একথা বলি তুমি কি অবিশ্বাস করবে। কেন এমন ভাবছ যে আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব। তাহলে শোন. যেদিন তুমি সত্যি সত্যি বাবা-মাকে ছেড়ে চলে এলে সেদিন থেকে মনে হয়েছে আমি সত্যি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে একদিকে রেহানা, আর একদিকে সেলিনা। রেহানাকে বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝতে পারিনা সেলিনাকে। আরো ভয় হয় ওর সহজ সাবলীল স্পষ্টতাকে। আজ আমি চাইলেও বোধ হয় আমার মুক্তির পথ নেই। নিজের দেওয়া গন্ডীতে নিজেই বাধা পড়ে গেছি কখন যেন। যতই তোমাকে অস্বীকার করতে চেয়েছি, যতই তোমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি, তোমার তীব্র অভিমান, ততই তোমাকে আমার আরো কাছে নিয়ে এসেছে। এখন মনে হয়, তোমাকে ছাড়া বুঝি আমি চলতে পারব না, আর এই দুর্বলতা মনের মধ্যে যতই অনুভব করেছি ততই না জেনে তোমাকে আরো বেশি আঘাত দিয়ে ফেলছি। এবার বল আমি কি করব।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অশ্রুকণা বলল, তোমাকে আমি বুঝি প্রান্তিক, তোমার দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা সব কিছু একাকার হয়ে আমাকে গ্রাস করে। আমি বললাম, তুমি বোঝ আমার কষ্ট? তোমার কি মনে হয, বুঝি না? জানিনা কণা, শুধু মনে হয় আজ যে গোলক ধাঁধাঁয় আমি পথ হারাতে বসেছি, সেখান থেকে তুমিই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পার। কি ভাবে? তাতো জানিনা কণা, এ শুধু আমার বিশ্বাস, যে মেয়ের আমাকে না জানিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, কেবল মাত্র তার কাছেই আমার মুক্তির মন্ত্র।

কফিটা শেষ, হয় এক সময়। আমার স্বীকারোক্তি কে এড়িয়ে গিয়ে অশ্রুকণা বলে, সেলিনা কে তুমি ভালবাস না? উত্তরে বলি সত্যি কথা কি জান কণা, সেলিনা আমার

জীবনে যেমন এক ঝলক মুক্ত হাওয়া, তেমনি কেবলমাত্র সেই আমার জীবনে নিয়ে আসতে পারে প্রচণ্ড ঝড়, যাতে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে যেতে পারে আমার, কেন তোমার এরকম মনে হয়। তাতো বলতে পারবো না। শুধু অনুভবে বুঝতে পারি ছায়ার মত তার উপস্থিতি। তাই কখনো কখনো এত দুর্বল হয়ে যাই যে আমার নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

ও আমার একটা হাত নিজের হাতেব মধ্যে নিয়ে বলে প্রান্তিক, অপরাধ তুমি করতে পার না। শুনেছি তপতীদি তোমাকে একদিন ভীষণ ভালবাসতো। রেহানার কথা থাক, হয়তো তার স্তরে নিজেদেব পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু সেলিনা, সে যে তোমাকে কি পরিমান ভালবাসে তার কল্পনাও তুমি করতে পাববে না। আমাদের বাধন কাটাতে পারলেও তার বাধন তুমি কোনদিন কাটাতে পারবে না। সে হয় তো কোন দিন তোমাকে ভালবাসার কথা বলেনি, হয়তো বলবেও না, কিন্তু অন্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিক্তিতে ওজন করে নিয়েছে তার ভালবাসার ভার কতো। আজ তোমাকে বলতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা নেই, ও আমাদের সকলের ছোট অথচ সবাই আমরা হেরে গেছি ওর কাছে। তোমাকে আমার অনুরোধ, যদি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে সেই ভালবাসার অধিকারে দাবী করছি, যদি সত্যিই রেহানা ছাড়া তোমার জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, সেলিনাকে গ্রহণ করো, তোমার তপ্তমরু হৃদয় একমাত্র ওইভরে দিতে পারে মরুদ্যানে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কণা আজ তোমাকে বলতেই হবে, জীবনে যদি এমন কিছু ঘটে পারবে মেনে নিতে? অশ্রুকণা বলল, আমি রেহানাব মতো বড় নই, তাই তোমার মঙ্গল কামনায় সে যেমন হারিয়ে যেতে পারে, আমি তা পারি না। আমি একেবারে সাধারণ মেয়ের মতন একান্ত করে পেতে চাই আমার ইপ্সিতকে। তোমার কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে ভাগ আমি চাই না। আমি মরে যাব, সেও ভালো তবু মেনে নিতে পারবো না আর কারো দাবীর অধিকার। তাই অভিমান বা রাগ আমার যাই থাকুক, সে শুধু আমারই থাকুক। আর সেজন্যই কষ্ট হলেও একদিন যেমন রেহানার কাছে হেরে গিয়েও জয়ী হতে চেয়েছিলাম, আজো তেমনি সেলিনার হাতে তোমাকে তুলে দিয়েও জয়ী হতে চাই। অশ্রুকণার আভিজাত্য ব্যর্থতার মধ্যে খুঁজে পাক তার চরম সার্থকতা। পারবে না মন থেকে, তোমার কণার প্রেমিকা সত্তা মুছে দিয়ে শুধু তোমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে।

কি যে মনে করে ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা যাবে না। মনে হতে লাগলো অশ্রুকণা আমাকে এই চরম পরীক্ষায় ফেলে প্রমাণ করতে চায়, তাকে হারানোর সাধ্য কারো নেই। আমি বললাম, জীবনের স্মৃতি কি মুছে দেওয়া এত সহজ? কি করে ভুলে যাব, প্রথম যে দিন গঙ্গার ঘাটে বিশাল বট গাছের নীচে আমার জন্য বয়ে আনা টিফিন তুমি ফেলে দিয়েছিলে গঙ্গায়। আমার জীবনে রেহানা সেদিন তেমন করে আসেনি। ভুলতে পারবো কি ব্যাণ্ডেলে যাবে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েও আমাকে কিছু না বলে তোমার বাড়ীতে ফিরে যাওয়া। কেমন করে ভুলবো রেহানার জন্য নিজে সরে দাঁড়ানো, যে চরম অভিমানে তুমি আমাকে পেতে চেয়েছো, তার কোন মর্য্যাদাই দিতে পারলাম না

একথা ভুলবো কি করে? কি করে ভুলবো, আমাকে সকলের থেকে উঁচুতে জায়গা দিতে গিয়ে চিরদিনের জন্য তোমার বাবা-মাকে ছেড়ে আসা। পারবো কি ভুলে যেতে আমাকে না জানিয়ে তুমি যেতে পারোনা এই তীব্র অভিমানকে। যে জোর সেলিনার আছে বলে তুমি বলছ, সেই জোর তোমার থাকবে না? ম্লান হাসল অশ্রুকণা, যে হাসিতে দুঃখ আনন্দ ব্যথা বেদনা সব কিছু একাকার হয়ে যেন চরম প্রশান্তি নেমে এল। বলল, আমার জোর নেই কে বলেছে? জোরের কথা যদি বল, একদিন নিজেই জানতে পারবে আমার থেকে কারো বেশী জোর নেই, না রেহানারও নেই। যত ভালবাসাই তোমার পরে তার থাকনা কেন, একদিন তোমার মনে হবে জীবনের আনন্দ যজ্ঞে সে তোমাকে ঠকিয়েছে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কণা এ তুমি কি বলছ? ও কোন প্রতিবাদ না করে বলল, আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করো না। আমি ওই ভাবে বলিনি। তোমার জীবনে রেহানার অভাব আমি বুঝি। কিন্তু এও বুঝি সে তোমাকে পূর্ণতা দেয়নি, দিয়েছে চরম শূন্যতা আর হাহাকার। হয়তো রেহানা এমন এক জীবন বেছে নিয়েছে, যত মহানই সে জীবন হোক, সে জীবন তোমার জন্য নয় প্রান্তিক। যদি তার সন্ধান পাও কোন দিন সে মহাজীবনের করুণা তোমার ওপর বর্ষিত হতে পারে, কিন্তু তোমার সুখ দুঃখের সাথী হয়ে তোমার আপন ঘরে সে আর ফিরে আসবে না কোন দিন। তুমিও পারবে না নিজেকে তার সামিল করতে, যদি পার, তাহলে মনে করব, আমার ভালবাসা মিথ্যাই শুধু নয়, জীবন সম্পর্কে আমার গোটা ধারণাটাই ভুল।

হয়তো অশ্রুকণা যা বলেছে সে তার বিশ্বাসের কথা। হয়তো রেহানা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন মনগড়া। কি করে ভুলে যাবো রেহানার ভালবাসা, তার সেই কথা, প্রান্তিক আমিতো তোমারই। আমি যখন বলেছিলাম, কিন্তু কেউ যদি তোমাকে ছিনিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে? বলেছিল রেহানার দেহটাইতো সব নয়, তার মন? সে তো তোমারই প্রান্তিক। আমি জানি, কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর সেটা ভালো করে জান বলেই এই অকারণ ভয় দেখাচ্ছো আমাকে। সেই রেহানা, আমাকে ছেড়ে অন্য জীবন বেছে নেবে? না অশ্রুকণার একথা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছেনা। ও বলল, কিছু ভাবছো? বললাম, না, শুধু মনে হচ্ছে কি বিচিত্র এই জীবন। সম্রাট সেকেন্দার শা'র সেই অমর উক্তি 'কি বিচিত্র এই ভারতভূমি'। ও সেদিকে না গিয়ে বলল, তোমাকে কি আমি আঘাত করেছি? আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, ভালবাসা যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় আঘাত সেখানে বাজে না। পূর্ণ ঘটে কি শব্দ হয়? তারপর এক সময় বললাম, রাত হয়েছে আমাকে যেতে হবে। জানতে চাইলাম মা কি উঠেছেন? তুমি বোস, আমি দেখছি।

কখন যেন ঘুমিয়ে গেছেন মিনতি সেন। আমি চলে যাব জেনেও ডাকতে মায়া হল ওর। এতক্ষণ শুধু গল্পই করেছে অশ্রুকণা। একবারও জিজ্ঞাসা করেনি, আমি কখন খেয়েছি। এখান থেকে বাড়ী ফিরতে তো অনেক রাত হবে, এতক্ষণ না খেয়ে থাকবে? এক অব্যক্ত ব্যথায় ভিতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে, অশ্রুকণার। ফিরে এসে বলল, পিসি ঘুমাচ্ছেন, আজকের রাতটা তুমি থাকতে পার না।

বললাম ভীষণ লোভ হচ্ছে, আজকের রাতটা তোমার কাছে থাকতে। তারপর ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, আমার এই ক্ষণিকের দুর্বলতাটুকু ক্ষমা করতে পারবে তো। ও বুঝি ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ কাঁদছিল এবার টপটপ করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি বললাম ছি কণা! তোমার চোখে জল? আমি মুছে দিতে চাইলে ও বাধা দিয়ে বলল, সামান্য অবাধ্য জলকেও তুমি সহ্য করতে পারছো না। থাকনা ওটা আপনা আপনি শুকিয়ে যাবে। আমি বললাম তাই থাক। হয়তো তোমার চোখের জল এক সময় শুকিয়েও যাবে, কিন্তু আমার কাছে এ মুহূর্তটুকু যে অমরত্ব পেল তার মূল্যতো কম নয়। মাকে বলো আমি আসছি।

উঠে যখন পড়ছি, ও বলল, ভীষণ লোভটাকে কি অবলীলায় তুমি দমন করতে পারলে, কিন্তু সারারাত আমার কাটবে কি করে সে কথাতো বলে গেলে না? আমি বললাম, শ্রীরাধিকার সেই অভিশাপ তোমার মনে আছে? তাকিয়ে আছে দেখে বললাম "আমার পরান যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।" প্রচণ্ড আঘাতে যেন বুক ভেঙে যাচ্ছে অশ্রুকণার, উঃ বলে চিৎকার করে উঠে অশ্রুকণা। বলল কি নিষ্ঠুর তুমি। আমি বললাম তোমার থেকেও।

মন, না চাইলেও যেতে হবে আমাকে। অশ্রুকণাও জানে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে না করলেও ছেড়ে তাকে দিতেই হবে। কত ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস, এই ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে অলিখিত হয়ে বেঁচে আছে কে তার হিসাব রাখে? ভেজানো দরজা খুলে পা রাখলাম বাইরে। ও আবার পিছু ডেকে বলল, প্রান্তিক, শুধু এই একটা রাতের জন্য আমার স্বপ্ন কল্পনাকে তুমি বাস্তবায়িত করতে পার না? আমি ছল ছল চোখে তাকালাম ওর দিকে। বলল, কি যে হচ্ছে আমার বুকের মধ্যে দেখবে একবার? আচমকা তুলে নিল আমার হাত। আমি থর থর করে কেপে উঠলাম। ও আমার হাতটা তার নিজের বুকে রাখতে গিয়েও ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি চলে যাও প্রান্তিক তুমি চলে যাও এরপর হয়তো আমি তোমার কাছে ভীষণ ছোট হয়ে যাব।

আমি তার আবেগকে বুঝতে পারছি। সংক্রামক রোগের মতো তা যে আমাকেও সংক্রামিত করে চলেছে, ওর দুটো হাত নিজের দুহাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, দু হাতের করতলে আমার কম্পিত ওষ্ঠধর নামিয়ে এনে গভীর ভালবাসার চিহ্ন একে দিলাম।

বেরিয়ে যখন আসছি, ও এল পিছু পিছু, বলল সেলিনা যদি যেতে চায়, ওকে কিন্তু নিয়ে এসো। আমি অবাক হয়ে বললাম সেলিনা কেন? ও মৃদু হেসে বলল এমুহূর্তে তোমাকে বড্ড দুর্বল লাগছে প্রান্তিক। একা পথ ভুল করতে পার। সেলিনা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। অভিমানে বললাম, আমায় তুমি ঠাট্টা করছ? অশ্রুকণা বলল, ছিঃ প্রান্তিক, ওকে না নিয়ে এলে যে সারা জীবন তোমাকে ভুলের খেসারত দিয়ে যেতে হবে। আমার মাথার দিব্যি ওকে তুমি জোর করেই নিয়ে এসো। তারপর বলল আমার লোভের মাত্রাতো জানি, ও যদি আসে, বেশ কয়েকটা দিনের জন্য আমি তোমাকে কাছে পাবো, একি আমার কম লোভ। আচ্ছা বলে আর ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

অতরাতে ফেরার জন্য নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, কেন যে এত রাত কর প্রান্তিক।

তোমাকে আগেও বহু বার বলেছি, মিনতির ওখানে যেদিন যাবে, সেদিন রাত হলে একটা ফোন করে দেবে। আসতে হবে না। তোমার তো দেখছি আমাকে গুরুত্ব না দিলেও চলে। আমি এগিয়ে এসে পিসির মুখ চেপে ধরে বললাম, আর কখনো একথা বলবেনা। আমাকে কেন বোঝনা পিসি। তোমাকে বাদ দিলে কি আমার গুরুত্ব? পিসি তবু রেগে গিয়ে বললেন, অনেক গুলো ভালো ভালো বুলি শিখে নিয়েছো তাই দিয়ে চুম্বকের মতো টানো সকলকে। চারিদিকের যা অবস্থা, প্রতিদিন রাজনৈতিক খুন, ছিনতাই রাহাজানি খুন হয়েই চলেছে, ভয় হয় না? অথচ একটা সংবাদ দেওয়ারও প্রয়োজন বলে মনে করো না।

বুঝতে পারছি, যে কোন কারণে পিসি রেগে আছেন। সেলিনা এগিয়ে এসে বলল, কেন রাগ করছ মা। তোমার এখানে কি ভাবে সংবাদ দেবে। আমাদেরই বরং উচিৎ ছিল, মিনতি পিসির বাড়ী ফোন করে জানা প্রান্তিক ভাই কখন আসছে। তাইতো প্রান্তিক ভাই? পিসীর কথা যদিও বা সহ্য করা গেল, কিন্তু সেলিনার কথায় যেন সমস্ত শরীরে আগুনেব ফোস্কা পড়ল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে পিসিকে বললাম, উপায় ছিল না পিসি, হঠাৎ মিনতি সেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর কালই অশ্রুকণার নতুন জায়গায় যোগদানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে করতে একটু রাতই হয়ে গেল। মিনতি সেন কিছুতেই ঘুম থেকে উঠছেন না আর তাকে না বলেও আসতে পারছিনা। এই উভয় সংকটে পড়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্য না বলেই এসেছি, তুমি চিন্তা করবে। পিসি বললেন তাহলে আমার কথা ভেবেছিলে, এটাই যথেষ্ট প্রান্তিক, তবুও তোমাকে আমার অনুরোধ, মিনতির ওখানে গেলে তোমার আসতে অসুবিধে হতে পারে, তাই একটু জানিয়ে দিয়ে থেকে যাবে। ভবিষ্যতে কোন দিন এতরাত করে বাড়ী ফিরবে না।

পিসি আর কোন কথা না বলে রান্না ঘরে চলে গেলেন। সেলিনা বলল চল প্রান্তিক ভাই খাবে। সকালে পিসি আগে খেয়ে বেরিয়ে যান, সেলিনা যেদিন বেরোয় আমার আগেই বেরিয়ে পড়ে, দুপুরের খাওয়া আমাকে একাই সারতে হয়, কিন্তু রাতে আমরা এক সঙ্গেই খাই। একটা পারিবারিক স্পর্শ লেগে থাকে তাতে।

খেতে খেতে সেলিনা জানতে চাইল, তা হলে তোমাদের ট্রেন কখন প্রান্তিক ভাই। আমি অবাক হয়ে বললাম আমাদের ট্রেন মানে? বাঃ অশ্রুদিকে তুমি এগিয়ে দিতে যাবে না? না, এখনো সেই অভিমান? তারপর বলল দেখ প্রান্তিক ভাই এত অভিমান কিন্তু ভাল নয়। হঠাৎ বললাম, না আমি যাব না। সেলিনা হেসে ফেলল। পিসি বলল, তুই হাসলি যে, বাঃ হাসব না। প্রান্তিক ভাইকে যেতেই হবে, ও ভালো করেই জানে ওর না গিয়ে কোন উপায় নেই, তবু বলছে যাব না। হাসব না। পিসি বললেন, তুই সব জেনে বসে আছিস। জানিই তো। প্রান্তিক ভাই যদি শেষ পর্যন্ত রাজী না হতেন, তাহলে কিছুতেই এত রাতে বাড়ী না ফিরে অনেক আগেই ফিরতেন। আমি অবাক হয়ে ভাবি এ মেয়ে কি সর্বজান্তা। কিন্তু ওর কোন কথার প্রতিবাদ করারও সাহস হল না আমার। নীলাঞ্জনা পিসি বললেন, ও না গেলে তো সেই মিনতিকেই যেতে হতো ও যদি যেতে রাজী হয়ে থাকে তাহলে তো বলব ও ঠিকই করেছে, বাবা-মাকে ছেড়ে ও এসেছে, এখন প্রান্তিক যদি সব ব্যাপারেই

ওকে এড়িয়ে চলে তাহলে মেয়েটিই বা দাঁড়ায় কোথায় বল? আর ও যখন রাজী হয়েছে তখন উল্টো পাল্টা কথা বলে তুই আবার ওকে বাধা দিচ্ছিস কেন সেলিনা? যেন আকাশ থেকে পড়েছে, এই ভাবে সেলিনা বলল. আমি বাধা দিচ্ছি? আমি তো আরো প্রান্তিক ভাইকে যেতে বলছি। আমার কথার তুমি এই মানে বুঝলে। থাক আমাকে অত মানে শেখাস না। দেখতে পাচ্ছি, আজকাল প্রান্তিক যাইই করে তুই তার বাঁকা অর্থ করিস। অভিমানে উঠে পড়ে সেলিনা। বেশ আমি কোন কথাই বলব না। এখনতো দেখছি আমার কথারই তুমি বাঁকা অর্থ কর। তারপর এতদিন অশ্রুদিব সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে প্রান্তিক ভাই তুমিতো তার জন্য কিছুই বললে না, আর অশ্রুদি যেই মাত্র কান্নাকাটি করে কোন ভাবে প্রান্তিক ভাইকে রাজী করিয়েছে, সেই মাত্র প্রান্তিক ভাই ভাল হয়ে গেল। আর আমি হয়ে গেলাম খারাপ? ঠিক আছে, আমি আর কোন কথাই বলব না, আর থাকবও না তোমাদের কোন কথার মধ্যে।

আমি বললাম সেলিনা বোস, পিসিকে তুমি ভুল বুঝছ কেন? পিসিতো তোমাকে এমন কিছু বলেননি, ও আমার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল তোমরা কথা বল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে আমি চললাম। সত্যি সত্যি ও চলে গেল।

আগে পিসির ঘরে আলদা বিছানায় ও রাত কাটাতো। ওর পড়াশোনার অসুবিধা হয় বলে পাশের যে ঘরটা এতদিন অব্যবহারে পড়েছিল সেটাই সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা আমার ও পিসির ঘরের মাঝখানে। ও সেই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নীলাঞ্জনা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। উঠে গিয়ে ওকে ডাকলেন কয়েক বার। কিন্তু সেলিনা বলল. আমার ঘুম পাচ্ছে, আমাকে আর বিরক্ত করোনা মা। নীলাঞ্জনা আর অপেক্ষা না করে ফিরে এলেন। বুঝতে পারছি খুবই আঘাত পেয়েছেন নীলাঞ্জনা পিসি। মাতৃত্বের সবটুকু অধিকার তাকে দিয়েও কেন যে এই অভিমান কে জানে? আমি বললাম, ওতো চিরদিনই এই রকম, ও বলছিল বোলুকনা, আমিতো ওর কথায় কিছু মনে করিনা পিসি।

নীলাঞ্জনা বললেন তা ঠিক। তারপর কী ভেবে বললেন, এক কাজ করো প্রান্তিক তুমি ওকেও নিয়ে যাও। এখানে থাকলে কে জানে ওর এই অভিমান কদিনে ভাঙবে? আমারও খুব খারাপ লাগবে। বরং তোমার সাথে গেলে হয়তো আস্তে আস্তে এ অভিমান এক সময় জল হয়ে যাবে। যদি যেতে না চায়? জোর করে নিয়ে যাওনা। আমার বিশ্বাস তুমি জোর করলে ও অমত করবেনা। আচ্ছা কাল সকালেই দেখব। কাল সময় হবে না আজই রাজী করাও। কি করে করাবো, ও যদি দরজা না খোলে। খুলবে। বললাম যদি খোলেও আমার প্রস্তাবে কি রি-অ্যাক্ট করবে কে জানে?

আমি খেয়ে উঠে পিসির সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে, নিজের ঘরে যাওয়ার সময়, ওর দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে ডাকলাম ওকে। কিন্তু ও কোন সাড়া দিল না। আমি ওযাতে শুনতে পায় তেমনি ভাবে বললাম, আমি জেগে থাকব। তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ জরুরী কথা আছে, একবার এসো লক্ষ্মীটি। তারও কোন প্রতি উত্তর ও দিল না। পিসি বললেন, তুমি নিজের ঘরে যাও প্রান্তিক। ওকেতো বললেই, ওর সঙ্গে তোমার কথা আছে,

যদি ওর প্রয়োজন থাকে ও যাবে তোমার কাছে, না হলে আর কি করা যাবে। নীলাঞ্জনা পিসিও খানিকটা বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

রাত ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে এসেছে ও আসতে পারে, এই আশায় আলো জ্বালিয়ে শুয়ে আছি। মুহূর্তের পর মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে যায়। গভীর ঘুম নেমে আসে চোখে, ও তবু আসে না। তারপর বাত কত হবে জানিনা ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢোকে সেলিনা। ওই রাতেও সেজেছে পরিপাটি করে। চোখে দিয়েছে সুর্মা, সুন্দর এলো খোঁপায় বেঁধেছে চুল, গলায় একটা সরুচেন চিক্‌চিক্ করছে ঘাড়ের কাছে, কপালে সবুজ টিপ দুই ভুর মাঝখানে। ধূসর রঙের শাড়ী পরেছে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। চোখে অদম্য কৌতূহলের দুষ্টুমি। অপূর্ব লাগছে ওকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল বা খুব সুন্দর লাগছে তো তোমাকে, কিন্তু সে যে তার এক তারাতে কি সুর বেঁধেছে কে জানে? তাই কিছুই না বলে বললাম তুমি? কেমন লাগছে বললে নাতো। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —

হারিয়ে যাওয়া মুখর রাতে
তোমায় আমি চেয়েছিলাম,
আসলে নাতো সেদিন প্রিয়া
তবু তোমায় পেয়েছিলাম,
ধূসর বাতের অন্ধকারে,
স্বপ্ন ভেলায় সওয়ার হয়ে
তোমায় যখন ছুঁয়েছিলাম,
আকাশ ভরা তারার রাতে,
হঠাৎ কখন মিলিয়ে গেলে
আবার যদি আসলে ফিরে
চোখের তারায় আগুন জ্বেলে,
কোন সে ফাগুন জ্বালাতে চাও?
একটু খানি তাকিয়ে দেখ,
তপ্ত হৃদয় মরুর রাতে
আঁচল হাওয়ার দুষ্টুমিতে
অভিমানের কি দাম পাও।

জড়তাহীন লাইনগুলো কেমন করে যে হৃদয় আবেগকে ঝরিয়ে দিতে পেরেছিল বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলাম ও যখন বলল

অভিমানের হৃদয় মাঝে
দেখতে তুমি পাও কি আমায়?
কেমন করে আসি আমি

সেতো তোমার জমার খাতায়
না মেলা এক অংক, তুমি
মেলাতে চাও বারংবার,
ভাবতে তুমি পেরেছো কি
এই এসেছি আবার যখন
হারানো মন খুঁজে পেতে
সুর বেধেছি এক তারাতে
চিনতে তুমি পারবে কিগো
সেই সুরেরই ঐক্যতান।

দুহাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, না সেলিনা পারবো না, পারতে আমি চাইও না, কেন পারবো? কিসের জন্য পারবো? যে সুরের ঐক্যতান নিয়ে আজ তুমি এসে দাঁড়িয়েছো আমার দুয়ারে, নিঃশব্দ রাতের ক্ষণিক উষ্ণতায় লুণ্ঠন করে তাকে খান খান করে দিতে চাই না। তারপর বললাম জানতে চাইছিলেনা, কেমন লাগছে আমাকে? বললে নাতো! আনত চোখ দুটি নামিয়ে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। আবেগে থর থর করছে তার সমস্ত দেহ বল্লরী। এত দুর্বলতো কোন দিন মনে হয়নি সেলিনাকে। মায়া হল, মনে হল যে সুরের ঐক্যতান নিয়ে ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার দ্বারে, আমার গোপনতার অন্ধকারে তাকে একাকার করে দিই। কিন্তু পারলাম না, এবারও হেরে গেলাম ওর কাছে। ও বলল, আর এগিয়োনা প্রান্তিক ভাই, মধ্য রাতের এ স্মৃতি নিয়ে কেমন করে এগিয়ে দেবে তুমি কাল অশ্রুদিকে। তার চেয়ে তুমি ফিরে এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

ও আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বললাম সেলিনা। বল কাল তুমি যাবে আমার সাথে? কোথায়? অশ্রুকণাকে এগিয়ে দিতে তুমিও চল আমার সাথে। এতক্ষণ বুঝি এই কথাই ভাবছিলে? এটা আমার উত্তর নয়। ও বলল, আমাকে সঙ্গে নিলে সব ছন্দ হারিয়ে যাবে তোমার। কেন? আমিতো শান্ত সরোবর নই, আমি উত্তাল সমুদ্র, ঢেউয়ের তালে তালে তুমি যদি নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে ব্যর্থ হও, সেতো আমারই ব্যর্থতা। তার চেয়ে তুমি একাই যাও। আমি চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে, ও বলল, তাছাড়া অশ্রুদির তোমাকে একা পাওয়া ভীষণ প্রয়োজন। আমি মৃদু হেসে বললাম হয়তো প্রয়োজন তার থাকতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনে সঙ্গ দিতে গিয়ে যদি পথ হারিয়ে ফেলি? চোখে সেই অব্যর্থ দুষ্টুমি মাখা হাসি। ভয় নেই, আমার অশরীরী কায়া তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তবু তুমি যাবে না? কেন পাগলামী করছ। এবার ঘুমাওতো বলে ও চলে গেল। কিন্তু কি যে দিয়ে গেল, কেমন করে মেলাই তার হিসাব?

জানি অংকের হিসাবের সঙ্গে জীবনের হিসাব মেলে না। মিনতি সেন সরাসরি অশ্রুকণাকে নিয়ে হাওড়াতে চলে যাবেন। আমি যাব এখান থেকে ৮ টায় ট্রেন। সুতরাং আমাকে ৭টা থেকে ৭.১৫ মি. মধ্যে বেরোতেই হবে। সকালে উঠে প্রস্তুতও হয়েছি।

সেলিনাও যথা সম্ভব সাহায্য করেছে। নীলাঞ্জনা বললেন, সেলিনা, মা তুইও যা, কয়েকদিন থেকে আয় অশ্রুদের সাথে, ওর ও ভাল লাগবে, তোরও ভাল লাগবে। সেলিনা বলল কেন যে বিরক্ত কর মা, বারবার এক কথা বলে, একদম আমার ভালো লাগে না, বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আর দেরি করলে ট্রেন মিস্ করতে পারি। ওর দরজার কাছে গিয়ে বললাম, সেলিনা আসছি, তারপরে কণ্ঠে আবেগ ঝরিয়ে বললাম ঠিক আছে তোমাকে যেতে হবে না, তাই বলে যাওয়ার সময়ও তুমি দরজা বন্ধ করে থাকবে? কণ্ঠে বুঝি আবেগের সঙ্গে মিশেছিল বিষণ্ণতার ছোঁয়া। কোন উত্তর নেই ভেতর থেকে। পিসিকে প্রণাম করে আমি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি, হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এল সেলিনা, ঠিক যে পোষাকে ও কাল রাতে এসেছিল আমার কাছে। শুধু খোঁপাটা এলো নয়, চুল সুন্দর বেনী করে বাঁধা। কাঁধে শান্তিপুরী ঝোলা ব্যাগ। বেরিয়ে এসে বলল চল প্রান্তিক ভাই। আমি অবাক হয়ে বললাম কোথায়? ওর কণ্ঠে সেই চাপল্য, বলল নিজের স্বার্থটাতো ভাবতে হবে, তোমাদের অবাধ্য হয়ে নিজের স্বার্থ বাঁচাব কি করে? দেখতে পাচ্ছি নীলাঞ্জনার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, সেই যখন যাবিই ঠিক করলি, কিছু না খেয়ে বেরোবি। দাঁড়া একটা মিষ্টি আর এক গ্লাস জল খেয়ে যা। বাধ্য মেয়ের মত তাই খেয়ে নিয়ে, আমাকে বলল, গাড়ীতে উঠে কিন্তু খাওয়াবে প্রান্তিক ভাই। পেটে অত খিদে নিয়ে আমি কিন্তু এতটা পথ যেতে পারবো না। বললাম আচ্ছা। রাস্তায় নেমেও আবার দ্রুত ফিরে এল ও ঘরে। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো। কি জানি, আবার মত পরিবর্তন করবে কি না। কিন্তু না, ও এসে নীলাঞ্জনাকে প্রণাম করে বলল, চিন্তা করো না মা, আমি যত জেদীই হইনা কেন তোমাদের অবাধ্য হব না, বলে নীলাঞ্জনাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই আবার দ্রুত ফিরে এল। একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত দিয়ে থামিয়ে উঠে পড়লাম। বসলাম পাশাপাশি, ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলে বললাম, কাল থেকে বলছি চল আমার সাথে, পিসি বলেছে, তবু এত উৎকণ্ঠায় রাখলে কেন? ও শুধু হাসল। হাসলে যে। না এমনি। শুধু এমনি, না অন্য কিছু ভাবছিলে? ও আস্তে আস্তে আমার একটা হাত ওর হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, কি জানি কেন ভীষণ ভয় করছে, কেন যে বুকটা এমন করে খাঁ খাঁ করছে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তারপর বলল এই সব অশুভ চিন্তাকে সরিয়ে রাখতে প্রাণপনে যুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারলাম না তোমাকে একা ছেড়ে দিতে, যদি অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করে দিও। তারপর বলল, আমার মনের মধ্যে যে কী হচ্ছে সে কেবল আমি জানি তোমাকে তা বোঝাতে পারবো না।

একোন সেলিনা! যতই দেখছি ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই রোদ তো এই বৃষ্টি, এই মরুভূমি তো পরক্ষনেই সাগরের উচ্ছল তরঙ্গ। কিছুতেই ওর মনের কিনারা খুঁজে পাচ্ছিনা। বললাম, তাহলে শুধু জিততেই পার না মাঝে মাঝে হারতেও জান, তাইনা? ও আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, হার জিতের মানে জান? বোঝ কাকে বলে হারা আর কাকে বলে জেতা? সেই পুরোনো সেলিনার মেজাজ যেন। বললাম, না জানিনা। কিন্তু ওখানেই না থেমে বললাম, বক্সিং-ই তোমার আসল জায়গা, যেখানে হার জিতই শেষ কথা।

তাই বলে ভালবাসার অভাব হয় না কোন দিন। ও বলল থাম? অনেক বড় বড় কথা বলছ প্রান্তিক ভাই। কতটুকু জান তুমি এই বক্সিং জগতের? জান ব্যর্থ যে হয় তার জন্য কাঁদে কত লোক? শুধু কথার মায়াজালে নিজের সত্যকে আড়াল করতে চাইছো। চাইছো না আমি তোমার সাথে যাই এইতো। তারপর বলল, নামিয়ে দাও আমাকে। যাবনা আমি তোমাদের সাথে? বললেই তো পারতে একথা, না ক্ষণিকের দুর্বলতায় ভুলে গিয়েছিলে সবকিছু। তোমার জীবন তোমারই, সেখানে রেহানা আসবে না অশ্রুকণা আসবে, সে অংকের হিসাব মেলাবে তুমি, কেন অকারণ আমায় জ্বালাতন কর। তারপর আমাকে কোন সময় না দিয়ে নিজেই আদেশ করল ড্রাইভার, গাড়ী রোখ্।

এই প্রথম রেগে গেলাম আমি। ড্রাইভারকে বললাম, কারো কোন কথা শুনতে হবে না। ট্রেনটা মিস্ না করতে হয় তার জন্য একটু তাড়াতাড়ি চালাও ভাই। তারপর সেলিনাকে বললাম, দেখ সেলিনা, সকলের সহ্যের একটা সীমা আছে আর আছে হেয়ালিরও, নিজেকে তুমি যতবড়ই মনে করো না কেন, তোমার মূল্য কতটুকু তা তুমি ভাল ভাবেই জান। কোন কিছুকে সোজাসুজি পেতে শেখো। ভালবাসলেও সোজাসুজি ভালবাস। ঘৃণা করলেও তা সোজাসুজি করো। আর একটা কথা জেনে রাখ জীবনটা তোমার হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তুমি আমাদের অস্বীকার করে বেরিয়ে না যাচ্ছো ততক্ষণ তোমার খেয়ালটাই একমাত্র সত্য হতে পারে না। বলেছিলে অপমান করতে করতে আমায় নাকি অপমানের নেশায় পেয়েছে। তুমি কি করছ? কে দিয়েছে প্রত্যেককে এত অপমান করার অধিকার? আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইলো। থেমে গেলাম। কিন্তু প্রচণ্ড রেগে যে গেছি তা বুঝতে পারার জন্য তৃপ্তিও পাই। কিন্তু আমার রাগ বা জ্বালাকে কোন গুরুত্বই না দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো সেলিনা। উত্তেজিত হয়ে বললাম, হাসলে যে। এবার শান্ত সরোবরের মতন স্থির যেন ও। বলল, তোমার ভিতরের এই পৌরুষটাকেই দেখতে চেয়েছিলাম প্রান্তিক ভাই, তোমাকে দুর্বল ভাবতে এত কষ্ট হচ্ছিল যে, শুধু ভাবছিলাম, যারা তোমার উপর নিজেদের ভাগ্যকে সঁপে দিতে চায়, তাদের বুক আগলে বাঁচাবার কোন ক্ষমতা তোমার আছে কি না।

একই নারীর কি বিচিত্র রূপ। ঠিকই বলেছিল কাল রাতে ও, আমিতো কেবল শান্ত সরোবর নই আমি উত্তাল সমুদ্র। নিজের সম্পর্কে তার এই মূল্যায়ন আমার মনে হয় ১০০ ভাগ খাঁটি। জিজ্ঞাসা করার সময় হলো না, তোমার কথা অনুসারে যারা আমার উপরে নির্ভর করতে চায় তাদের আগলে রাখার ক্ষমতা আমার আছে কি না, তারা কারা। তার আগেই গাড়ীটা ঢুকে গেল স্টেশনের ভিতরে।

প্লাটফর্মে গাড়ী দেয়নি তখনো, হয়তো এখনি দেবে। দেখতে পেলাম একটি কফি স্টলে দাঁড়িয়ে আছেন মিনতি সেন ও অশ্রুকণা। তারা এদিকে ওদিক তাকাচ্ছেন, আমরা এসেছি কি না তাই হয়তো খুঁজে দেখছেন, সেলিনা এগিয়ে এসে অশ্রুকণার হাত ধরে বলল, অশ্রুদি লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই চলে এলাম তোমাকে তোমার নতুন জায়গায় শুধু পৌছিয়ে দিতে নয়, কটাদিন থাকার বায়নাও নিয়ে এসেছি তাড়িয়ে দেবে নাতো।

এতো সেই পরিচিত সেলিনা। তোমাকে তাড়িয়ে দেব বলেই কি প্রান্তিককে অত করে বলেছিলাম আসতে না চাইলেও জোর করে নিয়ে আসবে। সেলিনা তাকালো আমার দিকে, অসম্ভব দুষ্টুমি ভরা দুটি চোখ। বলল, কই প্রান্তিক ভাই একবারও তো বললে না সে কথা। শুধু তুমি কিছু মনে কর কি না, তাইতো এত না আসার বায়না ধরেছিলাম। কিন্তু তোমার ছাড় পত্র নিয়েও এই গোপনতার মানে কি?

কি উত্তর দেব এর, তবু কিছু না বললে অশ্রুকণা ভুল বুঝতে পারে, তাই বললাম, তুমিই বলতো সেলিনা, সে সুযোগ কি তুমি দিয়েছো? কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা তুমি করেছো তাতে বলার সুযোগটা পেলাম কখন? হয় তো সত্যি। সেলিনা যে তা বোঝে না তাও নয়, তবু সে সেলিনা, যে কখনো হারতে জানে না। বলল পিসি তোমার ছেলেকে আমার পিছনে লাগতে না করে দাও, নিজে হাজারটা দোষ করবে আর অপরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে এটা ঠিক নয়, এটা অন্যায়। মিনতি সেন ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন হ্যাঁরে সেলিনা, ওখানে গিয়েও কি এমনি করে ঝগড়া করবি নাকি তোরা। এই দেখ পিসি, নিজের ছেলের অন্যায়টাকে কি কৌশলেই না তুমি আড়াল করতে চাইছো। হেসে ফেলেন মিনতি সেন, বললেন, এতো সব মায়েরই ধর্ম। তোর মা তোকে আড়াল করে না? করেন তো, আবার বকেনও। অবাক হয়ে মিনতি সেন বললেন, নীলাঞ্জনা তোকে বকেছে কোনদিন? হ্যাঁ বকেছো তো। এমন ভাবে বকেছে যে কাল রাতে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে সারারাত না খেয়ে রয়েছি। এখন মনে হচ্ছে দূর আমি কি বোকা। রাগারাগি করে না খেয়ে থাকার কোন মানে হয় নাকি। এখন খিদের কষ্টটাতো আর মাকে পেতে হচ্ছে না। আমাকেই ভুগতে হচ্ছে। তা পিসি যা হোক কিছু খাওয়াও তো আগে, তারপর কথা হবে।

আচ্ছা খাওয়াচ্ছি, বল কি খাবি? কি করে জানব তোমাদের কাছে কি আছে? আর এই সময় হুট হুট করে ট্রেনটা প্লাটফরমে ঢুকে গেল। মাইকে ঘোষনা করা হচ্ছে ১৫ নং প্লাটফর্মের গাড়ী নির্দিষ্ট সময়েই ছাড়বে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আর মাত্র ৫ মিনিট সময় বাকী আছে। অশ্রুকণা বলল ট্রেনে গিয়েই খাওয়া যাবে সেলিনা, আমারও খিদে পেয়েছে। তোমার মত কাল রাতে আমারও খাওয়া হয়নি। সেলিনা অবাক হয়ে বলল, কেন, তোমার খাওয়া হয়নি কেন? ঐ তোমারই মত। কি রকম? প্রান্তিক অতরাতে না খেয়ে চলে এল, পিসিকেও তাই আর বললাম না, ডাকলামও না, এই সবের জন্য আর কি? ওঃ এখানেও তাহলে সেই প্রান্তিক ভাই। তা হলে বুঝতে পারছ পিসি মা হয়ে ছেলেকে কেমন করে আড়াল করছো? তারপর বলল, তোমার ছেলে যদি না খেয়ে আসে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আসে তার জন্য তোমার নিজের ছেলেকেই বকা উচিত অশ্রুদিকে বকা কেন? ওকি করবে? ও কি বলেছে, তুমি খেয়োনা, মায়ের সাথে তোমার কথা বলার দরকার নেই। ওর কথা শুনে মিটি মিটি হাসছেন মিনতি সেন, সেলিনাকে বললেন, তোর অভিযোগ যথেষ্ট গুরুতর, আর ওখানে যে কয়দিন থাকবি, সব অন্যায় গুলো খাতায় লিখে রাখবি, তার পর ফিরে এসে আমাকে জানাবি, দেখবি কি রকম শাস্তি দিই। তুই কি ভেবেছিস মা হয়ে ওকে ক্ষমা করব? মোটেই নয়। মনে থাকবে তো। মনে থাকবেনা মানে, সাক্ষী নেই?

সেলিনা বলল যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকেই সাক্ষী মানতে হবে নাকি? তাহলে কাকে মানবি? অশ্রুতো থাকবেনা। ও বলল তোমাকেই মানবো। মিনতি সেন একটি ছোট্ট শিশুর মতো সেলিনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন আচ্ছা তাই মানিস। তারপর দ্রুত গাড়ী থেকে নামতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

মেদিনীপুরের এক আধা মফস্‌ল শহরের প্রান্ত ঘেঁষা আদিবাসী, তপশিলী ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল। স্কুলটা খানিকটা মিশনারী ধাঁচের হলেও মিশনারী নয়। ব্যয়ভার বহন করে প্রতীম বাবুদের কোম্পানী। ম্যানেজমেন্ট ওখানে যে সমস্ত শিক্ষয়িত্রীরা থাকতে চান তাদের জন্য যেমন হোষ্টেল এর এ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, তেমনি যারা থাকতে চান না, তাবা যাতে সময় মত স্কুলে আসতে পারেন তার জন্য গ্রাম্য যান-বাহনের বন্দোবস্ত রেখেছেন, এমন কি স্কুলের সকল শিক্ষার্থী, তাদের জন্য আলাদা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা রেখেছেন, সে সমস্ত কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ থেকে জ্বালানী পর্য্যন্ত সবকিছুই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। সপ্তাহে ৪ দিন হয় পঠন পাঠন, আর ২ দিন হাতে কলমে কাজ শেখানো হয়। অঞ্চলটা কৃষি প্রধান, তাই এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে কৃষি কাজটা বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শহর এখান থেকে অনেক দুরে। তাই এখানকার ছেলেমেয়েদের জন্য মাসে একদিন শিক্ষা মূলক যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখেছেন। ম্যানেজমেন্ট বিশ্বাস করে, এই সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছে দিতে হলে তাদের ভাষায় তাদের মতো করেই বোঝাতে হবে। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছালাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আগের থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যাতে কোন অসুবিধা না হয়। মেদিনীপুর শহর থেকে সারাদিনে একটি মাত্র বাস যাতায়াত করে। আর সেই বাস স্টপেজ থেকেও এখানকার দূরত্ব কমবেশী ২০ কি.মি., হয় সাইকেলে, না হয় ভ্যান রিক্সা অথবা হাঁটা ছাড়া যাওয়ার কোন বিকল্প উপায় নেই। মটর গাড়ী যাওয়ার কোন রাস্তা নেই, তবে সাইকেল বা ভ্যান রিক্সা যাওয়ার রাস্তা সরু হলেও পরিচ্ছন্ন।

আমাদের যিনি নিতে এসেছিলেন, তিনি সত্যভূষণ দোসাদ। ভদ্র শিক্ষিত এবং মার্জিত এক যুবক। আমরা নামতে তিনি নমস্কার করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের নিতে এসেছি।

রাস্তা দিয়ে চলছি। চারপাশের হত দরিদ্র মানুষগুলিকে দেখে কান্না আসার মত অবস্থা। এত দীর্ঘ পথে কোথাও একটা ভালবাড়ী চোখে পড়লনা। জামা গায়ে আছে এমন মানুষজনের সংখ্যাও খুব কম। সত্যভূষণ বাবু আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এখানকার মানুষজন খুবই গরীব, কিন্তু তাই বলে আপনারা শহরের মানুষেরা এই সব গরীব মানুষদের যে চোখে দেখেন এরা কিন্তু তা নয়, এদের আত্মমর্য্যদা সীমাহীন। এরা চুরি করে না, না খেয়ে থাকলেও ভিক্ষা করে না। বরং শহর থেকে যারা এখানে আসেন, তাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন, শহরের মানুষ এদের কখনো মানুষ বলেই ভাবে না। ছোট বড় সকলকেই তুচ্ছার্থে তুই তোকারি করেন। সামান্য ভদ্রতা

কবে তুমি পর্যন্তও বলেন না। অথচ এরা কিন্তু কোন কিছুই তেমন একটা গায়ে মাখে না। ... বিশ্বাস, ঈশ্বরই এই ব্যবধান যখন রচনা করেছেন তখন আর তাদের প্রতিবাদ করে কি লাভ? সেলিনা ও অশ্রুকণা কোন কথারই কোন উত্তর না করে চুপ করে শুনে যায় মিঃ দোসাদের বক্তব্য। আমি বললাম, সত্যভূষণ বাবু, আপনিতো এদেরই একজন। উনি বললেন হ্যাঁ। আপনি নন? আমি চমকে উঠলাম, সত্যভুষণ বাবু যে এমন চোখা প্রতি উত্তরে আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যেতে পারেন তা ভাবনার অতীত ছিল। বললাম, নিশ্চয়ই। আমি অবশ্যই এদেরও একজন, যেহেতু এরা মনুষ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কিন্তু আপনাকেই আমার জিজ্ঞাস্য আমার মনে হয় আপনি যথেষ্ট শিক্ষিত। উনি কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শিক্ষিত বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন জানিনা। যদি একাডেমিক কোয়ালিফিকেসানকে আপনি শিক্ষিতের মান দণ্ড হিসাবে বিচার করেন তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি গত বছর ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম.এ করেছি। অবশ্য এটাকে আমি কোন পবিচয় বলে মনে করিনা। কারণ একটু অনুকূল পরিবেশ আর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে যেকোন মানুষই আমার মত বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে এম.এ করতে পারেন। কারো নামের পাশে এক গাদা ডিগ্রী দিয়ে আমি তার মূল্যায়ন করিনা। সামান্য থেমে বললেন আমি মানুষকে বিচার করি তার হৃদয়ের সংবদেনশীলতা দিয়ে। মানুষকে আপন করে নেওয়াব ক্ষমতা কতটুকু আছে তাই দিয়ে তাকে আমি পরিমাপ করি। তারপর সুন্দর হেসে বললেন, থাক না ও সব কথা। আপনারা আজ প্রথম এসেছেন আর আসার সময় এই অখ্যাত অজ্ঞাত কুলশীল মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে এসেছেন। ভয় পেয়ে যেতে পারেন, সেই আশঙ্কাতেই এত কথা বলা। কিন্তু ওরা যে ভয়েব বস্তু নয়, এটাই শুধু জানিয়ে দিতে চেয়েছি। আমার বাচালতাকে ক্ষমা করবেন।

সন্ধ্যার পরে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছালাম মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। বিরাট স্কুল কমপাউন্ড। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অজস্র জানা অজানা গাছ-গাছালি আর কোয়ার্টারের সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। প্রত্যেকটা কোয়ার্টার একতলা, মেঝে পাকা, কিন্তু ছাদ টালির। এক একটা কোয়ার্টার থেকে আরেকটা কোয়ার্টারের দূরত্ব বেশ খানিকটা এবং কাটাতারের বাউন্ডারি দিয়ে তা আলাদা করা। সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাই কি অপূর্ব জায়গাটা তাই না? তারপর অশ্রুকণাকে বলল, অশ্রুদি তোমার ভাগ্যটা সত্যিই হিংসা করার মত। সত্যভূষণ বাবু বললেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না, তবে একথা আপনি ঠিকই বলেছেন জায়গাটা অপূর্ব। মানুষগুলো আরো অপূর্ব, শুধু যদি তাদের অনাড়ম্বর সাধারণ জীবন যাত্রাকে মেনে নিতে পারেন। আরেকটা কথা ভয় পাবেন না। এমনিতে এখানে কোন ভয় নেই, তবু ম্যানেজমেন্ট এই গোটা বাউন্ডারির বাইরে পাহারা দেওয়ার জন্য রক্ষী মোতায়েন রেখেছেন। নামেই তারা রক্ষী, আসলে তারা এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের দল। তাদের কাছে এই স্কুলটা দেব মন্দিরের মতন পবিত্র, তাই তারা নিজেদের গরজেই সারারাত ধরে পাহারা দেন কেউ যাতে এই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করতে না পারেন। ম্যানেজমেন্ট তাদের জন্য যা ব্যয় করেন, তা তারা কেউই হাতে নেননা, এই স্কুলকেই দান করে দেন। অশ্রুকণা এই

প্রথম বলল, আশ্চর্য তো। হ্যাঁ সত্যিই আশ্চর্য! তারপর বললেন, থাকতে থাকতে যদি এদের ভালো লেগে যায় তাহলে দেখবেন আরো অনেক ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমি বললাম, তা হলে কি আপনি বলতে চাইছেন এখানে চোব, গুন্ডা, বদমায়েস এ সব নেই? নেই কেন হবে? আছে। তবে আপনাদের শহরের মতো তারা মাথা উচুঁ করে চলে না। তারা এই সমাজ জীবনের বাইরেই থাকে। গ্রাম্য নেতৃত্ব তাদের সাধ্যমত বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে যে আপনি বললেন, এখানে কোন চোর-গুন্ডা নেই। আমি সেই ভাবে বলিনি, আসলে আপনারা শহুরের ভদ্রলোকেরা যেমন ভাবেন, গ্রামের গরীব মানুষ মানেই হয় গুন্ডা না হয় চোর আমি তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আপনার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক। উত্তরে মিঃ দোসাদ বললেন সেই অর্থে আমি প্রতিষ্ঠানের কেউ নই। প্রতীমবাবু একদিন আমাকে ডেকে বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাক আমি চাইনা, তবু যদি গ্রামকে ভালবেসে গ্রামেই থাকবে বলে মনস্থ কর তাহলে, এই প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দের দায়িত্ব গ্রহণ কর না। তা ছাড়া আমি এই স্কুলেরই ছাত্র। তাইতো তার অনুরোধকে ফেলতে পারলাম না, এই আর কি। সরকারি ভাবে আমি কেউ নই, শুধু ভালবাসার টানে থেকে গেছি। অবাক হয়ে শুনছে অশ্রুকণা ওর কথা। বুঝতে পারছি ওকে আমাদের সবার ভালও লেগে গেছে। উনি বললেন, আজ আর হবে না অশ্রুদেবী, তবে কাল থেকে এখানকার একটি মেয়ে আপনার সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেবে। ওকে বেতন দেওযার দায়িত্ব অবশ্য ম্যানেজমেন্টের। তাকে ভাল লাগলে আপনাকে শুধু সুপারিশ করতে হবে। অবশেষে বললেন আসি তাহলে নমস্কার। রান্না ঘরে সবই আছে এখানে রান্না কয়লায় করতে হবে। বাসন পত্র রান্নার সবই আছে। এবেলার মত তরিতরকারী, ডিম, ডাল রাখা আছে। ম্যানেজমেন্টের বাজার সরকাব কাল সকালে আসবেন, এখানকার ষ্টোর থেকে তিনিই সব পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাসের শেষে আপনার বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে। এটাই এখানকার নিয়ম। অবশ্য আপনি ইচ্ছে করলে বাজারটা নিজেও করতে পারেন। পারবেন কিনা বলতে পারবো না কারণ, কাছাকাছি কোন বাজার নেই। আসি তাহলে। উনি বেরোতে গিয়েও আবার ফিরে এসে বললেন। এই দেখুন সবই বললাম, কিন্তু চাবি দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম। এই ধরুন চাবি। চা-কফি-বিস্কুট, গুড়ো দুধ সবই আছে ষ্টোর রুমে। ষ্টোর রুম খুললেই দেখতে পাবেন।

না এরপর তিনি আর দেরি করেননি। সেলিনা বলল, অশ্রুদি চাবিটা দাও তো দেখি তোমার নতুন ঘরে কি আছে? আগে চা বা কফিতো খাওয়া যাক। অশ্রুকণা বলল তোমরা বোস সেলিনা আমিই দেখছি। সেলিনা বলল এখন থেকে এত নিজের নিজের ভাবলে চলবে কেন অশ্রুদি। আমরা চলে গেলেই না হয় ভেবো। আমি বললাম, কণা ওকে চাবিটা দিয়ে দাও, সত্যিই তো আমাদের চা বা কফি খাওয়াবার অধিকারতো ওর আছে। সেলিনা তার তীর্যক দৃষ্টি হেনে বলল, তাহলে মানছ আমার কথা, ও চাবি নিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে।

অশ্রুকণা চুপ হয়ে বসে আছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ওর ভাল না খারাপ কেমন লাগছে এই দ্বিধায় পড়েছে বোধ হয়। বললাম, কিছু ভাবছো কণা। না এমন কিছু নয়। ও

উঠে গেল। আমায় বলে গেল, সারদিনের পোষাকটা বদলে আসছি। তুমিও বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে জল দিয়ে পোষাকটা বদলে নাও। ভাবছি স্নান করব। ও আঁতকে উঠে বলল, না প্রান্তিক, নতুন জায়গা জ্বরটর আসতে পারে। এলোই বা, কয়টা দিনতো তোমার শুশ্রূষা পাব। ও থমকে দাঁড়িয়ে বলল, লোভ যে হয় না প্রান্তিক তা নয়, তবে সে অধিকারটুকু পাব কি না কে জানে। ও চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কফি, বিস্কুট, ডিম সিদ্ধ নিয়ে এল সেলিনা, আমাকে একা বসে থাকতে দেখে বলল, অশ্রুদি কোথায়? সারা দিনের পোষাকটা ছাড়তে গেছে। এখনি আসবে। তুমি ছাড়বেনা? তারপর বলল, তুমি একটু বোস আমি আসছি। ও ভিতরে গিয়ে দেখল, অশ্রুকণা কিছুই ছাড়েনি, একা একা কাঁদছে। সেলিনা বলল, অশ্রুদি তুমি কাঁদছো, সেলিনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার একদম ভাল লাগছেনা। সেলিনা এ চাকরি আমি কবব না। তোমাদের সাথেই ফিরে যাবো। সেকি কথা অশ্রুদি। এত সুন্দর জায়গা, কেন করবে না? কেন তুমি এরকম ভাবছো! জানি না, কেন আমার মোটেই ভাল লাগছেনা। আচ্ছা ঠিক আছে। কালতো রবিবার। কাল না হয় সারদিন ভেবো। এখন চল, আমি কফি করে ও ঘরে রেখে এসেছি, প্রান্তিক ভাই বসে আছে, আগে ওটা খেয়ে নাও, তারপর না হয় শাড়ী বদলিও। সেই গাড়ীতে কখন কি খেয়েছো। তারপর অশ্রুকণাকে এক প্রকার জোর করে নিয়ে এলো সেলিনা।

চুপচাপ কফিটা খেয়ে উঠে পড়লো ও। সেলিনা বাধা দিল না। ও চলে গেলে, সেলিনা বলল, জান প্রান্তিক ভাই অশ্রুদি শাড়ী বদলাবার নাম করে ঘরে গিয়ে শুধু কাঁদছিল। কাঁদছিল? কেন? তাব নাকি এ জায়গা একদম ভালো লাগছেনা, তাই অশ্রুদি এখানে জয়েনও করবেনা, আমাদের সঙ্গেই ফিরে যাবে। তুমি কি কিছু বলেছো? আমি উশ্মা প্রকাশ করে বললাম, হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করছ কেন? আমি ওকে কি বলবো? তারপর বললাম এত সুন্দর জায়গা যদি ওর পছন্দ না হয়, তাহলে কিছু করার নেই। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোথায় পাবে? ওরতো বরং প্রতীমবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এত সুন্দর একটা চাকরি ওকে পাইয়ে দিয়েছেন বলে? বাঃ তোমার বক্তৃতা শেষ? মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ হলেই বুঝি একা একা থাকা যায়? একা একা থাকবে কেন? সত্যভূষণ বাবুতো বলেছেন, কাল থেকে একটি কাজের মেয়ে আসবে। তাছাড়া এখানে ওর মতো আরো অনেক শিক্ষয়ত্রী আছেন, তারা কেমন কবে থাকছেন? তুমিতো জাননা তারা কেমন করে থাকছেন। হয়তো তাদের মনেও এই রকম দুঃখ আছে। আমি বুঝতে পারছিনা সেলিনা, কেন অশ্রুকণার এই ভাবনাকে তুমি সমর্থন করছো। তোমার জন্য। আমার জন্য? হ্যাঁ তোমার জন্য। মানে? যা হোক এমন কিছু তুমি বলেছো, যেটা অশ্রুদিকে আঘাত দিয়েছে। তুমি হয়তো আমায় বলতে চাইছোনা। তারপর বলল, তোমাদের সঙ্গে আমার আসাই উচিত হয়নি। কিন্তু কি করব এসে যখন পড়েছি।

আমি তারপর বিস্মিত হয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার একদম ভাল লাগছেনা সেলিনা। তাহলে কাগজ কলম দাও, লিখে রাখি কেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে? মিনতি পিসিকে রিপোর্টটা করতে হবে তো। কবে তুমি সিরিয়াস হবে সেলিনা?

কত সহজ ভাবে বলল, যেদিন তোমার মন, অন্যের জন্য সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। কি বলতে চাইছো তুমি? কিছুনা। অশ্রুদিকে কি বলেছো, তা তুমিই জান, আমি বাথরুমে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি ওকে তোমার মত করে বোঝাও, একটু জিততে চেষ্টা কর প্রান্তিক ভাই? সব জায়গায় এত হেরে যাও কেন বলতো। মনে রেখ দুর্বল পুরুষকে করুনা করা যায় শ্রদ্ধা করা যায় না।

ও কফির সরঞ্জামের সব কিছু নিয়ে চলে গেল। অশ্রুকণার দুঃখ হয়তো বুঝতে পারছি। মনের মধ্যে যে গোপন স্বপ্নগুলো থাকে, বাস্তব, পারিপার্শিকতা, আর যৌক্তিকতা যাকে প্রতিমুহূর্তে প্রতিহত করে চলে, এমনি এক উন্মুক্ত মনোরম পরিবেশে, তা হয়তো প্রকাশ হতে চায়। অশ্রুকণার মনের মধ্যেকার সেই স্বপ্নগুলো হয়তো বেরিয়ে আসার জন্য গুমরে মরছে, কিন্তু সে জানে, তার কোন উপায় নেই। তাই হয়তো চাপা অভিমান চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু আমি কি করবো। তবু আস্তে আস্তে গেলাম অশ্রুকণার কাছে। চেয়ারে বসে মাথাটা উপুড় করে টেবিলে রেখে চুপ করে আছে। পিঠ থেকে আঁচলটা সরে গিয়ে উন্মুক্ত পিঠের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আমি ওর পিঠে হাত দিতেই ও টেবিল থেকে মাথাটা তুলেই মুহূর্তে আমাকে দেখে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বলল, না প্রান্তিক আমি পারব না কিছুতেই পারবো না তোমাকে ছেড়ে থাকতে। আমি আস্তে আস্তে ওকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়াবটায় বসিয়ে দিয়ে বললাম, কণা, এভাবে কেন নিজের দুর্বলতায় আরেকজনকে আচ্ছন্ন করছ? কেন বুঝতে পারছনা এখানে সেলিনা আছে। ও যে কিছু বোঝেনা তাতো নয়। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ওর অনুভূতি প্রখর, ওর উপলব্ধি সীমাহীন, কেন তার কাছে এভাবে ছোট হয়ে যেতে চাইছো। তা ছাড়া তাকে নিয়ে আসার জন্য তো জোর তুমিই করেছিলে। তাহলে এমন করছ কেন? আর আমার কথা কেন একদম ভাবছনা। তোমার এই দুর্বলতা আমাকে কত দুর্বল করে দিতে পারে বুঝতে চাইছোনা কেন? এরপর মুখ দেখাবো কি করে?

অশ্রুকণা বলল, তোমাকে যে বুঝতে পারছি না তা নয় প্রান্তিক। আসলে আমি নিজেকে বোঝাতে পারছি না। যে চরম অভিমানে একদিন বাড়ী ত্যাগ করেছিলাম, আজ কেবলি মনে হচ্ছে সে আমার ভুল। ওকে বাধা দিয়ে বললাম, সত্যিইতো। না সত্যি নয় কি সত্যি নয়। এই যে তুমি বললে বাড়ী থেকে চলে আসা আমার ভুল, না ওটা অমার ভুল নয়। তাহলে কি তোমার ভুল। জানিনা, তুমি যাও প্রান্তিক। আমাকে আর দুর্বল করে দিওনা। সেলিনা কোথায়? বাথরুমে গেছে। ও তাই তুমি এসেছো আমার কাছে? ওর সামনে দিয়ে আমার কাছে আসার সাহস তোমার হয়নি তাইতো। আমি থাকতে না পেরে বললাম, এও তোমার ভুল কণা। আমি তো জানিই না তোমার ভিতরে বয়ে চলেছে এক প্রচণ্ড ঝড়। বললে আমি শাড়ীটা বদলে আসি। হ্যাঁ বলেছিলাম আর সত্যিই শাড়ীটা বদলে তোমার কাছে আসতামও। তাহলে না এসে একা একা কাঁদছিলে কেন? কেন তুমি হঠাৎই কোন সুযোগ না দিয়ে আমার মনে ঝড় তুলে দিলে? বলল অশ্রুকণা। আমি ঝড় তুললাম? কি ভাবে? ও বলল কেন তুমি এক সাধারণ সৌজন্যতাকে অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় করে তুললে?

যেমন? কেন তুমি বললে এলোইবা জ্বর কয়েকটা দিন তোমার শুশ্রূষা পাবতো। অথচ তুমি ভাল ভাবেই জান তোমাকে শুশ্রূষা করার জন্য, তোমার পাশে সব সময় থাকার জন্য, সেলিনা আছে, অথচ এই ঝড়টুকু তোমার না তুললে কি চলতো না?

আমি স্তম্ভিত। এই সামান্য ঠাট্টাটুকু কারো জীবনে যে এমন কঠিন ঝড় তুলে দিতে পারে তা আমার ভাবনারও অতীত। বললাম, সত্যি যদি জ্বর হয়, জ্বর কেন, যেকোন রকম শুশ্রূষার প্রয়োজন হয় জীবনে, থাকুকনা সেলিনা আমার পাশে পাশে, তোমার শুশ্রূষা যদি সত্যি আমার প্রয়োজন হয় পারবে দিতে? ও বলল, তুমি কি নিতে পারবে? বললাম দেখ কণা, সেলিনাকে আমি ঠিক অতটা বুঝিনা যতটা তোমরা বোঝ। একটা জিনিষ শুধু বুঝতে পারি কোন ভাবেই সেলিনা আমার অমঙ্গল চায় না। তার জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়ে সে রূখে দাঁড়াতে জানে। আবার যদি সে বোঝে, তার থেকেও কোন কোন মুহূর্তে তোমাকেই আমার প্রয়োজন, হাসি মুখে সরে দাঁড়াবে, কোন রকম রাগ বা অভিমান না রেখেও, আমাকে তোমার হাতে সেই মুহূর্তের জন্য তুলে দিতে তার কোন ঈর্ষা থাকবে না, তাই বলে সে চিরদিনের জন্য তার দাবী ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে এতটা দুর্বল তাকে তুমি মনে করো না। আবার ও যাদের ভালোবাসে, এই ধর তুমি, তপতী, রেহানা, নীলাঞ্জনা পিসি, মিনতি সেন এই নামগুলো বললাম এই জন্য যে, কারণ, মেয়েদের ঈর্ষা মেয়েদের নিয়ে আবর্তিত হয়, তাদের যদি কারও সত্যি আমাকে প্রয়োজন হয়, তাহলে সেই প্রয়োজনের জন্য আমাকে হাসিমুখে ছেড়ে দেবে। এই ধরনা, আজকের কথাই, আমিতো জানিনা কিছুই, কিন্তু তোমার মনে যে ঝড় উঠেছে, তার জন্য ও আমাকেই দায়ী করল আর অবশ্যিই যেন তোমার কাছে আসি, তার দিব্যি দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। সুতরাং সেলিনার অবর্তমানে তোমার কাছে এসেছি এটা ঠিক নয়।

অশ্রুকণা বলল, আর আঘাত দিওনা প্রান্তিক। এবার চুপ কর, তুমি যা বলছ তা যে বুঝিনা তাতো নয়, মন বুঝতে না চাইলে কি করব। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি বললাম আমার সঙ্গে তোমার ক্ষমার সম্পর্ক নয় কণা। তোমার সব আচরণকে যদি মেনে নিতে না পারব, কিসের আমার ভালবাসার বড়াই। এবার ওঠ লক্ষ্মীটি, মনে হয় সেলিনার বেরোবার সময় হয়েছে। তোমার আচরণে ও হয়তো ভাবতে পারে সে বুঝি এসে অন্যায় করেছে। ও ছলছল চোখে তাকালো আমার দিকে। বলল, আমাকে একটা কথা দেবে, আর হয়তো সময় হবে না। বল। ও বলল তোমাকে যদি ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে তুমি আসবে আমার কাছে? আমি কণ্ঠে আবেগ ঝরিয়ে বললাম আসব! ও বলল, যদি সেলিনা বাধা দেয় তা হলেও, আমি বললাম জানিনা আমার কোন কাজে সেলিনার বাধা দেওয়ার কোন অধিকার আছে কি না, যদি থাকেও, তবু তোমাকে কথা দিচ্ছি কণা, তোমার একান্ত প্রয়োজনে সে আমাকে তোমার দেখার ইচ্ছে হোক বা অন্য যাই হোক, জানতে পারলে আমাকে পাবে তোমার পাশে। কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে বললাম আর কিন্তু নয় কণা, ঐ বুঝি বেরোল সেলিনা, এবার তুমি যাও। আচ্ছা তাই হবে। তুমি যাবে না বাথরুমে? যাব আগে তোমার হোক।

আমি ফিরে এলাম, যে ঘরে প্রথম এসে বসেছিলাম সে ঘরে। আসতেই দেখি ভিজে

কাপড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে সেলিনা। আমি ওর দিকে তাকাতেই একটু হেসে ও অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

ভাবছি এই মান্ অভিমান আর দুর্বলতা নিয়ে কদিন কাটানো যাবে এখানে। সেলিনার চাওয়াটা এতটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তাতে কি ভাবে এর সমাধান হবে কে জানে। আর অশ্রুকণা, ওর চাওয়াটা বুঝি, স্পষ্টতা বুঝিনা। আজ যদি সত্যি সত্যি ও ওর দাবী নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে বুঝতে পারছিনা কি ভাবে তার ইতি টানতে পারবো।

কতক্ষণ এরকম ভাবছিলাম মনে নেই। একটা আটপৌরে শাড়ী পরে এসে দাঁড়ালো সেলিনা আমার সামনে। বলল তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে প্রান্তিক ভাই। আমি হেসে বললাম, হঠাৎ? বাঃ জীবনের সব ঘটনাই তো হঠাৎ হঠাৎ হয়, এই যেমন অশ্রুদি হঠাৎ বলল, তার ভাল লাগছেনা সে এ চাকরি করবেই না, চলে যাবে আমাদের সঙ্গে। এও তো তাব হঠাৎ ভাবনা তাইনা? হযতো হবে। তাহলে কি তুমি বলতে চাইছো হঠাৎই আমাকে তোমার ভাল লেগে গেল? বলতে পার এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাইরের আকাশে ওই ভরা জোছনা, চারিদিকে এত গাছ গাছালি তার মাঝে ওই সুন্দর ফুলের বাগান, ভাল না লেগে পারে? খাওয়া দাওয়ার পবে চলনা আসার সময় দেখে এসেছি বাগানের এক প্রান্তে যে বসার বেদী ওখানে গিয়ে বসব কিছুক্ষণ শুধু তুমি আর আমি। চোখে ওর অদম্য কৌতূহল। আমি বললাম রাজী আছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে নাতো।

এতটা সাহস্ বুঝি ও আশা করেনি, বলল, তুমি হারতে চাওনা তাই তো? না তা নয়। তবে? তোমাকে আমি জিততে দেবো না, প্রতিটি মুহূর্তে তুমিই কেবল জিতে যাবে, তা হবে না। মনে থাকবে তো। আজ পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেছে কি যা আমি মনে রাখিনি। বুঝতে পারছি সেলিনা প্রচন্ড অবাক হয়ে যাচ্ছে। বলল, ঠিক আছে সময় মত তার পরীক্ষা দেওয়া যাবে। আপাতত বলত: কি রান্না হবে। ও ইতিহাস তো আমার জানার কথা নয়। কি আছে তাইতো জানিনা। আলু, ডিম, আর ডাল। বললাম এক কাজ কর, এক সঙ্গে সবই সিদ্ধ দিয়ে দাও, তাতে সময় বাঁচবে, তাছাড়া বেশ খিদেও পেয়েছে। ও বলল তোমার পেয়েছে খিদে? অসম্ভব। মানে? মানে থাক, আমি তা হলে সব সিদ্ধ বসিয়েই দিচ্ছি। তুমি অশ্রুদি বেরুলেই বাথরুমে যাবে? আচ্ছা। তাই বলে আবার চান করে বসো না কিন্তু। কেন? তা ছাড়া সারাদিনের যা ক্লান্তি চান না করলে ক্লান্তি যাবে কেন? সেলিনা প্রতিবাদ করে বলল না, অসময়ে চান করলে অসুখ বিসুখ করতে পারে। করলই বা তুমিতো আছো? আমি? না বাপু আমি পারবো না এখানে তোমার শুশ্রুষা করতে? তুমি না পারলে অশ্রুকণাই করবে। তার মানে অশ্রুদিকে তুমি ভোগাতে চাও এইতো। না। তবে? আমি তোমাকে ভোগাতে চাই। ও রাগ করে বলল, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার কোন শুশ্রুষাই করতে পারবো না। ও বলতে গেলে রাগ করেই চলে গেল। বুঝতে পারছি ও ও যেন কি বলতে চায়। শুধু ওর আচরণ বোঝা কষ্টকর এই যা তফাৎ।

খাওয়া দাওয়ার পরে দুই ঘরে দুটো বিছানা করা হলো। ঠিক হয়েছে অশ্রুকণা ও সেলিনা থাকবে এক ঘরে আর আমি অন্য ঘরে যা একেবারে স্বাভাবিক। একটা ঘর থেকে

আরেকটা ঘরে যাওয়ার জন্য যে দরজা আছে তাতে খিল, সিটকিনী বা ডাঁসা নেই। অতএব তা ভেজানো থাকলেও খোলাই থাকবে।

সব কিছু গোছাতে গোছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। সেলিনা বলল প্রান্তিক ভাই, তোমার শরীর খুব ক্লান্ত এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি বললাম তোমরা ঘুমাবেনা? না, আমরা একটু বাইরে গিয়ে বসব। আমাকে নেবেনা? অশ্রুকণা বলল, সেলিনা, প্রান্তিক যখন যেতে রাজী আছে, তুমি ওকেই নিয়ে যাও, আমার সত্যিই ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সেলিনা বলল ঘুম পাচ্ছে, না প্রান্তিক ভাই না গেলে তুমি যাবে না কোনটা সত্য? কি যে ঠাট্টা কর সেলিনা! তোমরা যাও না, বিশ্বাস কর আমার শরীর আর বইছে না। জীবনে এত ধকল তো কোন দিন আসেনি। তাহলে আমিও যাবো না। আমি বললাম সেই ভালো। বরং সকলেই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া যাক। কাল না হয় যাওয়া যাবে। সেলিনা আর কথা বাড়ালো না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

সকাল হয়েছে কখন বুঝতে পারিনি। সমস্ত শরীরে অসম্ভব ব্যথা, হাত পা নাড়াতে পারছিনা। ওদের বারণ শুনে স্নান করিনি। কিন্তু তাতে ওদের আশঙ্কা কাটানো যায়নি। অশ্রুকণা কফি করে সেলিনাকে বলল, দেখতো সেলিনা প্রান্তিকের ঘুম ভেঙেছে কি না। এটা ওকে দিয়ে এসো। এর মধ্যে সকালে বাজার সরকাব এসে কি কি বাজার পাঠাতে হবে তার লিষ্ট নিয়ে গেছেন। সেলিনা কফি নিয়ে আসে। আমি বুঝতে পারছি ও এসেছে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে পারছিনা। ও ডাকছে প্রান্তিক ভাই, কি ঘুম ঘুমাতে পার। ওঠ, কফিটা খেয়ে নাও। আমি তবু তাকে কোন সাড়া দিচ্ছি না দেখে ও কফিটা রেখে আমাকে ঠেলা দিতেই চমকে উঠে বলল, একি প্রান্তিক ভাই গা যে পুড়ে যাচ্ছে। ডাকতে পারনি? তবু আমি কোন কথা বলতে পারছিনা, ও জানতে চাইল জ্বর কখন এসেছে? বললাম জানিনা ঠিক। মাঝরাতে রাতে যখন শীত শীত করছিল তখন তোমাদের ডেকেছিলাম, বোধহয় তোমরা শুনতে পাওনি। ও বলল, আমি অশ্রুদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অশ্রুকণা এলো। গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠে বলল, এতো দেখছি ১০৩/১০৪ ডিগ্রি জ্বর হবে। তোমাকে বার বার করে বললাম স্নান করো না। এখন কি হবে বলতো। সেলিনা বলল, প্রান্তিক ভাই এখানে বেশকিছুদিন থাকতে চায় তাই ইচ্ছে করেই জ্বরটা বাধিয়েছে। সত্যভূষণ বাবু এলে কোন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা দেখা যাবে। আপাতত তুমি ওর কাছে বস অশ্রুদি। আমি রান্না ঘরে আছি। ও আর দাঁড়ালো না।

অশ্রু বলল, জ্বরটা কখন থেকে এসেছে প্রান্তিক, আমি বললাম ঠিক জানিনা, তবে মনে হয় গাড়ীতে যখন উঠেছি তখন জ্বর জ্বর লাগছিল। ভেবেছিলাম ও কিছু নয়। গুরুত্ব দিইনি। তারপর যখন বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে জল দিলাম, শীতে ভাল করে চোখেমুখেও জল দিতে পারলাম না। তখন বললে না কেন? ভাবলাম কমে যাবে তাই আরকি। আর তাছাড়া ভিতরে ভিতরে একটা লোভতো ছিলই। তবে সত্যিই বুঝতে পারিনি, এমন তীব্র ভাবে আক্রান্ত হতে পারি। যদি কোন একস্ট্রা চাদর টাদর থাকে দেখনা ভীষণ শীত করছে। অশ্রুকণা ঘরে গিয়ে অতিরিক্ত একটা চাদর এনে আমার গায়ে চাপা দিয়ে দিল। আর

একেবারে বিনা কারণে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু ওর দিকে তাকাবার মত অবস্থা তখন আমার নেই। কফিটা কোন ভাবে খেয়ে আবার চোখ বন্ধ করলাম। এর মাঝে এলেন সত্যভূষণ বাবু। সেলিনা তাকে দরজা খুলে দিলে উনি বললেন, আপনাদের কোন অসুবিধা হয়নি তো। না। অশ্রুদেবী কোথায়, একবার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে যেতে হবে। আজ তো রবিবার। তাতে কি? তিনি একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি বসছি, আপনি যদি তাকে একবার পাঠিয়ে দেন। আচ্ছা বসুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অশ্রুকণা এলে সত্যভূষণ বাবু বললেন, আপনি যদি একবার তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নেন, তা হলে ভাল হয় অশ্রুদেবী। একবার প্রধান শিক্ষিকার কাছে যেতে হবে। অশ্রুকণা বলল, আজ না গেলে নয়? কেন বলুন তো। কোন অসুবিধা আছে কি? অসুবিধা একটু আছে বৈকি। আমাকে বলা যায় না? আপনাকে তো বলতেই হবে। আপনি যদি এ সময় না আসতেন। তাহলে হয়তো আমাকেই আপনাকে খুঁজতে বেরোতে হতো। সত্যভূষণ বাবু শুধু একটু হাসলেন, তারপর বললেন বলে ফেলুন। অশ্রুকণা বলল, কাল প্রান্তিকের জ্বর এসেছে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মনে হয় ১০৩/১০৪ ডিগ্রি জ্বর হবে। ডাক্তারের প্রয়োজন। জানিনা এখানে কোন ডাক্তার আছে কি না। না এখানে ধারে কাছে কোন ডাক্তার নেই অশ্রুদেবী। আমি ডাক্তার নই, তবুও এখানকার গরীব মানুষের চিকিৎসা আমাকেই করতে হয় বেআইনী জেনেও। আমাদের প্রতিষ্ঠানে অবশ্য একজন ডাক্তার আছেন, তবে তিনি আজ নেই, বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। যদি বিশ্বাস রাখেন আমি একবার দেখতে পারি। অশ্রুকণা বললেন আসুন।

সত্যভূষণ বাবু আমাকে দেখলেন। টেথিসকোপ ছাড়াই শুধু হাতে তিনি বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন। চোখ এবং জিহ্বা দেখলেন। তারপর বললেন, না ভয় নেই অশ্রুদেবী। আমি কয়েকটা ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই একটা খাইয়ে দেবেন, ঘন্টা চারেক পরে আরেকটা খাওয়াবেন। তারপরও যদি না কমে, তাহলে আরো চারঘন্টা পরে আরেকটা খাওয়াবেন। তবে তৃতীয়টা খাওয়াবার প্রয়োজন হবে না বলেই মনে হয়। অশ্রুকণা উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বললেন আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আরে না না, কষ্ট কেন দেবেন। আপনি বরং এক কাজ করুন অশ্রুদেবী, আপনি চলুন আমার সঙ্গে বড় দিদির সঙ্গে দেখা হবে, আর ওষুধটাও নিয়ে আসতে পারবেন। আর সেই সঙ্গে আমি কোথায় থাকি সেটাও দেখা হয়ে যাবে। অশ্রুকণা বললেন ঠিক আছে আপনি বসুন আমি আসছি।

সত্যভূষণ বাবু আমার কাছে না বসে, বসার ঘরে গিয়ে বসলেন, সেলিনা কফি ও বিস্কুট নিয়ে এলে সত্যভূষণ বাবু বললেন, আমিতো চা বা কফি কিছুই খাইনে। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলেন। সেলিনা বলল, কষ্টটা বড় কথা নয় সত্যবাবু, অপমানটাই বড়। মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। না বোঝার কথাত্রে নয় আপনার। অবাক হয়ে তাকালেন সত্যভূষণ বাবু সেলিনার দিকে, তারপর বললেন, হয়তো আপনি বলতে চাইছেন সকালে এসে কিছু না খাওয়াটা অপমানেরই নামান্তর, তা যদি বলেন, আমি

বিস্কুট গুলো খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন চা বা কফি সত্যিই আমি খাইনা। কারণ? কারণ এমনিতে কিছুই নেই। আসলে আমিতো এদের মাঝে বড় হয়েছি, এখানকার কেউই চা বা কফি খায় না। আর এখানে ওসব পাওয়াও যায় না, তাই অভ্যেসটা গড়ে ওঠেনি। সেলিনা বলল যে অভ্যেস গড়ে ওঠেনি, তার আবার স্থায়িত্ব কি? হ্যাঁ তা বলতে পারেন। তাহলে কফিটা খেয়ে নিন। বাঃ আপনিতো অপূর্ব ম্যানেজ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে কি নামে ডাকব আপনাকে। হয়তো আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে না। তবে একান্তই যদি দরকার হয়, তা হলে আমাব নাম সেলিনা। সেলিনা রহমান। দাঁড়ান দাঁড়ান আপনার নাম যেন কোথায় দেখেছি। হেসে ফেলল সেলিনা। বলল, কোথাও দেখেননি, হঠাৎ আপনার মনে হয়েছে তাই আপনি বললেন। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না মিস রহমান আমার স্মৃতি শক্তি খুব একটা খারাপ নয়। আমি কি তা ভাবতে পারি কখনো। শুধু মাত্র গতকাল রাতে আমার পরিচয় পেয়েও আজ তা যখন ভুলে গেছেন তখন তার প্রশংসাতো করতেই হবে।

সত্যভূষণ বাবু ভীষন লজ্জায় পড়ে গেলেন। এর কি উত্তর দেবেন তিনি। অশ্রুকণা এসে বললেন চলুন সত্যবাবু। তারপর জানতে চাইল, কত দেরি হবে ওখানে? বেশী নয়, হয়তো ঘন্টা দেড়েক হতে পাবে। অশ্রুকণা বললনে, সেলিনা আমি ফিরেই রান্নাটা করব। ততক্ষণ প্রান্তিকের কাছে গিয়ে বোস। ওর কিছু দরকার হয় কি-না। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি সেলিনা আমার ঘরেই আসছে। ভেজানো দরজা খুলতেই আমি বললাম এসো। ও একটা চেয়ারে বসল আমি বললাম ওখানে কেন আমার কাছে এসো। ও কাছে এল। বললাম সকালে ও ভাবে চলে গেলে কেন? তুমিতো আমাকে চাওনি? কে বলেছে? যদি চাইতে তাহলে আমাকে যেতে দিলে কেন? আর তা ছাড়া কাল বার বার বললাম স্নান করো না। তবু তাই করলে এবং জ্বর বাধালে আর এখন আমাকেই শাস্তি দিতে চাইছো? আমি কি ইচ্ছে করে জ্বর বাধিয়েছি? তাছাড়া কি? এ তোমার ভুল সেলিনা। স্নানতো দুরের কথা, হাতে মুখে পর্যন্ত ভালো করে জল দেওয়া হয়নি। আসলে বলতে গেলে জ্বর নিয়েই তোমাদের সঙ্গে এসেছি। ও স্তম্ভিত হয়ে বলল জ্বর নিয়ে? বলনি তো। বলার সময় কোথায় পেলাম। সেলিনা আর কথা না বাড়িয়ে বলল, বাথরুমে যাবে? যাওয়াতো দরকার, কিন্তু উঠতে যে পারছিনা। উঠতে পারছো না অশ্রুদিকে বলেছিলে? না, তাহলে আমাকে ধর। তোমাকে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছি। ও নীচু হলে দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে উঠে পড়লাম। আর আমার গায়ের উত্তাপ ওর শরীরের যেখানে যেখানে স্পর্শ করলো, সেখানে সেখানে যেন, ফোস্কা পড়তে লাগল। ওর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল উঃ তুমি কি নিষ্ঠুর।

সমানে মাথায় জল পট্টি দিয়ে চলেছে সেলিনা। ওর মত প্রাণ চঞ্চল সদা কৌতুকময়ী মেয়েরও যে কি হল কে জানে। গুম মেরে বসে আছে, কি যে করবে বুঝতে পারছেনা। কলকাতা হলে হয়তো এতক্ষণ ২/৩ জন ডাক্তারকে কল দিয়ে বসতো। কিন্তু এখানে তো কাউকে ও চেনে না। খুব মায়া হতে লাগলো ওর জন্য। বললাম, সেলিনা কি এত ভাবছ? কিছু না প্রান্তিক ভাই। কিছু যদি নয় তা হলে এত চুপ চাপ আছো কেন? হাজার কথার

ফুলঝুরি ছোটে যে মুখে তা এতো নিশ্চুপ কেন? ও আস্তে আস্তে বলল, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা প্রান্তিক ভাই। কেন? কেবলি মনে হচ্ছে আমি যদি ওই ভাবে অসুখ জ্বর এই সব না বলতাম তাহলে হয়তো তোমার কিছুই হতো না। আমি হেসে ফেলে বললাম, তুমিতো এ যুগের শিক্ষিত মানুষ, সব কিছুকে বিচার করতে হয় যুক্তি দিয়ে। এই সব কুসংস্কারগুলো তোমার মাথায় আবার কবে থেকে শিকড় গেড়ে বসল। ও কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছে দেখে তাড়া লাগিয়ে বললাম, কি হলো বললে না কবে থেকে? ও একটা ছোট্ট হাই তুলে বলল, বিশ্বাস করবে তো। হঠাৎ বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কেন? তারপর কি মনে হতে বললাম, সেলিনা, তোমাকে বিশ্বাস না করা যে আমার পাপ। ও বলল, যেদিন থেকে নিজেকে আর তোমার থেকে আলাদা করে ভাবতে পারিনি সেদিন থেকে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম সেলিনা! ও বলল, আর কথা নয়, ওই বুঝি অশ্রুদি এল। আমি তবুও তাকে বললাম সেই দিনটা কবে বলনা সেলিনা। ও তবু উঠে যেতে চায় দেখে ওর আঁচলটা ধরতেই, ওটা কাঁধ থেকে সরে যেতেই আমি লজ্জায় ওকে ছেড়ে দিলাম। সেলিনাও বুঝি প্রচণ্ড লজ্জায় আর আমার দিকে না তাকিয়ে অশ্রুকণাদের দরজা খুলে দিতে এগিয়ে গেল।

অশ্রুকণা আর তার সঙ্গে একটা মেয়ে। জানতে চাইল প্রান্তিকের জ্বর কি একই রকম আছে? মনে হয় একটু কমেছে। অশ্রুকণা তারপর সঙ্গের মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, এর নাম সীতা, সত্যভূষণবাবু পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, তুমি এই ওষুধটা আগে নাও। ওকে এখনি একটা খাইয়ে দাও। সেলিনা বলল, সে না হয় হবে অশ্রুদি। এত ব্যস্ত হওয়ার তো কিছু নেই। কিছু নেই মানে? এখানে কিছু হলে কে দেখবে? কেন তুমি? আমি? তুমি ছাড়া আবার কে দেখবে? বাঃ বেশ মজার কথাতো আমি ছাড়া আবার কে দেখবে? তুমি দেখতে পারবেনা? পারবো। তবে তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন। অবশ্য ততক্ষণে প্রান্তিক ভাই সুস্থই হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার দিকে মনে হচ্ছে জ্বরটা আর নেই। কাল সারাটা দিন যে ভারি ভারি ভাবটা ছিল তাও আর নেই। বেশ হাল্কা লাগছে। অশ্রুকণা বলল, এ বেলা ফুলের বাগানের মাঝখানে যে বেদীটা আছে ওখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে। সেলিনা বলল সেই ভাল, বিকেলের হিম লেগে জ্বরটা আবার এলে মন্দ হয় না! অবাক হয়ে অশ্রুকণা বলল সেলিনা তুমি যে মাঝে মাঝে কি ভাষায় কথা বল বুঝতে পারি না। তুমিও বুঝতে পারনা? অবাক করলে অশ্রুদি। আমার কথা একা প্রান্তিক ভাইই বোঝেনা এতদিন তো তাই জানতাম এখন দেখছি তুমিও বোঝ না? ঠিক আছে বোঝার দরকার নেই, চল চা ওখানেই খাওয়া যাবে।

আমি বললাম দরকার নেই কণা। আজ আর বাইরে গিয়ে বসব না, বরং আর যদি জ্বরটা না আসে তা হলে কাল গিয়ে বসা যাবে। সেলিনা বলল, দেখলে তো অশ্রুদি, আমি যেটা বলব তাতেই প্রান্তিক ভাই বাদ সাধবে। যাতে আমি রেগে যাই তাই করবে। আবার ওনার মায়ের কাছে আমাকে লিখিত রিপোর্ট করতে হবে, ওর বিরুদ্ধে আমার কি কি অভিযোগ? একটা হাই ছেড়ে বলল, তাইতো তোমায় বলেছিলাম, আমিতো রেহানা নই,

আমি সেলিনা। হতভাগী রেহানার বোন, আর তার অবর্তমানে আমি তো বোঝা। আমি অবাক হয়ে মনে মনে বললাম, সেলিনা তোমার এই দুর্বোধ্য ভাষা আমি সত্যি বুঝিনা, তবু যত পার কলকাতায় গিয়ে তোমার ভাষায় কথা বল, এবার অন্তত শান্ত হও। চেষ্টা করেও মুখে কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না।

অশ্রুকণা বলল সেলিনা, প্রান্তিক না বুঝলেও তোমাকে আমি বুঝতে পারি। তোমার যন্ত্রণা তোমার আত্মপীড়ন, তোমার স্বপ্ন, তোমার অন্তরের কথা, প্রান্তিকের পুরুষ চোখ এড়িয়ে গেলেও, আমিতো তোমার মতো মেয়ে তাহলে এ আঘাত দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও। সেলিনা অভিমানের সঙ্গে বলে, আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছি অশ্রুদি তুমি একথা বলতে পারছ? অশ্রুকণা বলল না সেলিনা, তুমি জেনে শুনে আমাকে আঘাত দিচ্ছ না। আসলে তোমার কথার ভুল মানে হয়ে অন্তরকে আঘাত করছে। তারপর পড়ে থাকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে অশ্রুকণা চলে গেল।

সেলিনাকে অনেক রকম কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারিনা। সেলিনাই বলে, তোমারও কি তাই মত, যে আমার কথায় তোমরা আঘাত পাও। আমি বললাম, সেলিনা ওভাবে সরাসরি উত্তর দেওয়া যায় না। বেশ তাহলে, তুমি কদিন থেকে যাও অশ্রুদির কাছে। আমি কালই চলে যাবো। তুমি চলে যাবে মানে? মানে কিছু নয়। আমি থাকলে, আমাকে কথা বলতেই হবে, আর প্রতিটি কথারই তোমরা ভুল মানে করবে। আমি সেদিকে না গিয়ে বললাম, কিন্তু আমাকে এখানে রেখে যেতে পারবে? কেন পারবো না? তুমি আমার কে যে তোমার জন্যে আমাকে এই বনজঙ্গলে পড়ে থাকতে হবে? কেউ নই না? না কেউ নও। তারপর বলল, আমি কিন্তু কাল চলে যাবই প্রান্তিক ভাই, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না।

বেশ, আজতো আর যাচ্ছ না, কাল যখন যাবে তখন ভাবা যাবে। আজ বরং চল ওই বাগান দিয়ে একটু ঘুরে আসি। তুমি যাও। আচ্ছা সেলিনা, অশ্রুকণা তোমায় এত ভালবাসে, আর তুমি কেন প্রতিমুহূর্তে ওকে আঘাত দাও। নির্বিকার সেলিনা বলে, আমিতো অশ্রুদিকে আঘাত দেওয়ার জন্য কোন কথা বলিনা, উনি নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিয়ে আঘাত পেলে আমি কি করব? তাহলে তুমি কাকে আঘাত দিতে চাও? তোমাকে। আমাকে? কেন আমার প্রতি তোমার এত রাগ কেন? সে আমি জানি না প্রান্তিক ভাই, প্রায়ই ভাবি, না এ আমার ঠিক হচ্ছে না, তবু তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠি। আমার কেবলি মনে হয় আঘাতের মধ্যে দিয়েই আমি তোমার কাছে পৌছে যেতে পারি। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকাই ওর দিকে। বলি, অন্তরের মধ্যে যদি সত্যের সন্ধান না পাও আঘাত দিয়ে কি পাবে? না পাব না, জানি, তবু মনে হয় এতেই বুঝি আমি আমাকে মেলে ধরতে পারি। আমি বললাম, তোমাকে একটা কথা বলব সেলিনা? বল। আমাকে কি তুমি বুঝতে পার না? তোমাকে তো বলেছি আমার থেকে তোমাকে কেউ বেশী বোঝে না। তাই যদি হয়, তাহলে এই পাগলামি গুলো ছাড় সেলিনা। তোমার অশ্রুদিকে তার নিজের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য কর। তারপর বললাম তুমি যেমন আমাকে বোঝ, মনে হয়

অশ্রুকণাকেও বোঝ তার থেকে বেশী। যে কটা দিন এখানে থাক, কোন আঘাত নয়, কোন সংঘাত বা অভিমান নয়, একান্ত বন্ধুর মতো তার হৃদয়টাকে বুঝবার চেষ্টা করো। যে ভালবাসা তোমাকে সে দিতে চেয়েছে, তা গ্রহণ কর সেলিনা। এ আমার একান্ত অনুরোধ।

এমন করে বুঝি সেলিনাকে কোনদিন কিছু বলিনি। হয়তো এমনি কোন কথা সে শুনতে চেয়েছিল আমার মুখ দিয়ে। ও মুখ নীচু করেছিল। আমি বললাম, কি হল? তুমি তাকাবে না আমার দিকে? ও মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু একি এমন নিঃশব্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে কেন ওর চোখ দিয়ে? আমি বললাম সেলিনা! ও বলল না এভাবে নয় প্রান্তিক ভাই, আঘাতের বিনিময়ে আরো বড় আঘাত দিয়ে ভেঙে দিতে পার না আমার দম্ভকে? আমার ঔদ্ধত্যকে এমন ভাবে সহ্য কর কেন? সে কি শুধু আমি রেহানার বোন বলে? ও উঠে যেতে চাইলে, আমি উঠে গিয়ে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালাম। একটু আগে দেখেছি সীতাকে নিয়ে অশ্রু বাগানের দিকে চলে গেছে। ও বলল পথ ছাড়, বললাম না ছাড়বনা। ও বলল, ছিঃ অশ্রুদি কি ভাববে? অশ্রুকণা নেই, ও অনেকক্ষণ হলো বাগানে গেছে। তবু তুমি সরে দাঁড়াও প্রান্তিক ভাই। তা হয় না সেলিনা, কোন ভাবেই আমি তোমাকে দূরে সরে যেতে দিতে পারি না। কি করবে আমাকে নিয়ে, পারবে আমাকে জায়গা দিতে রেহানাকে সরিয়ে? পারবে অশ্রুদির ভালবাসা ভুলে, শুধু আমাকেই ভালবাসতে, পারবে তপতীদির দীর্ঘ ছায়া চিরদিনের জন্য তোমার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে? আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম পারবো। হ্যাঁ পারবো সেলিনা, যদি মুহূর্তের জন্যও তুমি রেহানার নাম উচ্চারণ না কর, যদি রেহানাকে তোমার জীবন থেকে চির নির্বাসিত কর, যদি কখনো অশ্রুকণার ছায়ায় নিজে দাঁড়াতে না চাও, যদি তপতীকে মুছে দিতে পার তোমার ভালবাসা থেকে। সেলিনা এগিয়ে এলো আমার কাছে, এই প্রথম ঝাপিয়ে পড়ল আমার বুকে, না এ শাস্তি তুমি আমাকে দিও না, তার চেয়ে তুমি আমায় যা বলবে, সেই ভাবে চলব। তোমাতে নিবেদিত প্রাণ আমার চলার পথের পাথেয় হোক প্রান্তিক ভাই। আর কোন দিন তোমার অবাধ্য হবো না। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোন আচরণে আজ থেকে আমি আর অশ্রুদিকে আঘাত দেবনা।

ভীষণ ইচ্ছে করছিল, সেলিনাকে সজোরে বুকের পরে টেনে নিয়ে আদরে আদরে তার উপোসি তৃষ্ণাকে ভরে দিই। হায় ভীরু মন, যা তুমি চাও তা তোমার পাওয়ার যোগ্যতা কত বিচার করেও দেখনা। ও আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি নেমে এলাম বাগানে। জোছনা ভরা রাতের আকাশ। বাগানে ফুটেছে অজস্র ফুল। কি যে মনোরম পরিবেশ। স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয় দূর তেপান্তরে। ভাবতে অবাক লাগছে, সেলিনা কি ভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মুহূর্তের দুর্বলতায় কখনো কখনো যে মনে হয়নি, ওকে আমার ভীষণ প্রয়োজন, তবে তা আজকের মত নয়। সেলিনা হীন এমন শূণ্যতার অনুভূতি আগে তো কখনো হয় নি। তবে কি তার সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদনই আমি চেয়েছিলাম।

জানিনা, কি চেয়েছিলাম, অশ্রুকণা আমাকে একা দেখে আমার দিকে এগিয়ে এল। সেলিনা এলোনা? না, ওকে বলে এখানে আমি আসিনি। ও কৌতুক দৃষ্টি হেনে বলল আবারতো একটা ঝামেলা করবে? কি আর করব কণা। ও বলল, বাইরে বেশ ঠান্ডা, তোমার

বেরোনো ঠিক হয় নি। তাহলে তুমি বেরুলে কেন? তোমার ঠান্ডা লাগবেনা? আমি শাড়ীর আঁচলে ঠান্ডাটাকে খানিকটা চাপা দিতে পারব, কিন্তু তুমি? আমি না হয় সেই আঁচলে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করব। ও বলল আঘাত পাব জেনেও এই কৌতুক তুমি ছাড়তে চাওনা, কেন বলত? ভালে লাগে তাই। যাকগে সে সব কথা। বড় দিদির সঙ্গে দেখা হল? হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা খুব ভাল জান? কি বললেন? আমার জয়েনিং রিপোর্ট নিলেন, আর এখানকার সব কিছু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দিলেন। সত্যভূষণবাবু ছিলেন? হ্যাঁ ছিলেন, উনি কি বললেন? না উনি কিছু বলেননি। বড় দিদির ওখানে কাজ শেষ হয়ে গেলে, উনি বললেন চলুন আমি যেখানে থাকি। আমি ওর দিকে তাকাতে উনি বললেন ওষুধটাতো নিয়ে যেতে হবে অশ্রুদেবী। আমি বললাম ও হ্যাঁ, চলুন।

এই প্রতিষ্ঠানের যে বিরাট পাঁচিল, তার গা ঘেঁষে আরেকটা ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা কোয়ার্টার। উনি আমাকে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। বেশ বড় হল ঘরের মত। সারা ঘর ভর্ত্তি অনেক বই। একটা বেশ বড় টেবিল, আর বসার চেয়ার আর সামনে মাত্র ২টো চেয়ার। আমি ওকে জিজ্ঞাস করলাম এটা আপনার অফিস? উত্তরে বললেন না ঠিক অফিস নয়, আবার অফিসও বলতে পারেন। হেঁয়ালিটা বুঝলাম না। হ্যাঁ অশ্রুদেবী হেঁয়ালিই, তবে ধীরে ধীরে হয়তো বুঝবেন। এখানে যখন এসেছেন সবই জানতে পারবেন। এখানে আপনি একা থাকেন? ঠিক একা নই, আরো দু জন থাকেন. একজন আমার দেখাশুনা করেন, আরেকজন এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী। আপনার স্ত্রী? না নেই। মানে? নেই মানে নেই, মানে এখনো সেই ভাবে ভাবিনি। তারপর নিজেই হেসে বললেন, একদিনেই সবকিছু জানতে চাইলে চলবে কেন অশ্রুদেবী। তারপর আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন প্রান্তিকবাবুর ওষুধ। আমি ওটা হাত পেতে নিলে উনি বললেন, না অশ্রুদেবী চা বা কফি কিছু খাওয়াতে পারবো না। কারণ ঐ এ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে নেই। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আমি বললাম, অদ্ভুত মানুষ এই সত্যভুষণবাবু তাই না। হ্যাঁ তার সৌজন্য বোধের তুলনা হয় না। তবে যে কজনের সঙ্গে কথা হল, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তার কথা বললেন, তাতে আমার মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যে কোন অফিসিয়াল যোগাযোগ নেই, এটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমারও তাই মনে হয় কণা। ও বলল এবার চল, দেখ সেলিনার আবার অভিমান কোথায় গিয়ে পৌঁছায়। আমি বললাম, ওর কথা থাক, তোমার কি কোন অস্বস্তি হচ্ছে আমার সঙ্গে বাগানে থাকতে? খানিকটা তো হচ্ছেই প্রান্তিক। দেখ সেলিনা আঘাত পেতে পারে এমন কিছু আমি করতে চাইনা, আর আমি আঘাত পেতে পারি এমন কিছু বুঝি করতে তোমার আপত্তি নেই? এই ভাবে বলছ কেন প্রান্তিক। তোমাকেও আঘাত দিতে চাইনা, পারলে আঘাতে শুধু প্রলেপ নয় জীবনটাও তোমার কানায় কানায় ভরে দিতে চাই। কিন্তু তা আজ আর সম্ভব নয়। কেন? সব কথার উত্তর দিতে পারব না প্রান্তিক। তা ঠিক, কাল কিন্তু বলেছিলে, আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে গোটা বাগানটা ঘুরে এসে আমরা বসার বেদীটার সামনে যখন

এসেছি অশ্রুকণা বলল বসবে কিছুক্ষণ? হ্যাঁ বসা যাক, বলে বসে পড়লাম আমরা। ও বলল, হ্যাঁ বলেছিলাম, এখনো বলছি, সারাজীবন ওই একই কথা বলব, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। তাহলে? তাহলে কি! তাহলে সেলিনা কি ভাববে এ নিয়ে ভাবছ কেন? ভাবছি এই জন্য যে ওকে ছেড়েও আমি থাকতে পারবো না! কণা? ও বলল, বল। এ ভাবে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন? আমার তো কোন কষ্ট নেই। কোন কষ্ট নেই? না প্রান্তিক, কোন কষ্ট নেই। এতদিন আমার জন্য তোমার কোন অনুভূতি আছে কি না, তার জন্য কষ্ট হতো। প্রায়ই মনে হতো সত্যি কি আমার জন্য তুমি একটুও ভাব না। তাই কষ্ট হতো। এখন মনে হয়, আমার সে ধারণা ভুল। এখন, আমার যেটুকু প্রাপ্য, আমি জানি তোমার কাছ থেকে আমি তা পাবই, সুতবাং কষ্ট কেন হবে? কাল কিন্তু বলেছিলে আমার সঙ্গে তুমি চলেই যাবে। আমি যদি এখন বলি, আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না কণা! কি করবে? চলে যাবো তোমার সাথে। তোমাব এই চাকরি, জীবনের এই নিবাপত্তা সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে। দেখ প্রান্তিক, কোন মেয়ে কিসে নিরাপত্তা পাবে তুমি কি তা জান? ঠিক বুঝতে পারলামনা। ও বলল, তুমিতো রেহানাকে সমস্ত নিরাপত্তাব আশ্বাস দিয়েছিলে, দাওনি? ঠিক জানিনা, নিরাপত্তা জিনিষটা কি তাও বুঝিনা, তবে ওকে আমি ভালবেসে ছিলাম। যদি সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে একদিন ওকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হতো কি করতে তুমি! হয়তো রেহানা আমাকে বিশ্বাস করে পথেই নামতো! কেন? ভালবাসার আকর্ষণে। না প্রান্তিক সেটাই সব নয়, শুধু ভালবাসার টানে, মেয়েরা কোন প্রেমিকের হাত ধরে পথে নামে না, যদিনা সে বিশ্বাস করে, সেই পুরুষটি তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে। আমিও বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালবাসতে না পারলেও নিরাপত্তা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। আমি অবাক হয়ে বললাম, শুধু নিরাপত্তাই সব। হ্যাঁ সব প্রান্তিক। ইনটারভিউ শেষে প্রতীমবাবু বলেছিলেন, অশ্রু, তোমাকে তুমিই বলছি, একবার যাবে আমার বাসায়? আমি অবাক হয়ে বললাম এ ভাবে বলছেন কেন? আমিতো আপনার আশ্রয় প্রার্থী। উনি বললেন, ভুল তোমার মা, তুমি আমার আশ্রয় প্রার্থী নও। তোমার যোগ্যতা তোমাকে আশ্রয় দেবে। আমি সে জন্য তোমাকে যেতে বলছি না, তবে? তোমার কাছে কয়েকটা ব্যাপার জেনে নিতে চাই। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে যাবো, প্রান্তিক আসুক। উনি বললেন, ও এখন আসবেনা। তা হলে কখন আসবে? আসবে, আর তোমাকে নিয়েও যাবে। আমি বললাম, চলুন। গেলাম ওনার বাড়ীতে। ফ্রীজ খুলে উনি আমাকে মিষ্টি খেতে দিলেন। তারপর বললেন, আমি তোমার পিতৃস্থানীয় অশ্রু! তাই যা জিজ্ঞাসা করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দিও। আমি মাটির দিকে চোখ রেখে বললাম বলুন। উনি বললেন, মা - বাবাকে এতবড় আঘাত কেন দিয়েছ জানি না অশ্রু, মনকে প্রস্তুত করতে পারলে ওদের মেনে নিও। ওরা তোমার মঙ্গলই চেয়েছিলেন। আমার ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠে আসতে চাইছিল। উনি বললেন, আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো। প্রান্তিককে তুমি গভীর ভালবাস এইতো। তাই তার অপমান তুমি সইতে পারনি। কিন্তু ওকে আমি যতটুকু বুঝেছি, তাতে তোমার মন যেভাবে ওকে চেয়েছে সেই ভাবে হয়তো ও তোমাকে চাইতে পারেছে না, তার মানে কিন্তু এই নয় যে ও তোমাকে ভালবাসেনা।

ওর জীবনে কিছু জটিলতা আছে বলে মনে হয়। ও একটি মেয়েকে ভীষণ ভালবাসতো তাই না? তার নাম বোধ হয় রেহানা। ওর বোধ হয় বিশ্বাস সেলিনার জন্য সে চলে গেছে। আসলে কিন্তু তা আমার মনে হয় না মা। যে মহান ভালবাসা ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তার স্থায়ী আসন গড়ে নিতে চায় রেহানার ভালবাসা সেই গোত্রীয়। তাই আমার বিশ্বাস, রেহানা হয়তো চিরদিনই ওর আড়ালে থেকে যাবে। ওর কাছেই শুনেছি সেলিনা রেহানার বোন। কয়েকটি টুকরো ঘটনার মধ্যে ও সেলিনার কথা যা বলেছে তাতে সেলিনা ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার নয়। পারবেনা মা, সেলিনাকে তার হাতে সপে দিয়ে রেহানার মত মহৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত রাখতে। উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে উনি তাকিয়ে ছিলেন, আর আমিও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম প্রতীমবাবুর দিকে। জিজ্ঞাস করেছিলাম, প্রান্তিক আপনাকে কি বলেছে জানিনা, কিন্তু এটা সত্যি যে দিন বাবা-মায়ের প্রতি অভিমান করে চলে এসেছিলাম, সেদিন কিন্তু প্রান্তিকের জীবনে আসতেই হবে এমন কোন স্বপ্ন ছিল না, তবে স্বপ্নগুলো কুঁড়ির মতো ফুটেছিল, রেহানার চলে যাওয়ার পরে। যদিও আমি বিশ্বাস করতাম, রেহানার থেকে সেলিনা আরো বেশী ভালবাসে প্রান্তিককে। রেহানার ভালবাসা ছিল চাপা। কাউকে বুঝতে দিতোনা। কিন্তু সেলিনা ছিল তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ সমুদ্র যেন। সেখানে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া প্রান্তিকের যে আর কোন উপায় নেই, তা জানতাম। প্রতীমবাবু বাধা দিয়ে বলেছিলেন, অশ্রু, একটু বোধ হয় ভুল বললে, সেলিনা অবশ্যই তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ সমুদ্র কিন্তু সমুদ্রতো শান্ত হতে জানে অন্য দিকে হাজার চেষ্টাতেও শান্ত সরোবর কখনো তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ হতে পারে না। প্রান্তিকের একটা মন সব সময় স্পর্শ করে আছে সেলিনাকে, কারণ সেলিনাই এসেছে তার কাছে একেবারে বাস্তব হয়ে। রাগে-বিদ্বেষে, মানে-অভিমানে, দুঃখ ও ভালবাসায় একেবারে পূর্ণ হয়ে। যা রেহানার ছিল না। রেহানার ভালবাসা যেন পূজার অঞ্জলি। দেবতা নিলে নিজেকে ধন্য মনে করবে, কিন্তু না নিলেও তার কোন অভিযোগ নেই, সেখানে সেলিনা তার দাবী নিয়ে প্রান্তিকের সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চাইতে জানে। তার পূজার ফুল অবহেলা করে কেউ পার পেয়ে যাবে তা সে মেনে নেবে না কোন ভাবেই। এমন এক সাহসী প্রতিবাদ তার মধ্যে আছে বলেই সেলিনা তোমাদের সকলের থেকে আলাদা।

প্রান্তিক ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল নিজের অজান্তে সেলিনার সহজ সারল্য আর স্পষ্টতায়। হয়তো প্রান্তিক মানতে চাইবেনা. তবু এটা সত্য অশ্রু একটা সময় সকলের অগোচরে রেহানার জায়গায় সেলিনা ওর মনের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

এরপর প্রতীমবাবু বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই অশ্রু, তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি বলতে পারো।

এবার অশ্রুকণা আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, বিশ্বাস কর প্রান্তিক আমার ভিতর থেকে কান্না উঠে আসছিল যেন। মনে হচ্ছিল এত অবিশ্বাস। যে কথা তুমি প্রতীমবাবুকে বলতে পারলে, তা তুমি আমাকে বলতে পারলে না? এইটুকু করুণা আমার উপর করা যেত না? তারপর মনে হল, বলবে কেন? সে অধিকার তো আমার নেই। আমিতো রেহানার মতো নিবেদিত প্রাণ নই। নই সেলিনার মত তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ সমুদ্র

যে প্রয়োজনে শান্ত হতে জানে। আমি তো শান্ত সরোবর। ঢেউটুকুও যেখানে ওঠেনা। প্রতীমবাবুকে বললাম, না আমার কিছু বলার নেই। উনি বললেন এ তোমার অভিমানের কথা মা। আমি জানি, তোমারও আছে অনেক কথা বলার। তবুও আমার অনুরোধ দাঁড়ি টানাটানি করে একটা অমূল্য জীবন নষ্ট করে দিও না। একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললাম, প্রান্তিকের জীবনটাই আপনার কাছে বড়, তার মান-অভিমান, দুঃখ-ভালবাসা এ সবের জন্য আপনার ভাবনা হয়, আর আমি মেয়ে বলেই কি আমার দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনাকে ভাবতে নেই?

উনি হাসলেন। কি মধুর সেই হাসি, তোমাকে বোঝাতে পারবো না। সমস্ত প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। বললেন কে বলেছে তোমার কথা আমি ভাবিনি মা। আমিতো প্রান্তিককে ত্যাগ করতে বলি নি, ভালবেসে দূরে সরে যেতেও বলিনি। তোমার ভিতরের আলোকে তোমার বাইরেটাকেও আলোকিত করতে বলেছি মাত্র, যে ত্যাগ তুমি রেহানার জন্য করেছিলে সেই ত্যাগটুকু তুমি শুধু সেলিনার জন্য কর।

বলেছিলাম যদি না পারি। এও তোমার অভিমান। তোমাকে যতটুকু বুঝেছি তাতে না পারার কিছু নেই মা। জীবনে জ্বালাটাই কি সব? তার স্থির শান্ত ও মাধুর্যময় রূপটাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না? করে কিন্তু এটাও করে আমি যে জ্বালায় জ্বলছি সেই একই জ্বালায় যেন অন্যেও জ্বলে প্রতীমবাবু বললেন, এইখানে তুমি প্রায় সেলিনার সমকক্ষ হয়ে গেছো। তুমি নিজে জ্বলতে জ্বলতে হয়তো চাইতে পারো সেও যেন তোমারি মত জ্বলে। কিন্তু সেলিনা শুধু কামনায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবেনা সে যে কোন ভাবে তার বুকেও আগুন জ্বেলে দেবে। তার মানবী রূপটাই তার কাছে আসল সত্য।

আমি বলেছিলাম, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, উনি বললেন, কোন দিক নির্দেশের জন্য তোমাকে এত কথা বলিনি। আর আমার এসব কথা শুনে মনে হতে পারে প্রান্তিক বুঝি আমাকে এসব বলেছে। কিন্তু না, মা, ও আমাকে কিছুই বলেনি।

সামান্য টুকরো টুকরো কথার মধ্য দিয়েই যা আমার মনে হয়েছে তাই শুধু বললাম। তোমার পথ, তোমার সিদ্ধান্ত সে সবই তোমার। আমার কিছু বলার নেই।

না উনি আর কিছু বলেননি, আজ বুঝতে পারছি প্রতীমবাবু ভালবাসার কোন জায়গায় পৌঁছে গিয়ে একথা বলতে পেরেছেন। তারপর নিজেই বলল যিনি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তিনিই তো ত্যাগের মহত্ত্ব বোঝেন তাই না প্রান্তিক? তোমার কাছেই শুনেছি, সেই কতবছর আগে পূর্ব পরিচিতি ছাড়া একটি বিয়ের সম্ভাবনা বিয়োগান্ত একটি ঘটনায় নষ্ট হয়ে যায়। প্রতীমবাবু তার জন্য নিজেকে দায়ী করে এই জীবন বয়ে নিয়ে চলেছেন। যে মেয়েটি তার মত মানুষকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, তার হৃদয়টা কি নিষ্ঠুর তাই না প্রান্তিক? আমি কল্পনাও করতে পারিনি অশ্রুকণা বুঝতেও পারেনি যে সে মেয়েটি কে? আমি বললাম সত্যিই নিষ্ঠুর। নির্মম আর পাষাণ। কিন্তু তুমি যদি জানতে কণা, যে সেই হৃদয়হীন মেয়েটি হাজার প্রলোভনেও নতুন করে ঘর বাধতেই শুধু পারলো না তাই নয়, ভালোবাসার স্বপ্নটুকুও দেখতে পারলো না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় কি জান? প্রতীমবাবু বা তোমার ভাষায় সেই হৃদয় হীনা নারী উভয়ে উভয়ের অজান্তে বয়ে চলেছে এক দুর্বিষহ

জীবন হাসি মুখে, কারো প্রতি কোন অভিমান না রেখে।

অবাক হয়ে অশ্রুকণা বলল তুমি জানলে কি করে? কাকতালীয় ভাবে। তারপর বললাম তুমিতো প্রতীমবাবুকে দেখেছো, একবার দেখতে ইচ্ছে করে না সেই নারীকে, যিনি তার জেদে অবিচল থেকে প্রতীমবাবুকে এই কঠিন জীবনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন?

অশ্রুকণা বলে, হ্যাঁ ভীষণ ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে তার কাছ থেকে, কেন আপনাবা জীবনকে এই ভাবে টেনে নিয়ে চলেছেন? এতে আপনারা কি লাভ করেছেন? আমি বললাম তারা হয়তো জীবনে পাননি কিছুই, কিন্তু তোমার আমার মত জীবনগুলোকে ভালবাসায ভরে দিয়েছেন। জান কণা সেই হৃদয়হীনা মেয়েটি কে? প্রচণ্ড ঔৎসুক্য নিযে ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল কে? আমি বললাম মিনতি সেন! শোনামাত্র নির্বাক নিষ্পন্দ ভাবহীন বেদনাময় অভিব্যক্তি যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল অশ্রুকণাকে। বললো মিনতি পিসি? হ্যাঁ আমার মা। প্রায় ২৫ বছর পরে আমি প্রতীমবাবুকে মিনতি সেনের কথা বললাম, সরাসরি যখন জানালাম, আমাব মাই আপনাকে এই জীবনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, ইচ্ছে করে না আমার মায়ের শূন্যতাকে পূর্ণতায় ভরে দিতে? উনি প্রথম ভেবেছিলেন, মিনতি সেন হযতো নতুন সংসাব পেতেছেন, আর আমিই তার উত্তরাধিকারী, তখন হয়তো চাপা অভিমান থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু যখন জানতে পারলেন, রেহানার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা, তিনি শুধু অবাক হলেন না, জীবনের সর্বোত্তম শ্রদ্ধা তিনি জানালেন মিনতি সেনকে। বললেন আমাকে, তোমার মায়ের মাতৃত্বের অহংকারকে আমি শ্রদ্ধা করি প্রান্তিক। এখনি কিছুই বলার দরকাব নেই, কিন্তু প্রয়োজন যদি দাবী করে জানিয়ো আমার সর্বোত্তম শ্রদ্ধা তাকে। বলেছিলেন তোমাদের প্রয়োজনে তোমাদের হিতাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে আমাকে পাশে পাবে। এর থেকে বেশী দাবী করে কোন মহত্ত্বকে ছোট করে দিওনা প্রান্তিক! জানি না কেন, নিজের অজান্তে মাথা নত হয়ে এসেছিল তার পায়ের উপর।

তুমি যখন রাগ করে চলে গেলে কণা, মিনতি সেনই আমাকে বললেন ওরা কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখনা, যদি মেয়েটার কিছু হয়। ও যে এত অভিমানী আর জেদী ভাবতেও পারিনি, হয়তো ঠিক মতো ওকে ভালবাসতে পারিনি, যদি পারতাম, যদি তোদের মত ও-ও আমাকে আপন ভাবতে পারতো যত অভিমানই হোক চলে যেতে পারতোনা। তুই যা না বাবা একবার।

তোমার জন্যই গিয়েছিলাম কণা। উনি শুধু জিজ্ঞাস করেছিলেন, আমার কাছে তুমি নিজেই এসেছো? না ...। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম এসেছি আমি নিজের ইচ্ছেয়, তবে মা জানেন, তিনি আমাকে নিষেধ করেন নি। পরের ইতিহাস তোমার জানা কণা। তুমি ভাবতেও পারবেনা কি অপরিসীম শ্রদ্ধা আমার মায়ের প্রতি তার। ত্যাগে যে প্রেম কোন স্তরে পৌঁছিয়ে যেতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রতীমবাবু ও আমার মা। অথচ দেখ, আমার মায়ের সঙ্গে প্রতীম বাবুর কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, দেখাশুনা করেই এই বিয়ে ঘটতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘটল না এই বিয়েকেই কেন্দ্র করে একটা চরম এক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ায়। আর এসব মিটে গেলে প্রতীমবাবু আমার মাকে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে

বলেছিলেন সবকিছুকে ভুলে গিয়ে যদি মনে করা যায় আমারা এক সাথে পথ চলতে পারি, আমি অপেক্ষা করব। অপেক্ষাই করেছেন প্রতীমবাবু আমার মায়ের কোন উত্তর না পেয়েও। আর আমার মা? তিনিও অপেক্ষা করেছেন উত্তর না দিয়ে। দীর্ঘ ২৫ বছর পরে যখন তুমি সজলবাবুকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে, আমাদের যাওয়ার কথাকে বাতিল করার জন্য আমি যাই প্রতীমবাবুর কাছে এবং তাকে আমাদের বাড়ীতে মানে নীলাঞ্জনা পিসির বাড়ীতে আসতে বলি, পিসি মাকেও বলেন তবে কোন কিছু না জানিয়ে। ২৫ বছর পরে দেখা হলেও চিনতে তারা পেরেছিলেন একে অপরকে। কিন্তু আত্ম মর্যাদার গভীর অহংকারে নিজেদের সরিয়ে নিতে কুণ্ঠিত হননি কেউ। আমি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, আমার মা। তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছিলাম এক গভীর বেদনা তাকে যেন পাণ্ডুর করে তুলেছে। মিনতি সেন আর কাছে এলেন না। যখন চলে গেলেন তখন দেখা করেও গেলেন না। প্রতীমবাবুকে মিনতি সেনেব বাবার একটা চিঠি যা তিনি আমাকে লিখেছিলেন তার হাতে তুলে দিয়ে ছিলাম তাতেই জেনেছিলেন তিনি, মিনতি সেনের সত্যিকারের পরিচয়। মুগ্ধ শ্রোতার মতন অশ্রুকণা শুনছিল আমার কথা। প্রতীমবাবু আর মিনতি সেন, তাকে যেন নিয়ে চলেছে এক নতুন জগতে। যেখানে জাগতিক দেনা পাওনা দিয়ে জীবনের বিচার হয় না।

কারো মুখে কোন কথা নেই। নৈসর্গিক নিঃশব্দতাকেও যেন হার মানিয়েছে আমাদের নিঃশব্দতা। বললাম এবার তবে ওঠা যাক। অশ্রুকণা বলল, হ্যাঁ উঠতেতো হবেই, কিন্তু বিশ্বাস কব, প্রতীমবাবু ও মিনতি পিসি তারা যে কেমন ভাবে তাদের অজান্তে আমার জীবনে আলোড়ন তুলেছেন তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না প্রান্তিক।

প্রতীমবাবুকে বলেছিলাম, আমি নিজে কিছুই চাইবোনা ওর কাছে। কিন্তু ও যদি আসে, আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না। বলেছিলেন, তাতে আরো আঘাত পাবে মা, কি দরকার জীবনকে আরো জটিলতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে। তার চেয়ে যা সহজ স্বাভাবিক এবং সুন্দর তার মধ্যে নিজের মুক্তি খুঁজে নিও। দেখবে তাতে কোন হারানোর বেদনা থাকবেনা। জীবনে যদি জয়ী হতে চাও মা, পথকে অনাবশ্যক দূর্গম না করে সুগম করে নাও।

হঠাৎ দেখি সীতা এগিয়ে আসছে। সামনে এসে বলল, দিদিমণি জিজ্ঞাসা করছেন, আপনাদের কত দেরি হবে। এখানে কি চা বা কফি পাঠিয়ে দেবে, না একেবারে রাতে খাবার খেয়ে নেবেন।

অশ্রুকণা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল বাবাঃ ১০টা বেঁজে গেছে। বলল, না তুমি যাও সীতা, আমি আসছি। ও আমাকে বলল এতটা সময় এখানে কাটালাম, কি জানি সেলিনা আবার কি ভাবছে, না জানি অভিমানে কথাই বলবে কি না। আমি একটু হেসে বললাম ভয় নেই কণা প্রতীমবাবুতো বলেছেনেই সেলিনা উত্তাল সমুদ্র হলেও, সমুদ্র শান্ত হতে জানে। তুমি কি বিশ্বাস কর ওকে বাদ দিয়ে এই আকাশ ভরা জোছনা ধারায় যে মুহূর্তটুকু কাটিয়ে গেলাম তাতে ও কিছু ভাববে না? কেন ভয় পাচ্ছ কণা। ভাবারতো কিছু নেই। কি জানি আছে কি না। তবু ভয় হয়। আমি বরং ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি না আসে? সীতাকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে নেবো। প্রয়োজন হবে না কণা। বল আমি ডাকছি! আচ্ছা।

একটু পরে এল সেলিনা। বলল, এতক্ষণ এখানে আছো, এরপরও আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো কেন? বললাম বোস না সেলিনা। রাত কত হয়েছে জান? না হিসেব করিনি। তারপর বললাম কি হল বসবে না? হ্যাঁ বসব, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি এক্ষুনি আসছি। ও ভিতরে গিয়ে অশ্রুকণাকে বলল, অশ্রুদি, প্রান্তিক ভাই আসতে চাইছেনা এখন, তুমি যাবে? চল না কফি খেতে খেতে আরো কিছুক্ষণ কাটানো যাক। না সেলিনা, তুমি যাও। আমিতো অনেকক্ষণ ছিলাম। সেইজন্য বুঝি, আমি যাইনি বলে তুমিও যাবে না। দূর পাগলি মেয়ে, আমি কি তাই বলেছি? তুমি যাওনা, হয়তো তোমাকে কিছু বলতে পারে। বেশ আমি ওর জন্যও কফিটা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও, আমি সীতাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরকার নেই অশ্রুদি, হয় আমাকে দাও, না হলে দিতে হবে না। হঠাৎ অশ্রুকণা বলল, একিরে মেয়ে, চুলগুলো এমন উস্কো খুশকো, শাড়ীটা যারপর নাই কোচকানো, এই ভাবে যাবে নাকি তুমি। একটু বুঝি লজ্জা পায় সেলিনা, বলে, চুলটা বাধার সময় হয়নি, আর তাছাড়া শাড়ী, বাড়ীর মধ্যে বাগান, কে দেখবে শাড়ীটা কেমন? অশ্রুকণা বলল, যার চোখ আছে সেই দেখবে। ঐ শাড়ীটা ছেড়ে ফেল সেলিনা, আর চিরুনীটাও নিয়ে যাও, প্রান্তিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চুলটা বেধে ফেল। সেলিনা বলল আমার চুল বাধা নিয়ে এত ভাবছো কেন? এমনতো নয় যে, এমন ভাবে প্রান্তিক ভাই আমাকে কখনো দেখেনি। হয়তো দেখেছে, কিন্তু দেখেছে বলেই এই ভাবেই তোমাকে রোজ দেখতে হবে তারতো কোন মানে নেই। তাহলে তুমিই চল, চুলটা তুমিই বেঁধে দেবে ওখানে বসে। অশ্রু বলল, সেই এক জেদ, আচ্ছা তুমি সব কিছু নিয়ে যাও। সত্যি যদি চুল বাঁধার কোন অসুবিধা হয় ফিরে এলে বেঁধে দেবো। আর দেরি করো না, অনেকক্ষণ প্রান্তিক একা একা বসে আছে।

সেলিনা আমার পাশে বসে পড়ে বলল, এই নাও চিরুনি আর ফিতে। আমি অবাক হয়ে বললাম, এসব দিয়ে আমি কি করব! কি করবে তা আমি কি করে বলব? আমাকে নাকি এভাবে তোমার দেখতে ভাল লাগবে না, এ ভাবে নাকি তোমার কাছে আসাই উচিত নয় আমার, তাহলে যে ভাবে সাজলে তোমার কাছে দৃষ্টি সুন্দর হয়, সেই ভাবেই সাজিয়ে নাও না বাপু।

ভিতরের অভিমানটা টের পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি যতক্ষণ অশ্রুকণা ছিল ও আসেনি ঠিকই, কিন্তু ভিতরের উত্তাপকে মিইয়ে যেতেও দেয়নি। বললাম, যে সাজে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে সেই সাজে সাজাতে পারলে সাজাবত! পারবে সাজাতে? আমার কোন আপত্তি নেই।

কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন! বললাম সেলিনা, তুমি কি আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ? না। তবে? আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি প্রান্তিক ভাই। আমাকে তোমার যে ভাবে ভাল লাগে, সে ভাবে দেখতে ইচ্ছে করে না? করে সেলিনা, এই মায়াবী রাতে তোমার ডানায় ভয় দিয়ে ঐ চাঁদের দেশে পৌঁছিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, যাবে তুমি? যাবো! সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে বলল সেলিনা। বার বার মনে পড়ছে একটু আগে অশ্রুকণার বলা প্রতীমবাবুর কথা, সেলিনা উত্তাল সমুদ্র হলেও সমুদ্র শান্ত হতে জানে। বললাম, আমার

দিকে পিছন ফিরে বস। ও কোন প্রতিবাদ না করে তাই করল। আমি চিরুনিটা তুলে নিয়ে যতটুকু সম্ভব সুন্দর করে ওর চুল আঁচড়িয়ে দিলাম। তারপর এক বেনীতে বেঁধে দিলাম ওর ঘন কালো চুলের গোছা, যেমন করে একদিন নির্জন নার্সিং হোমের কেবিনে রেহানাকে বেধে দিতাম। তারপর গাছ থেকে সেই জোছনা আলোকে তুলে নিলাম প্রমান সাইজের চন্দ্রমল্লিকা পরম মমতায় গুঁজে দিলাম তা ওর বেনীর উৎসে। এবার বললাম আমার দিকে ফিরে বোস। ও দ্বিধাহীন ভাবে তাই করল। অপলক তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। বলল অমন করে কি দেখছ? তোমাকে? আগে কি দেখনি কোনদিন? না সেলিনা, তোমাকে এমন ভাবে কোনদিন দেখিনি? তুমি কি দেখেছো এমন করে কোনদিন আমাকে? ও উঠে দাঁড়ালো, বললাম উঠলে যে। না এমনি, তুমি বোস আমি আসছি! কোথায় যাবে? কোথাও না, তুমি কিন্তু উঠবে না প্রান্তিক ভাই। ও উঠে গিয়ে গাছ থেকে সুন্দর দুটো গোলাপ তুলে নিয়ে এল, আর তা তুলতে গিয়ে গোলাপ কাটার আঘাতে ওর হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই। ও গোলাপ দুটো নিয়ে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। তারপর আমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল। আমি বললাম সেলিনা একি করলে? ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার হিংসা আর অভিমানকে উজাড় করে তোমাকে দিলাম। আমি ওকে বুকের পরে টেনে নিয়ে বললাম সেলিনা! আমার জন্য কিছু রাখলাম না প্রান্তিক ভাই, এবার আমি কেবল তোমারই। আমার মান-অভিমান হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা-ভালবাসা সবকিছু তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে তোমার হলাম, পারবে কি আমায় ফিরিয়ে দিতে? বললাম, তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি সে সাধ্য আমার নেই। তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, দেখি তোমার হাত! কেন? দেখিনা! ও হাতখানা বাড়িয়ে দিল। তখনো সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে। বুঝি প্রথম খেয়াল হল সেলিনার, বলল, হাতটা কেঁটে গেল কখন কে জানে? আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, আঙুলে তুলে নিলাম ঝরে যাওয়া রক্ত। তারপর তাই দিয়ে টিপ পরিয়ে দিলাম ওর দুই ভ্রুর মাঝখানে, বললাম, এটার বুঝি অভাব ছিল। কি যে আনন্দে তাকালো ও, বলল অশ্রুদিকে একটা প্রণাম করব, উনি নেবেন তো আমার প্রণাম? আত্মসমর্পণে আকাঙ্খা কোথায় পৌঁছিয়ে যায় তাই শুধু ভাবছিলাম।

কেটে গেছে কয়েকটা দিন। অশ্রুকণার প্রথম যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, এখন আর তা হয় না। মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে। সত্যভূষণ বাবু রোজ আসেন না। তবে ডেকে পাঠালে আসেন, তার সৌজন্য তাকে কোন ভাবে বাহুল্যে ভরে দিতে তিনি যেন জানেন না।

এবার যখন সত্যভূষণ বাবু এলেন, আমি বললাম, কালতো চলে যাবো সত্যবাবু। আপনার সৌজন্যের কথা আপনার সমব্যথী দরদী মনের কথা, আমাদের মনে থাকবে। উনি হেসে ফেলে বললেন, ও সবতো আমি নই, আমাকে কি মনে থাকবে প্রান্তিকবাবু। বললাম, কোন রকম বাঁকা অর্থে এসব বলিনি সত্যবাবু। সত্যি আপনাকে ভীষণ ভাল লেগেছে আমাদের। তাহলে বন্ধুত্বের অধিকার দিচ্ছেন তো। সে অধিকার তো যেদিন এসেছি - সেদিনই দিয়েছি। তাহলে ওই কথাই রইল, আমি না আসলে বেরুবেন না। আমিও যাবো আপনাদের

সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে, কোথায়? কাল অশ্রুদেবীই জানান যে আপনারা আগামীকাল যাবেন। মেদিনীপুরে কি একটা বিশেষ কাজ আছে, যদি আমি আপনাদের সাহায্য করি, অবাক হ'লাম একটু। মেদিনীপুরে কি কাজ, অশ্রুকণা কি বোঝাতে চাইছে, কোনটাই তো জানিনে। সেটা না হয় অশ্রুকণার কাছে জেনে নেওয়া যাবে, তাই বললাম, তাহলে তো খুব ভাল হয়। আসলে মেদিনীপুর শহরের তো বিশেষ কিছু জানিনা, আপনি থাকলে তো বিশেষ উপকারই হয়। উনি বললেন এ ভাবে বলছেন কেন? এটা আমার জেলা। মেদিনীপুর আমার শহর।

রাতের দিকে একা পেয়ে অশ্রুকণাকে বললাম, হঠাৎ সত্যবাবুকে আমাদের বিশেষ কি কাজের কথা বলেছ কণা? ও বলল, তা হলে থাক, আমি বলে দেব, না, ওরা এবার সময় পাবে না। আমি বুঝতে পারছিনা কি ও বলতে চাইছে, তবু বললাম, কণা সব সময় যে সব কথা বুঝতে পারবো এমন তো নয়। যদি তুমি কি চাইছো জানতে পারি। ও বলল, হয়তো অভিমানেই, সেলিনা মনে হয় আজ তোমার সব শূণ্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে প্রান্তিক, তাই হয়তো আর কারো জন্য তোমার হৃদয়ে এক বিন্দু জায়গাও নেই, আর সে জন্যই রেহানা আজ তোমার কাছে অতীত ইতিহাস। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, সত্যিকারের ভালবাসা ওর কাছ থেকে শিখেছিলাম একদিন। খাতা কলমে শেখায়নি। নীরবে, একাকী তার আচরণের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল হয়তো তাকে একবার খুঁজতে চাইবে। এই মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ডালিমের মৃত্যু হয়েছিল। আমার বার বার মনে হয়েছে, ডালিমের সঙ্গে এই জেলে রেহানার দেখা হতে পারে। তাই ভেবেছিলাম, হয়তো এখানকার সাক্ষাৎ প্রার্থীর রেজিষ্টার দেখলে রেহানার কোন হদিশ পেলেও পেতে পার। হয়তো এসব আমার ভুল প্রান্তিক। যদি জীবন থেকে ওকে মুছে দিতে চাও দরকার নেই। আর যদি মনে কর, বাস্তব যাই হোক না কেন, ওকে একবার খোঁজা তোমার দায়িত্ব। তাই মনে হয়েছিল, সত্যভূষণবাবু তোমাদের কিছু সাহায্য করলেও করতে পারেন।

না এখানে এসেও ভাবিনি, সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে এই ভাবে তার একটা খোঁজ নেওয়া যেতে পারে, যদিও স্থির বিশ্বাস, ডালিমের সঙ্গে রেহানার দেখা হয়েছিল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম কণা, জীবন থেকে রেহানাকে মুছে দিতে পারবো, এ তুমি ভাবলে কি করে? সেলিনা তার দাবী নিয়ে এসেছে বলে রেহানাতো মুছে যাওয়ার নয়। বলেছো সে তোমাকে ভালবাসা শিখিয়েছে, হয়তো সে তোমার হৃদয়ের উপলব্ধি। কিন্তু আমার জীবন দর্শনতো তারই দান। সব কিছুকে, কি ভাবে, জীবনের সঙ্গে সহনশীল করতে, কি ভাবে জীবনকে মর্য্যাদাময় করতে হয়, এসব আমাকে সে তার নীরবতা, উপলব্ধি আর অনুভব দিয়ে শিখিয়েছে। না কণা, জীবনে সেলিনা যেভাবেই আসুক না কেন, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না, বরং তুমিও চলনা সত্যবাবুর সাহায্যে আমি, তুমি ও সেলিনা যদি তার কোন খোঁজ পাই।

অশ্রুকণা বলল, এত আবেগ তাড়িত হয়োনা প্রান্তিক। তোমরাই যাও। প্রাথমিক খোঁজ যদি পাও, আমাকে জানিও। আমিতো এখানেই থাকবো, তার সর্বশেষ সংবাদ পাওয়ার জন্য আমি যথাসাধ্য করব। ওকে আর বেশী কথা বাড়াতে না দিয়ে প্রসঙ্গটায় ইতি টেনে দিলাম।

আজ চলে যাব। মনটা সকাল থেকে ভীষণ ভারাক্রান্ত অশ্রুকণাকে নতুন করে কোন সান্ত্বনা দেওয়ার নেই আমার। নিজের সান্ত্বনা সে নিজেই খুঁজে পেয়েছে। এখানকার পরিবেশ, এখানকার মানুষ, তার সহকর্মীরা সর্বোপরি সত্যভূষণবাবু সবকিছু মিলে হয়তো অশ্রুকণাকে নতুন ঠিকানার সন্ধান দিতে পারবে, এই আশা নিয়েই যাচ্ছি। সেলিনাও একয়দিনে জীবনের আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছে। ও বোধ হয় সার সত্য বুঝেছে যে হিংসা বা ঈর্ষা দিয়ে কোন হৃদয় জয় করা যায় না, তার জন্য যে স্বার্থ হীন ভালবাসা দরকার, সে তা অর্জন করেছে বলে মনে হয়।

মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছে সেলিনাকে অশ্রুকণা। ওর সব থেকে দামী শাড়ী আর গয়না দিয়ে সাজিয়েছে ওকে। সেলিনা বলল, এ তুমি কি করলে অশ্রুদি তোমার সব থেকে দামী শাড়ী আর গয়না আমাকে দিয়ে দিলে? অশ্রুকণা বলল, এসব তো ভাল লাগার জন্য। তোমাকে পরিয়ে আমার ভাল লাগলো। তাই তোমাকে সাজিয়ে দিলাম। শুধু ভাল লাগার জন্য অশ্রুদি। তা ছাড়া আর কি? তারপর বলল সেদিন রাতে যখন তুমি প্রান্তিকের সাজানো সাজে আমায় প্রণাম করলে, অবাক হয়েছিলাম সেলিনা, কি আছে ওর মধ্যে যা তোমাকে এমনি করে পরিবর্তন করে দিল। ভুল অশ্রুদি আমার মধ্যে যা কিছু পরিবর্তন সে তোমারই দান। গর্ব হয়েছিল কি না জানিনা সেলিনা, কিন্তু আনন্দে দু চোখে যেন বান ডেকে এসেছিল। ভেবেছিলাম, সময় যদি আসে আমিও একদিন সাজাবো তোমায়। তাই সাজিয়েছি বোন, অন্তরের কৃতজ্ঞতায় যদি গ্রহণ কর, অভিমানে যদি ছুঁড়ে ফেলে না দাও সেই হবে আমার পুরস্কার। সেলিনার গলা যেন আবেগে থর থর করে কাঁপছে, বলল, অশ্রুদি, তোমাদের ভালবাসার সত্যি কি আমি যোগ্য! অশ্রুকণা বলল সেতো জানিনা ভাই। যোগ্যতার পরিমাপ কি করে করতে হয় তাও জানিনা। একদিন মনে করতাম মিনতি পিসির বেছে নেওয়া জীবন যেন কোন ধনীর দুলালির হঠাৎ খেয়াল। কিন্তু যেদিন সত্যিটাকে জানলাম, মনে হ'লো মানুষকে আমরা কত ভুলই না ভাবি, মিনতি সেনের সর্বস্ব ত্যাগ, আমাকে যেন এক নতুন সত্যের সন্ধান দিল। না, সেলিনা প্রান্তিককে তোমার হাতে তুলে দিতে, আমার কোন পিছুটান নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মনে যে কোন লোভ ছিল না তা নয়, কিন্তু এখানে এসে জানলাম লোভই জীবনের সর্বস্ব নয়, তাকে, ত্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের সার্থকতা। হয়তো অনেক সময় ভুল বুঝেছ আমাকে, আমার আচরণও যে তাতে ইন্ধন যোগায় নি, তা কিন্তু নয়। ওর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠলো।

আমি শুনতে পাচ্ছি, সেলিনা বলছে, এই খানে তুমি জয়ী অশ্রুদি, ত্যাগের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের সন্ধান, আর আমি, ত্যাগ চাইনি, জীবনের সর্বস্ব দিয়ে পেতে চেয়েছি, পেয়েছি কি না জানি না, তবু প্রতিমুহূর্তে ভয়, এই বুঝি হারিয়ে যাবে। কেন এত ভয়? ওকি তোমাকে গ্রহণ করেনি? যে উপলব্ধিতে তোমার জয় হয়েছে সেই উপলব্ধিটুকু যে আমার নেই। প্রতি মুহূর্ত মনে হয় আমি রেহানার ছায়ামাত্র। রেহানার সাথে ওর যেভাবেই দেখা হোক, যদি তা হয় কোনদিন, ওর জীবন থেকে মুছে যাবে সেলিনা। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তো আমি সত্যের সন্ধান করিনি। যদি সেই শুভ মুহূর্ত আসে ওর জীবনে, আমি কি করব

বলতে পার অশ্রুদি?

একটু দ্রুত পায়ে সত্যভূষণ বাবু এলেন। এসেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে একটা টেলিগ্রাম এসেছে কলকাতা থেকে। অশ্রুকণা বলল কোন দুঃসংবাদ। প্রাণ খোলা হাসিতে নিজেকে প্রকাশ করে সত্যভূষণ বাবু বললেন আমাদের একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস, টেলিগ্রাম মানেই দুঃসংবাদ। না অশ্রুদেবী এটা দুঃসংবাদ নয়। পাঠিয়েছেন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রাণ পুরুষ সেই প্রতীম চোধুরী প্রান্তিক বাবুর জন্য। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাকে? হ্যাঁ প্রান্তিকবাবু আপনাকে। টেলিগ্রামটা উনি আমার হাতে তুলে দিলেন। যদিও টেলিগ্রাম, তবু আসলে একটা চিঠি। প্রতীম বাবু লিখেছেন, প্রান্তিক, আমি মেদিনীপুর হোটেলের ৪ নং ঘরে উঠছি। ৫ ও ৬ নং ঘর তোমার ও সেলিনার জন্য বুক করা আছে। অশ্রু যদি আসতে পারে, ওকেও নিয়ে এসো। তোমরা দেরি করছ দেখেই টেলিগ্রামটা করতে হল। ৫ তারিখ রাত ৮ টার মধ্যে অবশ্য পৌছে যেও। এতদিনে সত্যভূষণের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাদের আলাপ হয়েছে, ওই তোমাদের পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, ইতি - প্রতীম চৌধুরী।

অশ্রুকণা ও সেলিনা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি টেলিগ্রামটা তাদের হাতে দিয়ে বললাম, সত্যবাবু ৫ তারিখ তো আজ তাইনা? আপনি জানেন কি উনি কেন আসছেন? তা তো বলতে পারবো না প্রান্তিক বাবু।

অশ্রুকণা টেলিগ্রামটা পড়ে সেলিনার হাতে দিয়ে বলল, তোমরা যাও প্রান্তিক। আমি এখন আর যাব না। জানতে চাইলাম, কেন টেলিগ্রাম করেছেন পড়ে কিছু মনে হল? না বুঝতে পারছিনা, হয়তো এমনও হতে পারে ব্যক্তিগত কোন কাজেই হয়তো আসছেন।

সেলিনা বলল আমার মনে হয় অশ্রুদি, কোন বিশেষ সংবাদ আছে, এবং তা মেদিনীপুরেই। তারপর আমাকে বলল প্রান্তিক ভাই, রেহানার কোন ব্যাপার ওকে বলেছ কি? না আমি কিছু বলিনি, তবে ব্যাপারটি উনি জানেন। তুমি বলনি অথচ জানেন? আমি না বললেও কেউ না কেউ হয়তো বলেছে। তাই বল।

সত্যভূষণবাবু বললেন, তাহলে আর দেরি করা ঠিক হবে না, যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। বললাম বেশ চলুন তা হলে। সেলিনা বলল, অশ্রুদি তোমার কি যেতে খুব অসুবিধা হবে? বলল অসুবিধাটা তোমাকে বোঝাবার নয়। তোমাদের সঙ্গে গিয়ে একা একা ফেরার যে দুর্বিসহ যন্ত্রণা, তার ভেতর পড়তে চাইনা, এরপর যখন আসবে, তোমাদের সঙ্গে যাব। এবার আর অনুরোধ করোনা। সত্যভূষণবাবু বললেন, আমি বাইরে আছি, দেখি ওরা এল কিনা। উনি বেরিয়ে গেলেন। সেলিনাও পাশের ঘরে চলে গেল ব্যাগ আনার জন্য। অশ্রুকণা বলল, কিছু বলবেনা? বললাম তোমার মন শান্ত হোক কণা, ঈশ্বর যেন তোমাকে সেই শক্তি দেয়। যাওয়ার আগে আমার কাছে তোমার কিছুই চাওয়ার নেই বলল অশ্রুকণা। কে বলল নেই? তাহলে বল। কি তোমাকে দেব। যাতে আমার সব শূণ্যতা আর অভাব পূর্ণতায় ভরে যায় তাই আমাকে দাও কণা। আমি দিলে তুমি পারবে নিতে? পরীক্ষা করেই দেখনা? বাঁধা দেবে নাতো? না বেশ, তাহলে নিয়ে যাও বলে আচমকা ও

হাঁটু ভেঙে যে ভাবে মাথা নোয়ালো, তাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রইলনা। তবু তাকে বাধা না দিয়ে বললাম, তোমাকে কিছু দিতে না পারলেও আমি কিন্তু তোমার দান হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছি। দুঃখ পেও না কণা। অপেক্ষা করো। সত্যি? হ্যাঁ সত্যি। আমি আসব, আবার আসব তোমার কাছে কণা। এমন করে তোমার দানকে স্বার্থপরের মত কেবল বাক্সবন্দী করে রাখতে পারবো না। যদি না পার তাহলে জাগতিক এমন কিছু দিয়ে যাও, যা আমার একাকী নিঃসঙ্গতায় সব সময় আমার পাশে থাকবে। বেশ, বলে, আমার পার্স থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, জানিনা অহংকারটা বেশী হয়ে গেল কিনা।

উজ্জ্বল চোখদুটি চিক চিক করে উঠল। দু হাত পেতে নিল আমার ছোট্ট উপহার, তারপর বলল সেলিনাকে দেখ প্রান্তিক। ওর অভিমানে যেন কোন ভাবে ঘা না লাগে এই অনুরোধ।

সাতটার একটু পরে আমি ও সেলিনা মেদিনীপুর হোটেলের ৪ নং ঘরে নক করলাম। বেরিয়ে এলেন প্রতীমবাবু। আমরা ওনাকে প্রণাম করলাম। প্রতীমবাবু বললেন, জায়গাটা কেমন লাগলো সেলিনা? ভীষণ ভালো। তাহলে কদিন থেকে এলে না কেন? কি ভাবে থাকবো? কেন অশ্রুর কাছে। অশ্রুদিরতো থাকার অধিকার আছে, কিন্তু আমাদের তো তা নেই। অনধিকারে আর কদিন থাকবো বলুন। তাহলে তুমি অধিকার চাও? হাসতে হাসতে প্রতীমবাবু বললেন। চাইলেই বা আমাকে দেবে কে? গলাটা বোধ হয় একটু ভারি হয়ে এসেছিল। আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। তবে কি অশ্রুকণার কাছ থেকে বিদায়ের সেই ছোট্ট দৃশ্যটুকু তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি? এরই মাঝে প্রতীমবাবু বেল দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন, এলে স্নাকস্ ও কফির অর্ডার দিলেন যেমন, তেমনি তিন জনের ডিনারেরও। আমার হাতে ঘরের চাবি দিয়ে বললেন ওর ঘরটা দেখিয়ে দাও প্রান্তিক। আচ্ছা বলে সেলিনাকে বললাম চল। ওর ঘরে ঢুকে ও বলল, রাতে আমাকে এখানে একা থাকতে হবে? অদ্ভুত প্রশ্ন। বললাম, অসুবিধে হবে? অসুবিধা হলে কি করবে তুমি? থাকবো তোমার কাছে! বাজে কথা বলো না প্রান্তিক ভাই? কোনদিনই তুমি আমার কাছে থাকতে পারবেনা। একি বলছ সেলিনা। আজ রাতে যদি সত্যিই তোমার কাছে থাকি, কাল মুখ দেখাতে পারবে? আগে থাকার যোগ্যতা তো অর্জন করো, তারপর ভাবা যাবে, কি হবে আর কি হবে না। বললাম ঠিক আছে প্রতীমবাবু কফির অর্ডার দিয়েছেন। বেয়ারাকে দেখলাম, কফি নিয়ে ঢুকলো, তুমি তাড়াতাড়ি এসো। যাচ্ছি। আমি কিন্তু একা একা এ ঘরে থাকতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

একটু পরে শাড়ীটা বদলে চোখে মুখে জল দিয়ে এলো সেলিনা। প্রতীম বাবু বললেন, একা একা থাকতে ভয় লাগবে তো। নানা আমার কোন অসুবিধা হবে না বলে সেলিনা তাকালো আমার দিকে। লজ্জার কিছু নেই। ওই ঘর দুটোয় ভিতরে দরজা আছে, ভয় করলে দরজা না হয় খোলা রেখ। কিন্তু আমি তোমাদের আসতে বলেছিলাম, কারণ, এখানকার সেন্ট্রাল জেলেতো ডালিম মারা গিয়েছিল তাই না? আমরা উভয়ে তাকালাম ওনার দিকে।

আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ডালিমের মৃত্যুর দিন কয়েক আগে রুকসানা নামে একটি মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার মনে হয় মেয়েটি রেহানা হতে পারে। আসলে ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্য সাহেব, আমাকে বলেছিলেন, আপনিতো ওখানে যাচ্ছেন, খোঁজ নিয়ে দেখবেনতো রেহানা নামে কোন মেয়ে ডালিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না। আমি বললাম, হঠাৎ ডালিমের মৃত্যুর এতদিন পরে আপনার এ খোঁজ নেওয়ার দরকার হলো কেন? উনি আমাদের কোম্পানীর সলিসিটর, তাকে অনুরোধ করেছেন তোমার মা। আমরা যুগপত বিস্মিত হলাম। অবশ্য মেয়েটির একটি ঠিকানাও দেওয়া আছে প্রযত্নে মোসলেমউদ্দীন আমি তার বাড়ীতেও খোঁজ নিয়েছি, মোসলেমউদ্দীন ডালিমের এক দূর সম্পর্কের চাচা। কিন্তু ওখানে রুকসানা নামে কেউ থাকে না। ওই নামে উনি কাউকে চেনেনও না। মনে হয় মেয়েটি তার আসল নাম সাক্ষাৎ প্রার্থীর খাতায় লেখেনি। আমার সন্দেহটা অমূলকও হতে পারে। তবু প্রান্তিক আমি চাইছি তোমরা দুজনেই মোসলেমউদ্দীনের বাড়ীতে একবার খোঁজ নাও। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিনি ডালিমের কাছে আসতেন। এতক্ষণে সেলিনা বলল আমার মন বলছে রুকসানাই রেহানা। আমারও তাই মনে হয়। বললেন প্রতীম চৌধুরী। তারপর নিজেই বললেন, এবার তোমরা যাও। সকালে আমি একটা গাড়ী ঠিক করে রেখেছি। ড্রাইভার আমার নিজের লোক। তাকে বিশ্বাস করে তোমরা যে কোন জায়গায় যেতে পারো। তোমাদের আরো যদি কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় ও তোমদের নিয়ে যাবে। এবার এস তোমরা আমার কিছু অফিসিয়াল কাজ আছে।

আমরা চলে এলাম। ঘরে এসে জামা প্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ভাল ভাবে স্নান করলাম। তারপর পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আর সারদিনের ক্লান্তি শেষে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখে ঘুম নেমে এল।

খানিক পরে এল সেলিনা, বসল আমার মাথার কাছে। তারপর আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে নীরবে আমার মাথার চুলের মধ্যে তার আঙুল চালিয়ে বিলুনী কাটতে লাগল। এক সময় বলল, শরীর খুব খারাপ লাগছে প্রান্তিক ভাই? আমি চোখ মেলে দেখি ও আমার শিয়রের কাছে বসে আছে। বললাম, কতক্ষণ এসেছো? অনেকক্ষণ। ডাকলেনা কেন? তোমার ঘুমন্ত মুখটা দেখতে ভীষণ লোভ হচ্ছিল তাই। আমি আর কোন কথা না বলে উঠে বসলাম। বললাম এবার তুমি শুয়ে পড়ো, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। না। কেন না? ও দিকে না গিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় না রুকসানাই রেহানা। ঠিক বুঝতে পারছিনা, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। মানে? আমার কি মনে হচ্ছে জান? কি? তুমি আসনিতো সেলিনা? ও অবাক হয়ে গেল, বলল তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না মাথা আমার খারাপ হয়নি, আগে হয়তো এত বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন বুঝি। রেহানা এটা পারবেনা। রেহানা পারবে না, আর আমি পারবো, একথা ভাবলে কেন? রেহানা আমাকে ছেড়ে যেতে পারলেও তুমি পারবেনা এই বিশ্বাস আছে বলে? বিশ্বাস তোমার যেমনই থাকুক প্রান্তিক ভাই রেহানার কাছ থেকে তোমাকে আমি কোনদিনই কেড়ে নিতে পারবো না। আর তা ছাড়া তুমি যা ভাবছ, সে তোমার কল্পনা, বাস্তব নয়। একটা কথা জেনে রাখ,

তোমার জন্য আমি যুদ্ধ করতে পারি, নিজের জীবনও হয়তো দিতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য করুণা ভিক্ষা করতে পারি না কারো কাছে, তাতে আমার আত্ম মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। তাহলে কাল আমরা যাচ্ছি ঠিকতো। অবশ্য যাবো। যাবে? কেন, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ? একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, অবিশ্বাস নয় সেলিনা, অশ্রুকণার ওখানে ওই কয়টা দিন আমার জীবনে যে কি পরিবর্তন এনে দিয়েছে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। যেমন? আগে বুঝতে পারতাম না আমি কি চাই? এখন কি বোঝ? ভীষণ ভাবে বুঝি? কি চাও তুমি? তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলবে না এ সত্য আমি, ওখানেই আবিস্কার করেছি। না, প্রান্তিক ভাই, কোন সত্যই তুমি আবিস্কার করতে পারনি। অবশ্য তার জন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমিও যদি তোমার মতো জটিলতার মুখোমুখি হতাম, আমার অবস্থাও তোমার মত হতো। তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না? কি যে বল প্রান্তিক ভাই! আজ যদি তুমি বল সেলিনা, তোমার সঙ্গে যা করেছি সব অভিনয়! আমার বিশ্বাস করতে কোন কষ্ট হবে না। কেন জান? আমি বললাম কেন? আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় এই যে মান অভিমান ঈর্ষা ও হিংসা, তোমাকে পাওয়ার জন্য যে আকুলতা সেও কি অভিনয় নয়? যদি অভিনয় না হয় তা হলে কেন বলতে পারিনা প্রান্তিক ভাই, যে দিন প্রথম তোমায় দেখেছিলাম সেদিনই তোমায় ভালবেসেছিলাম। সেলিনা? না প্রান্তিক ভাই ওই ভাবে আমাকে দুর্বল করে দিও না। কারণ আমি জানি, রেহানা সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি হারিয়ে যাবে। কেমন করে সেই বাস্তবকে মেনে নেবো? তুমি হয়তো কোন দিন, বলনি, কিন্তু বুঝতে পারি, তোমরা সবাই আমার সম্পর্কে একটা কথা ভাবো, তা হলো আমার বাঁধন থেকে তুমি মুক্তি পাবে না। কি ভাবো না? আমি অবাক হয়ে যাই ওর কথায়? নিজেকে সংযত করে বলি, কে কি ভাবে জানি না সেলিনা, আমি শুধু জানি তোমার বাঁধনেই চাই আমার পূর্ণ মুক্তি। তারপর ওকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে অপলক ওর চোখে চোখ রেখে বলি, আমায় কি তুমি বুঝতে পারনা সেলিনা? পারি। তা হলে এত দ্বিধা কেন? নিজের মুখটা আস্তে নামিয়ে আমার তৃষ্ণাতুর ঠোঁট দুটি রাখতে চাই নিরাপদ আশ্রয়ে। ও আঙুল দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে বলে, আজ না। তোমার ভিতরের এ দুর্বলতা আমায় যে কি কষ্ট দিচ্ছে, সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না, তবু আজ নয়। আমি ওকে ছেড়ে দিই। বাইরের দরজায় কে যেন নক করে। ও আমার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মাঝের দরজাটা খোলাই থাকে। দরজাটা খুলেই দেখি প্রতীমবাবু, বললাম আপনি! হ্যাঁ আমি, ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়লে কি না। ডিনার দিয়েছে বেশ কিছুক্ষন। সেলিনাকে নিয়ে চলে এসো, দেরি করো না।

প্রতীমবাবুর কথা মতো গাড়ী আসে। ড্রাইভারের নাম আকবর আলী। আমি ও সেলিনা গাড়ীতে গিয়ে বসি। ওকে বলি, আকবর ভাই, তুমি মোসলেমউদ্দীন সাহেবের বাড়ী চেনো? চিনি। কত পথ হবে? তা প্রায় দু আড়াই ঘন্টা লাগবে। তাহলে চল।

চারিদিকে সুবজ শুধু ধান আর ধান। আমি আর সেলিনা। যেন স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে চলেছি। বার বার মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য, আমরা চলেছি, রেহানাকে

খুঁজতে, সেই রেহানা, যাকে বাদ দিয়ে আমি কোন দিনই ভাবতে পারিনি কিছু! সেলিনার কথা যদি সত্যি হয়, যদি রেহানাকে খুঁজে পাই, ওর সামনে আমি কি ভাবে দাঁড়াবো, কি বলবো ওকে আমি!

সেলিনা বলল কি ভাবছো? ভাবছি আমার অতীত ও বর্তমান। না তুমি তা ভাবছো না। তাহলে কি ভাবছি? ভাবছো, রেহানা যদি সামনে এসে দাঁড়ায় কি ভাবে বিদায় দেবে আমাকে, বল সত্যি কি না। ভয় নেই প্রান্তিক ভাই, রেহানাকে খুঁজে পেলে আমি কোন দিন কোন দাবী নিয়ে তোমার কাছে আসবো না। প্রতীমবাবুকে বলব, অশ্রুদির মতো আমাকেও একটু আশ্রয় দিন। তাতে তুমি মুক্তি পাবে? মুক্তি তো আমি চাই না। তবে? তোমার বুকে আগুন জ্বালাতে চাই প্রান্তিক ভাই আর সেই আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যেতে চাই। তুমি ভাবছো কি করে রেহানাকে খুঁজে পেলে আমার বুকে তুমি আগুন জ্বালাতে পারবে? তুমিতো জ্বলছো, নতুন করে জ্বালাবার দরকার হবে না। আচ্ছা সেলিনা 'রেহানাকে তুমি হিংসা কর?' রেহানাকে নয়, আমি হিংসা করি তোমাকে! সত্যি আমি বুঝতে পারি না, তোমাদের কাউকে। বুঝতে পারনা কেন? না বোঝার মতো তো আমার কোন আচরণ নয়, রেহানা বা অশ্রুদির মতো, দুঃখকে গোপন করতে পারি না আমি। রেহানা তার মনের মণি কোঠায় কি ভাবে তোমাকে জায়গা দিয়েছে বলতে পারব না, কিন্তু আমি কেমন ভাবে তোমাকে পেতে চাই তাতো অস্পষ্ট নয়। আমি রক্ত মাংসের মানুষ, আমার ব্যাথা আছে বেদনা আছে - আর তাকে প্রশমিত করার জন্য আমি কোন অবয়বহীন আদর্শের পিছনে ছুটি না। তাইতো তোমার কাছে আসি আমি বারবার বিচিত্র রূপে। কিন্তু তুমি? যখনি মনে হয়, আর কোন ভয় নেই, আমার বাধন কাটাবারও কোন উপায় নেই, তখনি আবার ভয় হয়, এই বুঝি তুমি হারিয়ে গেলে। এই বুঝি তুমি অশ্রুদির হয়ে গেলে, অথবা রেহানার। কেন এমন হয় বলত। বললাম তুমি কি বৈষ্ণব কবির সেই লাইনটা জান? কোনটা। যেখানে কবি বলেছেন "দুহ ক্রোরে দুহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" অথচ তাদের প্রেম ভাষায় অবর্ণনীয়। তারা নিজেরাও জানে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ কেউ ঘটাতে পারবে না, তবু ভয় নাই যায়। সেলিনা বলল —

আমারও মনে হয়
পাহাড়ের উচ্চতা স্পর্শ করতে পারে না যে কুটিল হাত
আমার প্রেম পৌঁছিয়ে যায়
পতনের অপেক্ষা না রেখে,
আমি বললাম, তাই যদি বিশ্বাস কর, কেন আঘাত দাও।
আঘাত যদিবা দিই,
বাজে কি সে আঘাত অন্তরে তোমার?
প্রতিধ্বনিত বীণা তন্ত্রীতে
যে সুর ব্যাকুল হয়ে বাজতে চায়

কোন সে অযুহাতে
ফিরিয়ে দাও তাকে।
কেন মায়াবী রাতের
নিঃশব্দ অন্ধকার, তোমার বলিষ্ঠ পেষনে
আলোকিত হয় না?
কেন নির্বাক মুখে
যে ভাষা মুখর হতে চায় বার বার
কোন সে কুয়াশায় ঢেকে রেখে
তার থেকে মুক্তি পেতে চাও তুমি?
যে কথা উচ্চারিত বহুবার
যে সুরের স্পর্শে প্রলম্বিত ইথার বাতাস
হৃদয় যেখানে কান্নায় উন্মুখ
ভীরু হৃদয় দুয়ারে আঘাত হেনে -
অন্ধ চোখের বোবাগলিতে
কান পেতে শুনেছ কি
উত্তাল সাগর তাব যে গর্জনে ঢেকে দেয় -
মুখর উর্মি, সে তরঙ্গ মালায়
ভুল করে কোন দিন যদি আস তুমি
ভীতি হীন মুহূর্তগুলো
যে স্বাক্ষর রেখে যায আদিম স্পষ্টতায়
অরণ্যের নির্জনতা
সেও কি ভয়ংকর তার থেকে?
কে তোমাকে বেসেছিল ভাল,
জানেনা সেলিনা,
সে কেবলি জানে
প্রথম স্পষ্টতায় যে স্বাক্ষর রেখেছিল একদিন
তোমার হৃদয়ে আজো ভাস্বর - তা,
শুধু তুমি অন্ধ বলে
বার বার হাতড়িয়েছ পথ
খুঁজে পেতে চেয়েছো সে ভুলের ঠিকানা।

জান তুমি ভাল করে
সব কিছু জমা আছে
হৃদয়ের মাঝে,
তবু কেন খোঁজ বার বার।
হে অন্ধ পথিক,
যে পথ চেননা তুমি
জাননা পথের শেষ
তবুও পৌঁছাতে চাও
পথ প্রান্তে যে আছে অপেক্ষা করে।
হায় ভালবাসা, ভীরুমন-
সেলিনারে বুঝলেনা কোনদিন।
শুধু কথার যাদুতে
চেয়েছো যা পেতে
নিজের অন্তর চিরে, দেখেছো কি?
কি চেয়েছো তুমি?
তবু যদি মনে হয়,
আমি ছাড়া সবই অন্ধকার
সকলি শূণ্য, শূণ্য চারিদিক
রিক্ত হস্ত ক্লান্ত বেদনায়
এতদিন যা চেয়েছ সবই ভুল
সত্য শুধু সেলিনার প্রেম।
ধর বন্ধু হাত, তুলে নেও হৃদয়ে তোমার
নামুক তৃষ্ণাতুর ওষ্টদুটি
প্রতিদান হীন।
এইতো এসেছি আমি,
চেয়েছি তোমার কাছে জীবনের দাম,
যে আজ হারিয়ে গেছে
হারতেই জন্ম যার
কেমনে করবে জয়ী, তারে তুমি,
হে অন্ধ পথিক।

থামল সেলিনা। কি সহজ সাবলীলতায় নিজেকে মেলে ধরল ও। সুরও ছন্দে এক অনরদ্য কবিতা যেন? না এমন করে কেউ আজো হৃদয়ে দোলা দেয় নি। গর্ব ও আবেগে সত্যি তাকে বুকের কাছে টেনে নিতে চাইলো মন। কিন্তু নির্জন অন্ধকার যা দিতে পারেনি, তাই দেবে এই প্রখর আলোক ধারা? হায় ভালবাসা তোমাকে বুঝিনি কোন দিন। আজো তাই অন্ধকারে চির রহস্যে ঢাকা থাক তুমি। যদি প্রেমের প্রদীপ কোন দিন জ্বলে আমার হৃদয় মন্দিরে, সেইদিন খুঁজে নেবো। আজ তুমি থাক, গোপনতার আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করে।

সেলিনা বলল, আমার কথাতো বললাম, এবার বল কি চাও তুমি আমার কাছে? বললাম যা তুমি দিতে চাঁও, তাই দাও নিঃস্ব করে হিংসা অথবা ভালবাসা, ঈর্ষা অথবা রাগ। বলল, দিলাম তোমাকে আমি সর্বস্ব উজাড় করে, এবার পারবে কি মেলাতে, না মেলা অংক তোমার। শুধু অপলক তাকিয়ে বললাম পারব, সেলিনা পারব।

বাস্তব যখন মিথ্যে হয়ে স্বপ্নের জগতে ডানা মেলেছে, আকবর বললো, এসে গেছি সাহেব, আর গাড়ী যাবে না, এবার হাটতে হবে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নেমে এলাম ভূমিতে। বললাম তাইতো, একটু চা খেলে হয় না? আকবর বলল, আপনারা বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

মোসলেমউদ্দীন বাড়ীতেই ছিলেন। গ্রামের বাড়ী যে রকম হয় সে রকম বাড়ী। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। আকবর বললেন মোসলে চাচা, একজন সাহেব এবং একজন মেম সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, নিয়ে আসব? উনি বললেন, নিয়ে আসবি? আচ্ছা আয়।

সেলিনা এগিয়ে গিয়ে বলল, আদাব চাচা, আমার নাম সেলিনা, ঘোলাটে চোখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ। কি যেন খুঁজছিলেন সেলিনার অবয়বে। বললেন, কি নাম যেন বললি বেটি! সেলিনা। মাথা নাড়ালেন বৃদ্ধ! না সেতো নয় অস্পষ্ট উচ্চারণে মনে মনে বললেন বৃদ্ধ। সেলিনা বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন না চাচা? আরার বৃদ্ধ তার ঘোলাটে চোখ দুটো যতটা সম্ভব বিস্ফোরিত করে তাকালেন ওর দিকে, কিন্তু কিছু না বলে আবার চুপ করে গেলেন। আকবর বললেন, চাচা মেহমানদের কিছু খাওয়াতে হবে তো, ইয়া আল্লাহ তাইতো। তা আকবর দেখতো বাপ ওদের জন্য কি করা যায়? আকবর চলে গেলেন। সেলিনা আবার ও বলল একদম চিনতে পারছেন না চাচা, সেই যে বেশ কিছুদিন আগে একবার এসেছিলাম। মোসলেমউদ্দীন কি যেন ভাবলেন। হয়তো মনে করবার চেষ্টা করলেন, সত্যি একে আগে দেখেছেন কি না। সেলিনা বলল, কি চাচা মনে পড়ছো তো! বৃদ্ধ যেন কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন, এই ভাবে বললেন, কি জানি বেটি। বয়স হয়েছে, সবতো আজকাল আর মনে থাকে না। আমি বরং তোমার চাচীকে ডাকছি। মোনা বলে হাক ছাড়লেন বৃদ্ধ মোসলেমউদ্দীন। মোসলেমউদ্দীন যতটা বৃদ্ধ, মোনা অর্থাৎ মনোয়ারা তা নয়, তাকে এখনো যুবতী বলে অনুমান করা ভুল নয়। সেলিনা এগিয়ে এসে বলল, আদাব চাচী, আসলামো অলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসলাম, বললেন মনোয়ারা বেগম। তারপর বললেন, তোমাদের

তো চিনতে পারলাম না মা। আমাদের চেনার কথা নয় চাচী, তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওর নাম প্রান্তিক। রেহানা নামের একটি মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছে, আর আমি এসেছি ডালিমের জন্য।

মনোয়ারা বেগম সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে, বললেন, এ দুজনের কারো সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই আর চিনিও না। তাছাড়া এদের সম্পর্কে জানবার জন্য তোমরা আমাদের কাছে এসেছো কেন? সেলিনা বলল, কারণ ডালিমের একমাত্র পরিচিত এবং জীবিত আত্মীয় বলতে আমরা শুধু আপনাদেরই খোঁজ পেয়েছি, তাই ভাবলাম আপনারাই হয়তো দিতে পারেন কিছু তথ্য, কিছু প্রাথমিক জ্ঞান! বৃদ্ধ মোসলেমউদ্দীন বোধ হয় এতক্ষণে আমাদের আসল কারণটাও অনুধাবন করতে পেরেছেন, বললেন যা শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে কেন টানাটানি করছ তোমরা। সেলিনা বলল, কারণ আমাদের বিশ্বাস রেহানা একদিন আপনার কাছেই এসেছিলেন এবং সেই নামেই একদিন ডালিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন আপনি, বলুন সত্যি কি না। বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন। সেলিনা হেসে ফেলে বললে, কি হলো চাচা, মনে পড়ছে, কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ালেন মোসলেমউদ্দীন। আবারও হেসে ফেলল সেলিনা। বলল, এতক্ষণ তাহলে আমাকে চিনতে চাইছিলেন না কেন চাচা? না তা ঠিক নয় বেটি, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমাদের বাড়ীতে। বর্ষায় ভিজে একা কার। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমি বাইরে এসে বললাম কে বেটি তুমি? কি যেন এক উৎকণ্ঠায় হাঁফাচ্ছে ও। বড্ড মায়া হল, মনে হল সারাদিন মেয়েটির কিছু খাওয়া হয়নি। বললাম কি নাম বেটি, বলল রুকসানা, আমি তাকে ঘরে আসতে বলে মোনাকে বললাম, ওকে একটা শুকনো কিছু দাওতো। মোনা ওকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং শুকনো কিছু পরতে দিয়ে আমাকে এসে বললেন, কেন এই উটকো ঝামেলা বাঁধালে বলতো। আমি ওকে শান্ত হতে বলে বললাম, উটকো ঝামেলাতো জীবনে কতই লেগে থাকে, আবার তা মিটেও যায় যেমন, আসেও নতুন করে। কিন্তু একটা অসহায় মেয়ে তোমার দরজায় এসেছে, আগে ওকে সুস্থ হতে দাও; তারপর না হয় ভাবা যাবে, ঝামেলাটা উটকো কি না।

মেয়েটি ভিজে শাড়ী জামা ছেড়ে এলো আমার কাছে। আদাব জানিয়ে বলল, আমায় আপনি চিনবেন না চাচা, আমিও আপনাকে চিনি না। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আপনার সংবাদ নিয়ে তবেই আসছি। বললাম সেন্ট্রাল জেল থেকে? মানে তুমি এক পলাতক কয়েদী? ও শিউরে উঠে, বলল, না চাচা, আমি কয়েদী নই। আমি একজনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, যিনি ঐ সেন্ট্রাল জেলেই আছেন। দেখা পেলে? না পাইনি, মানে অনুমতি পাইনি। কেন? অনুমতি দেয়নি কেন? ও আর কোন উত্তর না দিয়ে বলল, তাইতো আপনার কাছে এলাম। ওখানেই জানলাম, ওর আপনি আত্মীয়, এবং একমাত্র আপনিই ওকে দেখতে যান। আমি? কি নাম তার? আমি যার সঙ্গে দেখা করতে চাই ওর নাম ডালিম। ডালিম? তুমি ওকে চেন নাকি? বলল, শুধু চিনি না চাচা ভালভাবেই জানি তাকে। আর তার আজকের এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। তুমিই দায়ী? বুঝতে পারছিনা বেটি? বলব সেকথা সেজন্যই

তো এসেছি। তার আগে আমার সম্পর্কে আপনার এবং চাচীর যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তা যদি থাকে, তা হলেতো কোন কথাই বলতে পারবনা।

দেখ বেটি, বললেন সেলিনাকে, আজ পর্য্যন্ত ডালিমের খোঁজে কেউ আসেনি। এখান থেকে ৩/৪ টি গ্রাম পরে ডালিমের বাড়ী। ও যখন অনেক ছোট, তখন ওর বাবা মা মারা যায়। আমি ওর দুর সম্পর্কের চাচা হই। ছোট্ট তিন বছরের শিশু ডালিমকে আমি নিয়ে আসি। আমার প্রথম বিবি সন্তান হীন অবস্থায় মারা গেলে, মোনাকে বিয়ে করি। কিন্তু আল্লাহ্ যেখানে সহায় নন সামান্য মানুষ হয়ে আমরা সেখানে কি করতে পাবি। তাই নিঃসন্তান আমাদের বুকে ওকে মায়ের আদরে গ্রহণ করলেন ওর চাচী। ওকে লেখা পড়া আমি আমার সাধ্যমত করার চেষ্টা করেছি। বরাবর স্কুলে ও ভাল ছেলে ছিল। কোন দিন দ্বিতীয় হয়নি। এখানকার পড়া শেষ হলে, ও প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যায়। ওখানে গিয়ে প্রথম প্রথম তার বিরুদ্ধে বিছুই শুনিনি। পরে শুনলাম, ও একটা বদসঙ্গে ভীড়ে গেছে। তাকে ২/১ বার সাবধান করানোব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শোনেনি। পরে ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি। তোমার চাচীকেও বলে দিই ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেনা। কিন্তু যিনি ওকে সন্তান স্নেহে মানুষ করেছেন সেই মাতৃ মন কেমন করে মেনে নেবে এই কঠিন শাস্তি। মেয়েটি বলল, আপনি যা ভাবছেন তাতো সত্য নাও হতে পারে? জানিনা তুমি একথা কেন বলছ বেটি। তারপরে বলে চলেন এইখানে ও একটি মেয়েকে ভালবাসতো, আমাদেরও পছন্দ মেয়েটিকে। কিন্তু ওর অত্যাচারের শিকার হয়ে ও এখন সমাজেব বোঝা। শুধু তাই নয় কলকাতাতেও ও একটি মেয়েকে ভালবাসতো জেনেছিলাম মেয়েটিও ওকে ভালবাসতো, কিন্তু তাকেও অস্বীকার করে ওর কামনার আগুন জ্বলে উঠলো, ধাবিত হলো মেয়েটির বোনের দিকে। বাবা নই, তবু পিতৃত্বের অধিকারে তাকে মেনে নিতে পারলাম না। পারলাম না ক্ষমা করতে। ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে চলেন, একদিন ও ওর দলবল নিয়ে ঢোকে সেই মেয়েটির বাড়ীতে। কামনার আগুনে ভস্মীভূত করতে চায় ওদের কৌমার্য। কোন বাবা তা মেনে নিতে পারে না। আমিও পারিনি। কোন উকিল পর্যন্ত। দিইনি ওর হয়ে। মনে মনে চেয়েছিলাম শাস্তি হোক ওর। কিন্তু এত বছরের সাজা হবে ভাবিনি। পরে যখন জানতে পারলাম, জেলখানায় বসেও সে বাইরের দলের সঙ্গে যোগসাজস রেখে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ভেবেছিলাম নিজের হাতে ওকে চরম শাস্তি দেব। মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, না চাচা এ শাস্তি আপনি দেবেন না। আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। বললাম তুমি কে মা? আমি ওর এক বন্ধু। কিন্তু চাচা, যাদের জন্য ওর এই শাস্তি হয়েছে চেনেন তাদের কাউকে? না মা চিনিনা, তবে শুনেছি ওদের একজনের নাম রেহানা। আর একজন সেলিনা। আপনি ওদের কোন খোঁজ নেননি? না নিইনি, কারণ, আমিতো ওকে জানি, এই গ্রামেই তো তার সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু মা, তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে কেন? কারণ যাদের কথা আপনি বললেন তারাও আমার বন্ধু। তাই সকলের মঙ্গলের জন্য যদি ও ওর পথ থেকে ফিরে আসে তা হলে কয়েকটা অমূল্য জীবন বেঁচে যেতে পারে। বুঝলাম মা। বেশ, নিয়ে যাবো তোমাকে একদিন।

গিয়েছিলাম নিয়ে. আমিও সঙ্গে ছিলাম, ও বলেছিল, ডালিম এ পথ তোমার নয়, কেন এমন করছ? ফিরে এস। মানুষের ভালবাসার মাঝে খুঁজে নাও তোমার পথ। তুমি প্রেসিডেন্সির কৃতি ছাত্র, সেই পরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে না দাঁড়িয়ে কেন এই ঘৃণ্য চক্রান্তের পথে এগিয়ে চলেছো। আরো অনেক কথা বলেছিল মেয়েটি। তার পর বলেছিল, কথা দাও ডালিম, এ পথ তুমি ছেড়ে দেবে, বিনিময়ে তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব। ও বলেছিল পারবে না, দেওয়ার মনটাতো তোমার মরে গেছে! উত্তরে মেয়েটি বলেছিল একটা মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তার মন মরে না ডালিম, হয়তো ছাই চাপা হয়ে পড়ে থাকে, তারপর আবার কারো স্পর্শে সেই ছাই সরে গিয়ে আসল মনের সন্ধান পাওযা যায়। তুমি পার না ফিবে আসতে? আবার নতুন করে জীবনকে সাজাতে ইচ্ছে করে না? করে বৈকি, কিন্তু কে আমাকে সেই নতুন পথের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে? মেয়েটি বলল, আমি দেব ডালিম! ডালিম বলেছিল, কিন্তু যার মঙ্গলের জন্য আজ তুমি এসেছো, আমার নিষ্ঠুরতা থেকে যাকে তুমি বাঁচাতে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছো তার কি হবে? তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না ডালিম, তুমি শুধু কথা দাও। এই পথ তুমি ছেড়ে দেবে! মেয়েটির চোখ ছল ছল করছিল। ডালিম বলেছিল, একটু ভাবতে সময় দাও। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না? ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে বিশ্বাস করতে, কিন্তু তুমি তো আমার অতীত বা বর্তমান কোনটাই জান না। মেয়েটি বলল জানি। জান? তাবপর ও বলেছিল জান তুমি আমাবই জন্য তোমার মত আরেকটি মেযে আজ সমাজচ্যুতা। মেয়েটি বলল জানি। সবকিছু জেনেও তুমি চাইছো তুমি আমাকে পথ দেখাবে? দেখাবো ডালিম, কারণ আমার যিনি গুরু, তিনি শিখিয়েছেন ভালবাসা মানুষের অন্তরের সম্পদ, ঐশ্বর্য দিয়ে হয়তো জগৎ কেনা যেতে পারে, কিন্তু হৃদয় কিনতে হলে চাই ভালবাসা। ডালিম বলেছিল, তুমি প্রান্তিকের কথা বলছো? মেয়েটি চুপ করেছিল। এদিকে জেল প্রহরী তাড়া দিচ্ছে সময় উত্তীর্ণ বলে। মেয়েটি আবারও বলল, তা হলে কি আমাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে ডালিম? ডালিম বলল, এত বড় কঠিন সিদ্ধান্ত এত অল্প সময়ে নিই কি করে? তাছাড়া আমিতো একটা জীবন নষ্ট করিনি, অনেক জীবন নষ্ট করেছি, জীবনের সেই কাঠিন্য নিয়ে তোমার কথা কি ভাবে রাখবো একটু ভাবতে দাও। মেয়েটি বলল, তা হলে বল আবার কবে আসবো আমি। উত্তরে ডালিম বলেছিল, তুমি যে এসেছো এটাই আমায নতুন কিছু ভাবতে বলছে। ঠিক আছে তোমার কথা রাখতে পারবো কি না জানিনা তবু আগামী সপ্তাহে এসো। ছল ছল চোখে মেয়েটি বলল ডালিম ভাল থেকো। অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, আমাকে ফিরিযে দিও না।

থামলেন বৃদ্ধ মোসলেমউদ্দীন। তার চোখ দুটিও বুঝি ছল ছল করে উঠেছে। সেলিনা বলল, মেয়েটি কি আপনার সঙ্গেই ফিরেছিলেন চাচা? হ্যাঁ জেলখানা থেকে এক সঙ্গেই বেরিয়েছিলাম, বললাম চল মা আমার সাথে। ও যদি কোন দিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তবে তোমার জন্যই আসবে। ও বলল, আজ থাক চাচা, যদি আপনার সঙ্গে যাওয়ার মত হয়, সাতদিন পরেই যাব, ও নীচু হয়ে আমার পা স্পর্শ করলো, বললাম কোথায় যাবে?

বলল, আপাতত বর্ধমান, ও চলে গেল তারপর।

সূঁচ পড়লেও শব্দ হবে, এমনি নিঃশব্দতা বিরাজ করছে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ বললেন সাতদিন পরে স্থানীয় থানা সংবাদ দিল, ডালিম আত্মহত্যা করেছে। হয়তো তার পাপের প্রায়শ্চিত্য করে গেছে এই ভাবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, ওর মৃত্যু আমাকে আঘাত দেয়নি, মৃত্যুতেই যেন ওর সব দোষ স্খলন হয়ে গেছে। এক গভীর নিঃশব্দতা নেমে আসে আমাদের মধ্যে। কিছুক্ষন পরে মোসলেমউদ্দীন বলেন এর থেকে বেশী আর কিছু জানিনা আমি। সেলিনা বলল ও আর আসেনি কোনদিন। জানিনা মা। যেদিন ওর মৃত্যু সংবাদ পেলাম, সেদিনই তো মেয়েটির আসার কথা ছিল, হয়তো এসেও ছিল। ও মেয়ে কোন মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে বলে মনে হয় না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন বৃদ্ধ মোসলেমউদ্দীন। কিন্তু মা, এসব কথা জেনে তোমাদের কি লাভ? লাভ কিছু নেই চাচা। শুধু যাকে আপনারা রুকসানা বলে জানেন, ও যে রুকসানা নয় একথাটা আপনার জানা দরকার আর ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। অবাক হয়ে বৃদ্ধ বললেন রুকসানা নয়? তবে কে ওই মেয়েটি? ওইই রেহানা, আমার দিদি। হায় আল্লাহ্ আমি ওকে চিনতে পারলাম না। কি করে চিনবেন চাচা। ওকে তো আপনি কখনো দেখেননি। আর যে ছেলেটিকে ও পরবর্তী কালে ভালবেসে ছিল - হ্যাঁ, বৃদ্ধ বললেন, কি যেন নাম বলেছিল ডালিম! সেলিনা উত্তরে বলল প্রান্তিক, যাকে ও তার গুরু বলে পরিচয় দিয়েছিল, সেই প্রান্তিক অপনার সামনে। বৃদ্ধ ছল ছল চোখে তাকালেন আমার দিকে। বললেন তুমি প্রান্তিক? হ্যাঁ বলে বৃদ্ধের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। বৃদ্ধ কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, হায় আল্লাহ্ একি করলাম আমি। কেন তাকে আটকে রাখলাম না, কেন তাকে যেতে দিলাম। আল্লাহ্ কোনদিন আমায় ক্ষমা করবেন না, তারপর সেলিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কে মা? আামি সেলিনা। তারপর সেলিনা জানতে চাইল, আপনাকে তো বলে গেছে ও বর্ধমান যাবে। ডালিমের কেউ কি আছে ওখানে? না মা, ডালিমের কোন বন্ধু বান্ধব থাকতে পারে কিন্তু কোন আত্মীয় স্বজন নেই। কিন্তু দুঃখ পেওনা মা, আমি চেষ্টা করবো এবং খুঁজে একদিন তাকে পাবই। পেতেই হবে আমাকে। খোঁদা - রহমানে রহিম, একদিন তার সাক্ষাৎ আমাকে মিলিয়ে দেবেনই। আকবর এসে ডাকল, চাচা, আপনার মেহমানদের জন্য মিষ্টি, মাছ ও মাংস এনেছি। বৃদ্ধ বললেন, যা তোর চাচীকে দিয়ে আয়।

বৃদ্ধের হৃদয় যেখানে এক অনাস্বাদিত আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই খানে আঘাত হেনে সেলিনা বলল, চাচা আজ আর তাকে খুঁজে পেয়ে কি করবেন? উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ বললেন কি করব মানে, — তাকে আমি ফিরিয়ে দেব তার গুরুর কাছে। যে মেয়ে তারই সমবয়সী কাউকে তার গুরু হিসাবে মানে — তার দামটা কি আমি হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারি মা! সেলিনা বলল আচ্ছা চাচা, যাকে আপনি হৃদয় দিয়ে ভালবেসে নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছেন, তার এই অকাল মৃত্যু আপনাকে কি আঘাত দেয়নি? না মা দেয়নি। আমি শিক্ষক মানুষ। আজীবন মানুষ গড়তে চেয়েছি। পারিনি যে, তার তো জ্বলন্ত প্রমাণ ডালিম। আজীবন যে মনুষত্ত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি তার ঘরেই বেড়ে উঠেছে মনুষত্ত্বের

কুলাংগার। তাকে যে মানবিকতায় গুণান্বিত করেছে, যে আমাকে অন্তত শান্তিতে মৃত্যুর অধিকার দিয়েছে, তাকে কি খুঁজে পেতে চাইবো না। নিশ্চয়ই চাইবেন, কিন্তু আপনিতো ধর্ম্মভীরু মুসলমান, একটি মুসলমান মেয়েকে পারবেন বিধর্মী হিন্দুর হাতে তুলে দিতে? যতটা সহজ ভাবে এ মেয়েকে বশকরা যাবে বলে ভেবেছিলেন মোসলেমউদ্দীন সাহেব, তা যে হবার নয়, সেলিনার প্রশ্নের বাঁকা গতি দেখে বুঝতে পারছেন উনি। কিন্তু আজীবন শিক্ষকতার সহজ সংযম তাকে স্থিতধি হতে সাহায্য করেছে, বললেন, ধর্ম সাধারণের আচরণের জন্য মা। আমি হয়তো আমারই মতো মনের কোন মেয়েকে কোন বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে পারবো না, কিন্তু এ মেয়েটিতো তা নয়, তার মধ্যে মিশে আছে যে ভালবাসা আর মানবিকতার সহ-অবস্থান, কোন ধর্মের নিগড়ে তাকে বাঁধব কি করে? কথাটা আপনি কি ঠিক বলেছেন চাচা? ধর্মের সঙ্গে কি মানবিকতা ও ভালবাসার মিশ্রণ নেই? হয়তো আছে, কিন্তু মা, আমরা কি দেখতে পাই চারপাশে? আমরাই তো দেখি নিষ্পাপ ভালবাসাকে ধর্মের যুপকাষ্ঠে বলি হতে? তার জন্য কি ধর্ম দায়ী? পৃথিবীর কোন ধর্ম কি বলেছে দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ভালবাসা থাকতে নেই? ধর্মের আসল সত্যকে আমরা অস্বীকার করে কতকগুলো বস্তাপচা আচরণকে আমরা ধর্ম বলে মনে করি বলে এই অসুবিধা গুলো হয়। তা না হলে পৃথিবীর কোন ধর্মের অন্তরতম সত্যের মধ্যে পার্থক্য নেই। সেলিনা বলল, তা হলে যে বিভিন্ন ধর্ম গুরুরা বলেন, তাদের ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম? বৃদ্ধ বললেন যদি সেই সব ধর্ম গুরুদের মধ্যে ভালবাসা থাকে তা হলে কোন অসুবিধা নেই, কারণ আমি যা বিশ্বাস করি তাকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতে না পারি তাহলে আমার বিশ্বাসটাই যে পলকা হয়ে যায়। তাই বলছি মা, সব ধর্ম ভীরু মানুষের কাছে নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। সেলিনা বলল, এই যে ইস্‌লাম বলে, ইস্‌লাম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মোসলেমউদ্দীন বললেন, এটা ঈশ্বর বলে না মা, ইস্‌লামকে যারা বিশ্বাস করেন এটা তাদের কথা। আর ঈশ্বরতো সব ধর্মের কাছেই ঈশ্বর, তিনি কেন বলবেন কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ নয়।

মোনোয়ারা বেগম এই সময় প্লেটে সাজিয়ে আলাদা আলাদা করে মিষ্টি নিয়ে এলেন আমাদের সকলের জন্য। মোসলেমউদ্দীন বললেন, কখন খেয়েছো কি জানি, এবার কিছু মুখে দিয়ে নাও মা। সেলিনা বলল, কিন্তু আমার যে অনেক কথা জানার আছে। খেতে খেতেই তো জানা যেতে পারে। আমরা সকলে মিষ্টির প্লেট তুলে নিলাম। সেলিনা জানতে চাইলো, আচ্ছা চাচা ইস্‌লামের সব কিছুকেই কি আপনি চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করেন? চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, তুমিতো নীচু ক্লাশে অংকের যোগ বিয়োগ করেছো, তাই না? সেখানেই শিখেছো যে ২ আর ২ যোগ করলে ৪ হয়, এটাকে কি তুমি অস্বীকার করতে পার? কি করে অস্বীকার করব? একে অস্বীকার করলে যে গোটা অংক শাস্ত্রকেই অস্বীকার করতে হয়। সেটাতো যুক্তির কথা নয় মা, তোমার যদি যুক্তির পরে সীমা হীন জ্ঞান থাকতো তাহলে হয়তো অস্বীকার করতে। আসলে তুমি যখন থেকে ০ থেকে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা শিখেছো, সংখ্যা গুলোকে সংখ্যা হিসাবে মেনে নিয়েছো। যদি তুমিতা না মানতে, তাহলে সবাই যে ভাবে অংক মেলায় তুমি সেভাবে মিলাতে পারতেনা। এও সেই বিশ্বাস

তাই না? তার ভালমন্দ যাইই থাকুক বিশ্বাস যদি তোমার অটুট না থাকতো প্রচলিত অংক শাস্ত্রে তুমি নিয়মিত ভুলই করে চলতে। আমি ইস্‌লামকে বিশ্বাস করি। কোন সংখ্যার ভালমন্দের বিচার করার যেমন আমার কোন অধিকার নেই, তেমনি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের ও ভালমন্দের বিচার করার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

সেলিনা বলল, আপনি যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে আমার মুল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন চাচা, আমি জানতে চাইছি ইস্‌লামের সবই কি চিরন্তন সত্য? যুগের প্রয়োজনে তার কি কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়?

বৃদ্ধ বললেন, অবিশ্বাসী মানুষকে আল্লাহর পদপ্রান্তে নিয়ে যাওয়াই ইস্‌লামের আদর্শ। বাদ বাকী আচরণ দিয়ে ধর্মের বিচার করা হয় তুমি কিসের পরিবর্তনের কথা জানতে চাইছো মা? সেলিনা বলল, আমি সেই আচার আচরণের কথাই বলছি। এর কি পরিবর্তন সম্ভব নয়? ইস্‌লাম কি বলেছে এ আচরণ অপরিবর্তনীয়? মোসলেউদ্দীন বললেন মানবজীবনে আচরণের কয়েকটা দিক আছে। কিছু কিছু আচরণ আছে পৃথিবীর সব ধর্মের কাছে তা সমান সত্য। সেলিনা বলল ইস্‌লাম ধর্ম সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি প্রায়ই করা হয় তা হলো ইস্‌লাম অসহিষ্ণু, ইস্‌লাম এক সঙ্গে এক পুরুষের চারটি বিয়েকে স্বীকৃতি দেয়। স্বামী রাগের বসে তিন তালাক উচ্চারণ করলে, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কোন বিধর্মীকে ভালবাসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে যদি ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে তা হলে খুব একটা বাদ সাধা হয় না, অন্যথায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। বিশেষত ভারতীয় ইস্‌লামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা বিশ্বাস করে তার উল্টো টাকে ইস্‌লাম সত্য বলে গ্রহণ করে। ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী মানুষ সাধারণত অসাম্প্রদায়িক হয় না ইত্যাদি, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি চাচা? বড় কঠিন প্রশ্ন মা, বুঝতে পারছি তুমি আমায় এ সমস্ত প্রশ্ন কেন করছ? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি মতো আমি তোমাকে ব্যাখা করার চেষ্টা করছি। তুমি বলেছো ইস্‌লাম অসহিষ্ণু কি না কিন্তু মা সহিষ্ণুতাই হচ্ছে ধর্মের মূলমন্ত্র। পৃথিবীর কোন ধর্মই অসহিষ্ণু হতে পারে না, ইস্‌লামও নয়, কিন্তু যে দিকে তুমি অঙ্গুলি সংকেত করতে চেয়েছো, সেটা এক অর্থে সব ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আসলে অসহিষ্ণুতা ধর্ম ব্যবসায়ীর আচরণ, ধর্মের আচরণ নয়। বাংলার মাটিতে যে প্রেমের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম, তার পূর্বসূরী হিসাবে আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নিয়েছি তারা কিন্তু ইস্‌লামের সূফী সাধক। লালনের মধ্যে যার পূর্ণতা। একাধিক বিয়ের অধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছো তার জন্য আমার মনে হয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট খানিকটা দায়ী। ইস্‌লাম কোন জীবনের অমর্য্যাদা যেমন পছন্দ করে না। তেমনি যে মেলামেশায় আইনের স্বীকৃতি নেই তাও পছন্দ করে না। এই উভয় সংকট থেকে বাঁচতে হয়তো বা যাযাবর আরবীয়দের মধ্যে নারীর আধিক্য থাকায় এমন একটা প্রথা চালু হয়েছিল। ওটা কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, ওটা একটা আচরণ। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে নারী ও পুরুষের সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় সমান, অনেক ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা পুরুষের থেকে অস্বাভাবিক কম, সেখানে এমন একটা আচরণ মানতে গেলে সামাজিক বন্ধনটাই যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তাই হয়তো তুমি দেখবে, পৃথিবীর

অনেক মুসলিম দেশেও এর আধুনিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন এর পরে এনেছো ইস্‌লামের তিন তালাকের প্রসঙ্গ, এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাককে যে ভাবে শরিয়তী স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেটা মনে হয় ঠিক নয়। কারণ ইস্‌লাম নীতিশাস্ত্র তিনি তালাক উচ্চারণের জন্য সুনিদিষ্ট দিনের ব্যবধানের কথা বলেছেন। আর তাই এখানেও সেই ধর্ম ব্যবসায়ীদের কারসাজি। যদি কোরানের মূল সত্যকে মেনে নেওয়া যায়, তা হলে এই নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি চলেছে তার অবসান হতে পারে। বিধর্মীকে ভালবাসার যে কথা বলেছো, সেটাও ধর্মীয় বিধান নয় লোকাচার। আসলে মানুষের.মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে গোষ্ঠীতন্ত্র, আর এসবই তার প্রকাশ মাত্র। মানুষ বিশ্বাস করে, নিজের আচার আচরণের সঙ্গে ভালবাসার মানুষটির আচার আচরণের বিশ্বাসগত মিল থাকলে জীবন যাত্রা সহজ হতে পারে। জীবনে যেমন ভালবাসা আছে তেমনি আছে সামাজিক অবস্থান, দুটোকে মেলাতে চাইলে কিছু আপোষতো করতেই হবে।

সেলিনা বলল, কিন্তু চাচা দেখা গেছে, একটি বিধর্মী মেয়ে ইস্‌লামের কাউকে ভালবেসে তার ঘর করতে এলো, ইস্‌লাম নির্দেশ দেয়, মেয়েটিকে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, এবং সাধারণত তাই হয় সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া। বিধর্মী মেয়েদেরও দেখা যায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আজন্ম লালিত ধর্ম ত্যাগ করে চলে আসে যার ঘর করতে সেখানেও সে যে সুখী হয় সব সময় তা কিন্তু নয়। ভালবাসার আবেগ যখন মিইয়ে আসে, তখন আসে দুর্বিসহ ক্লান্তিময় জীবন, কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথও অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়, আবার কোন ইস্‌লামের মেয়ে বিধর্মীকে ভালবাসলে, সমাজ তাকে প্রতি পদে পদে বাধা দেয়, যদিওবা কোন ভাবে রাজী হয় সেখানে চাপ দেওয়া হয় ছেলেটি যেন ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে। কেন ইস্‌লামের কোন মেয়ে যাকে সে ভালবাসে তার ধর্ম গ্রহণ করে তার ঘরে যাবে না। দোষটা কোথায়? তাছাড়া এমনওতো হতে পারতো। কেউ কারো ধর্ম ত্যাগ করলো না, উভয়ে তার নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করে একই ছাদের নীচে বাস করল!

বৃদ্ধ বললেন, জানিনা মা, ভিতরের কোন আগুন থেকে তুমি এসব কথা বলছ? হয়তো ডালিমের অবিচার আর অত্যাচারের সঙ্গে ধর্মান্ধতার কথা বলতে চাইছো। তার ভুলের শাস্তি সে পেয়েছে। সমাজ তার নিজের গতিতেই চলে মা। যুগের প্রয়োজনে সে নিজেই বিবর্তিত হয়। তাই বলে সমাজ সংস্কারকদের কৃতিত্বকে আমি ছোট করে দেখছিনা। একটা কথা মা, ধর, তুমি একটি জিনিষ বিশ্বাস কর, তুমি কি চাইবেনা, তোমার বিশ্বাস যেন সার্বজনীন হয়, অর্থাৎ তুমি যা বিশ্বাস কর অন্যেও যেন তা বিশ্বাস করে। এই বার দেখা গেল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো একটা গোষ্ঠী, আর গোষ্ঠী অধিপতিগন কখনই চাইবেনা, তার গোষ্ঠী ভেঙে যাক। একবার যদি এই.ভাঙনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়,তা হলে দেখা যাবে ঐ গোষ্ঠীই একদিন নির্মূল হয়ে গেছে। তাই প্রাণপনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা। তাই বলে কি কেউ বেরিয়ে যাচ্ছেনা? যাচ্ছে। আবার নতুন গোষ্ঠীও তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম চলছে মা, তুমি আমি তার কি করতে পারবো? সেলিনা বলল, আপনি হয়তো পারবেন না চাচা, কিন্তু আমি পারবো না তা আপনি ভাবছেন কেন? একটু গম্ভীর

হলেন মোসলেমউদ্দীন। বললেন, হ্যাঁ মা তা ঠিক। তোমরা আধুনিক মনস্ক মানুষ। নিজের ধর্মে বিশ্বাস না থাকলে ছেড়ে যেতে পারই মা। আজকের যুগ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ। আজ সমষ্টিগত জীবনের থেকে ব্যক্তি জীবনের মূল্য অনেক বেশী। সেলিনা বলল, আমি কিন্তু আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি চাচা, আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন, আসলে আমি বলতে চেয়েছি বিধর্মী কাউকে ভালবাসলে আমার ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, এমন কি কোন কথা আছে? আমরা কি পাবিনা উভয়ে উভযের ধর্ম মেনে এক সাথে জীবন অতিবাহিত করতে। শুনেছি সম্রাট আকবরের বাজ অন্তপুরে অনেক হিন্দু মহিষী তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালন করতেন। তাতে কোন অসুবিধা হয়েছে বলেতো মনে হয় না। মোসলেমউদ্দীন সাহেব বললেন, আকবর ছিলেন ইতিহাসের নিয়ন্ত্রা। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, যেমন হিন্দুদের বিশ্বাস রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কিন্তু আকবর যা করতে চেয়েছিলেন তাতো স্থায়ী হয় নি। আসলে যে কোন বিশ্বাস, জনমনে স্থায়ী হতে হবে। একই জায়গায় আযান ও শঙ্খধ্বনি, নমাজ ও প্রার্থনা ইত্যাদির কিছু গুনগত পার্থক্য আছে। যে উদার মানসিকতায় তা গ্রহণ করা যায় আগে দেখতে হবে আমাদের সেই উদারতা আছে কিনা। তারপর বললেন, এবার তোমার মূলপ্রশ্ন নিয়ে বলা যেতে পাবে, যে দুটি হৃদয় ভালবেসে কাছাকাছি এসেছে তাদের মেনে নেওয়াটাই কিন্তু সব নয়, তাকে নিয়ে তার যে ছোট্ট সংসার, এবং তার শাখা প্রশাখা সবার মধ্যে থাকতে হবে সেই একই উদার মানসিকতা তবেই শুধু সম্ভব, না হলে নয়। সেলিনা বলল আপনি কি মনে করেন না, একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে এই উদার মানসিকতার পথে তাদের যাত্রা শুরু করবে। বৃদ্ধ মোসলেমউদ্দীন তার উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকন সেলিনার দিকে, কোন উত্তর জোগায় না।

মোনায়ারা বেগম তাড়া দিলেন, কি তখন থেকে কথা বলেই চলেছো, ওরা তোমার মেহমান, কি খাবে না খাবে একটু দেখবে না? হাসলেন মোসলেউদ্দীন, বললেন তুমিতো আছো। হ্যাঁ আমি আছি। কিন্তু তার আগে একবার এদিকে এসো। মোসলেউদ্দীন মোনায়ারা বেগমের পিছুপিছু গেলে, আমি সেলিনাকে বললাম, কেন বৃদ্ধ মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাত দিচ্ছ সেলিনা! কে বলল আঘাত দিচ্ছি? আসলে আমি জেনে নিতে চাইছি মুসলিম সমাজ এখন কোন পথে চলছে। তাতে তোমার লাভ? লাভ লোকসানের ব্যাপার নয়, এসব আমি আমার স্বার্থের জন্য করেছি। তোমার যদি মনে হয়, এসব শুনতে তোমার ভাল লাগছেনা, তাহলে তুমি আকবরের সঙ্গে গ্রামটা ঘুরে দেখে এস। হয়তো অশ্রুদির ওখানকার মতো সাজানো প্রাকৃতিক পরিবেশ নেই, কিন্তু স্রষ্টার আপন খেয়ালে সৃষ্ট যে প্রকৃতি, তা তোমাকে আনন্দ দিতে পারে। তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছো? আমার লাভ? সব কিছু কি লাভ লোকসান দিয়ে বিচার করা যায়?

মোসলেউদ্দীন সাহের ফিরে এলেন, বললেন, বেটি, তোমাকে একবার তোমার চাচী ডাকছে, একবার যেতে পারবে? সেলিনা বলল আচ্ছা যাচ্ছি চাচা, সেলিনা চলে যাওয়ার আগে বলল, চাচা ভীষণ ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলতে। আমি আসছি। আপনি ততক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলুন। ও চলে গেল। বৃদ্ধ বললেন, কিভাবে যে তোমার সঙ্গে কথা

বলব বুঝতে পারছিনা আমি বৃদ্ধ মানুষ, সেকালের ধ্যান ধারনাকে তো জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি, আমার সঙ্গে কথা বলতে কি তোমার ভাল লাগবে? বললাম এভাবে বলছেন কেন? এতক্ষণ কথা বলিনি কারণ আপনারা গভীর তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন আমি মুগ্ধ শ্রোতার মত শুনছিলাম। উনি হাসলেন, ভদ্রলোকের সমস্ত চুল ও দাড়ি পেকে গেছে আর দাঁতগুলো মুক্তোর মত সাদা। সবকিছুতেই যেন শুভ্রতার ছোয়া। তারপর বললেন, তোমরা যে আসবে আমার বাড়ীতে বুঝতে পারিনি বাবা। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে একটু বেশী কথা বলে আমিও হয়তো একটু বেশি কথা বলব, বিরক্ত হবে না তো? ছিঃ কাকাবাবু এসব আপনি কি বলছেন? আমি তো আপনার ছেলের মতন। তাই যখন বললে বাবা, তাহলে তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কিছু মনে করবে না তো। করুন। বৃদ্ধ বললেন কি ভাবে যে আরম্ভ করি। না, মানে, আমি রেহানার কথা জানতে চাইছি। ও তোমাকে গুরু বলে মানে, কিন্তু কেন? বড্ড কঠিন প্রশ্ন কাকাবাবু। আমি কারো গুরু নই, হতেও চাইনা। কেন? যে সমস্ত গুন থাকলে কাউকে গুরু বলা যায়, তার কোন যোগ্যতাই আমার নেই। তাহলে ও তোমাকে গুরু বলে মানছে কেন? দেখুন কাকাবাবু কেউ কি ভাবে কাকে দেখবে তাতো আমি বলতে পারবো না। রেহানাকে আমি ভালবাসি, এর বেশী কিছু নয়। তুমি তো শুধু রেহানাকে ভালবাসনা, আরো তো অনেককে ভালোবাসো। সেতো সব মানুষই ভালবাসে। তবু রেহানার ভালবাসা নিশ্চয়ই তোমার কাছে আলাদা মর্যাদা পায়। হয়তো পায়। আজ যদি মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায় তুমি গ্রহণ করবে তো। বললাম তার সঙ্গে আমার গ্রহণ বা বর্জনের সম্পর্ক নয় কাকাবাবু। আমি শুধু জানি জীবন আমার সে কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। বেশ তাই যদি হয় আজ যদি সে তোমার কাছে কোন প্রতিদান চায়? সত্যিকারের ভালবাসা কোন দান বা প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করে না কাকবাবু, আমি শুধু তাকে খুঁজে পেতে চাই। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে চাই জীবনের দাম তুমি এভাবে মেটালে কেন? তুমি কি ডালিমকে তার জন্য দায়ী করছ? সত্যি কথা বলতে কি কাকাবাবু ডালিমকে আমি চিনিনা, আজো পর্যন্ত তাকে আমি দেখিওনি। তবু তো সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। বললাম জানিনা কাকাবাবু কেন আপনি একথা বলছেন? ডালিম তার কাছে কি চেয়েছিল তা আমি জানিনা। কেন একদিন ডালিমকে ভালবেসেও তাকে সরে আসতে হয়েছিল তাও আমার অজানা। তুমি জিজ্ঞাসা করনি? প্রয়োজন মনে করিনি। ডালিমের কথা শুনেছিলাম ওর বোন সেলিনার কাছে, আসলে ভালবাসাতো কারো জীবনে বলে কয়ে আসেনা, আমাদের জীবনেও আসেনি সেভাবে। ভালবাসার যে জাগতিক পরিণতি সেই ভাবে আমরা নিজেদের কথা কারো কাছে স্পষ্ট করে বলিনি। শুধু মনে হতো, ও আছে আমার জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে, আর আমার উপলব্ধিতে মনে হয়েছে ও-ও হয়তো এমনিই ভাবতো। বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু বাবা ও ডালিমের সঙ্গে দেখা করতে এসে যে সব কথা বলেছিল এবং ডালিম যদি সত্যি সত্যি তার আহ্বান সাড়া দিতো কি করতে তুমি? জীবনে যে ঘটনা ঘটেইনি, তা ঘটলে কি করতাম, কি করে বলব। তবু। এর কোন উত্তরতো দিতে পারবনা কাকাবাবু। আমি শুধু বুঝি তার বেদনা তার কষ্ট তার অন্তরের শূন্যতা। সেই

শূন্যতা ও কষ্টকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আমার যা করণীয় তা করতে কখন পিছপা হতাম না। জীবনে আঘাত ও বেদনার মধ্যে যে ভালবাসা তার মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছি। এর চেয়ে বেশীতো কিছু চাইনি।

সেলিনা এলো। বৃদ্ধ বললেন, তোমার চাচীর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে মা! হ্যাঁ। তোমার চাচীর সমস্যার সমাধান হয়েছে কি? তাতো বলতে পারবো না, আমি আমার মতো করে বলেছি, তিনি তার মতো করে বুঝেছেন। সমস্যা সমাধানের আমার হাতে নেই। বৃদ্ধ আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, তোমরা বিশ্রাম নাও, আমি একটু ঘুরে আসি।

উনি চলে গেলে আমি সেলিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেলিনা তোমার আসল রূপ কোনটি। ও হাসতে লাগলো। হাসছো যে! দেখছি তোমার মনের হাঁস ফাঁস অবস্থা। মানে? মানে বুঝতে পারছনা? না পারছিনা। তাহলে চাচীর সমস্যাও বুঝতে পারবেনা। বললাম, তুমি হেঁয়ালি রেখে খোলাসা করে বলত? বললেই বুঝতে পারবে? বলেই দেখনা। চাচী জিজ্ঞাসা করছেন, আমি যখন তোমার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি তা হলে হিন্দু এয়োতির মতো আমার হাতে শাখা-নোয়া নেই কেন? নেই কেন সিঁথিতে সিন্দুর! ও হাসছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, এই সব কথা বলেছেন উনি? কেন তোমার শুনতে ভাল লাগছেনা? আমিতো আরো ভাবলাম, তুমি আনন্দে গদগদ হয়ে এতক্ষণ না জানি কি না করবে আমাকে নিয়ে। বললাম তা না হয় ভেবে দেখা যাবে কি করব, কিন্তু উনি আর কি বললেন তা হলে শোনার ইচ্ছে আছে ষোল আনা অথচ মুখে সন্দেহের ফুলঝুরি। এরপরে সেলিনা বলে চলে উনি আরো বললেন, আমার শ্বশুর শাশুড়ী, আই মিন তোমার বাবা-মা আমাকে মেনে নিয়েছেন কি না। তোমাদের অন্দর মহলে আমাদের থাকতে দেওয়া হয় কি না, না বাইরের বাড়ীতে থাকতে হয়। আমি রোজ মোনাজাত বা নামাজ করি কি না। তোমাদের ঠাকুর ঘরে আমার প্রবেশাধিকার আছে কি না। যে থালা বাসনে তোমাদের সকলের খাওয়া হয়, আমাকেও তাতেই খেতে দেওয়া হয় কি না, না মাটির বাসন বা চিনা বাসনে খেতে হয়। তোমাদের রান্নাঘরে আমার ঢোকার অধিকার আছে কি না। আমার হাতের রান্না তোমরা খাও কি না। পূজোয় না ঈদের সময়ে আমাকে নতুন শাড়ী দাও? আর কিছু জানতে চাও?

আমি অবাক আর বিস্মিত হয়ে বললাম না অনেক বলেছো। আর বলতে হবে না। তারপর বললাম সেলিনা, আমি শুধু ভাবছি এসব কথা উনি ভাবলেন কি করে? সেলিনা গম্ভীর হয়ে বলল, আমাদের আচরণ যদি ভাবার মত হয়, তা হলে ওনার ভাবতে দোষ কি? আমাদের আচরণ ভাবার মত মানে? বা তুমি ভুলে যাও কেন কলকাতাটাই সারা বাংলাদেশ নয়। অসংখ্য গ্রাম বাংলার অজস্র লোকাচার নিয়েই এই বাংলাদেশ। তুমি কি ভাবতে পার, বাংলার গ্রাম কি সেই ভাবে প্রস্তুত হয়েছে যাতে কোন কুমারী মেয়ে কোন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বাইরে কাটালে লিভ টুগেদারে বিশ্বাসী হয়ে তার বাহবা দেবে? তারপরতো দুই ভিন্ন ধর্মের মানুষ। তোমাকে স্বামী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা, এদের পক্ষে কল্পনারও অতীত। মুখে তার দুষ্টু হাসি, চোখে তার সীমাহীন কৌতুক। আমি বললাম, সে না হয় বুঝলাম কিন্তু তুমি কি বললে? তার আগে বলত এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তুমি কি বলতে?

বললাম যা সত্য তাই বলতাম। মানে তুমি বলতে, সেলিনা আমার স্ত্রী নয়, ওর সঙ্গে আমার বিয়েই হয়নি, এই সবতো। এটাইতো সত্য। সব সত্যি কি সত্যিকারের সত্যি? যে সত্য মানুষকে আঘাত দেয় যে সত্য হৃদয়ের ভালবাসাকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে, যে সত্য মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে সত্যি তোমার সত্যি হতে পারে, আমার সত্যি নয়? তা হলে তোমার সত্যি কি? তোমাকে বলব কেন?

মোনায়ারা বেগম এলেন, আর তাকে দেখেই নব বধুর সলজ্জতায় সেলিনা আঁচলটা তুলে দিল মাথায়? আমার অবাক হওয়ার পালা জেড গতিতে এগিয়ে চলেছে। উনি এসে বললেন, তোমাদের তো আগে চিনতামনা বাবা। আকবর বলছিল, তোমরা বিকালেই চলে যাবে। আমি বললাম, একটু তাড়া আছে কাকিমা। তাই যেতেই হবে। উনি আকুল ভাবে বললেন, দেখ বাবা আমার কোন মেয়ে নেই। নিজের গর্ভে তো কেউ এলোনা, যাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছিলাম নিজের পাপের ফলে, সেও হারিয়ে গেছে। আমার এ ঘর যে শূন্য সেই শূন্য রয়েই গেল। অন্তত একটা রাত যদি থেকে যেতে বাবা। নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম অন্তত একটা রাতের জন্য হলেও আমার মেয়ে জামাই আমার বাড়ীতে এসেছিল। আমি প্রতিবাদ করে বলতে চাইলাম কিন্তু কাকীমা। সেলিনা, আমি কি বলতে চাইছি অনুমান করতে পেরে বলল, এতে তোমার এত কি অসুবিধা হবে। একটা তো রাত। চাচী যখন এত করে বলছেন, ঠিক আছে চাচী, তুমি যাও, আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো। তাই হোক মা, বলে উনি চলে গেলেন।

আমি সেলিনাকে বললাম, একি খেলা খেলতে চাইছো তুমি। তুমি এর পরিণতি জান? কি? কোনদিন আর মুখ দেখবে না এইতো। সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগেনা সেলিনা। ও বলল,

আসলে ঠাট্টার মধ্যে আছে যে চরম সত্য
বুঝতে চাওনা তুমি তা।
তাই নীল আকাশ যখন
স্বপ্ন ডানায় ভর দিয়ে আসে তোমার কাছে
মনে হয় মিথ্যে ওড়নায় ঢাকা পড়ে গেছে
যৌবনের উদ্ধত অভিলাষ।
কিন্তু পেজামেঘের কোনায় কোনায়
যদি খুজে পেতে শিশির বিন্দু
মনে হতো, হয়তো তুমি খুঁজে পেয়েছো তোমার ঠিকানা।

আমি বললাম, সেলিনা, জীবন শুধু কাব্যের নয়। ভাল করে ভেবে দেখেছো চরম পরিণতিতে কি করবে তুমি।

ও বলল,

বিপদ যে তোমার দিক থেকে আসতে পারে ভাবিনি তা।

যদি আসেও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে আমার,
তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।
তোমার কৌমার্য্যের ক্ষত হোক চাইবনা কোন দিন
তবু যদি পতন আসে,
জীবনের সত্য বলে না হয় করলেই গ্রহণ।
তোমার মনে যে স্বপ্ন নেই
তাতো নয়।
না হয় বা অভিনয় হিসেবেই মেনে নিলে
হোক্না তা নির্মম নিষ্ঠুর।

আমি যে কি বলব বুঝতে পারছিনা। মনে মনে ভাবলাম ভুলই হয়েছে ওকে নিয়ে আসা। ও আমার বুকে আগুন জ্বালাতে চায়। আর সেই আগুনে পুড়ে মরবার সাধ। বললাম, তোমাব যা ভাল লাগে কর। আমি আব কিছুটি বলব না। গুম হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। ও বুঝি আমার রাগটুকুও বুঝতে চাইছে না, এগিয়ে এলো আমার আরো কাছে। মাথায হাত বোলাতে বোলাতে বলল এইতো লক্ষ্মী ছেলে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, আমাকে একদম ভাল লাগছেনা তাইনা? খুবই কুৎসিত দেখাচ্ছে? আমি আরো রেগে গিয়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে ভীষণ কুৎসিত লাগছে। ও হঠাৎ বলল রেহানার থেকেও। আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম বলে কি? তবু নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, সেলিনা তুমি আমার কাছ থেকে যাও। ও বলল। যাচ্ছিগো যাচ্ছি, কিন্তু যাওয়ার আগে বলে যাই

যাকে তুমি ভাবছো
হাজার কল্পনাতেও আসবেনা সে,
মিথ্যে প্রহর গোনা
ফিকে রৌদ্রের মত
মিলিয়ে যাবে এক সময়
ছবির মতো ভেসে আসবো আমি
দুঃখ ও আনন্দে একাকার হয়ে।
পারবে তাড়াতে?
তার চেয়ে রাত্রিটাকে সুন্দর করতে
মায়াবী রোশনাই একে নাও চোখে
মিথ্যে করেই না হয় বোলো একবার
সেলিনা সুন্দর তুমি।
সুন্দর তোমার প্রহর গোনার প্রতীক্ষা।

হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল আঁচলের ঝাপটা দিয়ে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। আমি মোসলেউদ্দীন সাহেব ও আকবর খেতে বসেছি। অভ্যেস মতো বলেছি সেলিনাকে তুমি বসবে না? বুঝতে পারিনি কখন থেকে ও আঙুল দিয়ে আমায় না করছে, মোনায়ারা বেগম বললেন, তোমরা কলকাতায় যা করবে করো বাবা এই গ্রাম বাংলায় স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে খাচ্ছে, কেউ দেখে ফেললে যে নিন্দা হবে বাবা। আমি এবারও তীব্র প্রতিবাদ করতে যাব তার আগেই সেলিনা আমাকে আকুল ভাবে চোখের ইশারায় না করলো। আমি চুপ করে গেলাম। কোন কথাই বললাম না।

বিকেলে মনোয়ারা বেগম বললেন, আকবরের সঙ্গে গ্রামটা ঘুরে এসো বাবা, জানিনা ভালো লাগবে কি না। এখানে পর পর কয়েকটি গ্রামে তোমাদের আপন জন মানে তোমার ধর্মের লোকজন কেউ নেই, না থাকলেও এরা তোমাকে ভালভাবে নেবে বাবা। আমি বরং এ বেলা মেয়েটাকে নিয়ে গ্রামটা চিনিয়ে নিয়ে আসি।

রাতটা থেকে যেতে হলো। সেলিনাকে কোন ভাবে রাজী করাতে পারলাম না এই নিষ্ঠুর অভিনয় না করাবার জন্য। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে বৃদ্ধ এক সময় বললেন, ভেবেছিলাম, ডালিম আমার সংসার ভরে দেবে। তোমার চাচীর মাতৃত্বের ইচ্ছে, সংসারের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ইচ্ছে সব কিছু পূর্ণ করবে ডালিমের ভালোবাসা। হলো না বাবা। খোদা না চাইলে কিছুই হয় না, আবার এই দেখ, আজ তোমরা এসেছো। এক হিসাবে তোমরা তো ডালিমের প্রতিপক্ষ। তাই তাকে ভালবাসার অধিকারে আমারও প্রতিপক্ষ, অথচ আল্লাহ্ তা চাননি। তাই তোমরা এলে ভালোবাসার অগ্রদূত হয়ে শত্রুকে আপন করে নেওয়ার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে। আল্লাহ্ যে মঙ্গলময় তা অস্বীকার করি কি করে। ভেবেছিলাম বাবা, রেহানাকে খুঁজে বের করে তোমার হাতে তুলে দেবো, কিভাবে যে মেয়েটি তোমাদের আসার পর থেকে হৃদয়ে আসন বিছিয়ে বসেছে কি ভাবে বোঝাবো। কিন্তু এখন ভাবছি কি হবে তাকে খুঁজে কার হাতে তুলে দেবো? তোমাদের চাচী না বললে তো আমি বুঝতেই পারতাম না তুমি সেলিনাকে গ্রহণ করেছো স্ত্রী হিসাবে। হতভাগিনী মেয়েটি কোথায় আছে কে জানে? সেলিনা বলল, যে নেই তার জন্য এত ভাবছেন, আর যে মেয়ে আপনার সামনে, তাকে কেন বুঝতে চাইছেন না চাচা। না মা ব্যপারটি ঠিক তা নয়। তোমরা সুখী হও আল্লাহ্ তোমাদের সুখে রাখুন। এ কথা বলে বৃদ্ধ চলে গেলেন। মোনায়ারা বেগম আমাদের নিয়ে এলেন বাড়ীর সব থেকে যে ভাল ঘরটি সেখানে। তারপর সেলিনাকে বললেন, সেলিনা। রাতে তোমরা এ ঘরেই থাকবে।

ঘরে ঢুকে আমিতো অবাক হয়ে গেলাম। একি করেছেন মনোয়ারা বেগম। দামী খাট, দামী বিছানা। নতুন চাদর পাতা। পাশাপাশি ২টো বালিশ সুন্দর ওয়াড়ের পরে হাতের সূচারু কাজে অপূর্ব লতাপাতা আঁকা ঢাকনা। দুই পাশে দুটো পাশ বালিশ। ফুলদানীতে নিজেদের বাগান থেকে তুলে আনা ফুলের গুচ্ছ। দেওয়ালে মক্কার পবিত্র কাবা মসজিদের ছবি, আর এক পাশে তাজমহলের ছবি। একপাশে কাঁচ দিয়ে বাধানো নিজের হাতে সেলাই করা 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে' নিচেয় লেখা মনোয়ারা। ঘরটা যেন বাড়ী থেকে

আলাদা।

সেলিনা বলল, এই ঘরে চাচা ও চাচী মাত্র একরাত কাটিয়েছেন। আমার কি যে হয়েছে, সেলিনার কোন কথাই ভাল লাগছেনা। নিজের মনের মধ্যে যে কিসের ঝড় বয়ে চলেছে বোঝার অগম্য। ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। ও বলল, তুমি রাগ করলে? না। তবে কথা বলছনা যে কি কথা বলব বলত। এই সব কিছুর জন্য নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝতে পারছি তোমার কথা। আমারও যে ভাল লাগছে মনে করো না প্রান্তিক ভাই। কিন্তু কি করব চাচীকে ব্যথা দিতে মন সায় দিল না। চাচীকে ব্যাথা দিতে পারলে না, কিন্তু আমাকে দিতেতো কোন অসুবিধা হয় নি। কে বলেছে হয়নি? তুমি কি ভাবছ এসব আমি চেয়েছি? কি করে বিশ্বাস করব, বললাম আমি। ও আমার হাত ধরে বলল। তোমাকে বিশ্বাস করি বলে চাচীকে ব্যাথা দিতে পারলাম না। একটাতো রাত প্রান্তিক ভাই। খাটের দু পাশে মেঝেতে প্রচুর জায়গা। খুব কি অসুবিধা হবে? বললাম, শুধু দু পাশের প্রচুর জায়গায় সমস্যার সমাধান হবে? তোমার চাচীর স্বপ্ন যে সার্থক হয়নি, কাল সকালে বিছানার অবস্থা দেখে তিনি যখন বুঝতে পারবেন, কি উত্তর দেবে? হাসলো সেলিনা বললো, তিনি যখন আসবেন, তিনি জেনে যাবেন, বিছানার কোন অমর্য্যাদা হয়নি। সবইতো বললে, কিন্তু রাতটাতো কম দীর্ঘ নয়, আর সেই নিকষ কালো রাতের অন্ধাকারে যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারি? কে তোমাকে বলেছে যে নিজেকে রক্ষা করতে হবে? মানুষের মধ্যে যে দুর্বলতা গুলো আছে, তার প্রকাশই তো মানবিকতার প্রকাশ। আজ তোমাকে বলতে হবে, সত্যি কি তুমি আমাকে চাও না? একথা উঠছে কেন? এটা আমার উত্তর নয় প্রান্তিক ভাই। আমি যা বলছি তার সরাসরি উত্তর দাও। বহুবার তো দিয়েছি। দাওনি, হেঁয়ালি করেছো মাত্র। তোমার মনের মধ্যে বেঁচে আছে তপতীদি, অশ্রুদি, আর রেহানা আছে তোমার স্বপ্নে। তোমার মনের মধ্যে নেই। কি করে বুঝলে? যারা মনের মধ্যে বেঁচে থাকে, তাদের ছেড়ে দিতে কষ্ট হয়, কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যায়, তাই তুমি ছেড়ে দিতে পেরেছো তপতীদি বা অশ্রুদিকে। মাঝে মাঝে তারা তোমার মনকে দোলা দেবে আবার হারিয়েও যাবে, কিন্তু যে আছে তোমার স্বপ্নে. সে তোমার মনকে দোলা দেয় না। গভীর বেদনায় বললাম সেলিনা এ তোমার ভুল? ভুল? হ্যাঁ ভুল। ভুল যদি হয়, তা হলে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি আমাকে কাছে টানলে কেন? আমিতো দূরেই থাকতে চেয়েছিলাম, কেন তোমার আকুল তৃষ্ণা আমার হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিল। জেনে বুঝে কতবার কত কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছি, কেন প্রতিবার তোমার সম্মতির কথা জানালে? একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এ অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? যদি জানতেই আমার কাছে নিজেকে কোনদিনই সঁপে দিতে পারবেনা, কেন আপন ভাবনায় সাজালে আমাকে বলত। শুধু তাই নয়, সেই বিকেল থেকেই আমাকে শুধু এড়িয়েই চলেছো, আমি যেন তোমার কাছে অসহ্য। একবার তাকাতে পর্যন্ত পারছ না।

সত্যি কি তাই? সত্যি কি তাকাইনি বিকেল থেকে ওর দিকে? তাকি হয়? যে ভাবে

সেলিনা এগিয়ে আসছে তাতে রেহানা ভেসে যাবে। এতদিনে মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু সেই মন নিয়ে, আমি কি সম্পূর্ণ ভাবে সেলিনার হতে পারবো। তবুও ব্যাথাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম ওর দিকে। উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, খাটের একটি দিকে হাত রেখে, আমার দিকে পিছন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেও? আর আমার অবাক হওয়ার শেষ সীমায় এসে আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম টকটকে লাল রঙের শাড়ী পরেছে সেলিনা, ব্লাউজটাও লাল, সুন্দর খোঁপায় গোজা লাল গোলাপ। তার হাতে এ গয়নাতো ছিল না আগে, তা হলে, কিসের গয়না ওটা।

কোনদিন দেখিনি সেলিনাকে এমনি লাল শাড়ীতে। শুনেছি যৌবন তার উদ্দামতা পায় লাল রঙে। দেখিনি কখনো। সেই উদ্দামতার ভাষা কি, তাও জানিনা। তবু সেলিনাকে এই অপরূপ রূপে দেখার আকাঙ্খা নিয়ে ডাকলাম, সেলিনা। ওকোন সাড়া না দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওর উন্মুক্ত পিঠে হাত রেখে আবারও ডাকলাম সেলিনা। তবু নিথর নিস্পন্দ যেন। বুঝতে পারছি চরম অভিমানে ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে। সেলিনা কেন বুঝতে চাইছেনা, ও যা চায় আমিও তো তাই চাই, কিন্তু তার আগে চাই রেহানার একটা খোঁজ। হয়তো সেলিনার ধারণা, রেহানা থাকলে সে আসতে পারবেনা আমার কাছে। আমিও হয়তো যেতে পারবো না তার কাছে, তাই কি রেহানাকে খুঁজে পেতে চায় না ও। কিন্তু এত স্বার্থপর তো সেলিনাকে ভাবতে চায় না মন। সেই সেলিনা যে আমাকে একটু একটু করে রেহানার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সেই সেলিনা, যে হাসি ঠাট্টা আর চটুলতার বেড়ি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে আমার দুর্বলতা থেকে। যে প্রতি মুহূর্তে রেহানাকে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে করেছে রিক্ত। সে কেমন করে হবে এমন স্বার্থপর। আমি আকুল হয়ে আবারও ডাকলাম, সেলিনা একবার তাকাও আমার দিকে। তবু নিশ্চল পাষাণ যেন, এবার আমি আর পারলমনা। জোর করে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম আমার দিকে? চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে জল, সে দিকে তাকাবার আগে চোখ চলে গেল ওর সিঁথির দিকে, আর নিজের আশ্চর্যতাকে হার মানিয়ে আমাকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তার রক্তিম সিঁথি। সুন্দর করে কে রাঙিয়ে দিয়েছে ওর সিঁথিকে সিঁন্দুর দিয়ে। কপালে দিয়েছে রক্তিম টিপ। অপূর্ব লাগছে ওকে। আর এই অপূর্ব সৌন্দর্যের বেলাভুমিতে ফোটা ফোটা চোখের জল যেন, লাল সূর্যের স্পর্শোন্মুখ ভোরের শিশির বিন্দু।

কোন রকম দ্বিধার অপেক্ষায় না থেকে ওকে সজোরে বুকের পরে টেনে নিয়ে বললাম, সেলিনা তুমি কি বুঝতে পারনা আমাকে? কি চাই অমি? কোন রকম প্রতিবাদ না করে বলল, আমি পারছিনা গো, আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমিও তাই, আমার বুক থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তাই যদি হয় তাহলে এই নাও, বলে নিজের ব্লাউজের মধ্য থেকে সিঁন্দুরের ছোট্ট কৌটটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল। তোমার অধিকারর স্বীকৃতি দাও। কণ্ঠ আমার কেঁপে উঠলো। বললাম সেলিনা! ও নীচু হয়ে আমার পায়ের কাছে বসে বলল, আমি হেরে গেছি, একেবারেই হেরে গেছি। আকুল প্রার্থনায় আমার তৃষ্ণাতুর নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, জয়ী হতে চাওনা তুমি? এখনো ভীরু মন, কিসের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে

আছো?

আমি কৌটা থেকে সিঁন্দুর নিলাম আঙুলে। পরম মমতায় পরিয়ে দিলাম ওর রক্তিম সিঁথিতে। আর ও? ওর খোঁপা থেকে তুলে নিয়ে লাল গোলাপটি আমার পায়ের উপর রেখে দিয়ে বলল, আরতো কিছু নেই, আমার এই ক্ষুদ্র উপহারকে ফিরিয়ে দিও না। ফুলটা তুলে নিলাম পায়ের উপর থেকে, দুহাত দিয়ে তুলে নিলাম আবার ওকে বুকের মাঝে, বললাম তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য নেই আমার, শুধু ভয়, হ্যাঁ সেলিনা ভয়, রাতের অন্ধকার যে আবেগ রচনা করেছে সাগর, সূর্যের উজ্জ্বলতায় তা যদি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, কেমন করে মুছে দেব জীবনের এই মধুর মুহূর্তটুকু। ও বললো, মুছতেই চাইবে যদি —

কেন আবেগ দিয়ে ভরালে আমায়?
কেন শুভ্র সিঁথিতে দিলে
রক্তিম অঙ্গীকার?
সে কি তবে পরাজয়?
আমি বললাম, কার পরাজয়? আমার। তারপর বলল,
মুহূর্তের ব্যঞ্জনা যখন
বারবার বলে যায়, আমার সত্ত্বায় তুমি আছো,
রক্তেব দোলায় লাগে সাগরের ঢেউ
গর্জন থেমে যায়।
সে শান্ত রূপের লাগি
আঁধার কি নয় মধুময়?
যে চোখের তৃষ্ণা লাগি
নীল আকাশ, আপন খেয়ালে আঁকে
নক্ষত্রের ছবি,
চাঁদও কি পিছিয়ে থাকে?
পক্ষ থেকে পক্ষান্তরে
নীরব সে অভিসারে
কানে কানে বলে যায়
আনন্দেব যজ্ঞভূমে যে আগুন জ্বালাতে আজকে
আমি তার সাক্ষী হয়ে রব চিরদিন।
কেউ নেই মুছে দিতে বিবর্তন আমার
আমিতো আসবো ফিরে বার বার

করাঘাতে হানবো আঘাত
রুদ্ধদ্বার দুয়ারে তোমার।
পারবে কি ফিরিয়ে দিতে
মুগ্ধ রাত জোছনারে
করতে বিমুখ?

সকাল থেকে আমার শুধু বিস্ময়ের পালা জীবনেব এত আবেগ এত ভালবাসা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল সেলিনা এতদিন? স্পষ্টতায় কোন আড়ষ্টতা নেই। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমায়। এতদিন তীর দিয়ে হেঁটে ছিলাম, পাশাপাশি। এবার ভেসেছি তাব স্রোতে। শুধু মনে প্রশ্ন নীলাঞ্জনা পিসি, মিনতি সেন, যদি কিছু জানতে চান কি বলব ওদের। সেলিনা বলল, কি ভাবছো? তোমার কথা। আমার কথা? হ্যাঁ তোমার কথা। কেন? তুমি কি বুঝতে পারছো না কেন ভাবছি? সবটা না হলেও কিছু কিছু যে পারছিনা তা নয়, কিন্তু এসব ভেবে কি হবে? একটা বাতের অভিনয় বইতো নয়। চাচীকে আঘাত দিতে পারলাম না, নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন সিঁদুর, কি করে বাধা দিই বলত। হাতে দিলেন এয়োতির চিহ্ন নোয়া, হিন্দু স্ত্রীরা নাকি এসব স্বামীর মঙ্গলের জন্য পরেন, আমি ওকে বললাম আমিতো হিন্দু নই। উনি বললেন তাতে কি, তুমি যখন কোন হিন্দু ছেলেকে তোমার স্বামী হিসাবে গ্রহণ কবেছো, তখনতো তার ধর্মই তোমার ধর্ম। আমি অবশ্য বলতে চেয়েছিলাম ওতো কোন ধর্ম মানে না, ও বলে মানবতাই তার এক মাত্র ধর্ম। উনি বললেন ও যা বলে বলুক, কিন্তু মা হয়ে আমি তোমাকে এভাবে ওর ঘরে পাঠাতে পারবো না। বললাম কোথায় পাবে তুমি এসব। বললেন আকরবকে দিয়ে আনিয়েছি। আমি আঁতকে উঠে বললাম, এসব কি করেছো তুমি, ও শুনলে আমাকে ভীষণ বকবে। বললেন বকুক, স্বামীর বকুনি স্ত্রীর অতো গায়ে লাগালে চলে মা?

তুমিই বল, আমি এর উত্তরে কি বলতে পারি? তারপর ভাল করে চুল বেঁধে দিলেন আমার। হাতে দিলেন ওই শাড়ী ও ব্লাউজ। বললেন এটা পরেই ওর কাছে যাও মা। তোমরা একালের মেয়েরা যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কোন খাদে নামিয়ে এনেছো ভাবলেও অবাক লাগে। আমরা রোজ বিকালে সারদিনের ক্লান্তি দূর করতে গোসল করতাম। নিজেকে যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে স্বামীর কাছে নিজেদের গ্রহণীয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করতাম। আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি বললেন, এতে লজ্জার কি আছে। মহাভারততো শুধু হিন্দুর কাব্য নয় ভারতীয় উপমহাদেশের সব মানুষের কাব্য। সব মানুষের কথা লেখা ওতে। ওখানে দ্রৌপদী আছে একজন। পাঁচজনের মনোরঞ্জন করেও তার মনে জেগে থাকে একজনের কথা, সে অর্জুন, তাকেইতো সে চেয়েছিল জীবন ভরে। কিন্তু অর্জুন কখনো তার একার হয়নি। সুভদ্রা ছিল অর্জুনে আরেক স্ত্রী। একদিন দ্রৌপদীকে বলেছিল দিদি পাঁচজন স্বামীর মনোরঞ্জন করেও তুমি যেমন অক্লান্ত তেমনি এত স্ত্রী থাকতেও অর্জুন শুধু তোমাকে চায় কেন? কি আছে তোমার মধ্যে যা দিয়ে তুমি বশ কর স্বামীদের। দ্রৌপদী হেসে ছিলেন উত্তর এড়িয়ে যেতে। কিন্তু নাছোড়বান্দা সুভদ্রা তা শুনবেন কেন?

বললেন এড়িয়ে গেলে চলবে না দিদি, আমাকে বলতেই হবে। নিরুপায় দ্রৌপদী বলেছিলেন আমি নিত্য নতুন রূপে হাজির হই ওদের কাছে যাতে কোন ভাবে তারা মনে করতে না পারে আমি পুরাতন।

লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমি বলেছিলাম তুমি পড়েছো মহাভারত? না তবে জানলে কি করে? তোমার চাচার কাছে শুনেছিলাম। কথাটা বলেই যেন কুমারীর সলজ্জতায় হাসলেন একটু। তারপর নিজেই বললেন, আমি তোমার চাচার দ্বিতীয় স্ত্রী। বয়সেরও পার্থক্য আমাদের মধ্যে অনেক। তবু তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে শুধু মাত্র নিরস কর্তব্য পালনে শেষ হয় না মোনোয়ারা, শুধু ভালবাসায়ও তা পূর্ণতা পায় না যদি একে অপরকে দেখে ভালো না লাগে তবে তা ব্যর্থ। তাই বলছি মা শুধু ভালবাসা দিয়ে জীবন সব সময় বাধা যায় না যদি একে অপরকে ভাল না লাগে। তাইতো গ্রাম বাংলার সব স্ত্রীরা স্বামীর সেই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিজেকে সাজাতো সযতনে। হিন্দু স্ত্রীকে সধবার এয়োতি ও সিঁথিতে সিঁদুর ছাড়া ভাল লাগতে পারে না। এ তাদের জন্ম গত সংস্কার, আর এই লাল রং এতো যৌবনের রং মা। মিথ্যে করেই বলেছিলাম, ওতো বলেনি কখনো। এনিয়ে ভাবে বলেও তো মনে হয় না। ভাবে মা ভাবে, তুমি কিছু মনে করতে পার তাই হয়তো মুখ ফুটে বলে না। আমি মনে করব কেন? তুমিতো সেই সংস্কারের মধ্যে বড় হওনি তাই। যদি তুমি ভেবে বসো, ভালবাসাটাকে বাদ দিয়ে সংস্কারটিই বড় করে দেখছ বলে।

বিশ্বাস কর প্রান্তিক ভাই, গ্রামের এই অল্প শিক্ষিত মহিলার মধ্যে এমন সুরুচি সম্পন্ন আভিজাত্যে আর উদার মনা বাস্তববাদী এক নারী বাস করতে পারেন ভাবিনি কখনো। সত্যি মনে হয়েছিল, যদি তোমার ঘরে সত্যি কখনো আসি, এমন ভাবনা কি তোমার অমূলক হবে? উনি আরো বলেছিলেন, সব কিছুকে বাদ দিয়ে যে ভালবাসা তা স্থায়ী হতে পারে না মা, ভালবাসতে গেলে তার দোষগুন নিয়েই তাকে ভালবাসতে হয়। তাদের আজন্ম আচরিত সংস্কারকেও ভালবাসতে হয়। দুপুরের দিকে শুনেছিলাম তুমি তোমার চাচার সঙ্গে আলোচনা করছ। বিধর্মী দুটি মানুষ ভালবেসে বিয়ে করলে একজনকে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে কেন? তারপর বললেন সত্যি কারের ধর্ম অন্তরের জিনিষ মা। কিন্তু যে ধর্মকে আমরা চোখে দেখি, সে আমাদের আচার সর্বস্ব ধর্ম একটু আগে যে সংস্কারের কথা বললাম, তার জন্যইতো একজনকে ত্যগ স্বীকার করতে হবে। উভয়ে উভয়ের ধর্ম এক সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে পালন করতে চাইলে, আচার সর্বস্ব ধর্মের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে তাই হয়তো একজনকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি বলে ছিলাম, বলল সেলিনা, কিন্তু চাচী সচরাচর দেখা যায় এই ধর্ম বর্জন গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায় সকলকেই মুসলমান হতে হয়, এটা কেন? কারণ হয়তো একটা আছে আমি অত বলতে পারবনা মা, তবে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে বেশ কিছু স্বাতন্ত্রের দাবী করে বলেই হয়তো এই রকম হয়। আবার অন্য কিছুও হতে পারে আমি জানিনা। আমি যদি ওর ধর্মীয় আচরণ পালন না করে আমি যে আজন্ম সংস্কারে লালিত পালিত হয়েছি ওকে তাই পালন করতে বলি। সে তুমি পারবেনা মা। কেন? যদি

পারতে তা হলে এতদিনই তা পারতে। তার থেকে তোমার পক্ষে সহজ ওর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। উত্তরে বললাম তাতে যদি অস্বস্থি হয়? তার উত্তরে চাচী বললেন, হলোই বা, একজনকে না একজনকে তো মানিয়ে নিতেই হবে। এক্ষেত্রে না হয় তুমিই মানিয়ে নিলে, তাছাড়া আমার মনে হয় জন্ম তোমার ইসলামের ঘরে হলেও ইসলামের আচার আচরণ তুমি কিছুই জান না। জীবনে হয়তো কোনদিন নমাজও করোনি। আমি মৃদু হেসে বললাম একথা তোমার সত্যি চাচী। আরো বললাম যাকে তোমরা রুকসানা বলে জানতে সেই রেহানা, আমার দিদি যখন ওকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তখন কিন্তু ডালিম ভাইয়ের বিষ নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। একদিন ও ডালিম ভাইকে সত্যিই ভালবেসে ছিল। কিন্তু ডালিম ভাইয়ের মধ্যে যে ধর্মান্ধতা ছিল, ওর মধ্যে তা ছিল না, তাইতো পাগলের মত ওর প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল ডালিম ভাই, আর সেই ধর্মন্ধাতার যুপকাষ্ঠে আমাদের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন উনি।

একটু থেমে বলল বুঝতে পারছি প্রান্তিক ভাই, ডালিমের কথা বলা আমার উচিৎ হয়নি। কিন্তু উনি বললেন, থাক ওর কথা মা, আল্লহ্ কাকেও ক্ষমা করেন না, ওকেও করেননি। রোজ কিয়ামত বলে সত্যি যদি কিছু থাকে তবে তার পাপ পুণ্যের বিচার হবে সে দিন। বিকালে ওঁর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম পাশের গ্রামে। উনি এক বাড়ীতে ঢুকে গেলেন আমাকে নিয়ে। ওঁরা আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? চাচী নির্ধিকার ভাবে বললেন, আমার এক মেয়ে? ওরা অবাক হয়ে বললেন তোমার মেয়ে? না সে ভাবে আমার মেয়ে নয় আমার এক আত্মীয়া। কলকাতায় থাকে, বেড়াতে এসেছে ওর বরকে নিযে। তাকেও নিয়ে এলেনা কেন? ওরা এই বেলা চলে যাবে বলেছিল, আমি জোর করে ধরে বেখেছি একদিন। এরপরে যখন আসবে নিয়ে আসব। তা কোহিনূর কোথায়? ভদ্রমহিলা বললেন, কদিন থেকে পাগলামিটা আবার বেড়েছে। ঘরে শিকল দিযে আটকে রাখা হয়েছে? আল্লাহর যে কি অবিচার, যার জন্য ওর আজ এই অবস্থা সেই যখন নেই, একেও তো নিয়ে যেতে পারে শেষ বিচারের অপেক্ষায়। আমি আঁতকে উঠে বললাম শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে? চাচী বললেন হ্যাঁ মা, মাঝে মাঝে ওকে শিকল দিতে হয়। কে উনি? ডালিমের স্ত্রী। মানে? মানে আর কিছু নয় মেয়ে। তোমাদের মত ফুট ফুটে আর সুন্দর ছটফটে ছিল মেয়েটি। লেখা পড়ায়ও ভাল ছিল। তোমার চাচা ওকে পছন্দ করে ডালিমের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ডালিমেরও পছন্দ ছিল। ও যদি কলকাতায় না যেতো হয়তো ওকে নিয়েই ঘর সংসার করতো। কিন্তু ওখানে গিয়ে কি যে হল! থাক সে কথা, একদিন ডালিমের কয়েকজন বন্ধু ওর প্রতি অত্যাচার করে। অবশ্যি সেই সময় ডালিম ছিল না। তাই বলে অন্যায় থেকে তো মুক্তি পেতে পারে না। না মা আর বেশী কিছু জানতে চেওনা। তোমার দিদি বোধ হয় এসব জানতোনা, তাই তাকে ভাল হতে বলেছিল। হয়তো একদিন ভালও বেসেছিল বলে, কিন্তু যাকে শুধু ঘৃণাই করা যায়, তাকে কি করে ভালবাসবে? চল ওকে দেখাবো তোমাকে। বললাম না চাচী থাক। থাকবে কেন? যদি তোমার দিদির খোঁজ কোনদিন পাওয়া যায় তারতো ব্যাপারটা জানতে হবে। জানার কি খুব প্রয়োজন চাচী? অবশ্য প্রয়োজন, এতটা জঘন্য প্রকৃতির

ছেলের জন্য একটা ফুলের মত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। মা হয়ে তা মেনে নিতে পারবো না। বুঝতে পারছি প্রান্তিক ভাই কি গভীর বেদনায় উচ্চারিত এই কথাগুলো। আমাকে তাড়া লাগিয়ে বললেন, চল দেখব ওকে।

চাবিখুলে ভিতরে ঢুকলাম আমরা। শান্ত মেয়েটি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু হাতে পায়ে শিকল। কি করুণ সে তাকানো আর দেখতেও সত্যিই ভাল। চাচী বললেন কেমন আছ বৌমা। ও চুপ করে রইল। আপন মনে কি যেন বলতে লাগল। আমি বললাম ওর হাত পায়ের শিকল খুলে দাওনা চাচী। বললেন না থাক, এবার চল। আমরা যখন চলে আসব, চাচীর শাড়ীর আঁচল ধরে টান দিল মেয়েটি। চাচী বললেন, কিছু বলবে বৌমা। চোখের ইশারায় কি যেন বলল, কলকাতা থেকে এসেছে, হ্যাঁ, সঙ্গে ওর বর আছে। হ্যাঁ নিয়ে আসব একদিন। তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ।

ফিরে আসার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা ওকে বৌমা বল কেন? বা তবে কি বলব, ডালিমের সাথেতো ওর একদিন বিয়ে হয়েছিল। আমি আর কোন কথা বলি না। ফিরে এলাম বাড়ীতে।

এবার বল প্রান্তিক ভাই, আমি কি করব? চাচী যা দিয়েছেন ইচ্ছে করলে তুমি তা এক এক করে খুলে নিতে পার আমার অঙ্গ থেকে। বললাম ভালবাসার দান খুলতে নেই সেলিনা। মিথ্যে জেনেও? উনিতো মিথ্যে জানেন না। সেলিনা বলল কিন্তু তুমি?

আমি বললাম রাত বুঝি শেষ হয়ে আসছে এবার ঘুমাও। তুমি ঘুমাবেনা? হ্যাঁ ঘুমাবো, আগে তুমি ঘুমোও। তবে তুমিও এস। ও আমাকে হাত ধরে নিয়ে এল বিছানায়, তারপর মনোয়ারা বেগমের সাজানো বিছানায় আমাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, সত্যি কি ঘুম পাচ্ছে? কি বললে সুখী হবে তুমি? যদি আমাকে তুমি তোমার ঘুম পাড়ানোর গানের অধিকার দাও। তবে তাই দিলাম।

তাই বলে সেলিনার গানের প্রয়োজন হয়নি মাথায় হাত ছোয়াতেই ঘুমিয়ে গেলাম। পাশে ও ছিল কিনা জানিনা। কে যেন দরজায় মৃদু আঘাত করছে। চোখ মেলে দেখি সেলিনা নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে নীচের খালি মেঝেয়। আমি ওকে আস্তে কানে কানে ডাকলাম। চাচী মনে হয় ডাকছেন। ও ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তারপর নিজের পোষাকের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতে ইচ্ছে করে শাড়ীর বিভিন্ন অংশ কুঁচকে দিল। এগিয়ে এসে আমার জামাটা এলো মেলো করে ভাজ ফেলে দিল। সিঁথির সিঁদুর দিল লেপটে। তারপর বিছানার চাদর দলমচা করে আবার তাকে স্বাবাবিক করে রাখল। খোঁপাটা খুলে গেছে কখন যেন। এমনি ভাবে ইচ্ছে করে খুলে দিয়ে এলোমেলো করে হাই তুলে দরজার কাছে গিয়ে বলল কে? আমি চাচী, দরজা খোল মা? সেলিনা দরজা খুলেতেই এক পলক তাকিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলল নাস্তা হয়েছে। তোমার চাচা ও আকবর বসে আছে, সেলিনা বলল, ওনাদের খেয়ে নিতে বল চাচী। আমার একটু দেরি হবে। স্নান না করে কিছু খেতে পারবনা।

দরজাটা বন্ধ করে কাছে এসে দাঁড়ালো ও। তখনো বুকের খাঁজের এক পাশ রয়েছে শাড়ীর ভাঁজে, কোমরে আধ খোলা শাড়ী গোজা। চুল নিজের হাতে করা এলোমেলো।

পলকহীন তাকিয়ে আছি ওর দিকে। হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে শাড়ীর আঁচলটা পরিপাটি করে তুলে দিল কাঁধের উপরে। লজ্জায় আনত হয়ে বলল ছিঃ দেখছো অমন করে? তোমাকে, কি বিচিত্র তোমার রূপ। আমি অবাক হয়ে ভাবছি আমার ভালবাসা কি তোমাতেই পাবে তার ঠিকানা? দুষ্টুমি করছ না ঠাট্টা। দুটোতেই ভীষণ লোভ হচ্ছে সেলিনা। ও বলল, যে পথ অন্ধকারে খুঁজে নিতে হয় আলোতে কি তার ঠিকানা মেলে? তা হলে উপায়? আবার প্রতীক্ষা হোক শুরু কবে পাবে এমন এক নিকষ কালো অন্ধকার রাত সেই অপেক্ষায় । যদি তর না সয়। হাসতে হাসতে বলল, জীবনের প্রথম যুদ্ধে যে জয়ী হতে পারে না, তাকে তো জয়ের অপেক্ষা করতেই হবে। বেরিয়ে গেল ও। মনে হলো। ওগো নারী কি বিচিত্র রূপিনি তুমি।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে আবাব বিশ্রাম নিতে এলাম সেই ঘরে, যেখানে কালকের রাত কাটিয়েছি প্রহর গুনে। সেলিনা আসেনি, আমি একাই এসেছি, শুয়ে শুয়ে ভাবছি জীবনের এই কয়েকটা দিন। সেইতো দিন সাত আট আগে অশ্রুকণাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলাম। আর আজ সেই মেদিনীপুরেরই আর একটা গ্রামে যে মেদিনীপুর কেড়ে নিয়েছে আমার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন-ভালবাসা, আমার প্রেম, আমার অনুভূতি ও উপলব্ধি, সেইই আবার দুহাত ভরে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে জীবনের সব অপূর্ণতা। তবু অমি নিতে পারছিনা কেন? কোথায় আমার অসুবিধা? এখানে এসে আবিষ্কার করেছি রেহানাকে নতুন ভাবে। যে রেহানা একদিন ডালিমকে ভালবাসা দিতে চেয়েছিল সেই রেহানা মাঝের দিনগুলোকে ভুলে নতুন করে ডালিমকে বাঁচার স্বপ্ন দেখাতে এসেছিল। যাকে জীবনে কোন দিন অন্যভাবে ভাবিনি। তাকে আজ নতুন করে ভাবছি কেন? কেন মনে হচ্ছে রেহানা আসেনি কোনদিন আমার কাছে পরিপূর্ণ রেহানা হয়ে। একি আমার পাপ? ওকে তো জীবনের সবটুকু দিয়ে ভালবেসে ছিলাম, তবে কেন সে ফাঁকি দিয়ে গেল। যদি ডালিমের জন্য তার মনে কোন দুর্বলতা থাকেও তবুও আমি তো তাকে অস্বীকার করতাম না। তাহলে সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারলো না কেন আমার কাছে। ডালিমকে বলেছে আমি তার গুরু। এটাইকি সত্য? গুরু শিষ্যের সম্পর্কের আবরণ উন্মোচন করে সেকি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছে? একবার হে ঈশ্বর তুমি শুধু একবার ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও।

মোসলেউদ্দীন সাহেব বললেন, রেহানা ফিরে এলে আমি তাকে কি ভাবে গ্রহণ করব। মিনতি সেন চেয়েছিলেন আমার জীবনে রেহানাই যেন আসে, তার অবর্তমানে অশ্রুকণাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছেন আমার কাছে। সেলিনার জন্য অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও সেলিনার জন্য ভাবেননি, আবার নীলাঞ্জনা পিসি রেহানার ভালোবাসকে মর্যাদা দিয়েও চেয়েছেন সেলিনাই যেন আসে আমার জীবনে। একসময় আফরোজ বেগম ও তাই চেয়েছিলেন। যদিও মৃত্যু শয্যায় তিনি অন্য রকম বলেছিলেন, তপতী ও অশ্রুকণার অনুভূতিতে রেহানা নয়, সেলিনাই আসতে চেয়েছে তার সবটুকু দাবী নিয়ে। যদিও এসব তারা মনে করেছে যদি রেহানা ফিরে না আসে। তপতীর মনে একদিন যাইই থাকুকনা কেন, আজ সে নতুন ভাবে বাঁচবার পথের সন্ধান পেয়েছে। তার জন্য বেশী ভাবনা হয় না। কিন্তু

অশ্রুকণা? সেইতো এসেছিল জীবনে প্রথম প্রেমের ডালি নিয়ে। তারপর সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে রেহানার জন্য সরে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার অবর্তমানে আবার যে সে আসতে চেয়েছিল - জীবনের চরম জটিল মুহূর্তে। কিন্তু তাই বলে সে এমন কিছু করতে চায়না, যাতে সেলিনা আঘাত পেতে পারে। আমার কাছ থেকে বিন্দু মাত্র সাড়া পেলে কি হতো জানিনা। কিন্তু পারলাম না ধরা দিতে। কিন্তু এটাই কি সত্যি? কেন ওর জন্য মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে মাঝে মাঝে। কেন এক নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিতে চায় সে, কিসের প্রতীক্ষায়?

আর সেলিনা? সব নারীর স্বপ্নে বেঁচে থাকে কারো বধু হওয়ার আকাঙ্খা। তারই কি পূর্ণতা পেল এখানে? প্রথম দিন থেকেই বুঝিনি তাকে। কি সহজ আর স্বাভাবিক, প্রথম যেদিন স্কুল থেকে ফিরতে গিয়ে আমাকে ডেকেছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সেই ক্যান্টিন, তার উচ্ছলতা। নিজেকে প্রকাশ করার স্বাভাবিকতা, আজ অস্বীকার করতে চাইনা যে তা আমাকে আকর্ষণ করেছিল তীব্র ভাবে। ভাললাগার সম্মোহনী মোহে তাকে বুঝি ভালবেসে ফেলেছিলাম। তার মনে কি ছিল জানি না। কিন্তু আমি যখন তার দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছি, তখনি সে আমাকে এগিয়ে দিয়েছে রেহানার দিকে। আর এমনি করে কবে যেন নিজের অজান্তেই নিজেকে একাকার করে দিয়েছি রেহানার সঙ্গে। তবু কি অস্বীকার করতে পারবো এই মন বারবার চেয়েছে সেলিনাকে, আর আমার সেই দুর্বল অনুভূতির কথা বুঝি সবার থেকে ভাল বোঝে সেলিনা। তাই নির্জন হাসপাতলের কেবিনে তার তীব্র অভিমান, আর অসম্ভব অধিকার বোধ, তার চোখের জল, তার মনের দ্বন্দ্ব সব কিছুই আমাকে প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়েছে। কিন্তু কখনো মনে করিনি, সেলিনা ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল হয়ে গেছে। কি আছে ওর মধ্যে, যে চৌম্বক শক্তি, আমার দিকে ধাবিত হয়ে আঘাতে আঘাতে খান খান করে দিতে চায় আমার অস্তিত্ব।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন বুঝি আধো ঘুম নেমে এসেছিল চোখে। আবছা দেখতে পাচ্ছি, রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে সেলিনা এসেছে আমার ঘরে। তারপর ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সারা দিনের ক্লান্তিকর পোষাক গুলিকে ছেড়ে রাতের পোষাকে নিজেকে সাজাচ্ছে। এক বেনী চুল বাধা আমার পছন্দ। তাই এলো খোপা খুলে, বাঁধছে এক বেনী চুল। সামনের ফুলদানী থেকে তুলে নিয়েছে গোলাপ। তারপর গুঁজেছে বেনীর গোড়ায়। ঠোঁটে আলতো লিপস্টিক বোলাতে বোলাতে হঠাৎ বলে উঠলো দুষ্টু কোথাকার। শুধু ভিতরের জামাটা পরে ব্লাউজের বোতাম আটকাতে আটকাতে, কি মনে করে, না আটকিয়েই, রাতের লাল রঙের হালকা শাড়িটা তুলে নিলো কোমরে, আঁচল ভাজ দিয়ে রাখল তা কাঁধের উপর। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো আমার দিকে।

হঠাৎ ভেজানো দরজা খোলার শব্দে চোখ মেলে তাকালাম, ও দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে বলল এতক্ষণ জেগে জেগে কার কথা ভাবছিলে? বলতো কার কথা? হাসতে হাসতে সেলিনা বলল ইদানীং তো দেখছি শয়নে স্বপনে তুমি একজনের কথা ভাবো, নিশ্চয়ই তার কথা ভাবছো? বলতো কে? যে তোমার চিরকালের শত্রু নিশ্চয়ই তাকে। ও সব হেঁয়ালি

না করে চটপট বলে ফেলতো নামটা। আমি বলব কেন? তুমিই বলনা। বেশ তাহলে কাছে এসো। আমি শুনতে পাচ্ছি এখান থেকেই। দুর ছাই, এতদূর থেকে বলা যায় নাকি। কাছে এগিয়ে এসোনা? ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো আমার কাছে। আমি ওর একটা হাত নাগালের মধ্যে পেতেই জোরে টেনে নিয়ে এলাম একেবারে আমার বুকের পরে, তারপর তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে বললাম, যে মেয়ের প্রতীক্ষায় আর একটা নিকষ কালো অন্ধকার রাতের প্রহর গুনছি, তার কথা ভাবছিলাম। ও বলল যাঃ। আমি বললাম আজ যাব না সেলিনা, চাচীকে বলে দাও। ও জোর করে উঠে পড়ল আমার বুক থেকে। বলল, আকবর চলে গেছে গাড়ীতে। আমারও গোছানো শেষ। এখন বলছ যাবে না, তা হবে না, আত্মমর্যাদাকে বিলিয়ে দিয়ে থাকতে পারবো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। চাচা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। আমি হতাশ হয়ে বললাম, সত্যি আরেকটা রাত থেকে গেলে খুব অসুবিধা হবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গছে! না এক রাতের শাস্তিতে মন ভরেনি! আরো শাস্তি দিতে চাও। আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বলছি? তা ছাড়া আবার কি? কি ভাবে আমার রাত কেটেছে জানো? আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, না জানতে চাইনা। তুমি প্রস্তুত? হ্যাঁ প্রস্তুত। তাহলে চল আমিও প্রস্তুত।

ও আর দাঁড়ালো না। চাচীর ঘরে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে বেরিয়ে এলো। সাজাতে গিয়ে চাচী ওর সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দিতে গেলে সেলিনা বাধা দিয়ে বলে, থাক না চাচী, রেখে দাও ওটা তোমার কাছে। আবার যেদিন আসবো, নিজের মতো সাজিয়ে দিও। সেকি কথা মা, এটাতো হিন্দু স্ত্রীর অলংকার, হাতে এযোতিব চিহ্ন লোহা আব সিঁথিতে সিন্দুর এ না হলে হিন্দু স্ত্রীকে মানায় না। বাধ্য হয়ে পরতে হয়। পরতে হয় চাচীর দেওয়া লাল শাড়ী।

বেরিয়ে এসে প্রণাম করে মোসলেউদ্দীন সাহেবকে, বলে কই চাচা আশীর্বাদ করলেন না। বৃদ্ধ বললেন আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুক বেটি, আর স্বামীর গরবে গরবিনি হও। তারপর তার পকেট থেকে একটা সোনার চেন বের করে বল্লেন, গরীব চাচার এই সামান্য উপহারকে কোন অজুহাতে ফিরিয়ে দিও না মা। সেলিনা হাটু গেড়ে নীচু হয়ে বসে বলে পরিয়ে দিন চাচা। এ যে আমার মঙ্গল সুত্র, আমার বাবার আর্শীবাদ। একে কি অস্বীকার করতে পারি? বৃদ্ধ চোখের জলে পরিয়ে দিলেন সেই সোনার চেনটি সেলিনার গলায়। দাম হয়তো বেশী নয় কিন্তু এর মানবিক মূল্যতো পয়সা দিয়ে কেনা যায়না। আমি প্রনাম করতে গেলে আমাকেও দেন উপহার ধুতি ও পাঞ্জাবি। বললেন তুমি ঐ জামা প্যান্ট ছেড়ে এটা যদি পর বাবা, মনে করব আমার সব অভাব পূর্ণ হয়ে গেছে। সেলিনা যেমন ওদের আঘাত দিতে পারলো না, আমিও বুঝি পারলাম না, ভিতরে গিয়ে জামা প্যান্ট খুলে পরে নিলাম ধুতি আর পাঞ্জাবি।

বেরিয়ে যখন আসছি, আমাদের সঙ্গে অনেক দুর এলেন। সেই যেখানে গাড়ী রাখা হয়েছে। আমরা গাডীতে উঠলে বৃদ্ধ বললেন, কোন অধিকার বলে তোমাদের আসতে বলব জানিনা বাবা, তবু যদি কখনো আমাদের কথা মনে পড়ে, আসতে ভুল করো না।

গাড়ী ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম সজল চোখে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ মোসলেউদ্দীন এবং মনোয়ারা বেগম।

জীবন কি ভাবে এগিয়ে যাবে, কেউ বোধ হয় তা আগাম বলতে পারে না। কোথায় যে তার বাঁধন আছে কে বলতে পারে। জনপদ ছেড়ে গাড়ী হু হু করে এগিয়ে চলেছে। দুই পাশে সবুজ মাঠের বুক চিরে মসৃণ রাস্তা দিয়ে। সেলিনা চুপ করে আছে। আনন্দে বুঝি ভরে গেছে বুক, তাই বাহুল্য কথা বলে সে আনন্দকে ব্যর্থ করে দিতে চায় না ও। এক সময় নিজের অজান্তে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আমিও চুপ করে রইলাম।

সবুজ প্রান্তরে নামে অন্ধকার। সেলিনা তার মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসে আমার কাঁধের ওপরে। বললাম শরীর খারাপ লাগছে? বলল না। তা হলে কি ভাবছো? বলতে পারব না। আমিও বলতে পারবনা সেলিনা আমি কি ভাবছি! আমি জানি তুমি কি ভাবছো? কি? ভারি বোঝা নামাবে কি করে তাইতো। দেখ সেলিনা জীবনের অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। কিন্তু আমার ছোট্ট জীবনে যা পেয়েছি, তার কোন তুলনা হয় না। শুধু আমাকে ছাড়া, আস্তে বলল সেলিনা। তারপর কাঁধ থেকে মাথাটা তুলে নিয়ে বলল পকেটে রুমাল আছে? হ্যাঁ আছে। তাহলে দাওনা সিঁথির সিঁদুরটা মুছে! আমি কণ্ঠে যত আবেগ আনা সম্ভব, তাই এনে বললাম সেলিনা! ও বলল, জানি তুমি কি বলবে, তবু এ হয় না। এই সাজে আমি কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবনা। কি বলব প্রতীমবাবুকে? কি বলব মা ও মিনতি পিসিকে।

বললাম, কাউকে কিছু বলতে হবে না সেলিনা, যাদের যা বোঝার তা তারা নিজেরাই বুঝবেন। আমি নিজ হাতে তোমাকে সিঁদুর পরিয়েছি। কি করে তা মুছে দেব? তুমিতো ইচ্ছে করে পরাওনি। সিচুয়েশান তোমাকে বাধ্য করেছিল। যতই বাধ্য করুক আমার ইচ্ছে না থাকলে পরাতে পারতাম? আমি জানিনা, তুমি মুছে দাও। পারবো না সেলিনা, কিছুতেই পারবো না। ও বেশ জোরে বলল আমিও পারবনা, কিছুতেই পারবনা এই সাজে প্রতীমবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তা হলে কি করবে? তুমি যদি না মুছে দাও আমি নিজেই মুছে দেবো। তার মানে তোমার অহংকারের সাথে আমাকে মানিয়ে নিতে পারছনা তাইতো। না গো তা নয়। আমার অহংকার তো তুমি। এমন করে তোমাকে পাবো ভাবিনি কোনদিন। ভাবনা যখন বাস্তব, তখনো তুমি তাকে অস্বীকার করবে? যদি পারতাম তোমাকে বুক চিরে দেখাতাম কি আছে এখানে, তবু আমায় অনুমতি দাও, এটাকে মুছে ফেলার। যদি না দিই। আমাকে কাঁদাবে তুমি? ঝর ঝর করে শব্দহীন কেঁদে ফেলল সেলিনা। আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, জানিনা কেন মুছে দিতে চাইছো, যে রূপ তোমার আসল রূপ তাকে মুছে দিয়ে কি চাইবে আমার কাছে? জানিনা কি চাইবো? বল না। কথা দাও নারীর সর্বোত্তম অধিকার থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে না। আমি বললাম, নারীর সেই সর্বোত্তম অধিকার কি? ও লাজুক দৃষ্টি হেনে বলল, তার মাতৃত্ব। আমি বললাম সেলিনা কল্পনাকে তুমি কোথায় নিয়ে চলেছো। নারীত্বের শেষ ঠিকানায়। তারপর একটু খানি চুপ করে থেকে

বলল এবার তুমি মুছে দাও লক্ষ্মীটি।

বুঝতে পারছি কেন বারবার ও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে চাইছে। ওতো জানে না হিন্দু নারীর কাছে এই সিঁদুরের মূল্য কত অমূল্য। বললাম, খেয়ালে পরেছো তুমি তাই তুমি ভাবতে পারছ এ বুঝি মুছে দেওয়া যায় সহজে। কিন্তু আজন্ম সংস্কারে লালিত কোন হিন্দু নারীর পক্ষে এযে কত বড় পাপ, তা তুমি ভাবতেও পারবেনা। পাপ? পাপ নয়? জান হিন্দু নারী এক ফোঁটা সিঁথির সিঁদুরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য করতে পার না এমন কিছু নেই। হিন্দু স্বামী যতবড় নিষ্ঠুরই হোক না কেন তার স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর কোন ভাবেই মুছে দিতে পারে না।

কি বুঝলো সেলিনা সেই জানে, আর জোর করল না। কিন্তু কথাও বলল না আমার সাথে। প্রায় ৮টা নাগাদ আমরা পৌঁছিয়ে গেলাম মেদিনীপুর হোটেলের ৪ নং ঘরে। নক করতেই বেরিয়ে এলেন প্রতীম চৌধুরী। সেলিনার দিকে একবার তাকিয়ে তাকালেন আমার দিকে, আর সেই অবকাশে পালিয়ে গেল সেলিনা। প্রতীমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন উদ্ধার করতে পারলে কিছু? হ্যাঁ পেরেছি। রুকসানা নামের মেয়েটিই রেহানা। ও গিয়েছিল ওখানে। বেশ বেশ আর বলতে হবে না। বাকীটা আমি বুঝে নেবো। বরং এই বেলা হাতে মুখে জল দিয়ে ফ্রেস হয়ে এস।

আধ ঘন্টার মধ্যে এলাম তার ঘরে। সেলিনা বাথরুমে গিয়ে ভাল করে চোখেমুখে সাবান দিয়েছে। তারপর ভাজহীন নতুন শাড়ী পরেছে সিঁথি না করে চুলটাকে উল্টে করে আঁচড়ে বেঁধেছে বেনী। চাপা পড়ে গেছে সিঁথির সিঁদুর। তবে তা সে মোছেনি। খুব ভালো করে না তাকালে বোঝা যায় না সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না। আমিও নতুন করে পরেছি পাজামা পাঞ্জাবি। এলাম প্রতীমবাবুর ঘরে।

ডিনার দিয়েছে। খেতে খেতে প্রতীমবাবু জেনে নিলেন মোসলেউদ্দীন সাহেবের ওখানকার সব ঘটনা। তারপর একথা সে কথার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবারতো তুমি এম এ ফাইনাল দেবে তাই না? হ্যাঁ। তোমার পরীক্ষা কবে? বললাম, আর মাস দুয়েক আছে। খুব ভাল কথা, তা তুমিতো আমাদের ওখানে পরীক্ষায় বসবার জন্য দরখাস্ত করে ছিলে, বসবে নাকি পরীক্ষায়। ভাবছি। ভাবছ মানে? মানে পিসি ও মাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। উনি আর কথা না বাড়িয়ে বললেন তাই কর। একটা কথা প্রান্তিক, যদি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দাও আর চাকরিটা হয়, করবে তো? কেন বলুন তো। না ভট্টাচাজ সাহেব বলেছিলেন, কোন একটা কোম্পানী থেকে তুমি নিয়োগ পত্র পেয়ে গেছো তাই আর কি? আমি জানতামনা, কোন নিয়োগ পত্র এসেছে কি না। সেই বহুদিন আগে মিনতি সেন একবার ওনাকে আমার চাকরির কথা বলেছিলেন হয়তো সেটাই হবে। ভট্টাচাজ সাহেব কথা রেখেছেন, আমি বললাম, একটা কিছুতো করতেই হবে। তবে এখনি আমার পক্ষ্যে জয়েন করা কোথাও সম্ভব নয় সামনে পরীক্ষা। প্রতীমবাবু বললেন ভটাচাজ সাহেব নিশ্চয়ই তা জানেন, তাইতো তোমাকে পরীক্ষা শেষে জয়েন করতে বলা হয়েছে।

সেলিনা চুপ চাপ আমাদের কথা শুনছিল, স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে নিজেকে এর মধ্যে

জড়ায়নি একবারও। আমি প্রতীম বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বলেন? উনি বললেন কি ভাবে জিজ্ঞাসা করছ? একজন সত্যি কারের বন্ধুর উপদেশ চাইছো না কর্ম জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কোনটা ভাল জানতে চাইছো? দুটোই। তাহলে তুমি ভট্টাচাজ সাহেবের অফারটা গ্রহণ কর কোন দ্বিধা না রেখে। একটু হতাশ হলাম, ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো বলবেন, তার কোম্পানীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। হতাশ যে হয়েছি তার প্রকাশ আমার চোখে মুখেও বিকশিত হয়েছিল, এই প্রথম তাকিয়ে দেখি সেলিনা মিটি মিটি হাসছে। বললাম তুমি হাসছো যে। সেলিনা যেন সেই পুরোনো সেলিনা। বলল বা চাইলে এক, হল আর এক, হাসবো না? তোমার হতাশা দেখে না আমার ভীষণ করুণা হচ্ছে তোমার ওপর। তারপর প্রতীমবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা কাকু ওর চাকরিটা আমাকে দেওয়া যায় না? এমন সরাসরি তার উপস্থিতিতে কাউকে আঘাত দেওয়া যায় এ বোধ হয় তিনি ভাবেন নি কোন দিন। আর তা ছাড়া একজনের চাকরি তাকে দেওয়া যায় কিনা, এর ভিতর দাবী না অধিকার কোনটা আছে বুঝতে পারেন না প্রতীমবাবু। তার থেকে আরো অবাক হয়ে যান, প্রান্তিক যেখানে বহুবার এসেও যাকে কোন সম্বোধন পর্যন্ত করতে পারেনি, এ মেয়ে সেখানে অনায়াসে কাকু বলে তাকে আপনার করে নিতে পারল। প্রতীমবাবু বললেন, তুমি চাকবি করবে? বাঃ সবার বাঁচার অধিকার আছে আমার নেই? হেসে ফেললেন প্রতীমবাবু। না তোমার সঙ্গে পারবো না। তা তুমি চাকরি করতে চাইছো কেন? ওরা চাকরি করছে কেন? ওরা মানে কারা? ওরা মানে অশ্রুদি, প্রান্তিক ভাই? তোমার কথা ঠিক হল না সেলিনা। অশ্রু করছে, কিন্তু প্রান্তিকতো এখনো করেনি। ওই একই হল আজকে না করলেও কালকে তো করবে। তা হলে তুমি কি বল ওরা চাকরি করবে না? কে খাওয়াবে ওদের? কেন মিনতি পিসি? আবার সেই ভুলে যাওয়া অতীত স্মৃতি। প্রতীমবাবু বুঝতে পারেন। এ মেয়ের মনে ভালবাসার জটিলতা ছাড়া আর কোন জটিলতা নেই। যদি থাকতো তাহলে অন্তত ওনামটা উচ্চারণ করতো না। কথা বাড়ালে গতি কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে চুপ করলেন প্রতীমবাবু। তারপর বললেন তোমার একটা চাকরির দরকার তাইতো। সামান্য হেসে বললেন, আজকে যদি দিই কাল জয়েন করতে পারবে? অবাক হয়ে গেল সেলিনা, বলেন কি ইনি, কি যে উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে মনের অবস্থা সঙ্গিন। এবার জোরে হেসে বললেন প্রতীমবাবু, কি হল মা? তোমারও কি প্রান্তিকের মতন অবস্থা, কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাইতো! কিন্তু না, বুঝেছি মা। একটু আগে বলেছিলে না অশ্রুদির চাকরির দরকার হল কেন? মানুষের জীবনে এমন এমন মুহূর্ত আসে, তখন তার কাছে ওটা ভীষণ জরুরী। অশ্রুর কাছেও তাই ছিল। সে রকম যদি প্রয়োজন মনে করি, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি নিজেই তোমাকে ডেকে নেবো। তারপর হেসে বললেন, পথে আসতে আসতে কি প্রান্তিকের সঙ্গে ঝগড়া করেছো নাকি? করেছি তো। কেন? সব সময় আমার পিছনে লাগে তাই, প্রতীমবাবু শুধু হাসলেন। সেলিনা বলল, আপনি শুধু হাসলেন কাকু, ওকে কিছু বললেন না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলব, তারপর সত্যিই আমাকে বললেন, দেখ প্রান্তিক নিশ্চয়ই ওকে তুমি একদমই বোঝার চেষ্টা করো না। এটা তোমার ঠিক নয়। অযথা ওর

পিছনে লেগো না। আমি মুখে কিছুটা লজ্জা এনে, বললাম তাই হবে।

চলে এলাম ঘরে। আসার আগে প্রতীমবাবু বললেন। এঘর আরো একদিনের জন্য বুকড্ করা আছে। ইচ্ছে করলে তোমরা আরো একদিন থেকে যেতে পারো। আপনি? না আমাকে কাল চলে যেতে হবে। তা হলে আমরাও চলে যাবো। বেশ তা হলে সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরোবো কিন্তু। আচ্ছা।

ঘরে ঢুকেই আমি সেলিনাকে বললাম, দিন দিন তোমার কি হয়েছে বলত? কেন? কেন মানে? আমি তোমার পিছনে লাগি? লাগই তো? কিরকম ভাবে? তুমি প্রতি মুহূর্তে আমাকে জ্বালাতন কর না? আমি তোমাকে জ্বালাতন করি? করই তো! কি ভাবে? নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা কর কি ভাবে জ্বালাও। আমাকে বলছ কেন? বেশ আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। বেশ বলবেনা। আমিও বলব না।

ভীষণ রাগ হতে লাগলো ওর পরে। এমনিতে বুঝতেই পারছিনা যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে তার মীমাংসা হবে কি করে, কি ভাবে ওকে পরিচয় দেব? তায় উল্টো পাল্টা বলেই চলেছে।

আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম, কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়েও পড়লাম। হঠাৎ কানে এলো, ঘরের আসবাব পত্র একবার টেনে এদিকে নিচ্ছেতো আরেকবার ওদিকে আর সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তখনো তাই করেই যাচ্ছে। আমি ভেজানো দরজা খুলে ওর ঘরে গেলাম। বললাম এসব কি হচ্ছে সেলিনা। আমার ইচ্ছে তোমার কি? তোমার ইচ্ছে বলে কি, তুমি অন্যের বিঘ্ন ঘটাতে পার? আমিতো তোমাকে বিরক্ত করছিনা। না তা করছনা, তবে যা করছ তাতে আমি ঘুমাতে পারছি না। ঘুমাতে পারছনা তো জেগে থাকো, কে তোমাকে ঘুমাতে বলেছে। বা তুমি ঘুমাবে না বলেকি আমিও ঘুমাতে পারবো না। আমি তো না বলিনি। বললাম দেখ সেলিনা বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। এই হোটেলে আরো অনেকে আছেন। তারা কে কি ভাবছেন বলতো। তারা ভাবলে আমার উপরে ভাববে, তোমার উপরে তো ভাববেন না সুতরাং তোমার চিন্তা কিসের? আমি একটু জোরে বললাম তুমি এসব করতে পারো না? সিভিক সেন্স বলে একটা জিনিষ আছে। সেটা সকলেই তোমার কাছে আশা করতে পারে। কেউ আশা করল বলেই আমাকে তা দিতে হবে, এমন কোন মাথার দিব্যি আছে নাকি? না তোমার সঙ্গে আর পারা যাবে না। কে তোমাকে পারতে বলেছে? যাও ঘুমিয়ে পড়। আমার ঘুমের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এ ভাবে কথা বলছ কেন? তুমিই বা আমাকে এত রাতে বিরক্ত করছ কেন? আমি নিজেকে যথা সম্ভব সংযত রেখে বললাম সেলিনা, আমি যদি তোমায় বিরক্ত করে থাকি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু এবার ঘুমাও লক্ষ্মীটি। আমার যখন ঘুম আসবে আমি ঘুমাবো, তোমাকে বলতে হবে না। আমি জোর করে বললাম, না এত অবাধ্য তুমি হতে পারো না কেন? কেন আবার কি? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার নাকি? আমি যা ইচ্ছা করিনা কেন তাতে তোমার কি যায় আসে। আসে সেলিনা আসে, কারণ আমি তোমার স্বামী। ও এই কথায় চুপ করে গেল। আমি ওকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ও কোন বাধা দিল না। কিন্তু ভিতরে

ভিতরে যে ফুঁসছে বুঝতে পারছি। আমি নীরবে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। এক সময় ও বলল, তুমি ঘুমোবে না? হ্যাঁ তুমি আগে ঘুমাও তারপর আমি ঘুমোবো। ও বলল, কাল কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। যাবে না মানে কোথায় থাকবে? ভাবছি অশ্রুদির ওঁখানে চলে যাবো। কেন? হঠাৎ অশ্রুকণার ওখানে কেন? আমার এখন তোমার সঙ্গে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছেনা। আমি বললাম বেশ তাই যেও কিন্তু এখন ঘুমাও। ও বলল, আমি ঘুমালে তুমি চলে যাবে নাতো! না যাবোনা। থাকবো তোমার কাছে।

কাল রাতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে সকাল বেলায় চলে যেতে হবে । তাই সেই ভাবেই প্রস্তুত হচ্ছি। প্রতীমবাবু নক করলেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললাম হয়ে গেছে। উনি বললেন সেলিনা কোথায়? বাথরুমে। আচ্ছা ও বেরোলে ওকে নিয়ে এসো। উনি চলে গেলেন। সেলিনাকে বললাম প্রতীমবাবু তাড়া দিয়ে গেছেন। বেশী দেরি করোনা। একটু তাড়াতাড়ি করো। তুমি যাও আমি আসছি।

আমি প্রতীমবাবুর ঘরে আসার মিনিট দশেক পরে ও এলো। কাল রাতে যে ও ওই রকম ব্যবহার করেছে তার কোন চিহ্নই যেন নেই। প্রতীমবাবু বললেন। হঠাৎ কাজ পড়ে গেল, তাই আজও আমার যাওয়া হবে না। তোমরাও বরং আজকের দিনটা থেকে যাও। মেদিনীপুর শহরটাকে তো দেখোনি। ভাল করে দেখে নাও। আমি আর কিছু বললাম না।

পড়াশুনার সত্যি ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিষ পরিস্কার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। এরপর উনি সেলিনাকে বললেন, তোমার যদি আমার সঙ্গে যেতে খারাপ না লাগে তাহলে চলনা আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে। ও বলল কোথায়? কাছেই বেশ চলুন।

ভেবেছিলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করব। কিন্তু কিছুই বলতে পারলামনা। ব্রেকফাষ্ট করে ওনারা বেরিয়ে পড়লেন। আকবর গেল ওদের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কখন ফিরবেন? লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গেছি এসে খাব। সেলিনা আমার দিকে রক্তিম দৃষ্টিতে তাকিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

নির্জন মুহূর্ত গুলোতে আমি একা। নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আমার জীবনে খুব কম এসেছে। আর মানুষ যখন নির্জন মুহূর্ত একা কাটায় , তখন হয় অতীত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, না হয় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুম এলো না। সকালের কাগজ এখানে একটু দেরিতে আসে। সেই কাগজও পড়া শেষ হয়ে গেছে, আজ দশ দিন নীলাঞ্জনা পিসিকে ছেড়ে এসেছি। এতদিন কেন, মাত্র কয়েকটা দিনও তাকে ছেড়ে থাকিনি কলকাতায় আসার পরে। ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে নীলাঞ্জনা পিসিকে। মিনতি সেনকেও মনে পড়ছে। তবু নীলাঞ্জনা পিসির জন্য এক ধরনের অভাব অনুভূত হচ্ছে বারবার। একজনকে গভীর ভাবে ভালবেসেও কি পেলেন জীবনে। মিনতি সেনও পাননি কিছু। নীলাঞ্জনা পিসির জীবন একদিন সত্যি পূর্ণ ছিল, পরে একদিন সবশূণ্য। সেই শূন্যতা তিনি আমাকে আর সেলিনাকে নিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সেলিনা তার জীবনকে যে অর্থে ভরে দিয়েছে আমি তা পারিনি, তবু যে তিনি আমার জন্য ভাবেন, একথা আমি অস্বীকার করব কি করে?

আজ সেলিনাকে অস্বীকার করতে পারবো না কোন ভাবে। মোসলেউদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের, তাতে কারো কোন হাত ছিল না। ঘটনা গুলো এমন ভাবে ঘটে গেছে যে তাকে আমরা আমাদের মত চালিত করতে পারিনি।

সেলিনা হয়তো হিন্দু নারীর সিঁথির সিঁদুরের মূল্য অতো বোঝেনা, কিন্তু আমিতো জানি, আপন পুরুষের হাতে একে দেওয়া ওই রক্তিম সিঁথি কত গরবিনী হতে পারে।

তাই মনে মনে ভাবছি, যদি সত্যি কথাটি বলি অবিশ্বাস হয়তো করবেনা, কিন্তু সবটুকু বিশ্বাস কি করতে পারবেন? কোন প্রশ্ন দেখা দেবেনা মনে? জানি মিনতি সেন হয়তো কিছুই ভাববেন না। কারণ কোন পুরুষের ভালবাসা জাগতিক ভাবে তিনি পাননি কোন দিন। কিন্তু এটাকি সত্যি? প্রতীমবাবুর ভালোবাসা কি তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন না? যদি না করেন তাহলে এমন নির্লিপ্ত থাকেন কি করে।

পরে কোন এক সময় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেলিনা দরজায় একের পর এক করাঘাত করেই চলেছে। চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলে বললাম এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? হ্যাঁ এলাম। কেন? না ভালো লাগছিল না। তাই এক সময় প্রতীমবাবুকে বললাম, কাকু আমি চলে যাব আমার একদম ভাল লাগছেনা। উনি বললেন, আমিও ভাবছিলাম, আকবরকে দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। প্রান্তিক একা আছে। ওকেও নিয়ে আসলে ভাল হতো। ও ভিতরে ঢুকলো। দেখলাম খুব হাসছে ও। আমি বললাম হাসছো যে, না এমনি, কাধের ব্যাগটা আমার বিছানায় ফেলে রেখে ও চলে গেলো নিজেব ঘরে। তারপর বাথরুম থেকে যখন বেরোল একেবারে ফ্রেশ এবং নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে, তখন অবাক হয়ে দেখলাম ওর সিঁথিতে যে সিঁদুরের রক্তিম দাগ ছিল তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে। ব্যাগটা যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই পড়ে আছে। একবার ভেবেছিলাম হয়তো ইচ্ছে করে ফেলে গেছে, দেখা যাক না কি আছে ওর ভিতরে, কিন্তু তবু আজন্ম সংস্কার বাধা দিল। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ও। একটা মানুষ কখনো রাগছে, কখনো অভিমান করছে, কখনো ভালবাসছে ভাবতেও অবাক লাগে। বললাম কি ব্যাপার কোন অলকাপুরীর সন্ধান পেলে নাকি? না তা পাইনি, তবে পাব মনে হয়। মুখে সেই মৃদু হাসি লেগে আছে যা মনকে ছুঁয়ে হৃদয়কে স্পর্শ করে। বলল, আমাকে কেমন লাগছে বলতো? ঠিক তোমার মত, বললাম আমি। ও রাগলোনা বলল, ভুল বললে। ভুল? হ্যাঁ ভুল, তুমি বলতে গিয়েও যা বলতে পারনি ঠিক তেমনি লাগছে আমাকে। তারপর বলল, জান সকালে যখন প্রতীমবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি, শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যেতেই দেখি ফুলওয়ালী ফুল বিক্রী করছে রাস্তার পাশে বাজারে, প্রতীমবাবু বললেন আকবর গাড়ীটা থামাও তো। আকবর গাড়ী থামালেন। উনি বললেন, নাম সেলিনা। আমি নামলাম। ফুলওয়ালীকে বললেন, তোমার এই সমস্ত ফুল ও মালাগুলোর দাম কত? ফুলওয়ালী বললেন পঞ্চাশ টাকা। তিনি পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে দিয়ে বললেন, সেলিনা সব থেকে ভাল মালা ও ফুলগুলো আলাদা করতো। আমি কিছু না ভেবে তাই করলাম। উনি বললেন ওগুলো তোমার ব্যাগে নাও। আমি অবাক হয়ে বললাম কেন? যা তোমার ভাল লেগেছে, তাই নিতে বলছি। কিন্তু এতফুল দিয়ে

আমি কি করব। উনি বললেন, ফুল দিয়ে কি করব বলতে নেই সেলিনা, জীবনের পবিত্রতা খুঁজে নিতে হয় ফুলের পবিত্রতার মধ্যে। তারপর তাড়া লাগালেন চল। আমি বললাম ওগুলো। থাক, তারপর ফুলওয়ালীকে ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন এগুলো তোমাকে দিলাম। উঠে পড়লাম আমরা। রাস্তায় চলতে চলতে ভেবেছি সত্যিই তো উনি আমায় এত ফুল দিলেন কেন?

বললাম মিছিমিছি চিন্তা করছ? একটু ঠাট্টা করবার জন্য বললাম, আসলে তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছেন এই বয়সে তো আর তোমাকে চকেলেট খাওয়াতে পারেনা। আর মূল্যবান কিছু দিতে গেলে সেতো অনেক খরচা। অথচ ফুল, সেতো সবার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা ও যেমন সহজ দান্ করাও সহজ। খরচাও বেশী হল না অথচ পবিত্র করে এমন এক মূল্য তাকে দেওয়া হল এক রাতেই যা বাসী হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য সেলিনা এত বড় কঠিন কথাতেও রাগলনা। তেমনি হাসতে লাগলো। তারপর বলল নাগো মশাই না। আসলে ফুল যে আমার ভাল লাগে, ফুলের গয়নায় যে নিজেকে সাজাতে চাই যে ভাবে হোক তিনি তা জানতে পেরেছেন। তাইতো তিনি ফুলওয়ালীর সর্বোৎকৃষ্ট মালা ও ফুল আমাকে দিয়েছেন। তারপর আমার কাছে এসে বলল। দাওনা গো এই মালা ও ফুলে তোমার ইচ্ছে মতো আমায় সাজিয়ে, বলেই সে এগিয়ে এসে তার ব্যাগ খুলে সেই সব ফুল ও মালা বের করল। আমি বললাম সেলিনা। বল? আমি কি তোমায় সাজাতে পারব? যদি ঠিকমত না পারি?

ঠিক মতো তো তোমায় সাজাতে বলিনি, শুধু বলেছি তোমার মনের মতো সাজিয়ে দাও। তবুও ইতস্তত করছি দেখে বলল, কি গো, সাজাবেনা? সত্যি তুমি সাজবে আমার হাতে? ও আকুল ভাবে বলল, দাওনা সাজিয়ে। বললাম, এখন থাক সেলিনা। কারণ ফুলের সাজে সাজতে গেলে সব সময় সাজা যায় না। তারজন্য বিশেষ সময় আছে? তার মানে তোমার রাগ এখনো মেটেনি। আমি ঘাট মানছি, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার অবাধ্য হবো না বলেও অবাধ্য হয়েছি। বললাম ছি কাল রাতের কথা আমার মনেই নেই। তবে আমাকে সাজাতে তোমার আপত্তি কোথায়?

সাজাব বন্ধু সাজাবো। সাজাবো তোমায় মনের মতন করে।
আসুক সন্ধ্যা আসুক আধার নেমে
শিশির সোহাগে ভিজুক রুক্ষ মাটি।
পেলবতা পাক তপ্ত আকাশ রুদ্রের হুংকার
সাঁঝের আধারে মুছে যাক তটভুমি।
মাটির প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে যদি তখন সাজতে চাও
সাজাবো তোমায় বন্ধু আমার মনের মতন করে।

সেলিনা বলল, কিন্তু ততক্ষণ যদি আমার ইচ্ছেটা মরে যায়, যদি মন আর সাজতে না চায়?

ক্ষতি কি তাতে, মম অনুরাগে রাঙাবো তোমায়

অভিমান যদি করো, অস্তবেলার গোধুলি পরশ দিয়ে

শিশির সোহাগে ভেজাবো তোমায় গভীর অন্ধকারে।

মিথ্যে রাগের ভেলায় ভেসে যদি যাও দূরে সরে

কি হবে উপায় তাই যদি ভাবো মনে, ভেবোনা বন্ধু

. হৃদয় তোমারে নীববে লইবে টেনে, কেমনে পালাবে? আঁখিতে তোমার

নীরবে মাগিছে যাহা, সাধ্য কি আমার ফিরাবো তোমায়

হৃদয় আমার যেখানে শুকিয়ে গেছে, সেইখানে তুমি এসেছো গো বাব বার

শুধু আজ নয় বহুদিন বহুকাল, বহু বরষের সঞ্চিত সাধনায়

তোমার পরশ লাগি উন্মুখ মম মন।

আমি কি ফিরাতে পারি।

সেলিনা বলল, এমন করে বল না, এমন করে তুমি আমায় কাঙাল করে দিও না। তুমিতো বলেছিলে ভিখারিনীকে করুণা করা যায় ভালবাস যায় না। তারপর কাতর ভাবে বলল আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, আমি তোমাকে পেতে চাই। সুদূর বেদী হতে আমি তোমার আর্শীবাদ চাইনা। আমি তোমার শিষ্যা হতে চাইনা। তোমাকে চাই আমার মতন করে।

বললাম, আমাকে তুমি যেমন করে পেতে চাও তেমনি ভাবেই পাবে। পাবে আমাকে তোমার অহংকারের মধ্যে, পাবে তোমার ঘৃণার মধ্যে, তোমার ভালবাসার মধ্যে, তোমার হিংসার মধ্যে। তোমার ঈর্ষার মধ্যে তোমার রাগ ও অনুরাগের বিচরণ ভূমিতে। তোমার বক্ত মাংসের অভিমানে আমাকে তুমি তোমার মত করে বুকে তুলে নাও।

সেলিনা যেন বিজয়িনী আজ। বলল, তাই নিলাম। আমার স্বপ্ন কল্পনা তোমাকে দিয়ে আমি ধন্য হলাম আজ। তারপর ফুলও ফুলের মালা সকলি আমাকে দিয়ে বলল, এগুলো থাক তোমার কাছে, তোমার পরশে গরবিনী হোক ওরা। মালার অলংকারে সাজবার সাধ আমার আর নেই।

ফিরে গেল নিজের ঘরে। পিছু ডাকতে পারলম না। আকবর যে যায়নি বুঝতে পারিনি। ফিরে এলো এক সময়। বলল, সাহেব তখন বলে দিয়েছেন, যদি কোথাও যেতে চান, আমি যেন আপনাদের নিয়ে যাই। বিকালে কোথাও বেরোবেন?

সেলিনা বেরিয়ে এসে বলল, আকবর ভাই, তোমার সাহেব কখন আসবেন? উনিতো আসবেন না আজ। সেকি কই আমাকে তো বলেননি। তাহলে হয়তো ভুলে গেছেন, উনি কাল বিকেলে আসবেন। যেখানে গেছেন, সেখানে অনেক কাজ পড়ে গেছে একদিনে হবে না, তাইতো আমাকে বললেন আপনাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। উনি আসবেন কি করে। উনিতো কাল আসবেন। আমিই নিয়ে আসব। তা হলে আকবর ভাই তুমি আজ

আমাদের সঙ্গে থাকছো তো। আমিতো আছি আপনাদের সঙ্গে। কোথায় থাক? এই হোটেলের নীচ তলায়। এখানে তো সাহেবকে সবাই চেনেন। সাহেব আসতে চাইলে, ৪/৫/৬ এই তিনটি ঘরই তিনি বুকড করেন? কেন? যদি কেউ এসে পড়েন থাকবে কোথায়? তবে সাহেব যখন আসেন তখন কেউ না কেউ সঙ্গে আসেন। আমি আগে আপনাদের দেখিনি এই প্রথম দেখলাম। সাহেবের কোন আত্মীয় স্বজন আছে কিনা জানিনা। সেলিনা বলল আচ্ছা তুমি যাও আকবর ভাই, যদি বেরোই তোমাকে সংবাদ দেব। আচ্ছা বলে আকবর বেরিয়ে যায়।

আমি বলি, সেলিনা, অনেকদিন বাড়ী থেকে এসেছি। বাড়ীর জন্য কোন ভাবনা হচ্ছে না? হচ্ছে বৈকি, সব থেকে ভাবনা হচ্ছে মায়ের জন্য। আর ভীষণ করে তার কথা মনে পড়ছে, কি জানি কেমন আছেন উনি। কারণে অকারণে আমাকে চোখের সামনে দেখতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যায়, তিনি আজ প্রায় ১০ দিন হয়ে গেল, আমাকে দেখতে পাননা। খুব কষ্ট হয় প্রান্তিক ভাই ওনার কথা ভাবলে? তাহলে চল, কাল আমরা চলেই যাই, বললাম আমি। আমারও তাই ইচ্ছে কিন্তু যদি প্রতীমকাকু কিছু মনে করেন। তা করতে পারেন। তাহলে?

তাহলে আর কিছু করার নেই। কালও থাকতে হবে। এই বদ্ধ ঘরে ভাল লাগে বল। অশ্রুকণার সংবাদ নেওয়ার জন্য মিনতি সেন অপেক্ষা করছেন। তিনিও নিশ্চয়ই ভাবছেন অনেক কিছু। আর জানতো প্রিয়জনের মন সব সময় খারাপটাই ভাবে। তারপর বললাম, চলনা এখান থেকে আমরা আমাদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসি। আমাকে নিয়ে? কেন অসুবিধা আছে? কি পরিচয় দেবে? কেন তোমার যা পরিচয়। তুমিতো নতুন যাচ্ছ না। একটু হাসলো সেলিনা। নতুন যাচ্ছি না বলেই তো তোমার অস্বস্তি বাড়বে। কোন পরিচয়ই আমার দিতে পারবেনা। শুধু তোমার অসহায় রূপটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখতে হবে। বুঝলাম না তোমার কথা। ও বলল, আচ্ছা, গ্রামে গিয়ে তোমার মনটা কোথায় ছিল বলতো? মানে? কেউ কি তোমায় কিছু বলেনি? কে কি বলবে। গ্রামের লোকেরা, তোমার বন্ধু বান্ধব, তোমার আত্মীয়স্বজন। আমি বললাম একটু ভালো করে বলতো সেলিনা। সত্যি আমি বুঝতে পারছিনা। ও আমার কোন কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আমাদের যাওয়ার আগে, তোমাদের গ্রামে শুধু নয় তোমাদের বাড়ীতেও গিয়েছিল রেহানা, তাই না। আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। একথাতো ওর জানার কথা নয়? বললাম, রেহানা যদি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকবে, তাহলে এখানে খুঁজতে এলাম কেন? সেলিনা বলল, এটা আমার উত্তর নয়। আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল মাত্র। গিয়েছিল কি না তুমি হ্যাঁ, বা না বল। বললাম আমি জানি না ও বলল মিথ্যে কথা বলছ। বুঝতে পারছি সত্যি কথা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বললাম, জানি না আজ এতদিন পরে একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তারপর বললাম হ্যাঁ একটা মেয়ে গিয়েছিল আমাদের গ্রামে শুধু নয়, আমাদের বাড়ীতেও। কিন্তু সে রেহানা কি না আমার বাবা জানেন না। তিনি ভেবেছিলেন মাষ্টারমশায়ের কোন আত্মীয়া হবে। ওকে ভীষণ ভালো লেগেছিল আমার বাবার, তাই পরের দিন আবার মাষ্টারমশাইদের

বাড়ীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন ও চলে গেছে। নিজের পরিচয় গোপন করেই যে গিয়েছিল। শুধু শেষবেলায় মাষ্টার মশাই জানতে চেয়েছিলেন, তুমি কে মা? কি তোমার আসল পরিচয়? বলেছিল আমি 'রেহানা' কিন্তু তারপর সে যে ট্রেনের কোন কামরায় গিয়ে উঠলো মাষ্টারমশাই আর তাকে খুঁজে পাননি। তাই তিনি বাবাকে বলেছিলেন, আমি নিজেই তার ঠিকানা জানি না আপনাকে কি ঠিকানা দেবো সীতাংশুবাবু। তবে ও মেয়ে চলে গেলেও আবার সে আসবে, আসলেই আপনার কাছে নিয়ে যাবো। এব থেকে বেশী আমি কিছু জানিনা সেলিনা। সে কেন গিয়েছিল, কেন হারিয়ে গেল, কোন উত্তরই আমার জানা নেই।

মুগ্ধ শ্রোতার মত শুনল সেলিনা তারপর বলল, অথচ একথা তুমি আমায় বলনি। না বলিনি, শুধু তোমাকে কেন, কাউকে বলিনি, কেন বলিনি জানিনা। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তুমি কি করে আমায এড়িয়ে গেছ। বলতে চাইলাম ঠিক এড়িয়ে যাওয়া নয় সেলিনা। আসলে যার সত্যটাই জানিনা। সেকথা বলে অকারণ সন্দেহের দোলায় দুলে কি লাভ? আমি ইচ্ছে করে তোমাকে লুকিয়েছি এটা ঠিক নয়। বরং কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে নিজেকে বুঝিয়েছি, যদি ও আসে আবার, মাষ্টাবমশাই জানাবেন, তার আগে বেশী আগ্রহ দেখিয়ে যদি তার আসার আশাটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তোমাকে নিয়ে গেলে কেন অস্বস্তি হবে সেটাতো বললে না? হবে বললাম, কিন্তু কেন হবে এটা তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। সেই হেঁয়ালি। ও বলল হেঁয়ালি শুধু আমার নয়। তুমি বলেছো আমার যা পরিচয় তুমি তা দেবে? বলতো কি আমার পরিচয়? বাঃ তুমি, সেলিনা, এটাই কি যথেষ্ট নয় তোমাকে পরিচিত করার। না যথেষ্ট নয়। সেলিনা একটা নাম, সেলিনা কোন পরিচয় নয়। তার থেকে বড় কথা, মা, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আমার মেয়ে সেলিনা। গ্রামের মানুষের ঔৎসুক্য তাতে নষ্ট হবে কেন? তারা বলেছিলেন নাম বলছো সেলিনা রহমান অথচ তোমার মেয়ে, তাহলে কি তোমার নাম নীলাঞ্জনা রহমান? মা আঘাত পেয়েছিলেন। বললেন, তাতে যদি তোমাদের ওর পরিচয় বুঝতে সুবিধা হয়, তাহলে আমি নীলাঞ্জনা রহমান। তোমরা মান বা না মান, ও আমার মেয়ে, এটাই ওর এক মাত্র পরিচয়। অবশ্য তারপর আমাকে ডেকে বললেন , কালই চলে যেতে চাই। আমি বললাম, তাই চল মা। আমারও ভাল লাগছেনা। জিজ্ঞাসা করলাম, মিনতি সেন জানেন ব্যাপারটা। না জানার তো কথা নয়? কারণ তিনি তো তখন ওখানেই ছিলেন।

নিজের অজ্ঞতার জন্য নিজের উপরেই ধিক্কার হচ্ছিল। এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে অথচ আমি জানি না। বললাম খুবই দুঃখের সেলিনা। তোমার কোথায় আঘাত বুঝি আমি, কিন্তু আমার বাবা বা মা তোমাকে কিছু বলেছেন? তোমার বাবার সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় নি। মায়ের সঙ্গে? হ্যাঁ হয়েছিল। তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছেন? ও একটু রেগে গিয়ে বলল তুমি কি জানতে চাইছো আমার কাছে বলত? আমি কি তোমার বাবা-মায়ের কথা বলেছি? না বলনি, তবে এত দিন পরে অতীতে কি ঘটেছিল তাই যখন বলতে পারছো তখনতো আমার জানতে হবে আমার কি করণীয়? তুমি কি আমার জন্য তোমার আপন জনের সঙ্গে ঝগড়া করবে? আমি উস্মা ভরে বললাম, কে আমার আপন

জন তুমি না ওরা? ও বলল থাক ও সব কথা । অযথা নিজেদের সুন্দর মুহূর্তকে নষ্ট করে দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া শুধু স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে তো জীবন হয় না। তীব্র বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব স্বপ্ন আর কল্পনা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই বলছি ওসব কথা ভেবে লাভ কি? বরং ভাবা যাক নিজেদের কথা। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা। ভাবা যাক আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি। নিজেদের প্রশ্ন করে দেখা যাক, যা হয়েছি তাই কি চেয়েছিলাম।

কোথায় যেন আঘাত পেয়েছে সেলিনা। আমি কি নিজের অসতর্কে কোন আঘাত দিয়েছি? কি জানি, বললাম, হঠাৎ মনে হচ্ছে তুমি দার্শনিক হয়ে গেলে। ও বলল এক অর্থে দার্শনিক তো আমরা সবাই। যে কিছু ভাবনা ও চিন্তা করে, সে নিজের সম্পর্কে হোক বা অন্য কাউকে নিয়েই হোক সেই তো দার্শনিক।

কথা বলতে বলতে সময় গড়িয়ে চলেছে। হোটেল বয় দরজায় নক করে লাঞ্চ দিয়ে গেল। খেতে খেতে ওকে বললাম, আজতো প্রতীমবাবু আসবেন না। আকবরও থাকবে আমাদের সঙ্গে, চলনা দীঘা থেকে ঘুরে আসি। তটভূমি ব্যাপী ঝাউবন সামনে সীমাহীন সমুদ্র। ও বলল, সত্যি যাবে তুমি। যদি তুমি যাও।

আকববকে বললাম। ও বলল, বিকালে বেরিয়ে তো ফিরে আসা যাবে না। আজ ওখানে থেকে কাল যদি আসি। হয়তো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সাহেব তো দীঘার ঠিকানা জানবেন না। যদি প্রয়োজন হয় কোথায় সংবাদ পাঠাবেন? বললাম তাও তো ঠিক। তাহলে থাক। আশাহতের বেদনা ফুটে উঠে সেলিনার চোখে মুখে। আকবর বলল, অন্য কোথাও গেলে বলবেন। আমি নিচেই আছি। সাহেব যদি এখানে থাকতেন, তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না। ও চলে গেলে আমি বললাম সেলিনা, চলনা বিকালে মেদিনীপুর শহরটা ঘুরে দেখি। না আমার কিছু ভাল লাগছেনা। তাহলে কি করবে? কেন যে প্রতীমকাকু আমাদের এখানে আটকে রেখেছেন জানিনা। আজতো চলে যেতে পারতাম। হঠাৎ বললেন, আজ নয় কাল। এখন বলছেন কাল নয় পরশু। এর থেকে অশ্রুদির ওখানে থাকলেও ভাল হতো। উনিতো বলতে পারতেন আমরা যেন চলে যাই। এমনতো দূর নয়।

সত্যিই তো এমন কিছু দূর নয়। কাল বললেন আজ ব্রেকফাষ্ট করেই চলে যাবেন। পরে বললেন হঠাৎ কাজ পড়ে গেছে আজ যাওয়া হবে না, এখন আবার বলছেন কালও যাওয়া হবে না। কি জানি কি কাজ।

যাওয়াতো হলোই না, এমনকি বিকালে শহরটা ঘুরে দেখার আশাও ত্যাগ করতে হল সেলিনার অনিচ্ছার জন্য। শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম বিকাল থেকে সন্ধ্যা। তারপর এক সময় রাত হয়। ডিনারের ঠিক আগে আগে আকবর বলে, সাহেব লোক পাঠিয়েছেন, এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে উনি আছেন। বলে পাঠিয়েছেন আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সকাল ৮ টায় ওখানে ওনার সঙ্গে ব্রেকফাষ্টে যোগ দিতে। সেলিনা বলল আকবর ভাই জায়গাটা কোথায়? আকবর বলল, শহর থেকে বেরিয়ে নাক বরাবর উত্তরে যে রাস্তাটা চলে গেছে ওই রাস্তা ধরে এগোলে পড়বে। জায়গাটার নাম কি? কোন নাম নেই। আসলে ধূ ধূ প্রান্তর। সাহেবদের ম্যানেজমেন্ট ওখানে একটা ইউনিট খুলবেন তারই

তদরকি হচ্ছে। অফিস, কর্মীদের বাসস্থানের জন্য মাটি কাটা এই সব চলছে আর কি? ভাল লাগবে চলুন না। দেখতে পাবেন কি উৎসাহ নিয়ে সকলে কাজ করছেন যেন কর্মযজ্ঞ। [illegible] জানতে চাইল সকালে কটায় যেতে হবে। আকবর বলল ছটার মধ্যে প্রস্তুত থাকবেন, আমি এসে ডাকব।

রাত প্রায় ১০টা বেজে গেছে। ঘুম আসছেনা, অথচ দুপুরে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম শুধু নয়, দেখিয়েছিলাম, তা কেমন মিইয়ে গেছে। যে আবেগ নিয়ে ওকে নিজের মত সাজাবার যে বায়না ধরেছিল আমার কাছে, এবং কথাও দিয়েছিলাম, উভয় পক্ষের প্রস্তুতির অভাবে তা হাওয়াই ফানুসের মত কোথায় মিলিয়ে গেল। এইই হয়। সেলিমা বলেছিল, তখন হয়তো ইচ্ছেটাই যাবে মরে। বলেছিলাম, যাক না, আমার অনুরাগে সাজাবো তোমায়। কিন্তু কেন পারছিনা। কেন বলতে পারছিনা, এস সেলিনা, ফুল সম্ভারে সাজাবো তোমায়। কিন্তু কোন কথাই বলার জোর যেন হারিয়ে ফেলেছি। এক সময় বাথরুমে যেতে গিয়ে উকি মারলাম ওর ঘরে। বললাম ঘুমাওনি। ঘুম যে আসছেনা। তাহলে এস আমার ঘরে। কেন? আমারও যে ঘুম আসছেনা। ও বলল, এতে ঘুমের কোন দোষ নেই, ঘুম আর আসবেনা। শুধু আজ নয়, কতরাত যে ঘুম আসবেনা কে জানে? আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওর বিছানায় গিয়ে বসলাম, জানতে চাইলাম একথা বলছ কেন? আমি শুধু বলছি না ভাবছি। কেন অমূলক এসব নিয়ে ভাবছ? তুমি ভাবছ না? কই নাতো। মিথ্যে কথা। তারপর বলল কে জানে কবে তুমি সত্যি কথা বলতে পারবে। তারপর একটু থেমে বলল, জান, আমার কেবলি মনে হয় এই ১০টা দিন তোমার আমার জীবনের সব থেকে অভিশপ্ত মুহূর্ত। আমি অবাক হয়ে বললাম এসব কি বলছ তুমি। ও বলল, সত্যি বলছি। এতদিন তোমাকে মনে মনে চাইলেও, আমার বিভিন্ন আচরণে তা প্রকাশ পেলেও এমন ভাবেতো কখনো বাইরে আসেনি। এমন ভাবেতো উজাড় করে নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিইনি, যা ছিল কেবল গোপন, মধুর স্মৃতিতে যা ছিল আলোকিত, তাই এল বাস্তবের রুক্ষতায়, হারালো তার পেলবতা। আজ যেমন এগিয়ে যাওয়ারও পথ নেই, পিছিয়ে আসার পথও বন্ধ। আপন শিকলে বন্দিনী আমি। আমি বললাম। এসব কি আবোল তাবোল ভাবছো সেলিনা। জীবনের এই মুহূর্তটুকুকে তুমি অভিশপ্ত বলছ? যা আমরা চেয়েছিলাম এই মুক্তিতে তো তারই প্রকাশ ঘটল। তবু বলবে তুমি অভিশপ্ত? ও বলল, আমরা নয়, বল, আমি যা চেয়েছিলাম। অভিমানে আমি বললাম তুমি চেয়েছিলে আর আমি চাইনি? না চাওনি। তোমার দরজা বন্ধই ছিল, আজও বন্ধ আছে। মাঝে মাঝে শুধু একটু ফাক করে উকি মেরে দেখেছো নীল আকাশে কোন মেঘের ঘনঘটা আছে কিনা। আমি ওর আরো কাছে এগিয়ে একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, তোমাকে কি করে বোঝাবো সেলিনা, আমার মন কেমন করে চেয়েছে তোমাকে। ও বলল জানি মাঝে মাঝে মনেও হয়েছে। তোমার একটা মন তীব্র ভাবে আমাকে চেয়েছে, তাইতো তার চুম্বক আর্কষণে বার বার তোমার কাছে এসেছি? কিন্তু এবার বলত সত্যি কি তুমি চেয়েছো কখনো? গ্রহণ করতে পেরেছো আমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে? পারনি। আর পারবেও না। এটা কোন আদর্শের অজুহাত নয়। যে

যৌবন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত খোঁজে মিলতে, মেলাতে পেরেও যদি তা ব্যর্থ হয়ে যায়, কি কৈফিয়ত দেবে? আমি বললাম, সেকি শুধু আমার দোষ? না দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ আমার অবাস্তব আকাঙ্খার, তাইতো তোমার নিজেব হাতে সিঁথি রাঙিয়ে দিলেও তুমি কিন্তু আমার হলে না। নিজেকে সবটুকু তুলে দেওয়া সত্ত্বেও নিতে পারলে না। নারীর সর্বোত্তম মাতৃত্বের অধিকার চেয়েও পেলাম না এরপরও বলবে আমি তো তোমার সেলিনা। যে নাবী সর্বস্ব উজাড় করে তোমাকে দিতে চাইলো তার কৌমার্য্য, কি সহজ অবহেলায় সরিয়ে রাখলে তুমি তা, তবু বলবে, জীবন অভিশপ্ত নয়? জানি তুমি হয়তো বলবে, এস সেলিনা, সব চাওয়া পাওয়ার আসান হোক আজ। যদি মুহূর্তের দুর্বলতায় তোমার সাগরে অবগাহন করি সারা জীবন ভরে যে কষ্ট তুমি বয়ে বেড়াবে কেমন করে সইবো তা। না আমি তা পারবো না, তার থেকে আমার একটা অনুরোধ রাখবে? আমি বললাম, কোন অনুরোধই তোমার রাখব না সেলিনা। যদি না, বলা কথাগুলো তুমি ফিরিয়ে না নাও। ও বলল অবুঝ হয়ো না। ত্যাগ শুধু রেহানাই করতে পারে না সেলিনাও পারে। আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে অশ্রুদির প্রেম তোমার হৃদয় জুড়ে থাকবে তা আমি হতে দেবো না। রেহানা যদি আসে ভালো না হলে অশ্রুদিকে তোমার জন্য রেখে দিয়ে আমি চলে যাবো। চলে যাবে? হ্যাঁ চলে যাবো। কোথায়? প্রতীমকাকুকে বলেছি, তিনি নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি আর পারালাম না। পুরুষের সংযমের সমস্ত বাধ প্রবল বন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। ওকে বুঝতে না দিয়ে ওর সমস্ত দেহটা আমার বুকের পরে তুলে নিয়ে পেষনে পেষনে নিষ্পোষিত করতে চাইলাম ওকে। আর কণ্ঠদিয়ে শুধু নিঃসারিত হলো, কেন আমাকে বোঝনা, কেন এভাবে আঘাত দাও। কেন বোঝনা সকলকে ছাড়তে পারলেও তোমাকে ছাড়তে পারার কোন উপায় নেই। এত নিষ্ঠুর কেন তুমি? ও বলল, ছাড় আমাকে এ ভাবে নিজেকে ছোট করোনা। মন যা চায় না, জোর করে তা নিতে যেওনা। কোন ভাবেই তুমি ছোট হয়ে যাও, এ আমি চাই না। এইটুকু অহংকারকে অন্তত তুমি বাঁচিয়ে রাখতে দাও। ওকে ছেড়ে দিয়ে চোখের জলে বললাম বুঝতে পারিনি সেলিনা। তুমিও আমার কেউ নও। তাই হোক তুমি সুখী হও।

পা চলছেনা। তবু কোন ভাবে ওর কাছ থেকে যেন পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে। সারা রাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে দিলাম। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করতে লাগলাম। কাল যেন ওর সঙ্গে যেতে না হয়। সকাল রাতের ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। কাল যে আকবর বলে গিয়েছিল সকাল ৬টার মধ্যে প্রস্তুত থাকতে। ভুলে গেলাম তা। সেলিনার হাতের স্পর্শে চোখ মেলে তাকালাম। হাসছে ও, সকালে স্নান করেছে। পরেছে মনোয়ারা বেগমের দেঁওয়া লাল শাড়ী। হাতে গলিয়েছে এয়োতির চিহ্ন নোয়া, যা এসেই খুলে রেখেছিল। পরিপাটি করে সিঁদুর দিয়েছে সিঁথিতে। চোখে দিয়েছে কাজল। লাল টিপ পরেছে দুই ভ্রুর মাঝে। নিজের হাতে রচিত বেনীতে কালকের কেনা যুইয়ের মালা জড়িয়ে নিয়েছে, হাতে শুভ্র গোলাপ। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। এটা যেন বিভ্রান্ত স্মৃতিতে ভুলেছে তার পথ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একি অপরূপা এলে তুমি আজ

দুয়ারে আমার

গভীর রাতের আঁধার পেরিয়ে

একি তর অভিসার

চোখের কাজলে

বিদ্যুৎ হানি করেছ কি

অনুমান -

হৃদয় আমার উন্মুখ

কেন কাঁপে বুক

অকারণ।

কাঁটার আঘাতে বিক্ষত মন

সেকি তবে অভিমান?

ও বলল, উঠবেনা? কটা বাজে জান? এখনিতো আকবর আসবে। মনে পড়ে যায়, কাল রাতের সব ঘটনা। এইকি তবে সেই সেলিনা। যে অশ্রুকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিল। জীবনে এমন বিচিত্র রূপিনী কোন নারীকে দেখেছি বলে মনে পড়েনা। বললাম একদম ইচ্ছে করছে না। ওকে ফিরে যেতে বল। সে হয় না। তারপর বলল, বার বার ব্যর্থ হয়েছি আমি। আজ আমি জয়ী হতে চাই, ওঠো, বলে ও আমার হাত ধরে টেনে তুললো। আর সেই সময় ওকে কাছে টানতে গেলে বলল, স্নান করে এসো আগে। আমি ওর কথারই প্রতিধ্বনি করে বললাম ততক্ষণ যদি এই মনটা মরে যায়। মরবেনা। আমি আছি এখানে তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আমি বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোলাম। নতুন একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবী আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল। এটা পরে নাও। বললাম কোথায় পেলে। বলল ও কাল আকবরের সঙ্গে বাজারে গিয়ে নিজের হাতে কিনেছি। কারো জন্য আমার প্রথম কিছু কেনা। আমি নিলাম। তারপর ভিতরে গিয়ে ওটা পরে বেরোলাম। ও আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, কি দেব তোমায় বল। আমার ক্ষুদ্রতা তোমাকে দিতে পারি না, আমার নীচতা তোমাকে আঘাত করতে পারে। আমার অহংকার তোমাকে অহংকারী করতে পাবে। তাই নিজেকে তুলে দিলাম তোমার হাতে। জানলাটা খোলা ছিল সেই দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ দেখ পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, এখনি সূর্য্য উঠবে, ঐ সূর্যকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বরণ করে নিলাম আজ প্রভাত বেলায়। বলেই কালকের কেনা সেই অপূর্ব রজনী গন্ধার মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল কিছু দেবে না? মনষে কর্ত্ত কিছু দিতে চাইছিল, তার হদিশ কি করে করব। বেনীতে ফুল গুজে দিয়ে আমার তৃষ্ণাব্যাকুল ওষ্ট দুটি নামিয়ে নিয়ে এলাম ওর অধর প্রান্তে। না কোন বাঁধা দিল না। যেন যুগ যুগান্ত ধরে যে তৃষ্ণার স্রোত বয়ে চলেছে দুই পাহাড়ী নদীতে, হঠাৎ তা জলস্ফীতিতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তটভূমি, আঘাত করতে উদ্যত যখন, তটভূমি প্রান্তর, হঠাৎ বন্যার আশঙ্কায়

যখন প্রতিটি মুহূর্তের অধীর প্রতীক্ষা, দরজায় নকের পর নক করে ডেকে চলল আকবর। সাহেব ছটা বেজে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি করুণ। সাহেবের ব্রেকফাস্ট করতে দেরি হয়ে যাবে। ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, আসছি আকবর তুমি গাড়ীতে যাও।

হাসছে ও। মৃদু হাসির তরঙ্গে যেন দুলে উঠছে মন। চাইছে নিবিড় করে সর্বস্ব উজাড় করে তাকে পেতে। ভগ্ন সারথী আমি পেলাম না আজো তাকে, জানিনা, সবটুকু পেতে আর কত কাল অপেক্ষা করতে হবে। ও তখনো একটা হাত ধরে আছে। বললাম, আকবর গাড়ীতে আছে চল। ও বলল, যাব তুমি তার আগে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও। বললাম কেন? দাঁড়াওনা। ওর কথা মত দাঁড়ালাম। ও হাটুভেঙে নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল। উঠে বলল, আশীর্বাদ করলে.না। করেছি? কি আর্শীবাদ করলে। ওটা গোপন বলতে নেই। তুমি না বলতে পারলেও তোমাকে প্রণাম করে কি চেয়েছি তোমার কাছে জানতে ইচ্ছে করছেনা? গভীর উৎসাহে বললাম, কি চেয়েছো? ও বলল আমার মাতৃত্বে তোমার রক্তের উত্তরাধিকার। তখনো, মিটি মিটি হাসছে সেলিনা। আমি বললাম, সে যোগ্যতা যদি আমার থাকে, তোমাকেই সেই অধিকার দিযে ধন্য হব আমি। তারপর একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমরা।

কতদিন, কত ভাবেই তো দেখেছি ওকে। কখনো চঞ্চলা হরিণী। কখনো অভিমানিনী, কখনো বা নিষ্ঠুর নিয়তি হিসাবে। আর এই রূপেতো প্রথম দেখেছিলাম তাকে মোনোয়ারা বেগমের ঘরে। নব বধুকে সাজিয়ে যেন বাসর ঘরে পাঠিয়েছেন তিনি। ওরই অনুরোধে ওর সিঁথি আমি অলক্তরাগে রাঙিয়ে দিয়েছিলাম। আজ সেজেছে ও নিজে। যেন নিজের অধিকারে সচেতন এক গরবিনী। যে মালায় বরণ করেছিল আমাকে। এখনো তা ওর গলায় শোভা পাচ্ছে। কি অপূর্ব যে লাগছে ওকে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছিনা। বলল, কি দেখছো অমন করে। বললাম নারীর রূপ থেকে রূপান্তরে উত্তরণ। বন্ধু থেকে প্রেয়সী সেখান থেকে তোমার এই বধূরূপ এর যে ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা কেমন করে বোঝাবো সেই অপরূপাকে। এরপর বললাম সেলিনা, বল তো কেমন করে জীবনে ঘটাও এই রূপান্তর। ও বলল জানি না। তার পর আমার হাতটা ওর নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, আমাকে তোমার ভাল লাগছে? কেমন করে জানাবো তোমায় কেমন লাগছে তোমাকে? জানতো কবিগুরু বলেছিলেন - বিয়ের বাসরের আড়ম্বর বিলীন হয়ে যায় একসময়, কিন্তু বাজে যে সানাইয়ের সুর তার রেশটুকু থাকে আজীবন। এই যে অপরূপা তুমি, সানাই না বাজলেও যে সুর বাজছে আমার মনে তাই চির অমলিন হয়ে থাকবে আমার শেষ যাত্রার দিন পর্যন্ত। কিন্তু? আজ আর কোন কিন্তু নয় সেলিনা। আজ আর কোন বিরূপ মন্তব্যে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি আর ভালো লাগার রেশটুকু নষ্ট করে দিওনা। তুমি যখন আঘাত দাও, হৃদয়ের কোথায় গিয়ে তা বাজে যদি হৃদয় চিরে তা দেখাতে পারতাম। এমন করে বলো না। আমি জানি, শুধু যে জ্বালায় নিজে জ্বলছি তারই আগুনটুকু পাও তুমি। জ্বালাতো পাও না। তুমি দেখতে পাওনা তাই। যদি দেখতে পেতে এমন করে জ্বালাতে পারতেনা। জানিগো জানি, বলল সেলিনা। তবু ভয় হয়। যে স্বপ্নে তোমায় আমি ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি, স্বপ্নের মরিচিকার মত তা

মিলিয়ে যাবে নাতো? বললাম কেন এত ভয় পাও। কাকে ভয় পাও তুমি। নিজেকেই ভয় পাই সব থেকে বেশী। যন্ত্রণার কীটগুলো আমাকে যখন মুহুমুহুঃ দংশন করে, আমি পাগল হয়ে যাই। ভাবি, যদি তোমার আত্মীয় স্বজন আমায় গ্রহণ না করে। নাইবা করলো সেলিনা। আমি তো করেছি? সবই বুঝলাম, কিন্তু এইভাবে দাঁড়াবো কি করে তোমার পিসি মানে আমার মায়ের কাছে। মিনতি পিসির কাছে। বললাম মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সেলিনা। তুমি তো কোন অন্যায় করোনি। দুটি হৃদয় ভালবেসে কাছে এসেছে, দুটি যৌবন একসাথে ভেসে যেতে চেয়েছে এতে তো লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু এই সমাজ। আমি বললাম, সমাজতো মানুষ সৃষ্টি করেনি। মানুষই তার প্রয়োজনে বানিয়েছে সমাজ। আবার প্রয়োজনে তাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়বে। সেই সমাজের কারিগর হিসাবে আমরা শুধু আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করে যাবো। সব থেকে বড় কথা সেলিনা, এমন করে কোনদিন বুঝতে পারিনি, রেহানাকে নয়, অশ্রুকণাকেও নয় আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম। ও আমার দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, পেয়েছো কি আমায়? আর কোন ভুল হবে না সেলিনা। হাজার চেষ্টায় আজ আর তুমি পালাতে পারবে না। তারপর বললাম, যে বাঁধনে বেধেছি তোমায় সে তো তোমার কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে এখনো, যে সিঁদুর মুছে ফেলতে চেয়েছিলে দৃপ্ততায় তাতেই রাঙিয়েছো সিঁথি। সে তো তোমার অধিকার। তাইতো চলার পথে ভুলের ঠিকানা হারিয়ে গেছে কখন নিজেও জানো না। সত্যি কি তাই? হ্যাঁ সত্যি।

গাড়ীটা থেমে গেল এক সময়। চারিদিকে সবুজ মাঠ। মাটি কাটা হচ্ছে একটু দূরে। আকবর বলল এসে গেছি সাহেব। এবার নামতে হবে। গাড়ী আর যাবে না? জিজ্ঞাসা করলাম আমি। বলল না। সামান্য পথ হাঁটতে হবে। আকবর আগে। আমি তারপরে, আর আমার হাত ধরে আছে সেলিনা। আমরা এগিয়ে চলেছি। আমি সেলিনার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর হাতে নোয়া। পরনে লাল শাড়ী, যেন বিজয়িনী চলেছেন দিগ্বিজয় করে।

প্রতীমবাবু বেরিয়ে এলেন। সেলিনার দিকে তাকালেন উৎসুক দৃষ্টিতে। তারপর আমাকে বললেন কোন অসুবিধা হয়নি তো। বললাম না। সেলিনা বলল, কাকু একটু দাঁড়ান না। অবাক হয়ে দাঁড়ালেন প্রতীমবাবু। সেলিনা ওই ভাবে প্রতীমবাবুকে প্রণাম করল। তারপর বলল, আর্শীবাদ করলেন না। বললেন করেছি মা। কি আর্শীবাদ করলেন। উনি বললেন যে সত্যের সন্ধান তুমি পেয়েছো তা যেন তোমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়। সেলিনা বলল, তা হলে আপনি বলছেন এতদিন যা আমি চেয়েছি তা আমি পেয়েছি? পেয়েছো যে তারতো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমার ঐ রক্তিম সিঁথি, তোমার হাতের নোয়া, তোমার লাল শাড়ী। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো সেলিনা। তাহলে আপনি আমাকে মেনে নিচ্ছেন তো। প্রতীমবাবু বললেন, আমি মানার কে মা? তোমার হৃদয় তোমার আকাঙ্খা পেয়েছে পরিণতি। মেনেছে তোমার মন। কিন্তু একটা কথা জানকি সেলিনা? বলুন। হিন্দু নারীর কাছে সিঁথির সিঁদুরের মূল্য যে কি অমূল্য, জানি না সে ধারণা তোমার আছে কি না। যদি খেয়ালে ও সিঁদুর ধারণ না করে থাকো, তাহলে আমি আর্শীবাদ করছি তুমি সীমন্তনী হও। লজ্জা ও নম্রতায় সেলিনা বলল,

আপনার ইচ্ছেকে যেন যোগ্য মর্যাদা দিতে পারি।

তারপর আর কোন কথা না বলে, তাড়া লাগালো, কাকু এবার বসে যান, আমি ব্রেকফাষ্ট পরিবেশন করছি। তুমি করবে? কেন বেয়ারা তো করতে পারে? তা পারে কিন্তু ওকে আজ ছুটি দিয়ে দিন। তা হলে দুপুরে খাবে কি? কেন আমি রান্না করব, আজ আপনি ও আপনার সহকর্মীরাই হোন না আমার ও আমাদের অতিথি। প্রতীমবাবু মৃদু হেসে বললেন তাই হোক মা। তারপর নিজের গলার মূল্যবান সোনার চেনটি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ তো আর কিছু নেই মা। সেলিনা কেঁদে ফেলল, প্রতীমবাবু বললেন ভয় নেই মা। যত ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক জীবনে, আমি থাকবো তোমাদের পাশে, আর সেই সময় আমি নীচু হয়ে ওনাকে প্রণাম করলাম।

সারাটা দিন কেটেছে এক গভীর আনন্দে। জীবনে কোন স্মৃতিতো মুছে ফেলার নয়। সন্ধ্যার আগে ফিরছি এক সঙ্গে। হিন্দু বধুর কি ভাবে চলা উচিত, কি তাদের করা উচিত এই সব নিয়ে জ্ঞান দিতে দিতে এলেন প্রতীমবাবু।

রাতের ডিনারের পরে সেলিনা চলে গেছে ঘরে। প্রতীমবাবু বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি প্রান্তিক, যদি কিছু মনে না করো। বলুন? যা তোমরা করেছো আমি নিজেও চেয়েছিলাম তোমাদের জীবনে এটা ঘটুক, কিন্তু এ তোমাদের হঠাৎ খেয়াল নয়তো। একথা বলছেন যে। উনি বললেন না এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। তবু যদি কিছু মনে না কর তাহলে বলবে কি কেন এ কাজ তোমাদের করতে হল হঠাৎ? আমি বললাম আপনি কি আমাদের জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছেন? না প্রান্তিক, আমি তোমাদের একজন শুভাকাঙ্খী। তবু তোমরা যা করলে, তার জন্য আমি তো আমার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। কেন? প্রতীমবাবু বললেন, আমি তোমাদের এখানে আসতে বলেছিলাম। অবশ্য তার জন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে যাই হোক । এখানে আসার পরে তোমরা যা করলে তার জন্য কারো কারো কাছে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন তো আমায় হতেই হবে। কেন তোমরা সকলকে এড়িয়ে এ কাজ করলে। যদি অসুবিধা না থাকে বলা যাবে কি? বললাম, আপনাকে বলতে চেয়েছি বারবার, কিন্তু সেই মুহূর্তটুকু তৈরি করা যায় নি। এবার মনে হয় বলা যেতে পারে। বলে যা যা ঘঠেছিল সব বললাম ওনাকে। উনি অবাক হয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, কিন্তু তোমার মা যখন শুনবেন হয়তো আঘাতও পেতে পারেন, কি বলবে তাকে? শুধু মা নয়, আঘাত তো পেতে পারেন আমার পিসিও, তাইতো এ দায়িত্ব আমরা আপনাকে গ্রহণ করতে বলছি। আমাকে বলছ? হ্যাঁ কাকু, আপনাকেই বলছি, কারণ আমি জানি, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আপনার উপর আমার মা ও পিসির আছে, তাতে এক মাত্র আপনিই পারেন সবকিছুকে ঠিকঠাক মত পরিচালিত করতে। একটা কথা শুধু আপনাকে বলতে পারি, আবেগ ও রোমান্টিক স্বপ্ন ও কল্পনা আমাদের যেখানেই ভাসিয়ে নিয়ে যাকনা কেন, আমি ও সেলিনা আপনাকে কথা দিচ্ছি, তারা গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিশীলিত সংযম আমাদের রক্ষা করবে। উনি বললেন জানি। এ বিশ্বাস তোমাদের উপর আছে। কিন্তু যদি এমন হয় যে তোমাদের কোন ভাবেই এই অবস্থায় গ্রহণ করতে পারলেন না কেউই। কি হবে?

খেয়াল করিনি কখন এসে দাঁড়িয়েছে সেলিনা পিছনে। প্রতীমবাবু ও খেয়াল করেন নি। সেলিনা বলল এমন অবস্থার মুখোমুখি হতে হলে, জানি আপনি দুঃখ পাবেন, তবু আপনাকে কথা দিচ্ছি কাকু, আমি সরে যাবো। আমি আমার সত্যকে নিয়ে একা একা পথ চলবো। কিন্তু আজ আর জীবন থেকে এসব মুছে ফেলার উপায় নেই কাকু। জানি মা, জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে সারা জীবন দিয়ে তার দেনা শোধ করতে হয়। সেলিনা বলল তাই করব, তবু আজ আর প্রান্তিকের জীবন থেকে সরে যেতে বলবেন না, পারবো না, বলে প্রতীমবাবুর পায়ের উপরে উপুড় হয়ে বসে পড়ল সেলিনা। আর তিনি তার মাথায় নীরবে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সব বুঝি মা। কিন্তু আমিতো প্রান্তিকের কেউ নই। হয়তো ঠিক অথবা ঠিক নয়। কিন্তু যা ঘটেছে তাতো আমরা ইচ্ছে করে ঘটাইনি, আর যে ভাবেই হোক ঘটে যা গেছে তা অস্বীকার করব কি করে। তারপর বলল, সবার প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রান্তিকের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিরব কাল, কিন্তু যদি সত্যিই আশ্রয়হীন হই, আপনি দেবেন না আমাদের আশ্রয়। বলুন কাকু দেবেন না?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রতীমবাবু বললেন, আশ্রয়হীনতো হওনি। যদি হও, আমার দরজা তোমাদের জন্য চিরদিন খোলা থাকবে মা। শুধু একটা কথা দাও, জীবনে যদি সেই দুঃসময় আসে কখনো, আমাকে না জানিয়ে কোথাও যাবেনা তোমরা। আমি ও সেলিনা প্রায় একসঙ্গে উচ্চারণ করলাম, তাই হবে কাকু।

একটা দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাটে রাত। কতবারই চেষ্টা করেছি স্বাভাবিক হতে, পারিনি, বলতে গেলে সারারাত চোখের জল ফেলেছি। সেলিনা কোনদিন ভাবেনি, তার ভিতর আছে এমনি একটি নরম মন, তার অন্তরেও বাস করে এমন এক ভীরু নারী, যে নিজে পথ চেনে না। আমার হাত ধরেই সে পথ চিনতে চায়।

এক সময় শেষ হয় রাত। ও আমার বুকের উপর থেকে উঠে গিয়ে স্নান করে। তারপর অশ্রুকণার দামী শাড়ীতে সাজায় নিজেকে। তাড়া লাগায় আমাকেও স্নান করবার জন্য। আমি স্নান করে এলে, মোসলেউদ্দীন সাহেবের দেওয়া ধুতি ও পাঞ্জাবী তুলে দেয় আমার হাতে, বলে পরে এস। তাই করে এলে, সিঁদুরের কৌটোটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে, জানিনা প্রান্তিক জীবনে আর কোনদিন তোমাকে এমন করে পাব কিনা। তাই তোমার দেওয়া সিঁদুরে আরেক বার রাঙিয়ে দাও আমার সিঁথি। নীরবে তাই করলাম প্রতিবাদ না করে। তারপর আমাকে ও আবারও প্রণাম করে বলল, মা যদি গ্রহণ না করেন, কথা দাও প্রান্তিক, আমাকে গ্রহন করবার জন্য মাকে তুমি অনুরোধ করবে না। বললাম সেলিনা। এই শেষ বারের মতো তোমার অবাধ্য হচ্ছি প্রান্তিক, তোমাকে কথা দিতেই হবে। আমার জন্য তুমি কারো কাছে কোন অনুরোধ জানাবে না। দুঃখে বুক ভেঙে যাচ্ছে, তবু বললাম, তাই হবে সেলিনা।

ফেরার পথে কত কথাই মনে হয়েছে। কত স্মৃতি ভেসে আসছে। কত মান-অভিমান, রাগ অনুরাগের খেয়া পেরিয়ে এই যেখানে এসেছি সেই কি তবে শেষ ঠিকানা? সন্দেহের দোলায় দোলে মন। আবেগে কণ্ঠ আসে রুদ্ধ হয়ে। আজ পর্যন্ত কেউ তো আমায় অস্বীকার

করেনি। কেউতো বলেনি, না, সেলিনা তোমার জীবনে আসতে পারেনা। আমার পিসিতো চেয়েছিলেন এই যেন হয়। মিনতি সেন সন্দেহের দোলায় দুললেও কখনো এটা ঘটতে দেবেন না এটাতো মনে হয়নি। অশ্রুকণাতো সেলিনাকে গ্রহণ করার জন্য বারবার বলেছে, তপতীতো তার হৃদয় দিয়ে বুঝেছে সেলিনার গভীর প্রেমের অনুভূতি। কে জানে রেহানা হয়তো এমনি কিছু অনুমান করে গভীর অভিমানে সরে গেছে কি না।

যখন হাওড়ায় এসে নেমেছি, সেলিনা বলল, বাড়ীতে এখনি ফিরবে? কেন? মিনতি পিসিকে একটা ফোন করলে হয় না? বুঝতে পারছি নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতায় তার ভীরু মন বার বার কেঁপে উঠছে। যাদের ভালবাসা জীবনকে এই খানে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে, যারা কখনো বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি, কেমন করে এ ঔদ্ধত্য তাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে। বললাম, ফোন করে কি বলব? ও বলল, ফোনটা ধরে আমাকে দাও। যা বলার আমি বলব। তুমি? হ্যাঁ আমি। কারণ, যা কিছু ঘটেছে তার সব দায়িত্ব আমার। বেশ, বলে স্টেশন থেকে মিনতি সেনকে ধরলাম হ্যালো? মিনতি সেন ইজ স্পিকিং। মা আমি প্রান্তিক বলছি। কোথা থেকে? হাওড়া থেকে। তাহলে বাড়ী না এসে ফোন করছিস যে, কখন পৌঁছালি? সেলিনা তোমার সঙ্গে কথা বলবে মা। দে হ্যালো? কে সেলিনা? হ্যাঁ, মা, বল আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবেতো মা। সে কি কথা সেলিনা। কি অন্যায় করেছিস যে ক্ষমা করার প্রশ্ন আসছে? আমার অন্যায়ের কোন সীমা নেই মা! বারে মেয়ে, কি যে করলি তাইতো বুঝতে পারছিনা, অথচ ক্ষমা চেয়ে চলেছিস। অন্যায়, সে ছোট বা বড় যেমনই হোকনা কেন, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি না তাই বল। যদি না পারি। তা হলে এমুখ আর তোমাদের দেখাবো না। এখান থেকে দুচোখ যে দিকে যায় চলে যাব। মিনতি সেন বললেন তুই যখন বলতে পারবিনা, তা হলে প্রান্তিককে দে, ওর কাছে জিজ্ঞাসা করি কি অন্যায় করেছিস। তার মানে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই তাই না মা। বেশ দিচ্ছি প্রান্তিককে, ধর, আর আমিও চলে যাচ্ছি। ব্যথায় কেঁদে ওঠে মিনতি সেনের বুক বললেন, সেলিনা। কোথায় সেলিনা? তার আগে ও আমার হাতে ফোন দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। মিনতি সেন বললেন, কি এমন তোরা করেছিস যে আমার ক্ষমা না পেলে ওকে চলে যেতে হবে। আমি ধীরে ধীরে বললাম, মা, একদিনতো রেহানাকে তুমি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলে। আজ কি পারবেনা সেই জায়গায় সেলিনাকে জায়গা দিতে। মিনতি সেন বললেন, প্রান্তিক, আমি গর্ভে ধারণ না করেও তোদের মা। তোর মা, রেহানার মা, আর আজ থেকে সেলিনারও মা। মা কি পারে অনুতপ্ত সন্তানের অন্যায়কে ক্ষমা না করে? তোরা অনেক কথা বলেছিস। কিন্তু কি অন্যায় করেছিস সেটা শুধু বলিসনি। ঠিক আছে, আমি আসছি, তোরা অপেক্ষা কর ওয়েটিং রুমে। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো। ছেড়ে দিলেন ফোন মিনতি সেন।

সেলিনা বলল, আমিতো তোমায় বলেছিলাম আমার জন্য তুমি কাউকে কিছু বলবেনা। কোন অনুরোধ করবে না। তুমি কথা দিয়েছিলে, কিন্তু রাখলে না সে কথা। ব্যথায় যেন ভারি হয়ে ওঠে বুক। বললাম হ্যাঁ কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার জন্য তো কিছু বলিনি

সেলিনা তাছাড়া অবুঝ হয়ো না। মিনতি সেন তো জানে না কিছুই। কেন তার প্রতি এই ভুল ধারণা করছ। সেলিনা বলল না প্রান্তিক আমি চলে যাবো। আমি একটু রেগে গিয়ে বললাম তুমি কি ইচ্ছে করলে যেতে পার নাকি। না পারিনা তোমার অমতে আজ আমি কিছুই পারিনা। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমায় বাধা দেবে না। কি ভাবে জানলে আমি বাধা দেবো না। এতদিন তো বাধা দাওনি। এতদিন আর আজকের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই? জানিনা। যদি না জান তাহলে মিনতি সেনের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে কেন? দেখ সেলিনা, তোমার হাতের নোয়া তোমাব সিঁথির সিঁদুর, তোমার কপালের ওই রক্তিম টিপ সব কিছু জ্বল জ্বল করে জানিয়ে দিচ্ছে, আজ স্বেচ্ছায় তুমি কিছু করতে পার না। আজ তুমি আমার স্ত্রী সেলিনা। সাক্ষী মনোয়ারা বেগম, মোসলেউদ্দীন সাহেব, আকবর, আর সব থেকে বড় সাক্ষী প্রতীমবাবু নিজে। এই সব কিছুকে অস্বীকার করে পারবে তুমি চলে যেতে আমাকে ছেড়ে? না পারবো না, কোন ভাবেই পারবো না। আমাকে তুমি পথ বলে দাও আমি কি করব। বললাম, তুমিতো পথ হারাওনি, যদি সত্যি কোন দিন পথ হারিয়ে ফেল, আমি থাকব· তোমাকে পথ দেখানোর জন্য। সত্যি প্রান্তিক! হ্যাঁ সেলিনা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকব তোমার পাশে। আবেগকে গাঢ় করে সেলিনা বলল, বিশ্বাস কর প্রান্তিক, তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে এই চিন্তা আমায় পাগল করে দিচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে বলত। আমি সবে বলতে আরম্ভ করেছি যুগ যুগ ধরে বহমান সংসার আর ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিনতি সেন। আমার কাঁধ থেকে ওর মাথাটা তুলে দিয়ে বললাম, দেখ সেলিনা, তোমাকে নিতে মা এসেছেন। সেলিনা উঠে গিয়ে মিনতি সেনকে প্রণাম করতেই, তাকে দু হাতে তুলে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, ওরে পাগলি মেয়ে, কোন অভিমানে পালিয়ে যেতে চাইছিস? আমার ক্ষমা পাবিনা বলে? ওরে পাগলী তোদের সব কথা অশ্রুকণা জানিয়েছে আমাকে।

ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে আমরা যখন পৌঁছালাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলে। জবার মা বলল কি সুন্দর মানিয়েছে বৌদিমনি তোমাকে? সেলিনা লজ্জা পেল এবং জবার মায়ের উত্তরে শুধু হাসল। মিনতি সেন নীলাঞ্জনার অফিসে ফোন করে বললেন নীলাঞ্জনা তুমি অফিস ফেরৎ আমাদের এখানে অবশ্য এস। নীলাঞ্জনা বলল, এত তাড়া কিসের? ছেলে এসেছে নাকি? মিনতি সেন বললেন শুধু ছেলে নয় ছেলের বৌও এসেছে। আসতে ভুল করোনা কিন্তু। অবাক হয়ে নীলাঞ্জনা বললেন, বৌ মানে কে? অশ্রু? এসেই দেখনা কে? কাকে বৌ হলে তোমার সুবিধা হয়। দেখ ছেলে তোমার, কাকে বৌ করবে সে তোমার ব্যাপার, আমার মেয়েটি এসেছে কি না তাই বল। এইতো মাত্র কদিন, তবু মনে হচ্ছে কতযুগ যেন দেখিনা ওকে? ওকি এসেছে? দাও না ওকে? মিনতি সেন বলল, দিচ্ছি ভাই দিচ্ছি, বলে হাক ছাড়লেন, সেলিনা তোর মা ডাকছে, যাই মা বলে এগিয়ে এসে ফোন ধরল সেলিনা। বলল, মা আমি সেলিনা বলছি। তবু ভালো, ফিরে এসেছিস আমিতো ভাবলাম, কোন বনে জঙ্গলে গেছিস বাঘের পেটে গেছিস কি না কে জানে? বাঘের পেটে কেন যাবো মা। ওখানেতো অশ্রুদি ছিল। নীলাঞ্জনা বললেন হ্যারে, শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক অশ্রুকেই বিয়ে

করল। একবার আমার কথা মনে করলনা। আমি কি বাধা দিতাম? সেলিনা বলল, অশ্রুদি তো থেমে গিয়ে আবার বলল, প্রান্তিক কাকে বিয়ে করে ঘরে আনবে সেতো তার ব্যাপার, তুমি আসছো তো! নীলাঞ্জনা বললেন প্রান্তিক তাহলে শেষ পর্যন্ত অশ্রুকেই বিয়ে করল! কণ্ঠে তার অভিমান। সেলিনা বলল, যাকে তার ভাল লেগেছে তাকেই সে বিয়ে করেছে। এতে তোমার আমার কি বলার আছে। তা ঠিক, তারপর বললেন, অশ্রুকে বধূর সাজে খুব সুন্দর মানিয়েছে তাইনা। তুমি এলেই দেখতে পাবে কেমন মানিয়েছে। নীলাঞ্জনা বললেন আমি না হয় পিসি আমাকে বলার দরকার মনে করেনি। তাই বলে মিনতি মানে ওর মাকেও বলল না। অশ্রুর বাবা-মা গিয়ে ছিলেন? মিটি মিটি হাসছে সেলিনা। বলল, তুমি কি সব সংবাদ ফোনেই নেবে নাকি? এসেই যা জানার, জেনে নাও না। নীলাঞ্জনা তবু আরো বললেন, তোর খুব মন খারাপ তাই না? আর তোকে না হয় ও নাই বা মেনে নিল, তাই বলে রেহানার কথা একবারও ভাবলনা। হয়তো ভেবেছিল, তারপর বলল, ওকে ডেকে দেবো? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, না দরকার নেই। তাহলে তুমি আসছো তো? তুই চলে আয় তারপর এক সঙ্গে না হয় যাবো। সেলিনা বলল, পুরানো হলেও নতুন বৌ তো। তুমি নতুন বৌকে কিছু দেবেনা? দিতে তো হবেই। তুই বলনা, কি দেওয়া যায়। আমার মনে হয় একগুচ্ছ ফুল দিলে সব থেকে ভালো হয়। তাই হয় নাকি? হাজার হোক, প্রান্তিকতো আমার ছেলের মতন। নারে তা হয় না। তবে কি দেবে? সেই জন্যই তো তোকে আসতে বলছি। তাহলে তোমার ভাইপোকেও নিয়ে আসি কি বল? তা কি করে হবে মা, নতুন বৌকে ছেড়ে ও একা আসবে কি করে? নারে ও পাগলামি করিসনে। তার থেকে আমিই আসছি। কখন আসবে? কতদিন তোমাকে দেখিনা, ভীষণ তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে মা। মনে হচ্ছে এখনই ছুটে যাই তোমার কাছে, ক্ষমা চাই আমার অন্যায়ের। আর তোর অন্যায়। তুই আবার কি অন্যায় করলি? অন্যায় যদি কেউ করে থাকে সে প্রান্তিক করেছে। এখনতো মিনতিই ওর সব। আমি কে? আমার দুঃখ ব্যথায় ওর কি যায় আসে? ও কিন্তু তা বলেনা মা। বলছিল তুমি যা করেছো ওর জন্য পৃথিবীতে কেউ নাকি তা করেনি। বানিয়ে বলছিসনা তো। ওর হয়ে বানিয়ে বলতে যাবো কেন? যা ও বলেছে তাই বললাম। তাই যদি হতো, তা হলে ও মিনতির ওখানে না উঠে আমার কাছেই আসতো। আমিতো মিনতির কাছে শোনামাত্র ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে আর কথাই বলব না। তা হ্যাঁরে তুই ভাল ছিলিতো। হ্যাঁ মা ভীষণ ভালো ছিলাম। অশ্রুদি ভীষণ যত্ন করেছে আমাদের। এতকথা ফোনে হয় না, তুমি এসো না? বেশ আমি আসবো। নতুন বৌকে যা হোক একটা কিছু দিতে তো হবে। দিয়েই চলে আসবো। তুইও কিন্তু চলে আসবি। তোকে আমি আর ওখানে থাকতে দেব না। বেশ তাই হবে, আগে তুমি এসোতো।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে নীলাঞ্জনা এলেন। গাড়ী করেই এলেন। সেলিনাকে নিয়ে যাবেন, তাই গাড়ী নিয়ে আসা। ইদানীং বেশ কিছুদিন হলো অফিস থেকে গাড়ী পেয়েছেন নীলাঞ্জনা। তবে সাধারণত অফিসের কাজের বাইরে গাড়ী ব্যবহার করেন না উনি। সুন্দর ফুলের বাস্কেট, আর দামী সোনার হার নতুন বৌকে দেবেন বলে নিয়ে এসেছেন নীলাঞ্জনা।

গাড়ীর হর্ণের শব্দে মিনতি সেন বেরিয়ে এসে দেখেন নীলাঞ্জনা। আরে তুমি? হ্যাঁ এলাম। তা বাড়ীতে একটা উৎসব উৎসব মনে হচ্ছে। আর কাউকে বলেছো নাকি? কয়েকজনকে বলেছি নীলাঞ্জনা। যারা আমার সুখ দুঃখের সঙ্গে সব সময় থাকে তাদের না বলে পারলাম না। তুমি তোমার ছেলের অন্যায়কে সমর্থন করলে? ছেলের অন্যায়? না নীলাঞ্জনা প্রান্তিক যে কোন অন্যায় করতে পারে না, সেতো তুমি ভাল করে জান। অন্যায় নয়? রেহানাকে ভালবেসে অন্যকে বিয়ে করা অন্যায নয? তুমি কি ঝগড়া করবে? তারপর বললেন হ্যাঁ, রেহানাকে ও সত্যি ভালবাসতো, তাই বলে যাকে ও বিয়ে করেছে তাকে ও ভালবাসে না, একথা তোমাকে কে বলেছে? হযতো বাসে, তবে একদিন কিন্তু ও বলেছিল, না ওকে ও ভালবাসে না, বলেছিল নাকি? কবে? তুমি আর ন্যাকামো করোনা মিনতি। যাক গে বৌমাকে ডাক। আমি আর্শীব্বাদ করেই চলে যাবো। আর সেই সঙ্গে সেলিনাকেও ডাকো, ওকে আমি নিয়ে যাবো। মিনতি সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন নীলাঞ্জনার দিকে। বলে কি নীলাঞ্জনা। ওকি তবে সত্যি জানেনা প্রান্তিক কাকে বিয়ে করেছে? ব্যারিষ্টার ভট্টাচার্জ সাহেব এসে ঢুকলেন সেই সময়। নীলাঞ্জনাকে দেখে বললেন, এনাকে তো চিনতে পারলাম না মিস সেন। ইনি প্রান্তিকের পিসি। ও নমস্কার, আমি সুরেশ ভট্টাচার্য বটতলার উকিল। নীলাঞ্জনা বললেন বটতলার উকিল যে এ বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেতে পারেন না, সে আমি জানি উকিল সাহেব।, কিন্তু সঙ্গে এটি কে? মেয়ে? হ্যাঁ আমার মেয়ে শান্তা। শান্তা এগিয়ে এসে নীলাঞ্জনাকে প্রণাম করল। মিনতিকেও করল। দীর্ঘজীবি হও মা। তা উকিল সাহেব গিন্নী কই? আছে কোথাও চিন্তা করবেন না দেখা হয়ে যাবে। অধৈর্য্য হয়ে নীলাঞ্জনা বললেন কি হলো মিনতি ছেলে ছেলের বৌকে ডাক। মিনতি, ভট্টাচার্জ সাহেবকে বললেন, আপনি উপরে যান ভট্টাচার্জ সাহেব। আপনার কাকা আসবেন না? আসবেন তবে একটু দেরি হবে জানিয়েছেন। মিনতি সেন নীলাঞ্জনার হাত ধরে বললেন, অভিমান করো না ভাই, এতে ওরা দুঃখ পাবে? নীলাঞ্জনা বললেন, আমি না হয় পিসি মিনতি, কিন্তু এই আমি না থাকলে, ওকে কে চিনতো। সেই আমায় এতবড় আঘাত দিল? আমি জানিনা কি ভাবে ও তোমাকে আঘাত দিয়েছে। জান না? না না জানার ভান করছ মিনতি? ঠিক আছে, ও সেলিনাকে বিয়ে করবে না তাই বলে রেহানার জন্য অপেক্ষা না করে অশ্রুকে বিয়ে করতে হবে? এরপর আমি সেলিনার মুখের দিকে তাকাবো কি করে বলতো? এতক্ষণে মিনতি সেনের বোধ গম্য হয় নীলাঞ্জনার রাগের কারণ। কিন্তু রহস্য উন্মোচন না করে বলেন। অশ্রুওতো তোমার মেয়ের মতন, ওকেই মনে করো না তোমার সেলিনা। তাই মনে করতে হবে মিনতি, উপায় কি বল। দেখি প্রতীমবাবুকে বলব, অশ্রুরতো চাকরি প্রয়োজন নেই অশ্রুর চাকরিটা যদি সেলিনাকে দেন। প্রতীমবাবুর নাম শুনতেই চুপ হয়ে গেলেন মিনতি। বললেন তাই বলো। কিন্তু আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ কি? আজকের দিনে ওনাকে নিমন্ত্রণ করোনি মিনতি? মিনতি সেন তাড়া লাগিয়ে বললেন তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে? এস ভিতরে এসো। প্রান্তিক ও তার বৌ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক সেই সময় বাইরে গাড়ী থামার শব্দ হল। আকবর হেটে এলেন হাতে একগাদা উপহার নিয়ে, এসে

বললেন, গাড়ীতে সাহেব বসে আছেন। প্রান্তিক সাহেবকে, একবার ডেকে দেবেন? মিনতি বললেন, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলামনা কে আপনি? আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আকবর। তারপর বললেন, প্রান্তিক সাহেব আসতে না পারলে, অন্তত একবার সেলিনা মেম' সাহেবকে বলুন না আসতে। সাহেব একবার তাকে ডেকেছেন। সেলিনার নাম শুনে চমকে উঠলেন নীলাঞ্জনা। বললেন, তোমার সাহেব এদের চেনেন? কেন চিনবেন না এই কয়কদিন তো ওনারা চৌধুরী সাহেবের কাছেই ছিলেন। কে চৌধুরী সাহেব? উষ্মা প্রকাশ করে বললেন মিনতি সেন। আকবর বলল, সেকি? আপনারা চৌধুরী সাহেবকে চেনেন না। সুর এ্যান্ড সুর কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার প্রতীম চৌধুরী? তিনি গাড়ীতে বসে আছেন কি অন্যায় কথা বলত। তার পর নীলাঞ্জনা আকবরকে বললেন যাও না ভাই প্রতীমবাবুকে উপরে ডেকে নিয়ে এসো। আকবর এগিয়ে গেলে নীলাঞ্জনা বললেন, মিনতি তোমার বাড়ীতে এসেছেন, তোমার কিন্তু একবার যাওয়া উচিত। মিনতি এব কোন প্রতিবাদ না করে বললেন, আমি প্রান্তিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি। না তার দরকার নেই মিনতি, আমিই যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ভাই অনুরোধ সেদিনের মত ব্যবহার করো না। চেষ্টা করবো, তুমি ওনাকে নিয়ে ওপরে এসো।

প্রতীমবাবু বললেন নমস্কার নীলাঞ্জনা দেবী, কেমন আছেন? ভাল আছি। নমস্কার। তারপর বললেন আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি আমাকে আপনি চিনতে পারবেন। তা হয়তো ঠিক। তবে আমার স্মৃতি শক্তি খুব একটা প্রখর নয়তো। তাই চিনেও না চেনার ভান করতে পারি না। অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেন নীলাঞ্জনা। বলেন, যারা চিনেও না চেনার ভান করেন হয়তো তার কোন গূঢ় অর্থ থাকতে পারে। আমাকে কিন্তু দয়া করে সেই দলে ফেলবেন না। না ফেলতে পারলেতো ভালো হয় কিন্তু কখন যে কোন দলে ভীড়ে যাবেন কে জানে? আর একটা কথা, আমার আসাতে যদি কোন অস্বস্তি হয়, তা হলে দয়া করে প্রান্তিক বা সেলিনাকে একটু ডেকে দিন না। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেই চলে যাবো। নীলাঞ্জনা বললেন অস্বস্তি হওয়া বা কারও তো কিছু মনে করার নেই প্রতীমবাবু। বরং অনেক লজ্জার হাত থেকে আপনি যেমন বাঁচিয়েছেন তেমনি অনেক অপ্রস্তুত হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা করেছেন, আর সেই আপনি গাড়ীতে বসে থেকে এদের সঙ্গে কথা বলে চলে যাবেন তা হয় নাকি? না ঠিক তা নয়। আসলে সেলিনার করুণ মুখের কথা মনে করে আমি না এসে পারলাম না। তারপর বললেন দেখেছেন ওকে নববধুর বেশে? কি অপূর্ব মানিয়েছে ওকে? অবাক হয়ে নীলাঞ্জনা বলে মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি। সেলিনা নববধু এসব কি বলছেন আপনি? প্রতীমবাবু বললেন আপনি এখনো দেখেন নি ওদের? না এখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রান্তিক বা অশ্রুকণা এদেরতো নতুন ভাবে দেখার কিছু নেই। নীলাঞ্জনা ও প্রতীমবাবু হাটতে হাটতে নীচের বসার ঘর পর্যন্ত এলেন। তারপর প্রতীমবাবু বললেন, দাঁড়ান নীলাঞ্জনা দেবী, মনে হচ্ছে আপনি কিছুই জানেন না। না জানার তো কিছু নেই। তাহলে অশ্রুকণার কথা উঠছে কেন? যতদুর জানি, অশ্রুকণা এখানে আসেই নি। আসেনি মানে? তাহলে প্রান্তিক কাকে বিয়ে করেছে? সেই জন্যইতো বলেছিলাম নবরধুর

অপূর্ব সাজে দেখেছেন সেলিনাকে? মানে প্রান্তিক সেলিনাকে বিয়ে করেছে? প্রতীমবাবু বললেন, ঘটনা চক্রে যা ঘটে গেছে তাকে ঠিক বিয়ে বলা যায় না, বলা যেতে পারে মুহূর্তের অভিনয়। কিন্তু অভিনয় ওতো কারো কারো জীবনে সত্য হয়। ওদের জীবনেও তাই হয়েছে। সেলিনাতো আপনার মেয়ে, একবার দেখবেন না নববধূর সাজ তার পূর্ণ হল কি না। নীলাঞ্জনার তখন নিজের কাছে নিজেকে এত অপমানিত লাগে যে, বললেন কোন দরকার নেই প্রতীমবাবু। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। হঠাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা আসছে কেন? আসছে এই জন্য যে আমি ব্যাপারটা জানিনা। আর আপনি তা জানিয়েছেন বলে। তারপর অশ্রুর জন্য যে উপহার এনেছিলেন। তাই প্রতীমবাবুর হাতে দিয়ে বললেন। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন প্রতীমবাবু? বলুন। ওটা ওর হাতে দিয়ে বলবেন ওর মা ওকে বুক ভরে আর্শীবাদ করেছেন, তবু আমি থাকতে পারছিনা। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন প্রতীমবাবু। বললেন নীলাঞ্জনা দেবী। নীলাঞ্জনা বললেন অনেক বিশ্বাস নিয়ে এটা আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আর যদি সম্ভব হয় কাল একবার আসবেন, আপনাকে আমার একটা ইচ্ছের কথা জানিয়ে যাবো।

নীলাঞ্জনা ও প্রতীমবাবুর দেরি দেখে মিনতি সেন এদিকেই আসছিলেন, হঠাৎ প্রতীমবাবুকে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, এলেনই যদি তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে কেন? উপরে যাবেন না? হ্যাঁ যাবো। তা আপনি কেমন আছেন মিনতি দেবী। ভালো, আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাল আছি, আর ভাল না থেকে কোন উপায়ও নেই মিনতি দেবী। এই দেখুননা কি কথা বলতেই, নীলাঞ্জনা দেবী তার সমস্ত উপহার আমার হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো যেন আমি সেলিনাকে দিয়ে বলি তার মায়ের বুক ভরা আর্শীবাদ রইল এর সাথে। তারপর চলে গেলেন। অনেক করে বোঝাতে চাইলাম, কিন্তু চলেই গেলেন নীলাঞ্জনা দেবী। সুতরাং বলতেই হবে ভাল আছি। এবার চলুন একবার উপরে যাওয়া যাক। চলুন। মিনতি সেন ওনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, যে ঘরে আছে, সেলিনা ও প্রান্তিক।

দেখতে দেখতে দলবল নিয়ে হৈ হৈ করে এলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব। সামনে প্রতীমবাবুকে দেখে বললেন আপনি? মিনতি সেন বললেন উনি প্রতীম চৌধুরী, প্রান্তিকের কাকা। আজকের দিনে আমাদের বিশেষ অতিথি, আপনি কথা বলুন কাকু, আমি আসছি। কমিশনার সাহেবের গলা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ব্যরিষ্টার ভট্টচার্জ সাহেব। কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পরে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি মি: চৌধুরী কখন এলেন? এই সবে মাত্র। কমিশনার সাহেব জানতে চাইলেন ভট্টাচার্জ সাহেব আপনি চেনেন নাকি একে। চিনি বৈকি, উকিল মানুষ। মক্কেলকে হাত ছাড়া করতে নেই। তারপর একটু হেসে বললেন, আপনিও চেনেন, তবে পুলিশি কর্ম ব্যস্ততায় ভুলে গেছেন এই যা। তবু। বললেন কমিশনার সাহেব। ব্যরিষ্টার ভট্টাচার্জ বললেন, উনি সুর এন্ড সুর কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার প্রতীম চৌধুরী। কমিশনার সাহেবের যেন হঠাৎ সব মনে পড়ে গেছে, বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, কয়েক দিন ধরেতো কাগজে নামও দেখেছি। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সমাজেরও যাতে উন্নতি হয় তার জন্য ওর অক্লান্ত চেষ্টার কথা। কয়েকদিন

ধরে কাগজে বেরিয়েছে কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় হয়ে ওঠে নি। একটু চিন্তা করে বললেন মনে হচ্ছে কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি। অনেকটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ভট্টাচার্জ সাহেব বললেন, তা অনেক সময় হয়। হঠাৎ হঠাৎ কিছুতেই মনে করা যায় না, তারপর আবার সব মনে পড়ে যায়। তাই বলছিলাম এখন আর ও সব ভেবে লাভ নেই। যখন মনে পড়বে, তখন দেখা যাবে। এখন চলুন ওপরে। আচ্ছা তাই চলুন বললেন কমিশনার সাহেব। আজ বিয়েও নয়, ফুলশয্যাও নয় তবু কেন মিনতি সেন আমাদের উপরের ঘরে প্রায় বন্দী করে রেখেছেন কে জানে?

খুব দামী শাড়ী পরেছে সেলিনা। মিনতি সেন তার সমস্ত মূল্যবান গয়না দিয়ে সাজিয়েছেন ওকে। হাতে এয়োতির চিহ্ন নোয়া যেমন আছে তেমনি আছে আরো অসংখ্য অলংকার। সিঁথির সিঁদুর ভোরের সূর্যের মত উজ্জ্বল। বেনীতে জড়িয়েছে বেল ও যুইয়ের মালা। উজ্জ্বল তিনটি লাল গোলাপ একেবারে উৎস মূলে। আমি পরেছি মূল্যবান পাজামা পাঞ্জবি। মিনতি সেনের বিরাট হল ঘরে আরো অনেকের সঙ্গে আমরা গল্পে মেতে আছি। শান্তার সঙ্গে খুব অল্প সময়ে মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায় সেলিনার। এত লোককে যে বলেছেন মিনতি সেন ভাবতে পারিনি। শুধু অভাব বোধ করছিলাম, অশ্রুকণা ও তপতীর। পিসিতো আসবেই জানা কথা।

আরেকটা ব্যাপারে মনটা বিষন্নতায় ভরে উঠেছে তাহলো আমার বাবা-মা। জানিনা তারা কেমন ভাবে নেবেন আমাকে। ভাগ্যের চাকা এমন ভাবে ঘুরে গেছে যে, আমি যেন আর ওদেব ছেলে নই। ওদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমার আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। তবু বিশ্বাস আছে — গ্রামের সমাজ আমাদের গ্রহণ করতে না পারার জন্য বাবা-মাও হয়তো চোখের জল ফেলবেন সমাজকে অস্বীকার করতে না পারার জন্য। তবু তাদের আর্শীবাদ থেকে হয়তো বা বঞ্চিত হবো না।

কমিশনার সাহেব এসে দাড়ালেন সামনে। আমি ও সেলিনা প্রণাম করলে, কমিশনার সাহেব তাকে আর্শীবাদ করে মিনতি সেনকে ডেকে বললেন, মিনু তোর বৌমাকে দেখে এত লোভ হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে এখনি হাইজ্যাক করে নিয়ে চলে যাই। সকলে হেসে উঠলেন। সেলিনা বলল, কোন দরকার নেই, যখনি দরকার হবে, আমি নিজেই চলে যাবো। হাইজ্যাকের ঝামেলা পোয়াবেন কেন? আবারও সবাই হেসে উঠলো। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, অবাক হয়ে কমিশনার সাহেব তাকিয়ে আছেন সেলিনার দিকে। তার ঠাট্টার যে এমন একটা জবরদস্ত উত্তর হতে পারে, বোধ হয় তিনি তা ভাবতেও পারেননি। কিন্তু উনিতো শুধু মিনতি সেনের কাকা নন, তিনি জবরদস্ত পুলিশ কমিশনার, জবাবেরও একটা জবাব দেওয়া দরকার। বললেন তা তুমি পারবে দিদি ভাই, কারণ হাইজ্যাক তোমার রক্তে মিশে আছে। ঠাট্টার সঙ্গে নিলে কথাটাকে ঠাট্টা হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতে গেলে অপমান বাজতেই পারে বুকে, তাই সেলিনাও হেরে যেতে রাজী নয়, বলল, তা আপনি এক অর্থে ঠিকই বলেছেন, যে রক্তকে আপনি এত গৌরাবান্বিত করতে চেয়েছেনে, আমিতো সেই রক্তেরই উত্তরাধিকার। চুপ হয়ে গেলেন কমিশনার সাহেব।

অন্যেরা জবাবের জন্য মনে মনে খুশী হলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করলেন না। কমিশনার সাহেব বললেন তোমার চাতুর্যকে প্রশংসা না করে উপায় নেই, কিন্তু দিদি ভাই আমাকে যে যেতে হবে। যাবেন, আপনিতো আমার অতিথি নন, মায়ের অতিথি তিনিই বুঝবেন আপনি যাবেন কি থাকবেন। এ জবাবও আশা করেননি কমিশনার সাহেব। শুধু একটু হাসলেন তারপর মিনু মিনু করে চিৎকার কবতে করতে বাইরে চলে এলেন।

এতক্ষণে প্রতীমবাবু এগিয়ে এলেন, সেলিনা ওকে দেখতে পেয়ে একবোরে দৌড়ে ওর কাছে এসে বলল, কাকু তুমি কখন এলে? আজ কিন্তু থেকে যেতে হবে কোন অজুহাত কিন্তু শুনবো না। প্রতীমবাবু অবাক হয়ে যান মেয়েটির মুহূর্তের উত্তরণে। ঠিক আছে দেখব। তার আগে একবার ঠিক করে দাঁড়াও তো, তারপর প্রান্তিককে বললেন, প্রান্তিক তোমার মাকে ডাকো। প্রান্তিক বেরিয়ে গিয়ে মিনতি সেনকে ডেকে নিয়ে এল। তখনো পর্যন্ত কমিশনার সাহেব যাননি বলে, তাকেও জোর করে ভিতরে নিয়ে এলেন। মিনতি সেন কাছে এসে দাঁড়ালে এক গাদা উপহারের বাক্স তার পায়ের কাছে রেখে প্রতীমবাবু বললেন, সেলিনার জন্য এনেছিলাম, গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য মনে করব। মিনতি সেন বললেন, আপনি এনেছেন, ওকেই আপনি দিয়ে দিন। আমাকে বলছেন কেন? ওরা যদি আমার বাড়ীতে কখনো যায়, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের অনুরোধ করবো না। আপনি প্রান্তিকের মা। হতভাগ্য মেয়েটিকে আপনি যে মেনে নিয়েছেন এতে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারবো না। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওটা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে দিতে চাই।

দেখতে পাচ্ছি, মিনতি সেন কাঁপছে। কত বছরের স্মৃতি বুকে নিয়ে পথ চলা। আজ তারা মুখোমুখি। ভিতরটা কি ভেঙে যাচ্ছে না? অবশ্যই যাচ্ছে, তাই হয়তো মিনতি সেন পালিয়ে যেতে চাইছেন। কোন ভাবে উপহারের বাক্সগুলি একে একে সেলিনাকে দিয়ে প্রতীমবাবুকে বললেন, আপনি খুশীতো। শুধু খুশী নই ভীষণ আনন্দিত। আপনার জন্য আমার গভীর শ্রদ্ধা রইল। মিনতি সেন আমারও বলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে তাল সামলাতে না পেরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, এগিয়ে এস মিনতি সেনকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমার শরীর খারাপ মা। না, আমি ভাল আছি। তুই দেখতো প্রান্তিক জবার মা কোথায় গেল। যাদের আসতে বলেছিলাম তারা মনে হয় সবাই এসে গেছেন। এদের তো কিছু খাওয়ার বন্দোবস্তও করতে হবে। এই সময় আমি জানতে চাইলাম পিসি আসেননি? মিনতি সেন কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। কি হয়েছে মার অমন করছেন কেন? আমি ঠিক জানিনা, তুমি দেখনা কি হয়েছে। তারপর জবার মাকে ডেকে আনতে বেরিয়ে গেলাম। এবার সেলিনা কমিশনার সাহেবে কে বললেন, এখন কিন্তু দাদু আপনি আমার অতিথি। মানে? বা মা অসুস্থ, অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বতো আমার। তাই বলছি, একদম চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, তা হলে হয়তো উল্টো ভাবে হাইজ্যাক হয়ে যেতে হতে পারে। হাসছে সেলিনা, খারাপ হয় না দিদিভাই এই বৃদ্ধ বয়সে হাইজ্যাক হতে, বললেন কমিশনার সাহেব। তারপর অনুরোধ করে বললেন, কিন্তু দিদি ভাই সত্যি দেরি হয়ে যাবে। তোমার আপ্যায়নটা যদি একটু তাড়াতাড়ি কর ভাল হয়। এই করি দাদু।

সেলিনার নির্দেশে মুহূর্তে হল ঘরটাকে ক্যাটারিং এর লোকেরা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে ফেলে। প্রত্যেককে হাত জোড় করে সেলিনা বলে, আপনারা যদি বসে যান তাহলে খুব ভাল হয়। প্রতীমবাবুকে বলল, তুমি বসবে না? না এখন না। তারপর বললেন তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে সেলিনা, আসবে এদিকে? সেলিনা এক পাশে এগিয়ে গেলে প্রতীমবাবু বললেন, তোমার মা এসেছিলেন, এই উপহারগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেলেন, আমি যেন এগুলো তোমার হাতে তুলে দিয়ে বলি, তোর মা তোকে বুক ভরে আর্শীবাদ করেছেন। আমি অনেকবার বলেছি, তবু তিনি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না। আমি যাচ্ছি ওখানে, যে ভাবে হোক ধরে নিয়ে আসব। কোন দুশ্চিন্তায় আজকে অতিথি আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না হয়। সেলিনা বলল প্রান্তিক জানে? না কেবল ওর মা জানেন। হয়তো এটা তার বুকে খুব বেজেছে। আমাকে যখন কাকু বলে ডেকেছো মা। আমি থাকবো তোমার পাশে কোন ভয় নেই। কিন্তু আমাকে থেকে যেতে বলবে না। যে ভাবেই হোক আমাকে চলে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করে দিও। তাই দেব। কোন অস্বস্তিতে তুমি পড় তা আমি চাইবনা। কিন্তু কাকু মা না আসা পর্যন্ত মনটা কাটার খোঁচার মত ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে, তুমি যে ভাবে পার তাকে নিয়ে এস। হ্যাঁ তাই হবে। আমি চলে যাচ্ছি। উনি চলে গেলেন। একবার হল ঘরে এসে সেলিনা দেখলো সব ঠিক ঠাক মত আছে কিনা। তারপর এল মিনতি সেনের কাছে, সেলিনাকে দেখে জবার মা উঠে দাঁড়াল, বলল, বৌদিমনি, তুমি একটু বোস না দিদিমনির কাছে। দাদাবাবুকে বলুন না ডাক্তার ডাকতে। আমি দেখছি। তুমি যাও।

সেলিনা মিনতি সেনের মাথার কাছে বসে ডাকলো মা।, চোখ মেলে তাকালেন মিনতি সেন। তারপর বললেন তুমি এখানে, যাদের বলেছি তাদের কি হবে? কোন চিন্তা নেই মা, সব ব্যবস্থা আমি করেছি, তা ছাড়া দাদু ভাই আছেন, তোমার সম্মান রক্ষার্থে, তিনি যা করার করবেন। কে? কাকু যাননি? তুমিতো অবাক করলে মা। আজকের দিনে উনি যাবেন কি করে? তুমি ঠাট্টাও বোঝনা? তাই যেন হয়। ওটা যেন ঠাট্টাই হয়। সেলিনা বলল, মা এসে চলে গেছে? তোকে কে বলল? যেই বলুক, তুমিতো আমায় বললেনা উল্টে চিন্তা করে করে শরীরের এই অবস্থা বানালে। কি করব বল, কি করে বলি তোর মা এসেও তোকে না দেখে চলে গেছে। কেমন ভাবে নিবি? যে ভাবেই নিইনা কেন? কথাটাতো সত্যি। আর উনি যদি এত জেদী হতে পারেন তবে আমার জেদী হতে আপত্তি কোথায়? নারে ওভাবে কথা বলতে নেই। ওর মনে যে আঘাত লেগেছে তা কি তুই বুঝবি না। খুব ভাল কথা মা, কিন্তু উনি যে ভাবে চলে গেলেন তাতে তোমার মনে আঘাত লাগবেনা। তাছাড়া আমিতো জানি তোমার মনে এমনিতেই ঝড় চলছে। কিসের ঝড়। আজ থাক মা। আর একদিন বলব। বরং চল অতিথিদের ওখানে। ওদর সঙ্গে কথা বল, দেখবে আস্তে আস্তে সব কিছু শান্ত হয়ে গেছে। এরপর মিনতি সেন জানতে চাইলেন তোর কাকু চলে গেছেন? আমাকে বলে গেছেন, কি একটা জরুরী কাজ আছে, সেরেই আসবেন। কিন্তু মা, যত বড় অফিসারই হোক উনিতো আর বাঘ ভাল্লুক নন, তবে ওনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তোমাকে

এত আড়ষ্ট লাগে কেন? এর আগে মায়ের ওখানেও দেখেছি তুমি প্রায় এড়িয়েই চললে ওনাকে। আজও ওনার কাছ থেকে উপহার গুলো নিতে তুমি কেমন কেঁপে উঠলে। কেন এরকম কর? তোমার সঙ্গে কি আগে ওনার পরিচয় ছিল? মিনতি সেন কি উত্তর দেবেন এর? বললেন। প্রান্তিক তোকে কিছু বলেনি? কি ব্যাপারে। তোর কাকুর সম্পর্কে। না তো। তা হলে তোর আর জেনে লাভ নেই। না মা আমাকে জানতেই হবে। কেন এত জোর করছিস। কাকুকে আমার ভীষণ ভালো লাগে, তুমি এমন করলে তো উনি আসতে চাইবেন না। নাই বা এলেন, তোরা যাবি ওনার কাছে। আমারা যাব আর উনি আসবেন না, একি আমাদের ভাল লাগবে? থাক তোর কাকুর কথা এখন, বরং চল, দেখি ওদের খাওয়া কতদূর হল।

নীলাঞ্জনা কিছুতেই আসবেনা না। বললেন না প্রতীমবাবু, কত আশা ছিল ওকে আমি মনের মত সাজিয়ে বাসরে পাঠাবো। নিজের গর্ভে তো কেউ এলো না। তাই আমার মাতৃহৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলাম ওকে। ওকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, প্রান্তিকের অসুখের সময়, মাত্র কয়েক মিনিটেই আপন করে নিল আমাকে। পরে রেহানাকেও দেখলাম। এমন মিষ্টি মেয়ে আর হয় না। দুই বোনের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু প্রথম দিন থেকে আমার মনে হয়েছে, রেহানা নয় সেলিনাই বেশী ভালবাসে প্রান্তিককে। কিন্তু বিশ্বাস করুন প্রতীমবাবু প্রান্তিকের কোন সাড়া না পেয়ে আমি এ ব্যাপারে চুপচাপ ছিলাম। তাছাড়া যেহেতু প্রান্তিক রেহানাকে ভালবাসে বলে, মনকে সেই ভাবে প্রস্তুত করি। এরপরে তো রেহানা চলে যায়। কোথায় যে গেছে আজ জানিনা। রেহানা থাকতে সেলিনা যা পারেনি, ওর অবর্তমানে কিন্তু ও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ওর দিকে। আমার সমর্থন ছিল। মনে প্রানে চাইছিলাম, রেহানা যদি ফিরে না আসে, তাহলে যেন সেলিনাকেই গ্রহণ করে প্রান্তিক। যদিও প্রান্তিককে আমি এসব কথা কোন দিন বলিনি, সেলিনাকেও নয়। আজ যখন আমার স্বপ্নই বাস্তবায়িত হলো। অথচ আমি জানলাম না, কেমন করে মেনে নেবো বলুন। প্রতীমবাবু বলেন আপনার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু নীলাঞ্জনা দেবী পৃথিবীতে কাউকে না কাউকে হয়তো আঘাত সইতে হয়। তা না হলে জীবনের সুন্দর ও মধুর মুহূর্তগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনার ওই ভাবে চলে আসায় মিনতি দেবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, একা ঐ বাচ্চা মেয়ে অতিথিদের সামলাবে কি করে। আর যদি কোন ভাবে সামলানোও যায় অসুস্থ মানুষকে নিয়ে কি করবে ও? তার থেকে চলুন। এ সময় আপনার ওনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

এবার চলুন। নীলাঞ্জনা বললেন, আমার এখানে আপনাকে কে আসতে বলেছে। এসেছি আমি নিজে, তবে সেলিনাকে বলে এসেছি, ও বেচারা জানেই না যে আপনি গিয়েছিলেন।

বেশ চলুন, কিন্তু আমাকে এই রাতেই ফিরে আসতে হবে। তাই হবে নীলাঞ্জনা দেবী। যদি সত্যি ফিরতে পারেন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

নীলাঞ্জনাকে নিয়ে প্রতীমবাবু যখন মিনতি সেনের বাড়ীতে পৌঁছালেন, তখন অতিথিরা সব চলে গেছে। শুধু প্রান্তিক, সেলিনা, জবার মা ও মিনতি সেন ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। আর কেউ আসবে না বলে জবার মা মেইন গেটে তালা দিয়ে দিয়েছে এ সময় গাড়ীর হর্ন বার বার বেজে উঠলো। মিনতি সেন নামতে চাইলে আমি বললাম আমি দেখছি। গেট খুলে দিতেই গাড়ী থেকে নামলেন প্রথমে প্রতীমবাবু তারপর নীলাঞ্জনা পিসি। আমি অভিমান করে বললাম, পিসি তুমি এসেও আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে? তারপর প্রতীমবাবুকে বললাম, কাকু আসুন। আকবরকে বললাম, আকবর তুমিও গাড়ীটা লক করে এস।

আকবরকে বাইরের ঘরে বসিয়ে আমি পিসি ও প্রতীমবাবুকে নিয়ে উপরে এলাম। সেলিনা ও মিনতি সেন কথা বলছেন। মিনতি সেন শুয়ে আছেন। আর তার শিয়রের কাছে বসে সেলিনা একথা সেকথা বলে চলেছে। আমি বললাম, মা, কাকু ও পিসি এসেছেন। সেলিনা দৌড়ে এসে নীলাঞ্জনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না মা, কিছুতেই কথা বলবো না। কেন তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে। তুমি ছাড়া কে আছে আমার বল, বলতে বলতে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল নীলাঞ্জনার শাড়ীর আঁচল। আর তাতেই সিঁথির সিঁদুর আর কপালোর টিপ এলো মেলো হয়ে গেল। নীলাঞ্জনা বললেন ছাড় আমাকে। কি পাগলামি করছিস। আজতো আমার আনন্দের দিন। আনন্দ না ছাই, তা হলে তুমি চলে গেলে কেন? এভাবে বলিস নে মা, তারপর বললেন কেন যে গেলাম আবার কেন এলাম তাও জানিনা। মিনতি সেন যেন মুহূর্তে সুস্থ হয়ে গেলেন, সেলিনাকে বললেন সেলিনা এবার ছেড়ে দে মাকে। প্রতীমবাবুকে বললেন বসুন মিঃ চৌধুরী। তারপর কাউকে না বলে যাওয়ার জন্য সত্যি রাগ হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, রাগ হওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। কখন খেয়েছেন? খাবেন তো? নীলাঞ্জনা, তুমি দেখনা সেলিনা ওর কাকুকে কি খাওয়াবে? বাঃ আমি কেন দেখব? তুমি কি করবে? আমার কাকু এসেছেন তোমার বাড়ীতে আর তাকে খাওয়াবার দায়িত্ব নেব আমি তা হবে না। তুমি বরং দেখ কি খাওয়াবে, আমি ততক্ষণ আকবরকে দেখছি। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন মিনতি সেন। নারীর লজ্জা সে যেন সব বয়সে এক। নীলাঞ্জনা বললেন, সেলিনা ঠিকই বলেছে মিনতি, তুমি ওকে খেতে দাও। আমি বরং ততক্ষণ সেলিনার সঙ্গে নীচে কথা বলছি।

ওরা আর অপেক্ষা না করে নীচের ঘরে চলে গেল। মিনতি সেন বললেন, আপনি কি এই ভাবেই খাবেন, না পোষাকটা বদলে নেবেন। প্রতীমবাবু বললেন, আপনার যদি অসুবিধা হয় তাহলে বদলাতে হবে, তা না হলে এতে আমার কোন অসুবিধা নেই। এ ভাবেই সবকিছু অভ্যেস হয়ে গেছে। মিনতি সেন বললেন, কিন্তু প্রয়োজনে তো অনেক অভ্যেস বদলাতে হয়। তা হয়, তবে জানেন কি, প্রয়োজনটা এত সামান্য যে বদলাবার দরকার হয় না। এর মধ্যে আমি ভিতরে গিয়ে পায়জামা পাঞ্জবি আর তোয়ালে এনে প্রতীমবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, আপনি বরং একটু ফ্রেশ হয়ে নিন কাকু। বেশ তোমরা যখন বলছ তখন দাও। কিন্তু প্রান্তিক, আমার একটু তাড়া আছে। মিনতি সেন বললেন, মেয়ের বাড়ীতে

এসে না থেকে চলে যাবেন। রাতটা থেকে গেলে খুব কি অসুবিধা হবে? প্রতীমবাবু তার কোন উত্তর না দিয়ে ওই সব নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন, এবং মিনিট ১৫ পরে যখন বেরিয়ে এলেন দেখে মনে হচ্ছে সত্যি যেন ক্লান্তি দূর হয়েছে। জবার মা এসে সংবাদ দিল, দাদাবাবু, বৌদিমনি নিচেই ডাকছেন আপনাকে। আসছি বলে, চলে এলাম আমি।

জীবনে এই প্রথম মুখোমুখি মিনতি সেন ও প্রতীম চৌধুরী। মিনতি সেন বললেন, কিছুই খাচ্ছেন না যে। বেশী খেতে পারি না মিস সেন, তা ছাড়া নীলাঞ্জনা দেবী জোর করে খাইয়ে দিলেন। তা হলে দরকার নেই, শরীর খারাপ করতে পারে। আমার শরীর খারাপ করে না। ঈশ্বর বোধহয় ওটা দিতে আমাকে ভুলে গেছেন। তা আপনি এখন সুস্থ তো। জানেন মিস সেন, আপনি যখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমার খুব খারাপ লাগছিল। কেন? কেন আবার কি? সবাই দেখলেন সেলিনার জন্য আনা আমার উপহার গুলো যেন আপনি অনিচ্ছায় গ্রহণ করছেন। নিজের ছেলের বৌয়ের জন্য আনা উপহার কি কেউ অনিচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে? আসলে যখন জানলাম, নীলাঞ্জনা সেলিনার জন্য আনা উপহার আপনার হাতে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে, তখন থেকেই ভীষণ হতাশ লাগছিল। ওটা ছিল তারই প্রভাব। এজন্য আপনি অন্য কিছু মনে করবেন না। না না মনে করার কিছু নেই, আমাকে যে আপনারা গ্রহণ করেছেন এটাই বড় কথা। তারপর মিনতি সেনকে বাধা দিয়ে বললেন না না আর দেবেন না। মিনতি সেন বললেন, কিন্তু এটা যে আপনার মেয়ের রান্না। ও যদি দুঃখ পায়। ওতো মেয়ে, দুঃখ পেলে পাবে। কিন্তু আপনি পাবেন না তো।

একি হল মিনতি সেনর? ২৫ বছর আগের ঘটনা গুলো কেন এক এক করে ভেসে উঠছে। চোখের সামনে ঠিক ছবির পর্দার মতো। প্রতীমবাবু বললেন, কি হল মিস সেন, অমন কাঁপছেন কেন? শরীর খারাপ লাগছে? নিজেকে সংযত করে বললেন, না না। কোন অসুবিধা নেই। আপনি খান, আর যদি খেতে ইচ্ছে না করে তা হলে একদিকে সরিয়ে রাখুন। দুঃখ পেলেন? আজ কাল আর দুঃখ পাইনা মিঃ চৌধুরী। সেই ভাল, দুঃখ একটা বিলাসিতা মাত্র। বিলাসিতা যত বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। আপনি বোধ হয় সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করতে পেরেছেন? জানিনা, তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমাকে শিখিয়ে দিতে পারেন কি ভাবে দুঃখকে বর্জন করতে হয়। প্রতীমবাবু বলেন, এতো অতি সোজা ব্যাপার মিস সেন, কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করুন। শুধু কাজ আর কাজ। দেখবেন দুঃখকে ভাববার সময়ই পাচ্ছেন না। মিনতি সেন বললেন চেষ্টা করব।

তারপর চুপচাপ দুজন। যেন কারো কোন কথা নেই। মিঃ চৌধুরী নীরবে এটা ওটা নাড়া চাড়া করছেন, বলতে গেলে প্রায় খাচ্ছেন না কিছুই - মিনতি সেন মিষ্টি নিয়ে এলে প্রতীমবাবু বললেন, আমি মিষ্টি খাইনে। খাননা? তাতে কি হয়েছে, আজ না হয় খেলেন। মেয়ের বাড়ীতে এক টুকরো মিষ্টি না খেলে চলবে কেন? তা যা বলেছেন। আচ্ছা দিন। অসুবিধা হলে থাক। মুখে বললেও ২/৩টে মিষ্টি নামিয়ে দিলেন প্রতীমবাবুর খাওয়ার থালায়, প্রতীমবাবু কোন রকম প্রতিবাদ না করে খেয়ে নিলেন।

খাওয়া শেষ হলে মিনতি সেন জল নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রতীমবাবু বললেন আমি

বেসিনে হাত ধুয়ে নিচ্ছি। মিনতি সেন বললেন, বেসিনটা নোংরা আছে, আপনি হাত এগিয়ে দিন আমি জল দিচ্ছি। কিন্তু হাত মুছতে গিয়ে দেখেন পকেটে রুমাল নেই। ধারে কাছে কোন তোয়ালেও নেই সেই বাথরুমে, মিনতি সেন ঘর থেকে একটা নতুন তোয়ালে এনে দিলেন হাত মুছতে।

প্রতীমবাবু বললেন, এবার আমাকে উঠতে হবে মিস্ সেন। আপনাদের মনে হয় খাওয়া হয় নি। তারপর বললেন দেখি আকবরের হোল কি না। মিনতি সেন বললেন, আপনি যে এসেছেন এটাই কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখা উচিত, সেখানে আবার থাকতে বলি কোন অধিকারে।

এমন যে সংযত মানুষ প্রতীমবাবু, তিনি যেন কেমন করে বলে ফেললেন, কোন অধিকার কি নেই? অবাক হয়ে তাকালেন মিনতি সেন। আর প্রতীমবাবু কথাটি বলে ফেলে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলেন। তারপর নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে বললেন, অন্য ভাবে নেবেন না মিস সেন, আসলে সেলিনার আমি কাকা, এইটুকু অধিকারতো দাবী করা যেতে পারে। মিনতি সেন যেন কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, সেলিনা বলল, কাকু তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছেনা? তুমি যে বললে শিয়ালদার একজায়গায় না গেলেই নয়? তা হলে আর দেরি করছ কেন? হ্যাঁ মা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি না গেলে ওদের সব নষ্ট হয়ে যাবে। আজ তা হলে আসি মিস সেন, নমস্কার। নমস্কার, তারপর মিনতি সেন সেলিনাকে বললেন, যাতো মা, ওনাকে একটু গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়। নীলাঞ্জনা বলল তুমি যাও মিনতি। সেলিনা বরং এদিকটা একটু দেখুক। অগত্যা মিনতিকেই পায়ে পায়ে এগুতে হয় প্রতীমবাবুর সঙ্গে। গাড়ীতে ওঠেন প্রতীমবাবু। তাকান উভয়ে উভয়ের দিকে। কত কথাই যেন বলার ছিল। কিন্তু কোন কথাই বলা হয় না। প্রতীমবাবু শুধু বল্লেন শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। প্রেসারটা বাড়তে পারে। ওটা চেক করে নেবেন। মিনতি সেন বল্লেন, আবার করে আসবেন? যদি আমার আসাতে অস্বস্তি না হয় তা হলে যেদিন বলবেন সেদিন আসব। আপনার এত কাজ ফেলে পারবেন আসতে? আকবর গাড়ীতে স্টার্ট দিল। প্রতীমবাবুর উত্তরটা শোনা হল না। কিন্তু মিনতি সেন কিছুতেই বুঝতে পারছেনা, যে ঝড় থেমে গিয়েছিল ২৫ বছর আগে, তাই কেন এবং কেমন করে পথভ্রষ্ট হয়ে হঠাৎ মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব এলোমেলো করে দিল। ধীরে ধীরে মিনতি সেন উঠে এলেন উপরে।

রাত প্রায় ১২টা। জবার মা আবার সবকিছু বন্ধ করে এলেন। আমি সেলিনা নীলাঞ্জনা পিসি ও মিনতি সেন এক সঙ্গে খেয়ে নিলাম। জানিনা কেন এবং কি ভাবে পিসির অভিমান জল হয়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, মিনতি সেন বললেন, সেলিনা আজ সারাটা দিন কেমন ঝড়ের মত কেটে গেছে, একটুও বিশ্রাম পাসনি, এবার যা শুয়ে পড়। দেখতে পাচ্ছি সেলিনার দৃষ্টিতে অসহায়তা। কি করবে বুঝতে পারছেনা। আমি নিজেও বুঝতে পারছিনা ওর সঙ্গে এক ঘরে আমিও রাত কাটাবো কি না। সেলিনা এগিয়ে গেল। আমি তখনো দাঁড়িয়ে আছি। মিনতি সেন বললেন কিছু বলবি? না তাহলে বসে আছিস কেন? ও তোর জন্য কতক্ষণ

অপেক্ষা করবে? অগত্যা আমাকেও সেলিনার পিছু পিছু যেতে হয়।

অনেকগুলো ঘর নিয়ে মিনতি সেনের বাড়ী। এ ঘরে আগে কোন দিন ঢুকিনি। সুন্দর করে বিছানা পাতা। বিরাট বিছানায় পাশাপাশি বালিশ। খাটটা ফুল দিয়ে সাজানো। সমস্ত বিছানায় শুধু ফুল আর ফুল। বিরাট খাটের দুই পাশে বড় বড় আয়না। শুলে সমস্ত শরীরটা প্রতিবিম্বিত হয় আয়নার মধ্যে। খাট থেকে একটু দূরে দেওয়ালের সঙ্গে বড় ড্রেসিং আয়না। জামা কাপড় রাখার আলনা তার পাশে। তার থেকে কিছু দূরে আলমারী। মিনতি সেনের রুচি বোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই। সেলিনা এগিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। আমি বললাম মেঝেতে বসলে যে, ঠান্ডা লাগবেনা। না লাগবেনা সারাটা দিন কি গরমটা গেল। তারতো কোন আঁচ পেলে না। কি করে পাব বল, আজকের দিনটা যেন তোমারই, কেউ যেন আমাকে চেনে না। সেলিনা হাসছে। হাসছো যে, না হেসে কি করি বল, ঘাড় থেকে নামাতে চেয়েছিলে পারলে না, তাই হাসি পাচ্ছে। ওঃ তাই বল, মানে সারা জীবন এই জীবন্ত বোঝা বয়ে চলতে হবে এইতো। তা একবার ঘাড়ে ওঠ, পরীক্ষা করে দেখা যাক ওজনটা কত। সেলিনা বলল ভয় নেই প্রান্তিক। আমার এত বড় বোঝা বইতে পারবে না, তার থেকে যতটা বইলে তোমার কষ্ট হবে না সেই অংকটা করেই ফেল না। করব, কিন্তু তুমি কি সারা দিনের এই ভাবি পোষাক পরে থাকবে নাকি? কেন এগুলো কি তুমি সহ্য করতে পারছনা? আমি বললাম, দেখ, কিছু কিছু জিনিষ আছে তা ক্ষণিকের জন্য সুন্দর। সর্বক্ষনের জন্য নয়। এই ভারি পোষাক আর গয়নার আড়ালে আসল তোমাকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই কষ্টকর। তাই যদি মনে হয়। তা হলে এগুলোকে আস্তে আস্তে খুলে দিয়ে তোমার আসল সেলিনাকে খুজে নাও না। আমি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলাম ওর কাছে তারপর ওর আঁচলে যেইনা হাত দিয়েছি সে যেন তেড়ে এসে বলছে এই করছ কি দাঁড়াও। আমি বললাম, আমি যাকে চাই তাকেই তো খজে দেখছি আবরণ ও আভরনের জঙ্গলে। ও বলল, না লক্ষ্মীটি, তুমি যাও, বোস গিয়ে ওখানে। তোমার পরিচিত সেলিনা হয়েই আমি আসছি? তা হলে হার স্বীকার করলে। ও বলল এ হারের স্বাদ যে আলাদা প্রান্তিক, এখানে যে জয়ী হতে চায় তার মত বোকা আর কেউ নেই। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে যায় সেলিনা। আর আমি শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গুনি।

ও ঘরে মিনতি সেন ও নীলাঞ্জনা পিসি তখনো কথা বলে চলেছেন। নীলাঞ্জনা বলছেন, আজকের জন্য প্রতীমবাবুকে ধরে রাখতে পারলে না। আমার তো মনে হয় তুমি আরেকটু জোর করলে উনি রাজী হয়ে যেতেন। জানি না নীলাঞ্জনা, উনি যে থাকতে চাননি, যেকোন অজুহাতে চলে যেতে চেয়েছেন এটাই যেন স্বস্তি। এ তোমার স্বার্থ পরের মতো কথা মিনতি। ভাবতে পারছ উনি কখন পৌঁছাবেন বাড়িতে। হয়তো একটু রাত হবে, কিন্তু পৌঁছবেন তো। আর পৌঁছালেই কষ্টের লাঘব হবে এক সময়। তার মানে বলতে চাইছো এখানে থাকলে তার কষ্ট হতো। হ্যাঁ নীলাঞ্জনা ভীষণ কষ্ট হতো, সে কষ্ট অসহ্য। তার থেকে আমি যে তাকে ছুটি দিতে পেরেছি, এটাই আনন্দের। নীলাঞ্জনা বললেন তুমি তার কষ্ট দেখছ, নিজের কষ্টটা দেখছনা? নিজেরটা দেখেছি বলেই তো তারটা এমন উপলব্ধি

করতে পারছি। তারপর বললেন, যাকগে নীলাঞ্জনা, ছেড়ে দাও ওসব কথা। বরং বল, কি ভাবে প্রান্তিকের বাবা-মা সেলিনাকে মেনে নিতে পারে। ওবা যে মানবে না এমন কোন ইঙ্গিৎ তো নেই, তবে কেন আগে আগে ভাবতে যাবো। তার থেকে বরং সীতাংশুদাকে আসতে বলি। সেই ভাল, তা হলে তুমি তাই কর নীলাঞ্জনা।

সারারাত নীলাঞ্জনার পাশে এ পাশ ও পাশ করেন মিনতি সেন। নীলাঞ্জনা বলল, মিনতি, কেন মিছেমিছি কষ্ট পাও। সে তোমাকে বুঝাতে পারব না কেন কষ্ট পাই। একটা দুটো বছর নয়। পচিঁশটা বছর কেটে গেছে। একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, যদি মনে করেন আমরা এক সাথে পথ চলতে পারব, আমি অপেক্ষা করব। এযে কি কষ্ট তোমাকে বুঝাতে পারবনা। দেখ যতদিন ওকে দেখিনি, এমন হয়নি। কাজের ভিতরে ডুবে থেকে নিজেকে ভুলতে চাই, ভুলতে চাই অতীত। কিন্তু ভোলা কি যায় ! ওকে দেখে বুঝতে পাবছি কি কষ্ট বয়ে চলেছেন। উনি বয়ে চলেছেন আর তুমি বয়ে চলছোনা? জানিনা নীলাঞ্জনা, কিছুই জানি না। তারপর বললেন জান নীলাঞ্জনা কথার পরে কথা বলতে গিযে ওকে যখন বললাম, আপনাকে থাকতে যে বলব সে অধিকার কোথায়? উনি বললেন কোন অধিকার কি নেই? কথাটা বলেই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়েন, পরে অবশ্য ব্যাখ্যা করে যদিও বললেন, আসলে আমি সেলিনার কাকা সেটা কি একটা অধিকার নয়? কিন্তু উনি যা বলতে চেয়েছিলেন, এতো তা নয়, তার ভিতরের না বলা কথা, বলতে চেয়েও বলতে না পারার যন্ত্রণায়, চোখ ফেঁটে জল আসতে চাইছিল, বহু কষ্টে সংযত করলাম। সে সময় নিজে যে কি পরিমান দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে কি বলব। কিন্তু বাঁচাল সেলিনা, ও সেই সময় এসে বলল, কাকু তোমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। নীলাঞ্জনা বললেন, আমি বুঝি মিনতি, তোমাকে একটা কথা বলব? বল তুমি ওকে ফিরিয়ে নিযে এস। তা হয়না নীলাঞ্জনা। কেন হয় না? কেন যে হয়না তা তোমাকে বলতে পারবো না, তবে এটা হয় না এটাই সত্যি। তারপরে বললেন ভুলে যাচ্ছ কেন আমি প্রান্তিকের মা। তুমি কি পারবে সেলিনাকে অস্বীকার করে পরিমলবাবুর কাছে ফিরে যেতে? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীলাঞ্জনা বলল পরিমলবাবুর সঙ্গে তুমি প্রতীমবাবুর তুলনা করো না, মিনতি, অন্ধকার এবং আলো কখনো এক হতে পারে না। এ তোমার অভিমান। না অভিমান নয়। অভিমানের জন্য চাই বিশ্বাস, অধিকার বোধ, যা তোমাদের আছে, আমার তা নেই। পরিমলবাবু সারা জীবন আমার সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। শুধু তাই নয়, মিথ্যে অজুহাতে আমাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন। চিরকাল ছলনার অভিনয় করে আমাকে ঠকিয়েছেন, আমার জীবনের কোন জায়গায় আজ তার জন্য বিন্দু মাত্র করুণা নেই। হয়তো এ তোমার ভুল, ক্ষণিকের জন্য তিনি যেটা করেছেন, সেটাও তার এক চরম অভিমান। নীলাঞ্জনা বললেন, তোমার কথা যদি সত্যি হতো, আমি তোমারই মত কষ্ট পেতাম, আনন্দ আর গর্বে আমার বুক ফুলে উঠতো। কিন্তু তাতো নয় মিনতি। একদিন যুঁথিকে ঠকিয়ে সে আমার কাছে এসেছিল তার অতীতকে গোপন করে। ও যদি গোপন না করে সত্যি কথাটা বলতো, তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারলেও তারজন্য একটা কষ্টের অনুভূতি আমার থাকতো। তবু ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যে কটা দিন

ছিল ও আমার কাছে, ওর ভালবাসা পেয়েছি, ওর আদর পেয়েছি, ওর স্বপ্নে নিজেও স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু তুমি? আমিও যে ওর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, নীলাঞ্জনা, সে যে আমার সাত রাজার ধন। বলতে পার, কে অমন করে জীবনকে তিলেতিলে ক্ষয় করতে পারে একটা মেয়ের জন্যে? তুমিতো জান ওর সঙ্গে আমার কোন ভালবাসার সম্পর্ক ছিল না। আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছিল সম্বন্ধ করে। কিন্তু ভেঙে গেল একটা দুর্ঘটনায়। তারপর তো অনেক ঝড় চলে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। একদিন যখন সেই ঝড় থামল, এসেছিলেন উনি। ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম এ আর হয় না। তার উত্তরে ঐ ছোট্ট চিঠি, ভাবিনি এমনি করে কেউ অপেক্ষা করতে পারেন। কোন ভালবাসার স্মৃতি অনুভূতি এসবের পরশ না পেয়েও যে কোন পুরুষ অপেক্ষা করতে পারেন, ওঁকে না দেখলে আমি জানতেই পারতাম না। ২৫ বছর পরে তোমাদের বাড়ীতে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলাম। বিশ্বাস কর ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসার থাকলেও পালিয়ে বেঁচেছিলাম সেদিন। আর আজতো পালাবারও উপায় ছিল না। আজতো একা পেয়েছিলে তবে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? পারলাম না নীলাঞ্জনা, কিছুতেই পারলাম না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন নীলকণ্ঠ। সমস্ত বিষ একাই হজম করে পৃথিবীকে নির্বিষ করেছেন। তারপর বললেন কি অদ্ভূত এই নারীমন তাইনা? কেন? ও যখন হাত মুখ আঁচিয়ে একটা রুমাল খুঁজছিলেন হাত মুখ মোছার জন্য, ধারে কাছে কোন তোয়ালে না থাকায় ছেলে মানুষের মত মনে হয়েছিল হাতের কাছে যখন কিছুই নেই আছেতো আমার শাড়ীর আঁচল, ওটা দিয়েতো কাজ সারতে পারেন। তা তুমিতো বলতে পারতে। চেয়েছিল মন, বার বার চেয়েছিল, কিন্তু পারলাম না নীলাঞ্জনা কিছুতেই পারলাম না। ২৫ বছর আগে মনকে যে ভাবে প্রস্তুত রাখা যেতো, আজ আর হাজার চেষ্ঠাতেও তা হয় না। তাইতো ঘরে গিয়ে নতুন তোয়ালে এনে তার হাতে তুলে দিতে হল। শুধু একটা সান্ত্বনা, যে পাজামা পাঞ্জবি পরে ও গাড়ীতে উঠলো, ওটা কাল হঠাৎই কিনেছিলাম। কেনার পরে মনে হল কেন কিনলাম। আজ মনে হচ্ছে ওটা হয়তো ওঁর জন্যই কিনেছিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র স্মৃতি থাকুকনা তার কাছে। কেঁদে ফেললেন মিনতি।

নীলাঞ্জনা ওকে কাঁদতে দিলেন, কোন রকম সান্ত্বনা না দিয়ে শুধু একটা হাত ওর বুকের উপরে রেখে চুপ করে রইলেন। তারপর এক সময় ভোর হয়। ঘুম ভাঙে আমার। কিন্তু সেলিনা তো নেই কাছে। সারারাত তো পাশেই ছিল। যেন কত যুগ যুগান্তরের অতৃপ্ত আদর দিয়ে ওকে ভরিয়ে দিয়েছি, ও-ও দিয়েছে। দুটি যৌবন যা চায় তারই বিনিময় করেছি আমরা, তবু অতৃপ্ত মন ভোরের আকাঙ্খা নিয়ে আবার যখন ওকে কাছে পাওয়ার জন্য পাশ ফিরেছি, দেখি সে নেই। কুঞ্চিত চাদরটি পরিপাটি করে টানা। এতবড় হল ঘরের কোনদিকেই তো ও নেই। তাহলে গেল কোথায়? হয়তো বাথরুমে। অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আবার। সেলিনা এল, যেন ভোরের যুই। এই সকালেও স্নান করেছে ও। পরেছে নিভাজ নতুন শাড়ী। লাল পাড় ভিতরের খোল আকাশী নীল। সিঁথিতে দিয়েছে সিঁদুর। কপালে পরেছে টিপ। সারা বিছানায় ছড়ানো ফুল কখন যেন একটা একটা করে তুলে নিয়ে ভরেছে প্লাষ্টিকের প্যাকেটে, তারপর তা একদিকে গুছিয়ে রেখেছে,

যদিও চুল ভেজায়নি সম্পূর্ণ ভাবে, তবু যেটুকু ভিজিয়েছে তোয়ালে দিয়ে মোছা সত্ত্বেও শিশির ফোঁটার মত চিকচিক করছে দুই কপালে গড়িয়ে পড়ার জন্য। আমি অপলক তাকিয়ে আছি ওর দিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল কি দেখছো। বললাম ভোরের যুঁই। ও কাছে এসে বলল উঠবেনা? ইচ্ছে করছেনা। তাহলে তুমি ঘুমাও, আমি দেখি মা কি করছেন। মন ভীষণ ভাবে চাইছিল আমার ভালবাসা ওর অধর স্পর্শে ধন্য হোক। কিন্তু ও পালিয়ে গেল। বলল না না ওটা রাতের অপেক্ষায় থাকুক। রক্তে যখন নেশা লাগে, রাতকে মনে হয় কতইনা ছোট।

এরপর একদিন নেশালাগা সেই রাত এল যদিও, কিন্তু এমন তিক্ত ভাবে এল যে, আমর জীবনে যে ঝড় উঠলো। তা যেন আর শেষ হতে চায় না। কি হয়েছে সেলিনার জানিনে। সারাদিনে একবারও মনে হয়নি, ওর মনের মধ্যে অন্য কোন স্রোত বয়ে যেতে পারে। আমার চাওয়ার উত্তরে ও বলল, জানতো প্রান্তিক ভিখিরিকে করুণা করা যায়, দান করা যায় না। দান গ্রহণ করতে হলে যোগ্যতা থাকতে হয়। সেলিনা এভাবে যে কথা বলতে পারে ভাবনারও অতীত। অপমানে ভিতরটা জ্বলতে লাগলো। প্রতি উত্তরে বললাম তা ঠিক, তবে গ্রহীতার যেমন যোগ্যতা থাকা দরকার, দাতারও তা থাকা দরকার। দাতার যে যোগ্যতা নেই জানলে কি করে? যে ভাবে জানতে পারলে গ্রহীতার যোগ্যতা নেই। ও বলল, যোগ্যতা যে তোমার নেই সে তো পরীক্ষিত সত্য। মানে? মানে তুমি বোঝনা? না বুঝিনা। তাহলে বুঝেও কাজ নেই। দেখ সেলিনা, এই সব কিছুর জন্য আমি দায়ী নই। দায়ী তুমি? আমি জানি, এবং তোমার থেকে ভালভাবেই জানি। যোগ্যতার নিয়ন্ত্রক কেবলমাত্র আমি। তার ভালোমন্দের দায়িত্বও আমার, আমি তোমাকে চেয়েছিলাম - নিজের যোগ্যতায়। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি, আজ কেবল তুমি আমারই। তোমার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্রতা থাকতে নেই থাকতে পারে না। ভালো লাগা মন্দ লাগার অধিকারটুকুও শুধু আমারই থাক। বললাম এটাই তোমার শেষ কথা? শেষ কথা বলে কোন জিনিষ হয় না প্রান্তিক। আমি চাইনা আমার ভালবাসার নেশায় তুমি ভেসে যাও। তোমার ভবিষ্যৎকে আমি এভাবে নষ্ট করে দিতে পারি না। তার মানে তুমি বলতে চাও তোমার দাম্ভিক অহংকারের কাছে আমাকে মাথা নত করতে হবে? এতো নতুন কথা নয়। সে তো তুমি করেছোই। আর করোছো বলে তোমার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। তাই সেলিনাকে আদর করতে গিয়ে রেহানার মুখ ভেসে ওঠে। সেলিনা নামে ডাকতে গিয়ে অসতর্কে উচ্চরিত হয় রেহানা। তবু তুমি বলতে চাও তুমি শুধু আমারই। তার থেকে তুমি একটা কাজ কর না প্রান্তিক, আমার নামটা বদলে নিয়ে রেহানা করে দাও। তাতে তোমারও কষ্ট হবে না, আমিও বাঁচব।

এরপর আর কথা চলে না। পৌরুষে আঘাত লাগা সত্ত্বে বললাম, আমাকে তুমি জান সেলিনা, আমার দোষ গুণ সব মেনে নিয়েই আমাকে তুমি গ্রহণ করেছিলে, রক্তে মিশে আছে যে স্মৃতি তাকে ইচ্ছে করলে কি মুছে দেওয়া যায়? জানি যায় না, তা হলে দ্বিচারিতা না করে তাই বলতে পারতে। বললে কি করতে? তোমাকে মুক্তি দিতাম। পারতে না সেলিনা, আজ নিজেকে যতই শক্তিশালী মনে করোনা কেন, আমাকে হাজার অপবাদ

দিলেও আমাকে মুক্তি দেবার শক্তি তোমার ছিল না, আজও নেই। কেন মিথ্যে দম্ভ কর। গোলাপের সৌন্দর্য তার কাটায় লোপ পায় না, কিছুটা দুর্বলতায় ভালবাসা উজ্জ্বলতা পায়। এটা যে তুমি বোঝনা তা নয়। তবু তুমি আঘাত দিতে চাও। দিয়ে যদি তুমি সুখী হও, বুক পেতে দেব তোমার আঘাত গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু মাত্র কদিনেই তোমার এই পরিবর্তন আমাকে যে কি কষ্ট দিচ্ছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এরপরেও কি আমাদের ভালবাসা শুধু দেনা পাওনার হিসাব কববে না? তুমিতো নিজেই বলেছো রেহানা যদি কোনদিন ফিরে আসে তার হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। এখনো বলছি। তাই যদি মনে হয়, তাহলে আমার মনের অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত রেহানা নামটাকে এত ভয় পাও কেন? তারপব বললাম প্রতীমবাবু ও মিনতি সেন, কেউ কাউকে পায়নি কোন দিন, তাই বলে তাদের জীবন উপলব্ধিকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে? তারপর বললাম বলত সেলিনা ওদের নিবেদিত ভালবাসার কোন তূল্য বিকল্প দেখেছো কোথাও? না দেখিনি। তাই বলে না পাওয়াব মধ্যে যে সত্য আছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলব, যে জ্বালা শুধু কাঁদায় আনন্দে ভাসায় না, তা আমি চাইনে। ভুল বললে সেলিনা, ওদের ওই অবয়বহীন ভালবাসায় যদি আনন্দ না থাকতো পৃথিবীর কোন কর্তব্যই তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হতো না। থাক এসব কথা, রাত হয়েছে অনেক এবার ঘুমিয়ে পড়। তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমার যখন ঘুম আসবে তখন আমি নিজেই ঘুমাবো। আমি ঘুমাবো আর তুমি জেগে থাকবে, আমি ঘুমাতে পারব? যদি না পার। তাহলে তুমিও জেগে থাক। ঠিক আছে দেখি তোমার সঙ্গে জেগে থাকা যায় কি না। ইস্ কত যেন ভালবাস আমায়? আমি ওব একটা হাত নিজের বুকের পরে রেখে বললাম, সত্যি তোমায় ভালবাসি না? তুমি বলত, কেমন করে বললে একথা? বলতো আমি কে? আবর সেই ছলনা আবার সেই কথার মারপ্যাচ উত্তরে বললাম তুমি! তুমি! ও জেদ ধরে বলল তুমি তুমি কি, বলনা আমি কে? আমি পাশ ফিরে ওকে আমার একেবারে বুকের পরে টেনে নিয়ে বললাম, তুমি আমার সেলিনা, কেবল আমারই সেলিনা। না গো আমি শুধু সেলিনা নই। আমি সেলিনার মধ্যে রেহানা। তারপর বলল তোমার কষ্ট আমি বুঝি প্রান্তিক। শুধু দুঃখ হয় যখন অনুভব করি তুমি আমার কষ্টটা ঠিক মত বোঝ না। কে বলেছে বুঝিনা? সেলিনা বলল আমি বলছি আমার মন বলছে। তা না হলে এক বারও কি তুমি আমার কষ্টের কথা জানতে চাইতে না? জানতে চাইতে না আমার এত কষ্ট কি ভাবে লাঘব হতে পারে। তারপরে বলল তুমি ঘুমিয়ে গেলে আমি যে বাকি রাতটা না ঘুমিয়ে কাঁদি একবার কি জানতে চাইতেনা কেন আমার চোখে জল? ওর কথা শুনে নিজের পরে ধিক্কার হয়, আমি কি সত্যিই অন্ধ? উত্তরে বলি, সেলিনা প্রেমের দেবী দিয়েছেন আমার ভিক্ষা পাত্র পূর্ণ করে, আমি যে দীন ভিখারি। তাই হয় তো বুঝিনা তোমার আসল কষ্টটা কোথায়? সেলিনা বলল তাই বলো। তোমাদের মহাদেবতো স্বয়ং ভিখিরি। হিন্দু কুমারীতো তবু তাঁরই মত বর খুঁজে ফিরেছে যুগে যুগে। তারপর আমাকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করে বলল আমার মাথা ঠিক ছিল না। আর আমি যখন তোমারই, পারলে না আমায় আঘাত করতে? আঘাত যে তোমাকে অনেক দিয়েছি তোমার কষ্টই

তো তা বলে দিচ্ছে। আরো আঘাত চাও? হ্যাঁ চাই, যত পার আমায় আঘাত কর। আঘাতে আঘাতে আমায় তুমি তোমার করে নাও প্রান্তিক। সেলিনার মধ্যে বেঁচে থাকুক তোমার রেহানা, ও মারা গেলে যে হারিয়ে যাবে তোমার সেলিনাও। এখনো অভিমান। না গো, বিশ্বাস করো, যতক্ষণ তোমায় পাব, যেন সবটুকু তোমাকে পাই। আর তোমার পূর্ণতা তো রেহানা ও সেলিনার প্রেমে। তাহলে কেন কষ্ট পাও? আমার তো কোন কষ্ট নেই। তারপর বলল কিছু চাইবেনা? চাইবো? না তুমি দাতার মত দুহাত ভরে দেবে? আজ আমি শুধু গ্রহণ করব। ভিখিরি মহাদেবের ভিক্ষের দানে নিজেকে নেব পূর্ণ করে, দেবেনা ? দাও প্রান্তিক দাও আমাকে পূর্ণ করে, তোমার প্রেমে, তোমার ভালবাসায়, তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্খার সর্বগ্রাসী বন্যার মতো আমায় তুমি ভাসিয়ে নিয়ে যাও প্রান্তিক।

পরীক্ষার মাস খানেক বাকি আছে। মিনতি সেন একদিন সেলিনাকে ডেকে বললেন, তোর মা কাল ফোন করেছিল একবার ওখানে যেতে। যাবি আজ? নিশ্চয়ই যাব। তা হলে প্রান্তিককে বল। তুমিও চল না। দূর পাগলি, তোরা যাবি মায়ের ওখানে আমি কেন যাবো? মিনতি সেন আর কোন কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমাকে যখন বলল, আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। কয়েকদিন নীলাঞ্জনা পিসির জন্য ভীষণ মন খারপ করছিল। সেলিনা বলল, একটা কথা বলব? বল। তোমার পরীক্ষার আর কদিন বাকি আছে? ঠিক মত ধরলে ২৫ দিন। শেষ হতে আরো ১০ দিন। সেলিনা বলল তার মানে মোট ৩৫ দিন। এই ৩৫টা দিন তুমি আমাকে রেখে আসবে মায়ের কাছে? আমাকে বুঝি ভাল লাগছে না। তারপরে হেসেবললাম, বেশ রেখে আসব, কিন্তু ওখানে এতদিন থাকতে চাইছো কেন? দেখ মায়েরও একটা মন আছে। তোমার পরে তারও একটা দাবী আছে। কিন্তু সত্যি করে বলতো, মায়ের সেই দাবী কি তুমি পূরণ করেছো? আরো বলল, তুমি হয়তো ভাবছো তোমার মায়ের শূণ্যতা যতবেশি পূরণ করতে পারবে ততটাই তোমার লাভ? বুঝলাম না। তুমি ভালো করে জান, তুমি না চাইলেও তোমার দাদুর এই বিশাল সম্পত্তির মালিকানা একদিন তুমি পাবেই। তোমার মা, এর কোন কিছুতেই কোন দিন হাত দেবেন না। আর সেই কৃতজ্ঞতায় তুমি এখান থেকে যেতে পারছ না। কিন্তু আমার মাতো তোমার পিসি, আজকের তোমাকে গড়ে তোলার কারিগরতো আমার মাই, তুমি অস্বীকার করতে পার? যা সত্য, তাকে অস্বীকার করা যায়? তা হলে এতদিনেও কয়েকটা রাত সেখানে থাকলেনা কেন? হয়তো তুমি ঠিক বলেছো সেলিনা আমি যে তা বুঝিনা তাও নয়, কিন্তু পিসিও তো একবারও বললেন না, তোরা কদিন থেকে যা প্রান্তিক। তিনি হয়তো অভিমানে বলেননি, তাই বলে তুমি থাকবেনা কেন? তাছাড়া মায়েরতো আজ কোথাও কেউ নেই। একটুও বুঝবেনা তার কথা?

ও যা বলছে কোন ভাবে তা অস্বীকার করতে পারিনা। বললাম, তাহলে পরীক্ষার এ কয়দিন আমরা ওখানেই থাকি। আমি কিন্তু সে কথা বলিনি প্রান্তিক। তারপর বলল দেখ, একটা কথা বলছি, তুমি অন্য ভাবে নিওনা। বল। আমি তোমার কাছে থাকলে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে। আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমি যদি বলি তার উল্টোটা হবে। ও

মৃদু হেসে বলল উল্টো টা যে হওয়ার নয় তার প্রমাণ গত একমাস। সুতরাং আমার পরে রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, মায়ের ওখানে গিয়ে আমি যে কোন অজুহাতে থেকে যেতে চাইব। তুমি এতে না করোনা। কিন্তু পিসি যদি কিছু বলেন বা কারণটা জানতে চান? দোষটা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিও। বলবে তোমাব পড়াশুনার অসুবিধা হবে। আচ্ছা তাই হবে।

সিদ্ধান্তটাকে বাস্তবায়িত কবতে খুব একটা অসুবিধা হয় নি। ওনারাও হয়তো মনে মনে চাই ছিলেন এমন কিছু। কিন্তু পিসির কাছে দুই দিন থাকতে হয়েছিল।

এই দুইদিনের মধ্যে প্রতীমবাবু একদিন ফোন করেন মিনতি সেনের বাড়ীতে। হ্যালো! মিনতি সেন ইজ স্পিকিং। ও নমস্কার, আমি প্রতীম চৌধুরি বলছি। নামটা শোনামাত্র অকারণ হাতটা কেঁপে গেল মিনতি সেনেব। কোন ভাবে নমস্কার করে বললেন কেমন আছেন? উত্তর এড়িয়ে গিয়ে প্রতীমবাবু বললেন, প্রান্তিক বা সেলিনা কেউ কি কাছে আছে? খুব দরকার? হ্যাঁ দরকার একটু ছিল। আমাকে বলা যায় না? যায়, তবে কিভাবে নেবেন। তা হলে থাক, আমি ওদের সংবাদ পাঠিয়ে দেবো। না দরকার নেই আপনাকেই বলছি, মিনতি সেন শোনার অপেক্ষায় চুপ করে থাকেন। প্রতীম চৌধুরী বলেন, প্রান্তিক কি আজ একবার আসতে পারবে? আজই? কেন অসুবিধা হবে? না, তা নয়, আসলে ওরা নীলাঞ্জনার ওখানে। ওদের বাড়ীতে তো কোন ফোন নেই। নীলাঞ্জনা অফিসে গেলে সংবাদটা দেওয়া যাবে। তা হলে থাক দরকার নেই। বরং ওরা আসলেই সংবাদটা দেবেন। তা না হয় দেব, কিন্তু আপনার প্রয়োজনটা কিন্তু বলেননি, তাছাড়া আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার শরীরটাও ভাল নেই। না না শরীর ঠিক আছে। তবে যা মনে হচ্ছে সেটা ২/৩ দিন অফিসে যাচ্ছিনা বলেই হয়তো মনে হচ্ছে। কেন অফিসে যাচ্ছেন না কেন? ভাবলাম ২/১ দিন বিশ্রাম নেওয়া যাক তাই আর কি? আপনার কোয়ার্টার কি অফিস লাগোয়া? হ্যাঁ অফিস কমপাউন্ডের মধ্যে তবে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, প্রান্তিক চেনে। আজো অফিসে যাবেন না। না ভাবছি আরো কয়েকটি দিন বিশ্রাম নিয়ে দেখি। কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় না বিশ্রামের মধ্যে। সেলিনাকে পাঠিয়ে দেব? কয়েকদিন থেকে আসবে আপনার কাছে। না না দরকার নেই মিস সেন। বড্ড বেশী লোভ হয়ে যাবে তাছাড়া প্রান্তিকের তো পরীক্ষা এসে গেলো মনে হয়। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে বললেন কোন দরকার নেই মিস সেন বরং আজ বা কাল যদি কিছুক্ষণের জন্য প্রান্তিক আসতে পারে ভাল হয়। আচ্ছা দেখছি, ধন্যবাদ। ফোন ছেড়ে দিলেন প্রতীমবাবু। মিনতি সেন ভাবছেন কি করবেন, অফিসে যাচ্ছেন না ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অথচ বলছেন শরীর ঠিক আছে। এখন যদি প্রান্তিককে বলি, তাহলে হয়তো তার পড়াশুনা বন্ধ করে ওখানে কয়েকদিন যাতায়াত করবে অথবা থাকবে। অসম্ভব নয় তাতে ওর পড়াশুনার ক্ষতি হবে। এমনিতেই তো যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এক নিজে গিয়ে দেখে আসা যায়। মনে মনে ভাবলেন যদি কিছু ভাবেন? একটা মন যুক্তি খাড়া করে ভাবে ভাববেন, তাই বলে এত আশা করে যিনি ফোন করলেন, তার প্রয়োজনটাও তো জানা দরকার। অবশেষে অফিসে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়লেন মিনতি সেন, আর এই প্রথম কোন এক জনের কাছে যাচ্ছেন মিনতি সেন, যিনি তার প্রেমিক নন, তার স্বামী নন, অথচ তার মনের

অবচেতনায় আজো যিনি বেঁচে আছেন স্বপ হয়ে, যে স্বপ্ন কোন দিনই হয়তো পূর্ণ হবে না। পূর্ণ হওয়ারও নয়। পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে দুরুদুরু একটা আশঙ্কা। কি জানি যদি কিছু মনে করেন উনি। আবার ভাবেন যদি কিছু মনে করেন, করবেন। কিন্তু যে মানুষটা তারই একটা ছোট্ট উত্তরের জন্য আজ দীর্ঘ ২৫টি বছর জীবনের স্বাদ আহ্লাদ ত্যাগ করেছেন, বিপদের সময় তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো কি তার কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না? প্রতীম বাবুর অফিস চত্তরে ঢুকে, কেমন যেন পা দুটি আর চলতে চাইছেনা। একটা ভীতি ময় অনুভূতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন, বড় সাহেবের বাংলো কোনটি? বেয়ারা কোন রকম প্রশ্ন না করে তাকে নিয়ে এলেন বড় সাহেবের বাংলোতে। কাঁপা কাঁপা হাতে বেল টিপলেন মিনতি সেন। একজন নার্স বেরিয়ে এলেন। কাকে চাই? সাহেব ঘরে আছেন? হ্যাঁ। আছেন একটু ডেকে দেবেন? উনিতো অসুস্থ? অসুস্থ? কতদিন। তা বেশ কিছুদিন হল। আপনি? আমি এখানকার একজন সিস্টার। ওনাকে দেখাশুনা করি। আপনি একাই দেখাশুনা করেন? হ্যাঁ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আমি দেখাশুনা করি। আর রাতে, ওর অফিসের একজন বেয়ারা থাকেন। মিনতি সেন জানতে চাইলেন ভিতরে আসতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ আসুননা।

মিনতি সেন কয়েকটা ঘর পরে গিয়ে দেখেন একা নিঃসঙ্গ ভাবে শুয়ে আছেন প্রতীমবাবু। ঘুমাচ্ছেন। মিনতি সেন বললেন, যখন জাগবেন তখনি কথা বলা যাবে। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছিনা। আমাকে চেনার কি খুব দরকার? না এমনিতে কিছু নেই, তবে যদি দেরি না করতে পারেন, তা হলে সাহেবকে বলতে হবে তো? না, তার কোন দরকার নেই, আমি ওর সঙ্গে দেখা করেই যাবো। তবুও যদি কিছু মনে না করেন! বলুন। আমি সাহেবকে বলেছিলাম, আমাকে যদি আজ ছুটি দিতে পারেন আমার বাবা খুব অসুস্থ। উনি বলেছিলেন দেবেন। ওঁর কে এক আত্মীয় ভাইপো বোধ হয় এসে থাকবেন। আমি সেই ভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু পরে উনি লোক পাঠিয়ে জানালেন যদি অন্তত ঘণ্টা দুয়েক থেকে যাই। দেখুন প্রায় ৪ ঘণ্টা হয়ে গেছে, কিন্তু সাহেব এখনো কিছু বললেন না। মিনতি সেন বললেন তবে চলে গেলেন না কেন? কি করে যাই এই অসুস্থ মানুষটাকে ফেলে বলুন? এখন যদি আপনি কিছুক্ষণ থাকেন, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, ঘণ্টা চারেক পরে আমি ফিরে আসবো। তারপরে আকুল ভাবে বললেন, আমি না যেতে পারলে ভীষণ অসুবিধা হবে। মিনতি সেন বললেন, আচ্ছা আপনি যান আমি থাকবো আর যাওয়ার আগে শুধু বলে যান কখন কি খাওয়াতে হবে। মেয়েটি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন। তারপর ও সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। মিনতি সেন ততক্ষণে, ঘরের এলোমেলো জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখলেন। যেখানে যেগুলি রাখলে সুন্দর হয় সেখানে সেগুলো রেখে বদ্ধ ঘরের জানালা গুলো খুলে দিলেন। বাইরের ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকলো ঘরে। জানালা দিয়ে ক্যামপাশের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ দেখা যাচ্ছে। মিনতি সেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন প্রতীমবাবুর মাথার কাছে মুখোমুখি। কি কাহিল হয়ে গেছেন, কদিনে। ভীষণ মায়া হতে লাগল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে। জুলপির কাছে চুলে পাক ধরেছে

সঙ্গে গাম্ভীর্য মিশে তাকে যেন আলাদা সৌন্দর্যের অধিকারী বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ পাশ ফিরে শুতে গিয়ে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে মিনতি সেনের চোখে চোখ পড়ল। অবাক হয়ে বললেন আপনি? উঠে বসতে চেষ্টা করলেন প্রতীম চৌধুরী। মিনতি সেন তাকে বাধা দিয়ে বললেন উঠবেন না। কতক্ষণ এসেছেন? তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হবে। অথচ আমাকে ডাকেন নি? না ডাকিনি কারণ আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। এরপর স্মিত হেসে বললেন, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বাস ভেঙে গেছে কি বলেন? বুঝতে পারলাম না। কেন মাত্র কয়দিন আগে তো বলেছেন, ঈশ্বর অপনাকে অসুস্থ করতে ভুলে গেছেন। একটু লজ্জা পেয়ে প্রতীমবাবু বললেন, আপনি কেন কষ্ট করে আসতে গেলেন? মেয়েটি আবার কোথায় গেল কে জানে? কে আপনার নার্সতো? হ্যাঁ? ওকে তো আপনি আজ ছুটি দেবেন বলেছিলেন। বলেছিলাম, কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম প্রান্তিক আসতে পারবেনা, তখন বাধ্য হয়ে ওকে আবার ডেকে পাঠাতে হলো। খুব ভাল। এই মন নিয়ে আপনি নাকি মানুষের উপকার করেন। তারপর বললেন যে মেয়ে তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি পায় না, সেই মন নিয়ে মানুষের কষ্ট বুঝবেন কি করে? তারপর বললেন তা ও যে চার্ট দিয়ে গেছে, তাতে তো আপনার লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। কি খাবেন? যদি ও কিছু করে গিয়ে থাকে ভাল, না হলে খাওয়া আজ আর হবে না। বাঃ চমৎকার। এরপর মিনতি সেন বললেন এতবড় কোম্পানীর সর্বেসর্বা আপনি। অজস্র প্রতিষ্ঠান চালান, তারা পালা করে কেউ থাকতে পারল না আপনার দেখাশুনার জন্য?. প্রতীমবাবু চুপ করে আছেন, কি উত্তর দেবেন এর? ম্যানেজমেন্ট তাকে নাসিং হোমে থাকতে বলেছিলেন, তিনি রাজী হননি। তারা যে পালা করে থাকবেন, সে উপস্থিতির আর্জিও মঞ্জুর হয়নি। একথা কি করে বলা যায়। মিনতি সেন ভিতরে গিয়ে কফি এবং বিস্কুট নিয়ে এলেন। নিন খেয়ে নিন। কোথায় পেলেন? বা অদ্ভুত প্রশ্ন তো? আপনার ঘরে সবই আছে, আর আমি একটি মেয়ে, কোথায় পেয়েছি এটাও আপনাকে বলতে হবে? প্রতীমবাবু বললেন, আপনার কফি? আনি বলে মিনতি সেন, আরেক কাপ কফি নিয়ে এলেন। তারপর বললেন, দাড়ি কামাননি কেন? পাজামা পাঞ্জাবিও তো বেশ কয়েকদিন পরে আছেন মনে হচ্ছে? কফিটা খেয়ে ও গুলো ছেড়ে দিন। কি করবেন? ভয় নেই কিছুই করবনা, বাথরুমে রেখে যাবো। তারপর বললেন, কি অদ্ভুত মানুষ আপনি, সত্যি কথাটিও বলতে পারেন না। প্রতীমবাবু বললেন সত্যি কথা না বললে আপনি এলেন কেন মিস সেন? মৃদু হাসলেন মিনতি সেন এবং বললেন আপনার এই অবোধ্য ভাষা কজনে বোঝেন বলুন তো। জানিনা, কিন্তু আপনি যে বুঝেছেন, আপনি কি তা অস্বীকার করতে পারবেন? তারপর বললেন এই মন নিয়েই তো আপনি সেদিন বলেছিলেন কোন অধিকারে আমাকে থাকতে বলবেন ম্লান হেসে এরপর বললেন আজ কি প্রশ্ন করা অসঙ্গত হবে, যে কোন অধিকারে আপনি এলেন?

মিনতি সেনের মনের মধ্যে চলছে সাগরের উন্মত্ততা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে ভেঙে দিচ্ছে তার চিন্তার সাবলীলতা। বললেন, আমার না হয় আপনাকে থাকতে বলার অধিকার ছিল না। কিন্তু আপনার তো ছিল, সেই অধিকারটা কেন প্রয়োগ করলেন না।

কেন অতরাতে মিথ্যে অজুহাতে ফিরে এলেন? সারাটা জীবনতো আঘাত পেয়ে চলেছেন, আর কত আঘাত পেতে চান? অবাক হয়ে প্রতীমবাবু বললেন, আঘাত? না মিস সেন, আঘাত আমার বুকে বাজেনা। নিজের বুকে বাজেনা বলে বুঝি অন্যের বুকে তা ফিরিয়ে দিয়ে আনন্দ পান?

মিনতি সেন উঠে চলে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, গায়ে কি এখনো জ্বর আছে? না, তা হলে, চলুন বাথরুমে। ভাল করে মাথায় জল দেবেন। গা টাও ভাল করে মুছে নিতে পারবেন। কিন্তু। আবারও সেই মৃদু হাসি মিনতির ওষ্ঠে। বললেন আমাকে স্পর্শ করতে যদি সঙ্কোচ বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার কাঁধে ভর দিন। তারপর চলুন। প্রতীমবাবু বললেন, না থাক, মিস সেন। কি দরকার, একটা দিনের আনন্দ যজ্ঞে ভাগ বসিয়ে। তার থেকে যেমন আছি তেমনিই থাকি না। আমার তো অসুবিধা হচ্ছে না। মিনতি সেন বললেন, জীবনে একটা দিনের স্মৃতি কি কম? তুচ্ছ ঘটনায় কত জীবন উৎসর্গীত হয়ে যায় জানেন? জানি। তাহলে? প্রতীমবাবু বললেন আপনি বোধ হয় জানেন না তুচ্ছ ঘটনায় উৎসর্গীত সেই জীবন, কি ভাবে তার দেনার ঋণ শোধ করে চলে। জানি। জানেন? না জানলে, এলাম কি করে? তারপর বললেন আর কথা বাড়াবেন না, এমনিতেই লাঞ্চের দেরি হয়ে গেছে।

মিনতি সেন কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন, তবু সঙ্কোচে আড়ষ্ট প্রতীমবাবু বললেন, আপনি আগে আগে চলুন, যদি অসুবিধা হয় আপনার সাহায্য নেবো। মিনতি সেন বললেন আপনি কারো কষ্ট বোঝেন না তাই না? হয়তো হবে মিস সেন। আসলে, আমরা কেউ কারো কষ্ট বুঝিনা, অথচ নীরবে বয়ে চলি তা। তাহলে খানিকটা বোঝা নামিয়ে হালকা হতে চেষ্টা করুন না। বেশ। প্রতীমবাবু খাট থেকে নেমে হাত রাখলেন মিনতি সেনের কাঁধে। আর তাতেই ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো তার সমস্ত শরীর। প্রতীম বাবু বললেন, একি হল মিস্ সেন? শরীর খারাপ লাগছে? না, চলুন।

রেজার এগিয়ে দিয়ে মিনতি সেন বললেন, দাড়িটা কেটে ফেলুন আমি আছি। আর মনকে বোঝাবার চেষ্টা করুন আপনার কোন কষ্ট নেই। আপনার কিছুই হয়নি, আপনার কোন কিছুরই অভাব নেই। সবই তো আছে আপনার। দেখবেন শরীরের কষ্ট এমনিতেই চলে গেছে। আশ্চর্য দুটো চোখ মেলে তাকালেন প্রতীমবাবু। মিনতি সেনও এই প্রথম বার সরাসরি তাকালেন তার দিকে। প্রতীমবাবুর দাড়ি কামানো হয়ে গেলে, মিনতি সেন এগিয়ে এসে, তার মাথাটা ভাল করে ধুয়ে দিলেন, জামাটা খুলে ফেলে, গীজারে করা গরম জলে গামছা ভিজিয়ে ভাল করে মুছিয়ে দিলেন সমস্ত শরীর। তারপর বললেন, এই নিন, পাজামা পাঞ্জাবি, ওটাকে খুলে রেখে, এটা পরে নিন। আর হয়ে গেলে আমাকে ডাকবেন, আমি বাইরে আছি। প্রতীমবাবু কোন রকম অবাধ্য না হয়ে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দরজার বাইরে পা দিলে মিনতি সেন এগিয়ে এসে তার হাতটা নিজের কাঁধের পরে নিয়ে বললেন চলুন। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীমবাবু মাথার চুলটা ঠিক করে নিয়ে বিছানায় বসতে গেলে মিনতি সেন বললেন, খাবেন না কিছু? অসহায় শিশুর মত

প্রতীম বাবু বললেন খাওয়াতো দরকার কিন্তু আছে কি কিছু? আবার সেই মধুর হাসি মিনতি সেনের ওষ্ঠাধরে মিলিয়ে গেল। বললেন, ডাইনিং টেবিলে আসুন। মিনতি সেন খাবার সাজিয়ে দিলে অবাক হয়ে প্রতীমবাবু বললেন, এসব আপনি কোথায় পেলেন মিস সেন। হাসি আড়াল করে বললেন আপনার রান্না ঘরে। আপনি খাবেন না? খাবো, আপনি আগে খেয়ে নিন। তা হয় না, আপনিও বসুন। আপনি বড় বেয়াড়া তর্ক করেন, আগে খেয়ে নিন, তাছাড়া এসময় আমি খাইনা। প্রতীমবাবু এর পরে আর তাকে জোর করলেন না। এমনতেই কেন যেন মনে হচ্ছে অনেক বেশী দাবী করা হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু শেষ হতে প্রায় ৪টা বেজে গেল। মিনতি সেন বললেন এবার আমাকে যেতে হবে। আশা করব কাল না হলেও পরশু আপনি অফিসে জয়েন করতে পারবেন।

কে যেন বেল দিল। মিনতি সেন এগিয়ে এসে দেখেন সকালের সিস্টার। উনি খেয়েছেন তো? সে আপনি দেখবেন, আপনার পেসেন্ট ঠিক মত শুশ্রুষা করা গেছে কি না। কিন্তু সিষ্টার ঘরটাকে এমন নোংরা করে রেখেছিলেন কেন? পেশেন্টের জামা-প্যান্ট তো মনে হয় কয়েকদিন ধরে পাল্টাননি, জানলাগুলো বন্ধ রাখেন কেন? শুধু ওষুধ খাওয়ালে কি রোগী চিকিৎসা হবে? ভয়ে ভয়ে সিষ্টার বললেন উনিতো কথা শুনতে চাননা। কথা না শুনলে জোর করে শোনাবেন। তারপর প্রতীমবাবুকে বললেন দেখুন মিঃ চৌধুরী সিষ্টারের কথার অবাধ্য হবেন না। তারপর বেরিয়ে এলেন মিনতি সেন একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না।

গতকাল আমার পবীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম সেলিনা - পিসিকে নিয়ে আসবে। কিন্তু আসেনি। মিনতি সেন বললেন আজ কি তুই যাবি তোর পিসির ওখানে? কেন? বা রে? মেয়েটা ওখানে কতদিন থাকবে? ওকে নিয়ে আসবি না? আজ আমার কাজ আছে মা। অফিস থেকে ফেরার পথে তুমি যেওনা। কেন তোর কি নিয়ে আসতে লজ্জা করছে? না। তবে? আমিতো বলেছি আমার কাজ আছে। তুমি যেতে পারবেনা? দেখি বলে অফিসে বেরিয়ে গেলেন মিনতি সেন।

আধ ঘন্টা পরে ফোনটা বেঝে উঠলো। হ্যালো। বলতো কে বলছি? সেলিনা। তা হলে চিনতে পারছ? কবে আসছ? মা যাচ্ছেন বিকেলে। তুমি আসবে না? কেন? ভীষণ ভাবে একটা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে। পিসি কোথায়? অফিসে। তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? রাস্তার একটা বুথ থেকে। তা হলে নুন শোতে চলে এস। বললাম মা আবার কখন যাবে কে জানে। যদি গিয়ে আবার তোমাকে না পান, কষ্ট পাবেন। ও জোর করে বলল কিছু কষ্ট পাবেননা। তুমি এস তো। কতদিন তোমাকে দেখিনা। এরপর সিনেমা দেখে আমরা যখন এলিট থেকে বেরোলাম, একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল অনুতপার সাথে। আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালো সেলিনা। হাসতে হাসতে অনুতপা বলল নতুন বৌকে নিয়ে সিনেমায় এসেছিলে? সিনেমায় এসেছিলাম ঠিকই, তবে নতুন নয় বেশ কিছুদিনের পুরানো বৌকে নিয়ে। হেসে উঠলাম আমরা সবাই। তারপর অনুতপা বলল, তুমি কিন্তু ডাবল লাভ করেছো প্রান্তিক। মানে? পরিচিত যে কেউ হঠাৎ ওকে দেখে

বলবে রেহানা। অথচ আমরা তো জানি ও সেলিনা। আমি হাসতে হাসতে বললাম তুমি যা বলেছো, তাইতো আমিও ওকে প্রায়ই ভুল করে রেহানা বলে ডেকে ফেলি। তাতে ও রাগ করে না? ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখোনা। সেলিনা হাসছে। অনুতপা বলল, তার আর দরকার নেই, ওর হাসি দেখে বুঝতে পারছি ও তোমার মন থেকে রেহানার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে চায়। আমি বললাম, তুমিও কি সিনেমা দেখতে এসেছিলে? ভেবেছিলাম, কিন্তু হলো না। কেন? একটা জরুরী কাজ পড়ে গেল। তারপর বলল, চলি তা হলে প্রান্তিক। একদিন বৌকে নিয়ে এসো না। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে আজকাল আর দেখাই হয় না। তা তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে? ভালো। তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবে? চলনা কোথাও গিয়ে চা বা কফি খাওয়া যাক। ও হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের রস ভঙ্গ করে? আমি বললাম, তুমি কিন্তু আগের মত আছো অনুতপা। তোমার কি খুব পরিবর্তন হয়েছে? তা একটু হয়েছে যেমন? এই বাঁধা গরু আর ছাড়া গরুর মধ্যে যে পরিবর্তন তেমনি আর কি? ও বলল আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তবে কি মনে হয়? তুমি আগের মতোই আছো। আমি হেসে বললাম, তা এই কথাটা তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না কেন? ও তোমার কথা শুনছে না? ঠিক তা নয়। তা হলে? তোমার তো বর আসেনি এখনো আসলে দেখতে পেতে সেলিনার সাথে তোমার চিন্তার বেশী কিছু পার্থক্য নেই। কি রকম? এই সব সময় বরকে সন্দেহ করা। অনুতপা বলল তোমার বিচার বড়ই এক পেশে হয়ে যাচ্ছে, বৌ'রা সন্দেহ করে, বর'রা করে না? করে হয়তো, কিন্তু আমার মুসকিল হচ্ছে, সেলিনাকে সন্দেহ করার মত সামনে যে কাউকে পাচ্ছিনা। জিভ কেটে অনুতপা বলল, খুবই পরিতাপের কথা প্রান্তিক, কিন্তু তোমার সন্দেহকে সত্য করতে ও বেচারা যায় কোথায় বলত। বরং তুমি নিজেই কাউকে জোগাড় করে দাও। দাম্পত্য জীবনে একটু কলহ না হলে মধুরতার স্বাদ পাবে না। তুমি জানলে কি করে? তোমার তো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। সব কিছু ব্যক্তি জীবনে ঘটলে অভিজ্ঞতা হবে, অন্যথায় হবে না এমনতো কোন কথা নেই। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, সেলিনা তা মানতে চায় না, নিজের অভিজ্ঞতায় যাচাই না করে ও কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। তা হলেতো আর সমস্যাই রইলনা। কি করে? ওই সমস্যা সৃষ্টি করবে, আবার তা মিটিয়েও নেবে, কি ভাই সেলিনা তাইতো। ও কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলো, তারপর অনুতপাকে বলল অনুদি আপনাকে আমার ভীষণ ভালো লাগেছে। আগেতো আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, আসুন না একদিন। সেদিনই ভাল করে জেনে নেবেন ও যা বলছে, তা ও নিজেই বিশ্বাস করে কি না। তারপর বলল ওতো অবলীলায় এখন যা বলছে একটু পরেই তো অস্বীকার করবে। আমি বললাম দেখলে তো অনুতপা কি ভাবে আমার পিছনে লাগছে। তা দেখলাম বৈকি, তোমার ভাগ্যকে সত্যি হিংসা করতে ইচ্ছে করে। আমি বললাম ইচ্ছে করে, কিন্তু সত্যিকারের হিংসা করোনা তো। নিশ্চয়ই করি। তবু ভালো, তুমি সেলিনার ভাগ্যকে হিংসা করনি, তা হলে যে কত রাত আমাকে জ্বলতে হতো কে জানে? হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এই রে বড্ড দেরি হয়ে গেছে আসি প্রান্তিক, আসি ভাই সেলিনা। সেলিনা বলল, তাহলে আপনি আসছেন তো আমাদের বাড়ীতে? আচ্ছা যাবো।

একটু রাতের দিকে মিনতি সেন সেলিনাকে নিয়ে ফিরলেন। বললেন, ওকে নিয়ে এলাম ঠিকই কিন্তু কাল বা পরশু তোর বাবা আসবেন। তোর পিসিকে তোর বাবা যে ভাবে চিঠি লিখেছেন, তাতে খুব ভয় হচ্ছে। বাবার চিঠিতে ভয়ের কথা আছে? অন্তত চিঠিটা পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে। বাবা চিঠিতে কি লিখেছেন? মিনতি সেন বললেন, আমি নিয়ে এসেছি। তুই পড়ে দেখ। পড়তে লাগলাম, বাবা লিখেছেন -

কল্যাণীয়া নীলাঞ্জনা, তোমর চিঠি পেয়েছি, চিঠিতে জানিয়েছো, তোমার মেয়ে সেলিনাকে প্রান্তিক বিয়ে করেছে। সেলিনা মানে যাকে নিয়ে তুমি এখানে এসেছিলে সেই তো? দেখ নীলাঞ্জনা ও যখন বিয়ে করেছে, নিশ্চয়ই জেনে শুনে করেছে। নিজের পরে গভীর বিশ্বাস আছে বলেই আমার বা ওব মায়ের অভিমত নেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। তেমনি তোমরাও কোন প্রয়োজন মনে করোনি। আমরা কিন্তু শুনেছিলাম রেহানা নামে একটা মেয়েকে ও ভালবাসে। আর ওর ভালবাসা যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায়, তাই তারই মঙ্গলার্থে মেয়েটি পথে নেমেছে। একদিন মেয়েটি আমাদের গ্রামেও এসেছিল। চিনতাম নাতো, তবে মেযেটির মিষ্টি মুখ তার নম্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, মনে হয়েছিল এমন মেয়েকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াতে চেয়ে প্রান্তিক কোন অন্যায় করেনি। অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি তাকে ভুলে যেতে বেশী সময়ও লাগেনি। তোমার মেয়েকেও হয়তো ভুলে যেতে ওর বেশী সময় লাগবেনা।

রেহানা এবং সেলিনা নাম দুটো শুনে মনে হচ্ছে তারা আমাদের স্বজাতি বা স্বধর্মীয় কেউ নয়। ধর্মীয় ছুৎ মার্গ আমার নেই। তাই সেলিনাকে আমি আমার পুত্রবধু হিসাবে গ্রহণ করলাম। তোমার মেয়ে এর থেকে বেশী দাবী না করলেই খুশী হবো। আর একটা কথা সমাজকে তোমরা না মানতে পার, আমার তো না মেনে উপায় নেই।

ইতি সীতাংশুদা।

ইচ্ছে ছিল না তুব সেলিনা যেহেতু দাঁড়িয়ে আছে আমার কাছে, তাই পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা তাকে দিয়ে দিলাম। ও পড়ে আমাকে ফেরৎ দিয়ে বলল, তুমি খুব ভাবছ? একটুতো ভাবছি । না ভেবোনা, আমার পরে বিশ্বাস রাখ, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই যেন হয়।

রাতে বলল, বাবা যখন আসবেন, তোমার পিসির ওখানে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। সেকি কথা, উনি কি ভাববেন? ওনার তো ভাবার কিছু নেই, তুমি তোমার মায়ের কাছে আছ আমি আছি আমার মায়ের কাছে। এতে ভাবতে যাবেন কেন? তাছাড়া আমাকে তো উনি মেনে নিয়েছেন। তা হয়তো নিয়েছেন, তবু যে কথা বলেছেন, যে তোমাকেও একদিন ভুলে যাবো। সেটাই তো চ্যালেঞ্জ প্রান্তিক, জীবনে চ্যালেঞ্জ না থাকলে সব কিছু কেমন জলো মনে হবে। কিন্তু তার আশঙ্কা যদি সত্যি হয় কোন দিন। সেলিনা বলল, পৃথিবীর সব আশঙ্কা কি সত্যি হয়, তা হলে তো ঈশ্বরের কোন দরকার ছিল না, মানুষই তার শেষ নিয়ন্তা হতে পারতো। তুমি আমার উপর এত বিশ্বাস রাখছ কেন? কারণ আমি তোমাকে জানি। বুঝি। রেহানাকে তো তুমি ভুলে যাওনি, তুমিতো তাকে প্রতিমুহূর্তে পেতে চেয়েছো

আমার মধ্যে। আমিও প্রতিমুহূর্তে রেহানা হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। তুমি কি বুঝতে পার না আমাকে? পারি সেলিনা, আর এজন্য খুব কষ্ট হয় জান? কেন? আমি বুঝতে পারি না রেহানার শান্ত স্বভাব না তোমার উচ্ছ্বলতা কোনটা আমাকে বেশী টানে। তাছাড়া এই যে একজনের মনকে বুঝে নিজেকে পরিবর্তন করা এই যে ত্যাগ। আমার কষ্ট কমায় না সেলিনা, বাড়িয়ে দেয় মাত্র। আমি তোমাকেও বুঝিনা প্রান্তিক, কখন কি চাও তুমি। আমার উচ্ছ্বলতায় তোমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রেহানার মুখ, তাই তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় রেহানা, আবার আমি যখন শান্ত হয়ে ঠিক রেহানা হতে চাই তখন তোমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সেলিনার ছবি, তোমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় সেলিনা। আমি যে কি ভাবে তোমাকে পাব বুঝিনা। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? কি? আমি বোধ হয় তোমার জীবনে না এলে ভাল হতো। আমি কিন্তু তা ভাবিনা। আমি সব সময় চাই, তুমি শুধু তোমার মত হয়ে আমার কাছে এস। না গো তাতে তোমার কষ্ট আরো বাড়বে। তুমি শুধু আমার কষ্টটা দেখলে নিজের কষ্টটা দেখছনা? তোমাকে সুখী করার জন্য, তোমার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কোন কষ্টটাকেই আমার কষ্ট বলে মনে হয় না। জানতো মেয়েরা কোন সুরে বাজবে তা নির্ভর করে পুরুষের ইচ্ছের পরে। নারী দেহতো একটা যন্ত্র মাত্র। তাতে সুর দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষের। তুমি যে সুর বাজাতে চাইবে, যদি সে সুরে বাজতে না পারি তা হলে বুঝবে, যন্ত্রটাই বিকল হয়ে গেছে। তারপর একটু থেমে বলল, আমার জন্য ভেবোনা প্রান্তিক, তোমাকে সুখী দেখার জন্য আমার কোন কষ্টটাকে কষ্ট বলে মনে হয় না। দেখো, তোমার বাবা, আমাকে সেলিনা হিসাবে ভাবতেই পারবেন না, তার চিন্তায় তাল গোল পাকিয়ে যাবে। আমি বললাম, তাতে যদি তিনি ভুল বোঝেন। যদি মনে করেন, তুমি একজন নিখুঁত অভিনেত্রী, তুমি যদি ছোট হয়ে যাও তার কাছে আমার কষ্ট কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে বুঝতে পারছ? বাবার কাছে সন্তান তো সব সময় ছোট। তুমি ভেবো না। কতদিন পরে তোমাকে কাছে পেয়েছি, মিথ্যে মন খারাপ করে রাতটাকে নষ্ট করো না প্রান্তিক। কাছে এস। ওর আকর্ষণে মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম ওর মধ্যে '

সকালে মিনতি সেন বললেন, তুই নাকি যাবি না, পিসির কাছে। হ্যাঁ মা, ভট্টাচার্য সাহেবেরে ওখানে একবার যেতে হবে। উনি বলেছিলেন, পরীক্ষার পরেই যেন জয়েন করি। কিন্তু তুই যে বললি, তুই তোর কাকুর ফার্মে জয়েন করবি। বলেছিলাম। কিন্তু কাকু নিজেই বললেন, আমি যেন ভট্টাচার্য সাহেবের দেওয়া অফারটা গ্রহণ করি। যা ভাল বুঝিস কর। ভবিষ্যতে আমাকে দোষারোপ করবিনা। আমি বললাম মা, কাকু বা ভট্টাচার্য সাহেব যাই বলুন না কেন কিন্তু তুমি যা বলবে, তাই হবে। দেখ এতবড় দায়িত্ব আমাকে দিস না। তোরা এযুগের ছেলে মেয়ে। ভবিষ্যত আমাদের থেকে অনেক ভালভাবে বুঝতে পারিস। তাই সিদ্ধান্তটা তোদেরই নেওয়া উচিৎ। তুমি রাগ করছ। রাগ করব কেন? শোন মা, আমাকে প্রথমে কাকুই জানান যখন উনি মেদিনীপুরে ছিলেন। আমি ওদের ওখানে কাজ করব না ভট্টাচার্য সাহেবের অফার গ্রহণ করব, আমার এ প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন, আমি কি ভাবে ওর কাছে এই উপদেশ চাইছি। বলেছিলাম আমার একজন শুভাকাঙ্খী হিসাবে। তখনি

উনি বলেন, তা হলে তোমার ভট্টাচার্য সাহেবের অফার গ্রহণ করা উচিৎ।

ঠিক সেই সময়ে ফোনটা বেজে উঠলো। মিনতি সেন বললেন হ্যালো। সুরেশ ভট্টাচার্য স্পিকিং। ও বলুন। প্রান্তিক আছে? হ্যাঁ আছে? ওকে দেবেন? ধরুণ। আমি বললাম হ্যালো? হ্যালো ইয়ং ম্যান, মিঃ চৌধুরী তো বললেন, তুমি পরীক্ষার পরে জয়েন করবে? কি হল, তুমি কি তোমার মত বদল করেছো নাকি। না না, মত বদলাব কেন? তাহলে কবে জয়েন করছ? ওরা আমার কথায় ২ মাস চেয়ার ফাঁকা রেখেছেন। আর তো রাখা সম্ভব নয়। আমি আজিই আপনার সঙ্গে দেখা করছি। এতক্ষণ মাযেব সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। থ্যাঙ্ক য়ু। ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

মিনতি সেন বললেন, তোর কাকু যখন বলেছেন, তখন ভট্টাচার্য সাহেবের অফারটাই গ্রহণ কব। আমি বললাম তুমি মন থেকে বলছ তো মা। উনি তা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে, তোরা তোদের কাকুকে খুব ভালবাসিস তাই না? সেতো তোমার জন্য মা। আমার জন্য? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন মিনতি সেন। তারপর অবশ্য বলেন তা হলে কি বলতে চাস্ তোব কাকুর মধ্যে ভালবাসার মত কিছু নেই, শুধু আমার মুখ চেয়ে তাকে ভালবাসিস?বললাম, এই ভাবে নিচ্ছ কেন? বড় কথা হচ্ছে কাকুকে ভাল না বেসে উপায় নেই, আর তিনিও এত ভালাবাসেন যে, কোন ভাবে এড়িযে যাওয়া যায় না। তাই আমরা শুধু সেতু রচনা করে চলেছি। সেলিনা কাছে ছিল না, তাই বললাম, আমি ছেলে, হয়তো একথা আমার বলা উচিৎ নয়, তবু বলছি মা, কাকুকে একটু বোঝার চেষ্টা করো। তাকে বুঝে আমার কি লাভ? কিছুই লাভ নেই মা? তাহলে তুমি গিয়েছিলে কেন ? চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো মিনতি সেনের। অপমান আর লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। নিজেকে খানিকটা সংযত করে বলল, সব কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে? কেন দেবে না? তুমিতো মা, তোমার ভালমন্দ দেখার কোন দায়িত্ব আমার নেই? আর তা যদি না থাকে, তবে আমিও বলে দিচ্ছি, তোমার লোক দেখানো ছেলে আমি হতে পারব না। যেন কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, বললেন প্রান্তিক। বললাম মা, তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য এসব বলিনি, শুধু বলতে চেয়েছি মন কোন বয়সেই মরে না, ভালবাসা মরে না কখনো। যদি কারো তা হয়, তার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। কাকু তোমাকে তারপর তিনবার ফোন করেছেন, তিন বারই তার কণ্ঠ শুনে তুমি কোন কথা না বলে ছেড়ে দিয়েছো, কিন্তু কেন? তোকে কে বলল? যেই বলুক কথাটা সত্যি কিনা, তাই বল। উনি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, কি হল বল? দেখতে পাচ্ছি মিনতি সেনের চোখ বেয়ে টপটপ করে জল নেমে আসছে। আমি কাছে এগিয়ে এসে তার আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, এত কষ্ট নিজের ভিতরে চেপে রাখ কেন মা? তুমি ভয় পাচ্ছ তোমার কোন আচরণে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি। না মা, পারবনা তোমাকে ছেড়ে যেতে, তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি বারবার তোমার কাছে আসব। কতবার তাড়াবে তুমি আমাকে? তুমিতো শুধু আমার মা নও তুমিতো রেহানারও মা, ভুলব কি করে বল। উনি শুধু বললেন, প্রান্তিক সত্যি তুই আমাকে ছেড়ে কোন দিন যাবিনা। কোথায়

যাব বল। তখনো মিনতি সেনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরছে। বললাম মা, এবার কষ্টটাকে একটু ভাগ করে নাও না। মিনতি সেন সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন ভট্টাচাজ সাহেবের ওখানে কখন যাবি? আমিতো ওর অফিসে যাব, খেয়ে দেয়েই যাব। তারপর বিকেলে সেলিনাকে ও বাড়িতে রেখে আসব। সেই ভাল বললেন মিনতি সেন।

ভট্টাচার্য সাহেব বললেন, তা হলে কাল জয়েন করতে পারবে তো। আপনি যদি বলেন, তা হলে আজও জয়েন করতে পারি। না তার আর দরকার নেই। তুমি কালই জয়েন কর। ওরা তোমাকে আলাদা কোয়ার্টার দেবে বলেছে। দিন সাতেকের মত দেরি হবে। ততদিন সব প্রস্তুত করে নাও। কোয়ার্টার নিতেই হবে? না নিয়ে কি করবে, ভাড়া বাড়ীতে থাকবে? না মানে আমাকে কোথায় যেতে হবে? সেকি? তুমি তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখনি। না দেখা হয় নি। বা অপূর্ব। আমি প্রয়োজন বোধ মনে করিনি কাকু, কারণ আমি জানি, আপনি যা করেছেন, তা বুঝে শুনেই করেছেন। উনি বললেন, তোমার কাছে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আছে? হ্যাঁ আছে তা হলে বের করো।

আমি বের করে দেখি, ওতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, শিলিগুড়িতে কোম্পানীর একটি ব্রাঞ্চে আমাকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করে পাঠানো হচ্ছে। ২ বছর থাকতে হবে ওখানে ' তারপর আমার কাজে ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট হলে, কলকাতার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।

বললাম, তার মানে কালই আমাকে শিলিগুড়ি যেতে হবে? না, সাতদিন তোমাকে হেড কোয়ার্টারে থাকতে হবে। তারপরই শিলিগুড়ি। আমি অকারণে একটা প্রণাম করে উঠে পড়লাম, কিন্তু উনি কোন বাধা দিলেন না।

কাজে জয়েন করেছি কাল, ফোন নং দিয়ে দেওয়া হয়েছে পিসি ও মাকে। আজ অফিসে ঢোকার মিনিট পাঁচেক পরে পিসি ফোন করে জানালেন, আজ ভোরে বাবা এসেছেন। তুমি যদি পার বিকেলে এস। বললাম তুমি অফিস থেকে বলছ? হ্যাঁ, সঙ্কোচে জানতে চাইলাম সেলিনা কি বাবাকে সামলাতে পারবে। ওই তো আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিল। সীতাংশুদাও বললেন, তুমি যাও নীলাঞ্জনা। বৌমা তো আছে। বাবার মুড কেমন দেখলে? গ্রামের মানুষ ভাল বা মন্দ কোনটারই প্রকাশ সোচ্চার নয়। বিকালে আসলে সব জানতে পারবে। এখন ছাড়ছি। মিনতিকে জানিয়ে দিও। তুমি জানিয়ে দাও পিসি সেইটেই ভালো হবে। আচ্ছা।

নীলাঞ্জনা পিসিই সেলিনাকে নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন সীতাংশুদা, তোমার বৌমা। সেলিনা প্রণাম করতেই বাবার চমক আর ভাঙেনা, বললেন আশীর্বাদ করি সুখী হও মা। কিন্তু তোমাকে যেন এর আগে কোথায় দেখেছি বলত। নীলাঞ্জনা পিসি বললেন সে কি সীতাংশুদা, এইতো যখন দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম তখন তো ও-ও গিয়েছিল। না নীলাঞ্জনা, ওকে যেন আলাদা ভাবে কোথায় দেখেছি। সেলিনা, বললেন, ঠিক বলেছেন বাবা, মেয়েকে চিনতে কি বাবার কোন অসুবিধা হয় না কি! বাবার মনে হল

এতো সেই কণ্ঠ যে একদিন বলেছিল, আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন আমাকে মেয়ে হিসাবে মেনে নেওয়ার, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না তো। বাবা বললেন, তোমায় কোথায় দেখেছি মা বলতো। সেলিনা বলল, বাবা তার মেয়েকে কোথায় দেখেছেন এ আমি কেমন করে বলব? যে ছবি মনের মধ্যে রয়েছে তাকে আর নতুন করে কোথায় দেখবেন। সে সব যাক বাবা, পরে না হয় ভেবে দেখবেন আপনার মন থেকে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে আবার ফিরে এসেছে কি না। আপনি এখন ক্লান্ত বিশ্রাম নিন, আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি। দেখি আপাতত কিছু খাওয়ার জোগাড় করা যায় কিনা। আপনি তো চা বা কফি কিছু খেতেন না, এখানে দেব কি? বাবা অবাক হয়ে, তাকালেন ওর দিকে, তারপর বললেন তুমি এত কথা জানলে কি করে মা। বা আপনি তো আমায় অবাক করলেন বাবার পছন্দ অপছন্দ মেয়েকে অন্যের কাছে জানতে হবে? যত দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন বাবা, বললেন, দাও মা, তোমার যা ভাল লাগে তাই দাও। তা না হয় দিলাম, কিন্তু আমি যা রান্না করব তাই খাবেন তো, আবার বলবেন না তো, বহু বছর কাছে না থাকার জন্য মেয়েটা আমার সব ভুলে গেছে, আমার পছন্দ অপছন্দ সব। তারপর বলল কিন্তু বাবা আপনি একা এলেন কেন? মাকে কেন নিয়ে এলেন না? প্রশ্নটা করেই তার কোন উত্তর শোনার অপেক্ষায় না থেকে সেলিনা চলে গেল! নীলাঞ্জনা বললেন, ও যে আমার কতখানি হৃদয় জুড়ে আছে, সে তোমাকে কি বলব সীতাংশুদা। সে আমি কয়েক মিনিটে বুঝতে পারছি নীলু। ওর পরকে আপন করে নেওয়ার শক্তি আমায় অবাক করেছে। তোমাকে বলা হয়নি নীলু। তোমরা দেশের বাড়ীতে যাওয়ার আগে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছিলেন। একে দেখে তাই আমি চমকে উঠেছিলাম। এতো সেই মেয়ে, সেই অধিকার বোধ, সেই মিষ্টি কথা। ও কি বলেছিল জান, আমাকে মেয়ে বলে ডেকেছেন, ভুলে যাবেন নাতো। আমার ভিতরটা যে কি হচ্ছিল তা তোমাকে বুঝাতে পারবনা। পরে শুনলাম ওর নাম রেহানা। প্রান্তিক ওকে ভালবাসে। সত্যি ভাল লেগেছিল প্রান্তিক ওর মত মেয়েকে ভালবেসেছে বলে।

ঠিক সেই সময়ে, কফি, পকৌড়া, আরো কিছু খাবার নিয়ে ঢুকলো সেলিনা, বলল, বাবা, সেই মেয়েটাকে তো আপনি পাগলের মত খুঁজেছেন তাই না? আজ যদি বলি, আমি সেই মেয়ে, পারবেন আমাকে অস্বীকার করতে? না মা পারব না। সত্যি তোমাকেই খুঁজছিলাম, আজ পেয়েছি তোমাকে। আর তো খোঁজার দরকার নেই। না, নেই কিন্তু তোমার মত মেয়েকে আমি যে কি বলে আর্শীবাদ করব বুঝতে পারছি না। মেয়েকে তো বাবা সব সময় আশীর্বাদ করছেনই আবার নতুন করে কি করবেন? তারপর নীলাঞ্জনাকে বলল, মা, তুমি অফিসে যাবেনা? আজ আর যাব না, কতদিন পরে সীতাংশুদার সাথে দেখা, তাছাড়া তুই একা একা পারবি কেন? আমি পারবো না? কি যে বল না মা। বাবা এসেছেন মেয়ের কাছে, আর মেয়ে বাবাকে সামলাতে পারবেনা এ আবার হয় নাকি। তুমি অফিসে যাও, বাবা বললেন, হ্যাঁ নীলু তুমি অফিসেই যাও। কিন্তু প্রান্তিককে যে দেখছিনা ও কোথায়? সেলিনা বলল, সে হবে না বাবা, আগে মেয়ের সঙ্গে সব কথা ফুরোক তবে ছেলে। তাই হবে মা, কিন্তু ও কোথায়? ও তো ওর মায়ের কাছে, তা ছাড়া সবে কালই নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে।

মা অফিসে গিয়ে ফোন করবেন, বিকেলে আসবে। বাবা আর কিছু বললেন না।

বিকেলে এলাম আমি। বাবা বললেন, নীলুকে চিঠিতে আমার আশঙ্কার কথা আমি ফিরিয়ে নিলাম প্রান্তিক। আমি বললাম, ওকে আপনার পছন্দ হয়েছে তো? সেলিনা বলল এই তোমার এক দোষ, মেয়েকে বাবার পছন্দ হয়েছে কি না এটা একটা প্রশ্ন হলো? আজ পর্যন্ত শুনেছো কোন মেয়েকে বাবার পছন্দ নয়? তার চেয়ে তুমি বলতো আমাকে তোমার পছন্দ কি না। বাবা শুধু হাসছেন। নীলাঞ্জনা বললেন, দেখেছো সীতাংশুদা ওরা কেমন ঝগড়া করে। বাবা বললেন দেখছি নীলু, আর ভাবছি এদেরকে যারা এ যুগের ছেলে মেয়ে বলে তাচ্ছিল্য করে তাদের জন্য করুণা হয়। বাবার কথার প্রতি উত্তরে সেলিনা বলে, বাবা আপনার আমাদের যুগে জন্মাতে ইচ্ছে করে না? আগে করত না, কিন্তু তোমাদের যত দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, আমি যেন বার বার তোমাদের মাঝে আসি। তোমাদের এই জীবনটা যদি ফিরে পেতাম? এতো সোজা ব্যাপার বাবা, শুধু গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে কি না সেটাই যাচাই করে দেখতে হবে। কেমন করে? নিজের মনটাকে দিয়ে, আসলে মনটাই তো সব। মনটাকে শুধু আমাদের মত কবে নিন, দেখবেন কোন অসুবিধা নেই। বাবা হাসলেন, বললেন, শিখিয়ে দেবে মা, কেমন করে এই বুড়োমনটাকে তোমাদের মত তরতাজা করে নেওয়া যায়। তাহলে কাল চলুন না আমার সাথে। কোথায়? যেখানে ইচ্ছে। শুধু মনকে একটু স্বাধীনতা দিতে হবে। তা হলে দেখবেন আর কোন অসুবিধা নেই। সত্যি মা কোন অসুবিধা নেই। তাইতো আজন্ম সংস্কারকে তুমি হেলায় তুচ্ছ করতে পার। এই পারাটাই বড় কথা তাই বলছতো। হ্যাঁ, ঠিক তাই বলছি। থাকুননা আমাদের সাথে দেখবেন কেমন সুন্দর ভাবে সব পেরে গেছেন?

রাতে খেতে বসে বলল, বাবা আপনি বলেছিলেন না, মা সমাজকে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু আপনার পারার উপায় নেই। হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু সেই সমাজকে তো আপনি অস্বীকার করতে পেরেছেন। কেমন করে? সমাজ মানে তো কিছু আচরণ, এই এর হাতে খাব না, ওর ছোয়া স্পর্শ করবনা, সমাজকে যদি মানতেন, তা হলে তো মেয়ের হাতে খেতেই পারতেন না। অথচ তা পেরেছেন, কেন বলুন তো। তুমিই বলনা কেন? আসলে স্নেহ আর ভালবাসা, দুটি মন যেখানে একে অপরকে ভালবাসে সেখানে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। এতদিন সমাজকে গভীর ভাবে ভালবেসে এসেছেন, তাই ভাবতেন একে বুঝি অস্বীকার করা যায় না, আজ যখন তার থেকেও আরো গভীর ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছেন সমাজকে ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে গেছে তাই না? বাবার মুখে কোন কথা নেই। সেলিনা বলল, বলুন ঠিক বলেছি কি না। তুমি ঠিক বলেছ মা। আমি শুধু ভাবছি তুমি এমন করে ভাবতে শিখলে কি করে? এটা কিন্তু আমি আপনার ছেলের কাছে শিখেছি। প্রান্তিকের কাছে? হ্যাঁ বাবা ওর কাছে। ওর কাছে শিখেছি, মানুষকে ভালবাসাই তার আসল ধর্ম। ধর্ম ব্যবসায়ীর ধর্ম নয়। ও কিন্তু হাতে কলমে একথা শেখায়নি, তার আচরণের মাধ্যমে শিখিয়েছে। আর ওতো আপনার রক্তের উত্তরাধিকার। তাই আপনার চিঠি পেয়ে ও যখন খুব চিন্তিত, আমি আপনার চিঠিটা পড়ি। জানি অন্যের চিঠি পড়া অন্যায়, তবু আপনার চিঠি পড়ে ওদের যা যা মনে হল,

আমার কিন্তু তা হল না। বাবা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কেন? বাঃ যে আপনি আমাকে মেনে নিচ্ছেন, তাকে আপনি অন্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন এতো দ্বিচারিতা। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন বৌমা। সেলিনা বলল, না বাবা, আমি শুধু বৌমা নই, আমি আপনার মা, আপনার মেয়ে। আপনার বুকে যে শূণ্যতা, সেই খানেতো আমার জায়গা। কেন বৌমা বলে আমাকে দূর করে রাখবেন। এবার বাবা বললেন মা সেলিঁনা। সেলিনা বলল আমি শুধু সেলিনা নই বাবা, আমিতো সেই মেয়ে যাকে আপনি পাগলের মত খুঁজে ফিরেছেন, আমিতো আপনার সেই রেহানা, একবার ডাকুন না আমায় ওই নামে।

অদ্ভুত এই সেলিনা, আমি ও নীলাঞ্জনা পিসি অবাক হয়ে ভাবছি বাবার চিন্তা ধারাকে এলোমেলো করে দিতে এমন করে বুঝি কেউ পারত না। অবাক হয়ে অপলক বাবা তাকিয়ে থাকেন সেলিনার দিকে। পিসি বলেন, কি হল সীতাংশুদা, মেয়ের কাছে হেরে গেলেন? বাবা বললেন, সত্যি নীলু এ যে কি আনন্দের হার তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না। সেলিনা সত্যি তুমি আমার মা। মনে থাকে যেন বাবা। বাজে অজুহাতে এই বিশ্বাস থেকে সরে আসবেন না কিন্তু।

মাত্র ২ দিন থাকবেন বলেছিলেন বাবা। মিনতি সেন এলেন বাবা যেদিন এসেছিলেন তার পরের দিন দুপুর বেলায়। বাবা ঘুমাচ্ছেন আর সেলিনা তার মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে ঘুমাতে সাহায্য করছে। হঠাৎ বেলটা বেজে উঠলো। বাবা বললেন কে এল মা? আপনি ঘুমান আমি দেখছি। দরজা খুলে মিনতি সেনকে দেখে একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন মা তুমি। হ্যাঁরে আমি, এবার ছাড়। মিনতি সেন এলেন বাবার কাছে। বাবা উঠে বসলেন। মিনতি সেন প্রণাম করে বললেন, কেমন আছেন দাদা। প্রান্তিকের কাছে শুনলাম, আপনি নাকি কালই চলে যাবেন। এবার নাকি আমার ওখানে যাওয়ার সময় হবে না, তাই আসতে হলো। সেলিনা বলল তোমার ছেলে বলেছে এই কথা? কেন ওকি ঠিক কথা বলেনি? তা জানিনা মা, তবে বাবা তোমার ওখানে যাবে না, আমি জানিনা তোমার ছেলে জানলো কি করে? এই তো ঘুমাবার আগে বাবা বললেন, মিনতির ওখানে একবার যাওয়া ভীষণ দরকার মা। আর তোমার ছেলে বলে দিল তোমার ওখানে যাবে না। আর তুমি সেই কথা বিশ্বাস করলে? বাবার অবাক হওয়ার পালা পারদের ওঠা নামার মত বাড়তে থাকে। মিনতি সেন বললেন, তুই দেখছি রেগে আছিস প্রান্তিকের পরে। ও কিন্তু ওই ভাবে বলেনি। তবে কি ভাবে বলেছে। বাবার ফিরে যাওয়ার তাড়া আছে, আসতে পারবে কি না কি জানি? সেলিনার মুখে হাসি ফুটে উঠে, বলে তাই বল। তা তুমি আজ অফিসে যাও নি? না তাহলে তো ভালই হল। চল না এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। তারপর বাবাকে বললেন, বাবা আপনি ঘুমান, আমি মায়ের সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে গল্প করছি। না মা, ঘুম আসবেনা, বরং আমিও তোমাদের সাথে গল্পে ভাগ বসাই, কি বল মিনতি? সেই ভাল, বললেন মিনতি সেন।

কাল বাবা চলে গেছেন। আগামী দিন আমাকে চলে যেতে হবে শিলিগুড়ি। বাবা যদিও দুদিন থাকবেন বলেছিলেন, কিন্তু সেলিনার বিভিন্ন অবদার মেটাতে পাঁচ দিন থাকতে হল। আমি বিশ্বাস করি এই পাঁচটা দিন বাবার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

রাতে সেলিনাকে বললাম, কোন যাদুতে বাবাকে তুমি এমন আপন করে নিলে? কেন মশাই দরকার নাকি সে যাদু শেখার? ভীষণ দরকার সেলিনা। কেন? তা হলে তাকেও আমি সেই যাদুতে বস করতাম। থাক মশাই আর বস করতে হবে না কাউকে, এমনিতে যাদের বস করেছো, তাদেরই জায়গা দিতে পারছনা, আবার নতুনকে এনে কাকে তাড়াতে চাও? আমি স্মিত হেসে-বললাম আমার ভয়কে। মানে? সেই যাদুতে আমি তোমায় বস করতে চাই সেলিনা। প্রান্তিক! না সেলিনা সত্যিই ভয় হয়, এই বুঝি তোমায় হারাই। "দুহু ক্রোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" বলে আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল।

শিলিগুড়িতে ও আমার সঙ্গে আসতে চায়নি। কিন্তু পিসি ও মিনতি সেনের অনুরোধে অবিশ্যি সে এল। আমি বললাম, তুমি আসতে চাইছিলেনা কেন? দেখ, তোমাকে পেয়েছি সকলের মধ্যে দিয়ে, তাই আমার মনে হয়েছে সকলের মধ্যে দিয়েই তোমায় আমি ধরে রাখতে পারব। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের কারো পালাবার পথ নেই। কিন্তু এখানকার এই বিশাল কোয়ার্টারে, আমি কারো মা নই, কারো মেয়ে নই, শুধু তোমার স্ত্রী, আর তোমার স্টাফদের কাছে মেম সাহেব, এই শূন্য ঘরে শুধু তুমি আর আমি। তোমার কথা যখন শেষ হবে, অথবা আমার কথা বলার ইচ্ছে হবে কারো সাথে, কে আমাকে সঙ্গ দেবে বল? পেতেও যেমন সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। হারাতেও তাই! আমি বললাম সেলিনা, সব সময় এই ফ্রাশট্রাসানে ভোগ কেন বলত? জানিনা, যা মনে হয়েছে তাই বললাম।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। কখনো দার্জিলিংয়ের তুষার ধবল পাহাড়, কখনো সিকিমের ঘন অরণ্য, পাহাড়ী নদী, এদের সঙ্গ দিয়ে কেটে যায় অবকাশ। একদিন বলল, আমাকে মায়ের কাছে রেখে আসবে প্রান্তিক? আমি অবাক হয়ে বললাম কেন? ও বলল আজকাল তুমি আর আমার দিকে তাকাওনা তাই! আমি তোমার দিকে তাকাই না? আমি তোমাকে ভালবাসি না? ভালবাস, আদরও কর। কিন্তু তাকাওনা। বুঝলাম না! সেই জন্যই তো বলেছিলাম, আমাকে মায়ের কাছে রেখে এস। কারণটা বলবে তো। ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তোমার রক্তের উত্তরাধিকার কুঁড়ি হয়ে ফুটেছে গো, তুমি বাবা হতে চলেছো প্রান্তিক। আমি আনন্দে পাগলের মত ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে আদরে ভাসিয়ে দিয়ে বললাম সত্যি? হ্যাঁ গো সত্যি, সত্যি, সত্যি। এবার আমায় ছুটি দেবে তো? আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? থাকতে তো হবে, যে আসছে, তার দাবীতো কম নয়। ওদের কাউকে যদি আসতে বলি। ও বলল নতুনকে বরণ করে নিতে, পারবে না কয়েকটা দিন আমাকে ছেড়ে থাকতে। কি করে থাকব বল, অফিস থেকে কতবার শুধু তোমাকে দেখব বলে ছুটে আসি। কাজ করতে করতে তোমাকে আদর করার জন্য মন পাগল হয়ে ওঠে। যেখানে ৩/৪ ঘন্টা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না, সেখানে এতদিন কি করে থাকবো। অভ্যেস কর, না হলে পস্তাবে, কেমন করে? হাসতে হাসতে বলল, পরে যখন কচি দুটি হাত তোমাকে বাধা দেবে, কি করবে? বললাম ওকে আদর করে সরিয়ে রেখে তোমাকে আদর করবো। আবদার?

সেলিনার যাওয়া হল না। নীলাঞ্জনা পিসি এবং মিনতি সেন ভাগাভাগি করে এ

একটা মাস এখানে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সেলিনার মনে হয় বন্দোবস্তটা মনঃপূত হয়নি। বলল, ওরা কি ভাববেন বলত। কি ভাববেন? তোমাকে হয়তো কিছুই বলবেন না, কিন্তু তারা কিন্তু মনে মনে ভাববেনই আমি যেতে চাইনি, তাই তুমি ওদের আসতে বলেছো। তা ঠিক নয় সেলিনা, আমি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বলেছিলাম। কেন বলতে গেলে? তুমিতো আমাকে রেখে আসতে পারতে। তুমি রেখে এলে ওরা কি বাধা দিতো? আমি বললাম ঠিক আছে সেলিনা। আমি তোমাকে রেখেই আসব। না গো, আর তা হয় না। কেন? আমিও যে পারবনা তোমাকে ছেড়ে থাকতে। এই সেই চিরন্তন সেলিনা।

লেটার বক্সে চিঠি ফেলে গেল পোষ্ট ম্যান। অশ্রুকণার চিঠি। লিখেছে সেলিনাকে। সেলিনা, ভুলে গেছো অশ্রুদিকে তাই না? ভুলে যাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় নেই ভাই। যাকে তুমি সারা জীবন ধরে চেয়েছিলে নিজের আঁচলের মধ্যে পেয়েও এত ভয় কেন? কেউ চুরি করে নিতে আসবে না, তোমার সাত রাজার ধনকে। কাল মিনতি পিসির চিঠিতে জানলাম, তুমি নতুন আগন্তুকের অপেক্ষায় আছো। কি ভাল যে লাগছে তোমাকে তা বলে বোঝাতে পারব না। বোন, তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। এই ইচ্ছের মধ্যে তুমি আবার অন্য কিছু খুঁজতে যেও না। তোমাদের দুজনকেই দেখতে ইচ্ছে করছে। আসবে একবার? সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া, লাল শাড়ীতে কেমন লাগছে তোমাকে, দেখার ভীষণ লোভ নিয়ে তোমাকে ডাকছি — অশ্রুদি।

চিঠিটা অনেকবার পড়ে সেলিনা, তারপর রাতে তা তুলে দেয় আমার হাতে। আমি বলি যাবে নাকি একবার। তোমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে তাই না? অশ্রুদিকে তোমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করছে শুধু মুখে বলতে পারছনা এইতো! হয়তো ঠাট্টা, হয়তো মনের সন্দেহ, হয়তো অমূলক ভয়, তবু সেলিনার একথা আমার ভাল লাগলো না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাণপনে চেষ্টা করে চলেছি অশ্রুকণা বা রেহানাকে ভুলে থাকতে। কখনো কখনো বা সেলিনার মধ্যে তাদের খুঁজে পেতে চেয়েছি। যখনি আমার নিঃসঙ্গতায় তাদের ছায়া পড়েছে পালিয়ে এসে আদরে আদরে ভরে দিয়েছি সেলিনাকে। আদরের প্রকাশ ঘটে আবেগের ভিতর দিয়ে, সব সময় যে আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তা কিন্তু নয়, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাতে, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ভেবেছিলাম একটা কড়া উত্তর দেব সেলিনাকে। কিন্তু কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম। ও বলল, কি হল তোমার কল্পনায় আঘাত দিলাম? বললাম কি বলতে চাও? চলনা অশ্রুদির ওখান থেকে ঘুরে আসি। আমার পরে তার দাবী না থাকলেও তোমার ওপর তো আছে। আর আমি তোমার স্ত্রী, সেই সূত্রে খানিকটা দাবীতো আমারও আছে। কি যে ও বলতে চায়, সব সময় বুঝিনা। তবু বললাম, আমার উপর কারো কোন দাবী নেই একমাত্র তুমি ছাড়া। ইস অভিমান দেখ। তারপর বলল কার উপর কার দাবী আছে ওই ভাবে মুখে জোর করে কিছু বলা যায় নাকি? তারপর বলল, তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে আজ যদি তোমার মা প্রতীম কাকুকে কিছু বলেন কাকুর কোন ক্ষমতা আছে তাকে অস্বীকার করার? বললাম, ঠিক জানিনা, তবে মনে হয় প্রতীম কাকু তা পালন করবার চেষ্টা করবেন। শুধু আমার মা কেন, তুমিও যদি কিছু চাও

তার কাছে, সাধ্যমত তোমার চাওয়াটাকেও তিনি পূরণ করবার চেষ্টা করবেন। আমার চাওয়া আর মায়ের চাওয়া কি এক? অথচ দেখ, জাগতিক কোন সম্পর্ক তাদের ভিতর নেই। আমি জানি প্রান্তিক, অশ্রুদির সঙ্গে তোমার কোন জাগতিক সম্পর্ক নেই, তবু তার যে কোন চাওয়াকে তুমি কোন ভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। আমি তা মেনেও নিয়েছি। কেন নিয়েছি জান? আমি অবাক হয়ে বললাম কেন? ও ধীরে ধীরে বলল, তোমার বাবা বলেছিলেন, দেহ তো মন্দির, মন নামক দেবতার আধিপত্য সেখানে। দেবতার কাছে তো আসবে লক্ষ লক্ষ ভক্ত। যার যেমন কামনা তাই নিয়ে। তা নিয়ে ভাবলে চলবে কেন? দেবতার কাছে, আমি যা চাইছি, তাই তিনি আমায় দিচ্ছেন কি না এখানেই আমার সন্তুষ্টি এখানেই আমার সীমাবদ্ধতা। বলেছিলাম, একই কামনা নিয়ে যদি অনেকেই আসে সেই দেবতার কাছে, তাহলে দেবতা কি সবার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন? না করবেন না, কারণ, তুমি যে সমাজকে অস্বীকার করছ, দেহ বেদীতো সেই সমাজেরই অঙ্গ। তাই সমাজিক বিচারে দেবতার ইচ্ছে পূরণের ক্ষমতা সীমিত। তাই বলে মা ইচ্ছেটা তো মরে যেতে পারে না। ঘুরে ফিরে আসে, বার বার আসে। তা ভাবায় যেমন আনন্দে তেমনি আবার কাঁদায়ও। বুঝেছিলাম আমাকে তিনি সন্দেহ মুক্ত করতে চেয়েছেন। আজ আমার কোন সন্দেহ নেই। তুমি কেন ভুল বুঝে নিজে কষ্ট পাচ্ছ। একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না, অশ্রুদিকে আমার কালে ভদ্রে দেখতে ইচ্ছে করলেও প্রতিমুহূর্তে তাকে তুমি দেখতে চাও। আর তোমার সেই ইচ্ছেটাকে দমন করে তুমি আমায় আদরে আদরে ভরে দাও। তোমার আদরের তারতম্যই তার প্রমাণ। আজ যদি তুমি একা একা তার কাছে যাও, থাকও দিনের পর দিন তাতেও তোমাকে আমি সন্দেহ করব না। এত বিশ্বাস আমার ওপর? না প্রান্তিক তোমার ওপর নয়। তোমার সীমাবদ্ধতার ওপর। মন, চাইলেও তুমি পারবেনা। তোমার সেলিনা, তোমার পাশে না থেকেও বার বার তোমাকে প্রতিহত করবে, আর তাকে অপমান করার কোন স্পর্দ্ধাই তুমি দেখাতে পারবেনা। তাই বলছিলাম, মিথ্যে মনকে ধোকা দিয়ে কি লাভ প্রান্তিক, আমারও ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করেছে অশ্রুদিকে, চলনা। আমি বললাম, তার থেকে এক কাজ কর না, ওকেই একবার আসতে বলনা। তবু তুমি যাবে না? তুমি তো জান সেলিনা যে কোন মুহূর্তে মা বা পিসি আসতে পারেন। যদি এসে আমাদের না পান। তা অবশ্য ঠিক। বেশ আমিই অশ্রুদিকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। কি লিখবে? হাসি হাসি মুখে বলল, লিখব, ভীষণ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাকে অশ্রুদি, আরেক জনের ইচ্ছে কিন্তু আমার থেকেও বেশী। আসছো তো? কবে আসছ জানিয়ো। না আসলে কিন্তু আড়ি। আমি রাগ করে বললাম, তোমার যা ইচ্ছে লেখ। যদি যেতে চাও তাতেও আমি রাজী। ও বলল, তাই বল। যেতে চাও অথচ জট পাকিয়ে তা ভন্ডুল করে দেওয়ার ইচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হল না। পরের দিনই মিনতি সেন এলেন। আমি তখন অফিসে। সেলিনা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল মা, তুমি? তুমি যে বললে আগামী মাসের প্রথম দিকে আসবে? বলেছিলাম কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোকে নিয়েই যাবো। আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠলো সেলিনার দুটি চোখ। বলল সত্যি মা। হ্যাঁরে পাগলি সত্যি সত্যি সত্যি।

তারপর বললেন তোর প্রথম সন্তান আসবে, আর পাশে থাকবো না, আমি অথবা তোর মা, না রে সেলিনা, তা হয় না। কিন্তু তুই যাবি তো। তোকে প্রান্তিক ছাড়বে তো। লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে বলল, মা!

আমি সংবাদ পেয়েও, একটা জরুরী মিটিংএ ব্যস্ত থাকার জন্য এলাম দুপুরের দিকে। মিনতি সেন বললেন, না রে প্রান্তিক তুই ঠিকই বলেছিস, এখানে কাউকে ভাল করে চিনিনা। আর ওখানে ডাক্তার নার্সিং হোম হাসপাতাল সবই চেনা। তাই ভাবলাম, ওকে নিয়ে যাই কি বলিস? বললাম, আমিতো তাই বলেছিলাম, ওখানে তোমারা সবাই আছো। তাহলে এক সপ্তাহ ছুটি নে, চল ওকে রেখে আসবি। তাই হবে মা। বলে, দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে আমি আবারও অপিসে গেলাম।

একা পেয়ে মিনতি সেন সেলিনার কাছে জানতে চাইলেন কিরে মেয়ে ক মাস হল? ঠিক হিসাব করে দেখিনি, তবে ৬/৭ মাস হবে মনে হয়। বলিস্ কি? এতদিনেও জানাস নি কেন? কি করে জানাবো, তোমার ছেলের তো খেয়ালই নেই আমার দিকে? ও কি খেয়াল করবে। নিজের রক্ত মাংসে যার অস্তিত্ব তা ও জানবে কি করে? আমার দিকে' তাকালেই জানতে পারতো। এখানে এসেতো দেখছি শুধু কাজ আর কাজ। ঠিক কাকু র মত। প্রতীম বাবুর প্রসঙ্গ উঠতেই মিনতি সেন আর কথা বাড়ালেন না। পুরুষ ছেলে, কাজের মধ্যেই আনন্দ পায় বেশী। কোন ডাক্তার দেখানো হয়েছে? না। বাঃ অপূর্ব, তোরা কি বলতো! ৬/৭ মাস হয়ে গেছে, এখনো ডাক্তারের কাছে যাসনি। না আজ বিকালেই কলকাতায় ফিরে চল, কালই ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু তোমার ছেলেতো আজ বিকালে যেতে পারবেনা। না পারে একদিন পরে যাবে।

সবশুনে বললাম একদিন পরেই যাও না মা। অফিসের কিছু কাজ আছে কাল তা শেষ করে পরশুদিন যাবো। ট্র্যাঙ্কলে ম্যানেজমেন্টএর সঙ্গে কথা বলেছি, ওরা এখন ১০ দিন এবং পরে যখন প্রয়োজন হবে তখন একমাস ছুটি মঞ্জুর করেছেন।

কলকাতার এক বড় নার্সিং হোমের ডাক্তারকে দেখানো হলো। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার বললেন, আগে ডাক্তার দেখানো উচিৎ ছিল। আপনারা শিক্ষিত মানুষ অথচ একবারও ডাক্তার দেখালেন না। নীলাঞ্জনা পিসি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন কোন অসুবিধা নেই তো ডাক্তার মুখার্জী? বললেন না তেমন কিছু নয়। তবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। বলছেন ৬/৭ মাস, কিন্তু বেবিতো ম্যাচিউর হয়ে'এসেছে, সুতরাং নির্দিষ্ট টাইম বলতে না পারলে আমারও বলা সম্ভব নয়, নির্দিষ্ট দিন। বরং পেইন উঠলে নার্সিং হোমে নিয়ে আসবেন।

আমাদের শোনা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। রাতে সেলিনা বলল, প্রান্তিক আমার ভীষণ ভয় করছে। কেন? জানিনা, তুমি থাকতে পার না? ঠিক আছে আমি দেখছি, কিন্তু আমাকে তো একবার শিলিগুড়ি যেতেই হবে। তুমি ভট্টাচাজ কাকুকে বলনা, যাতে কিছুদিন পর্যন্ত তুমি থাকতে পার। আচ্ছা তাই হবে। এসময় অযথা আজে বাজে চিন্তা করোনা। যে আসছে শুধু তার মঙ্গলের কথা ভাব। জান প্রান্তিক ভীষণ ভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে, কোন দিনতো ডাকিনি, কি ভাবে ডাকবো বলত! বললাম, ঈশ্বরকে ডাকারতো বিশেষ

কোন নিয়ম নেই। ডাকার মনটাই আসল। মনটাকে প্রস্তুত করতে পারলে যেমন খুশী তাকে ডাকতে পার। মন চাইলে, নমাজ বা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে ডাকা যেতে পারে। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে কি ভাবে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়? কি বলতে হয় ঈশ্বরের কাছে। আশঙ্কার স্পর্শ আমি অনুভব করি। মানুষ যখন সত্যি হতাশ হয়ে যায়, ঈশ্বরই বোধ হয় তার শেষ সান্ত্বনা হয়। ডাক্তার যদিও হতাশ জনক কিছু বলেন নি, কিন্তু ভালও কিছু বলেননি। তোমার আকাঙ্খাই তোমাকে শিখিয়ে দেবে কি ভাবে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে অথবা কি ভাবে নমাজ করতে হয়। প্রার্থনাটাই আসল সেলিনা। কিন্তু প্রান্তিক তুমি ছাড়া আমার কাছে ঈশ্বরের তো আর কোন প্রতিরূপ নেই। বরং তুমি বস, আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার কাছে আমি আমার ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনা করি। ভীষণ হাসি পেল ওর কথায়, কিন্তু তা দমন করে বললাম সেলিনা এমন ভেঙে পড়ছ কেন? জানিনা তো, কেন আমার এমন হচ্ছে, বার বার মনে হচ্ছে তোমাকে বুঝি আর আমি কোন দিন দেখতে পাব না। তাই কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছেনা। বললাম সেলিনা একদিনতো তুমি বক্সিংএর চ্যালেঞ্জার ছিলে, এভাবে ভেঙে পড়া তোমার শোভা পায় না। জানি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছনা প্রান্তিক, আমি আমার শেষ দেখতে পাচ্ছি যেন।

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, সব ভয় অমূলক সেলিনা। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন কোথায় পৌছিয়েছে তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা। সব উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেল। ও বলল, তুমি যাবে না বল। আচ্ছা যাবো না, আর দুশ্চিন্তা করো না কিন্তু। একবার বাবাকে আসতে বলবে। কেন? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার পৃথিবী চির অন্ধকার। বললাম, তাই হবে, কালই বাবাকে চিঠি দেবো, মাকে নিয়ে যেন চলে আসেন। আরেকটা কথা, যেখান থেকে পার রেহানাকে খুঁজে বের করবে? কি সব পাগলামি করছ? কোথায় খুঁজে পাব তাকে বল। ও বলল, তোমাকে তো কতবার বলেছি, আমার মধ্যে তাকে তুমি খুঁজে নাও। নিলে না। আমি রেহানা হতে চেয়ে ছিলাম, তুমি হতে দিলে না, আমার শেষ বেলাকার অনুরোধ, একটা দিন তুমি অন্তত আমাকে রেহানা বলে ডেকো। বললাম তাতে যদি তোমার মনে শান্তি আসে তাই হবে রেহানা। বাঃ কি তৃপ্তি। কি সুন্দর ভাবে ঐ নামটা তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় প্রান্তিক। আমি জানি সে একদিন আসবেই আসবে। আসতে তাকে হবেই প্রান্তিক। তাকে যে আমার বোঝাতেই হবে সেলিনা তাকে ঠকাতে চায়নি। শুধু তার প্রান্তিকের হৃদয় ক্ষতকে শুকিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে তার কাছে আসতে হয়েছিল। তুমি কথা দাও কোন অজুহাতে তাকে তুমি ফিরিয়ে দেবেনা। আমি রেগে বললাম, তুমি এবার থামবে? যা সব আজে বাজে কথা চিন্তা করছো তাতে তোমার সন্তানের মঙ্গল হবে? ও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল আর আমি তাকে কাঁদতেই দিলাম। কোন বাধা দিলাম না।

হেড কোয়ার্টারে গিয়ে ছুটির এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। শিলিগুড়িতে আর ফিরে যাইনি। শুধু এর মাঝে একদিন প্রতীমকাকুর ওখানে গিয়েছিলাম, কাকুই পিসিকে ফোন করে জানিয়েছিলেন আমি যেন একবার দেখা করি। উনি বললেন, সেলিনা কেমন আছে?

আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি, এসময় তোমাকে শক্ত থাকতে হবে, আর একটা সত্যি কথা বলছি যা তোমার মা ও পিসিকে বলতে পারিনি। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কি কাকু! উনি বললেন দেখ প্রান্তিক, যে ভাবে কেসটা জটিল হয়ে গেছে, তাতে নর্মাল কিছু হবে না। মেজর অপারেশান করতে হতে পারে। তাতে কিন্তু- সেলিনার জীবন সংশয় আছে। আমি চোখের জলে চিৎকার করে বললাম না কাকু না। একি প্রান্তিক তুমি কাঁদছো। ধীরে ধীরে বললাম, আমার মনে হচ্ছে আমার চারিদিক শুধু শূন্য আর শূন্য। যে ভয় আপনি করছেন, সেলিনা তা জানে? হ্যাঁ জানে। আমি গভীব বেদনায় বলে উঠি তাই তার আচরণ স্বাভাবিক নয়। ও চায় না, আমি ওকে সেলিনা বলে ডাকি। তবে কি বলে ডাকবে? ও চায় আমি যেন ওকে বেহানা বলে ডাকি। রেহানাব প্রতি গভীর অভিমান নিয়ে ও বলে, আমি ঠকাতে চাইনি রেহানা। শুধু তোর প্রান্তিকের ক্ষত স্থানকে শুকিয়ে দেওয়ার জন্যে তার আসা। সে যেন বুঝতে পারছে তার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে, তাই একটা দিনও অন্তত আমি যেন ওকে রেহানা বলে ডাকি। আসলে জানেন কাকু, ও আমাকে যেমনই ভালবাসুক না কেন, আমার জন্য ওর যত কষ্টই হোকনা কেন, রেহানাকে ভালবাসে ও হৃদয় দিয়ে। রেহানার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ও যা করেছে সে তো বলার নয়। রেহানার প্রতি তার তীব্র অভিমান, সে কেন এমন করে পালিয়ে গেল। এমনকি আমার বাবাকে পর্যন্ত বলেছে, তিনি যেন ওকে রেহানা বলেই ডাকেন। অদ্ভুত তো প্রান্তিক। হ্যাঁ অদ্ভুত। ঠিক আছে তুমি নিজে শক্ত হও। এই আমার অনুরোধ। আমি কাল যাবো। সেলিনা এখন কোথায়? তোমার পিসির কাছে, না তোমার মায়ের কাছে? মায়ের কাছে। ঠিক আছে আমি কাল যাবো, তবে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। কখন যাবেন? সন্ধ্যায়।

এসেছিলেন প্রতীমকাকু। নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করে। তারপর গাড়ীটা লক করে চির গম্ভীর্যের বেড়ি টপকে তিনি রাস্তা থেকে ডাকতে ডাকতে উঠলেন রেহানা, রেহানা? সেলিনা চমকে উঠে বললেন, কে ডাকছে মা, কাকু না, ও বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল। আর প্রতীমকাকু খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ে দ্রুত সিড়ি টপকে রেহানা রেহানা বলে উপরে উঠতে লাগলেন। আমি সেলিনাকে বাধা দেওয়ার জন্য নীচে নামতে চাইলে মিনতি সেন বললেন ওকে বাধা দিস নে প্রান্তিক। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম আর আশ্চর্য হয়ে মিনতি সেন দেখছেন এই দৃশ্য। কত বছর আগের প্রতীম চৌধুরী যেন তার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গ পাওয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে, আর তার মেয়ে সেও যেন ছোট্ট শিশুটি হয়ে তার বাবার কাছে যেতে চাইছে। হৃদ স্পন্দন বেড়ে চলেছে মিনতি সেনের। জীবনে এ দৃশ্যতো তার কোনদিন দেখা হতো না। কিন্তু একি হল, একটা সিড়িতে পা ফেলতে ভুলে গিয়ে সেলিনা তার নিজের শাড়ীতে জড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেল। প্রতীম দ্রুত এসে তাকে ধরার আগে, বেশ কয়েকটা সিড়ির ধাপ গড়িয়ে গেল সেলিনা। আর রক্তে লাল হয়ে গেল তার শাড়ী এবং মুহূর্তে জ্ঞান হারালো। আর প্রতীম কাকু তাকে নিজের বুকের পরে তুলে নিয়ে বললেন, রেহানা এ তুই কি করলি মা। কেন এ ভাবে নামতে গেলি। আমি তো আসছিই। আমি তো তোকে নিতে এসেছি। এরা তোকে ভুল বুঝতে পারে। আমিতো তোকে

ভুল বুঝিনি মা। কেন আমাকে এমন আঘাত দিলি?

প্রতীমের চির গাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল তার চোখেব জল। উপরে নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিয়ে মিনতি সেনকে বললেন, মিস সেন, ফোনটা কোথায়? মিনতি সেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সেলিনার বুকের উপর। আমি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। একি হল সব যেন স্বপ্নের মত। প্রতীম চৌধুরী ফোন করছেন, হ্যালো পুলিশ স্টেশান! ইয়েস! এখনি চলে আসুন এত নং বাড়ীতে একটা খুন হয়েছে, খুনী নিজেই ধরা দিতে চায়। এখনি আসছি, ফোন কেটে গেল।

মিনতি সেন বুঝতে পারেনি, প্রতীম চৌধুরী ফোনে কি বলেছেন। আমি প্রতীম চৌধুরীর কাছে এগিয়ে এসে বললাম, কাকু এ আপনি কি করেছেন। সেলিনা মারা গেছে কি না আপনি তো জানেন না। তা হলে মিথ্যে খুনেব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি কেন পুলিশকে আসতে বললেন? এসেছে পুলিশ? না আসেনি, ওদের আসতে দাও।

হঠাৎ পুলিশের গাড়ীর হর্ন বাজতেই, মিনতি সেন অবাক হয়ে বললেন, পুলিশ? আমার বাড়ীতে পুলিশ কেন? প্রতীমবাবু এগিয়ে এসে বললেন, মিস সেন, আমিই ওদের আসতে বলেছি। অবাক হযে বললেন, আপনি? কেন? সেলিনার মৃত্যুর জন্যতো আমি দায়ী। সেলিনা যে মারা গেছে আপনাকে কে বলল? গেছে মিস সেন সেলিনা বেঁচে থাকতে পারে না। এ আপনি কি বলছেন? সেলিনা বেঁচে থাকতে পারে না মানে? মানে যা সত্য তাই আপনাকে বললাম মিস সেন।

সেলিনা তখন আস্তে আস্তে চোখ মেলেছে। অজস্র রক্ত পাতে নিজেকে কেমন হাল্কা মনে হচ্ছে। আস্তে ডাকলো কাকু। প্রতীমবাবু এগিয়ে এলেন, আমি ও মিনতি সেন এই অবাক দৃশ্য দেখতে লাগলাম, বললেন কিবে রেহানা, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে? ও বলল, আমি রেহানা তো! হ্যাঁ মা, তুইতো রেহানা! তা হলে সেলিনা কোথায়? এই তো একটু আগে এই খানেই ছিল, এখন আর নেই। তা হলে পুলিশ কেন? ওরা আমাকে এ্যারেষ্ট করতে এসেছে মা। এ্যারেষ্ট করতে? তোমাকে? কেন? আমি যে ওদের আসতে বলেছি। সেলিনা বলল তুমি ওদের আসতে বলেছো কেন? যে ভাবে তুই ওপর থেকে দৌড়ে আসছিলি এবং আমিও তোকে ডাকতে ডাকতে উপরে উঠছিলাম, তাতে পা পিছলে পড়ে যাস, এবং একটা এক্সিডেন্ট কল্পনা করে পুলিশকে সংবাদ দিতে বাধ্য হই। ও তাই বল, তারপর আস্তে আস্তে মিনতি সেনকে বলে, মা কাকুকে বসতে বলবে না? আর পুলিশদের লক্ষ করে বলল, ওরা কষ্ট করে এলেন, ওদের একটু চা খাওয়াও না মা? মিনতি সেন বল্লেন এই খাওযাই। প্রতীমবাবু জানতে চান, এখন কি একটু ভাল লাগছে রেহানা। হ্যাঁ কাকু। তাহলে শুয়ে থাক। আমি আসছি। প্রতীমবাবু ডাঃ মুখার্জীকে ফোনে একবার আসতে বলেন। আধঘন্টার মধ্যে আসেন ডাঃ মুখার্জী।

মিনতি সেন অবশ্য তার আগেই, সেলিনার রক্তে ভেজা শাড়ী বদলিয়ে দিয়ে তাকে নতুন শাড়ী পরিয়ে, চুল আচড়িয়ে দিয়ে, আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। ডাঃ মুখার্জী

তাকে দেখলেন। তারপর প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়ে চলেও গেলেন। প্রতীম বাবু জিজ্ঞাসা করায় ডাঃ মুখার্জীকে বলেন, না ভয় নেই। শুধু নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করে একটা ছোট্ট অপারেশান করতে হবে। এতে খুব মানসিক আঘাত পাবেন উনি, তাই ওর মনটাকে দেখার দায়িত্ব আপনাদের। তারপর ডাঃ মুখার্জী জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ওকে রেহানা বলে ডাকছিলেন, রেহানা কে? প্রতীমবাবু সংক্ষেপে রেহানার ইতিহাস ডাঃ মুখার্জীকে জানান। ডাঃ মুখার্জী জানান, একজন সাইকোলোজিস্টকে দেখালে ভাল হয়। আপনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে, রেহানার ভীতি তার মন থেকে যাওয়ার নয়। একটা অপরাধ বোধও ভিতরে ভিতরে কাজ করছে। সব থেকে ভাল হয়, যদি রেহানাকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতীম চৌধুরী বললেন, কিন্তু তাতে উল্টোটাতো হতে পারে। সেই জন্যই তো একজন সাইকোলজিষ্ট দেখাতে বলছি। তবে আমার মনে হয় আপনি যা আশঙ্কা করছেন তা হবেনা। বরং রেহানা যদি সামনে এসে ওকে মেনে নেয় তাহলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাকে না পাওয়া যায় তাহলে মাঝে মাঝে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ভয় থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আরো বললেন, আপনি যখন বলছেন, রেহানা চলে যাওয়ার পরেও ২/৩ জায়গায় গেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও তিনি আছেন, একবার দেখুন না চেষ্টা করে। আর তার সন্তান, যার জন্য সে স্বপ্ন দেখছে, সেই স্বপ্ন ব্যার্থ হয়ে গেলে কি হবে? ডাঃ মুখার্জী বললেন, আমি আশাবাদী মিঃ চৌধুরী। এতরক্ত ক্ষরণের পরেও আমি মনে করি তার সন্তান ভালই আছে। আর একান্তই যদি ভুল প্রতিপন্ন হই, কি আর করা যাবে। আবার নতুন আগুন্তুকের অপেক্ষায় থাকতে হবে। কিন্তু সবার আগে দরকার রেহানাকে একবার খুঁজে পাওয়া। আমি দেখছি, নমস্কার।

প্রতীমবাবু ফিরে এলেন। মিনতি সেন বললেন, সেই আসার পর থেকেই একটানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন, শরীরও তো আপনার ঠিক সুস্থ নয়। একটু বসুন না। হ্যাঁ বসি, সত্যি ক্লান্তি লাগছে। তা হলে এক কাপ গরম কফি দিই। হলে মন্দ হতোনা, ওই যে কে যেন জবার মা, ওকেই বলুন না, কড়া করে এক কাপ কফি। আমিই নিয়ে আসছি, আপনি বসুন। সেলিনা বলল, কাকু, তুমি আমাকে রেহানা রেহানা বলে ডাকলে কেন? আমিতো সেলিনা। কি জানি ঐ নামটাই বেরিয়ে গেল তোমাকে ডাকতে গিয়ে। ওকে আপনি চেনেন? দেখেছেন কখনো? শুনেছেন ওর কথা কিছু? না, শুনিনি, তবে নামটা তোমাদের মুখে এতবার শুনেছি যে, ভুলতে পারিনি, তাই হয়তো অসতর্কতায় বেরিয়ে গেছে। সে না হয় ভুল করে আমি তোমায় ডাকলাম, কিন্তু তুমি অমন দৌড়িয়ে এলে কেন?

জানিনা কাকু, তবে ওই নামে আমাকে কেউ ডাকলে আমার ভীষণ ভাল লাগে। ভাল যদি লাগে তা হলে সকলকে তো বলতে পারো তোমাকে ওই নামে ডাকতে। বলেছিতো, কিন্তু কেউ ডাকে না। এতদিনের অভ্যেসতো মা তাই হয়তো অসুবিধা হচ্ছে। তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো। বল। তুমি আমার ওখানে চলো, আমি সব সময় তোমাকে ঐ নামেই ডাকবো। সেলিনা আমার দিকে তাকালো, বললাম যাবে কাকুর ওখানে? যাও না। তুমিও চল। আমি কি করে যাই বল। আমার তো কাজ আছে। শুধু কাজ আর কাজ। একদম

সময় দাওনা তুমি আমাকে। আমি হাঁপিয়ে উঠি। এত কাজ করতে হবে না তোমার। আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, তুমি কাকুর সঙ্গে কথা বল।

মিনতি সেন, এর মাঝে কাকে দিয়ে যেন গরম সিঙ্গারা আনিয়েছেন। সেই সিঙ্গারা এবং কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন এটা খেয়ে নিন, আর রাতে কিন্তু খেয়ে যাবেন। মিনতি সেনের দিকে না তাকিয়েই বললেন, আজ নয় মিস সেন? কেন? একটু অসুবিধা আছে। মিথ্যে অজুহাতটা বুঝি এখনো তৈরি করতে পারেননি। না তা নয়। সেদিনও মিথ্যে বলিনি মিস সেন আসলে...। কি আসলে? থাক ওসব কথা। বরং যদি অসুবিধা না হয়, কয়েকদিন মেয়েটাকে নিয়ে যাবো? আমার কাছে অনুমতি নিচ্ছেন? অনুমতিতো নিতে হবে বৈকি। ও আপনার ছেলের স্ত্রী। আপনার সম্মতি ছাড়া আমি কি ওকে নিয়ে যেতে পারি? ঠাট্টা করছেন? না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি যদি আপনি অনুমতি দেন, তা হলে ওকে নিয়ে কয়েকদিন রাখব আমার কাছে। অশ্রুদের স্কুলে একবার যেতে হবে। ভাবছি ও যদি যায় আমার সঙ্গে, ওর ভাল লাগবে, অশ্রুরও হয়তো ভাল লাগবে। সেলিনা বলল তুমি যাবে কাকু অশ্রুদির ওখানে? হ্যাঁ মা যেতে তো হবেই একবার। আমিও যাব তোমার সাথে। অবশ্যই যাবি, কিন্তু তোর শ্বাশুড়ীর মতটা তো আমার দরকার।

এই শ্বাশুড়ী শব্দটায় ভীষণ লজ্জা পেলেন মিনতি সেন। বললেন, আপনার মেয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, আমার মত দেওয়ার কোন অধিকার আছে কি না জানিনে। তবুও আমি সম্মতি দিচ্ছি, নিয়ে যান ওকে ক দিনের জন্যে। আমার এখানকার থেকে ও আপনার কাছে মনে হয় ভাল থাকবে। অনেক কথা ও আমাকে বলতে পারে না। কিন্তু আপনাকে মনে হয় ও বলতে পারবে। প্রতীমবাবু বললেন কিন্তু প্রান্তিক? না ওর সম্মতির জন্য ভাবতে হবে না, ওটা আমার উপরে ছেড়ে দিন।

প্রতীমবাবু উঠে পড়লেন এবং বললেন, তাহলে ঐ কথা রইল, আমি কাল সকালে নিজেই আসব, নমস্কার। মিনতি সেন প্রতি নমস্কার করে বললেন, তাই আসবেন, প্রতীমবাবু এক পা এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে গিয়ে বললেন, কাল কিন্তু আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাবো, দেখবেন, হোটেল থেকে আনিয়ে আমার খাওয়ার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দেবেন না।

মিনতী সেন ভাবতে লাগলেন, কি অদ্ভুত মানুষ কোন লজ্জা নেই। এতবড় মেয়ের সামনে এমন ইচ্ছের কথা কেউ বলে নাকি! খেতে চেয়েছেন, আর আমি নিজের হাতে রান্না না করে হোটেল থেকে এনে খাওয়াবো, ভাবলেন কি করে? প্রতীমবাবু চলে যাওয়ার পরে, মিনতি সেন, সেলিনার বিছানায় বসে, ওর হাতের আঙুল গুলো টিপে দিতে লাগলেন। হাসছে ও মিটি মিটি। মিনতি সেন বললেন, অমন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছিস কেন? তোমার অবস্থা দেখে। আমার আবার কি অবস্থা। কাকু যখন তোমার হাতের রান্না খেতে চাইলো, মুখটা তোমার কেমন প্যাঁচার মত হয়ে গেল, কি হাসি না পাচ্ছিল তোমাকে দেখে, তা আর কি বলব, মা। খালি ঠাট্টা সব সময় ইয়ার্কি। ইয়ার্কি না মা, সত্যি। তারপর বলল এটা কিন্তু কাকুর খুব অন্যায়। কেন তুমি রান্না করবে, জবার মাতো আছে। আসলে কোন কাজের লোকের হাতে উনি খাবেন না। তাই কায়দা করে বললেন, তোমার হাতে খাবেন। এদের

মুখে এক মনে আরেক। তুই চুপ করবি। মিনতি সেন ধমক দিয়ে উঠলেন। আচ্ছা মা, একটা কাজ করলে হয় না? কি? রান্নাটা না হয় আমিই করলাম, তুমি বললে তুমি করেছো? খালি ফাজলামো তারপর বললেন, তুই এখন কি খাবি বল। না আমি কিছু খাব না, শুধু তোমার সঙ্গে গল্প করব। পাগলি মেয়ের আবদারের জন্যে আর পারিনে। তোমার পেরেও কাজ নেই। তারপর চিৎকার করে ডাকলো জবার মা। জবার মা কাছে এসে দাঁড়ালে বলল, কাল কাকু এখানে খাবেন জান? শুনেছি বৌদিমনি। আর মাই সব রান্না করবে তা জান? জবার মা বললেন উনি কেন রান্না করবেন, আমিই করব। এই সেরেছে, দেখেছো মা, কাকুর খাওয়াটার বারোটা বাজল। জবার মা বলল, আমি কি কোন অন্যায় করেছি বৌদিমনি। মিনতি সেন বললেন, না তুমি যাও জবার মা। সেলিনা বলল, জবার মা, তুমি চা বা কফি খাওয়াতে পারবে? এখনি আনছি। জবার মা চলে গেলে, সেলিনা বলল, কাকুকে দেখলে তুমি অত কাঁপ কেন বলত মা। তোমাকে দেখলে অন্যেরা কাঁপে আর তুমি কাকুকে দেখলে কাঁপ। কথা বলতে গেলেও গলায় সেই জোর থাকে না কেন? মিনতি সেন বললেন তুই এখন চুপ করতো। তোর কাকু কি কি খেতে ভালবাসেন তাই বল। বা আমি জানব কি করে? জানিসনা তো অত কাকু কাকু করিস কেন? যেন কাকুই সব, আর আমরা সব বানের জলে ভেসে আসা মানুষ। কপট অভিমান দেখায় মিনতি সেন।

সেলিনা খিল খিল করে হেসে উঠলো। মিনতি সেন বললেন হাসলি যে। তোমার অবস্থা দেখে। রাগটাও প্রকাশ করতে জাননা। তার থেকে চলনা মা, তুমিও কয়দিন থাকবে আমার সাঙ্গে কাকুর ওখানে। মিনতি সেন বললেন বেশ বলেছিস, সেই কাকু আর কাকু। তুই একা একা কাকুর কথা ভাব। আমার কাজ আছে।

এর মাঝে কেমন করে যেন, নীলাঞ্জনা পিসিকে সংবাদ দিয়েছেন, মিনতি সেন। তাই ভোর না হতেই নীলাঞ্জনা এসে উপস্থিত। সেলিনা বলল, মা তুমি? হ্যাঁরে। তা এখন ভাল আছিস তো? কি কাণ্ডটা বাঁধিয়েছিলি বলত। একটু সাবধানে থাকতে পারিসনে। জান মা, আজ কাকু আসবেন, তুমি একটা কাজ করনা। কি? কাকু কি কি খেতে ভালবাসেন একটু ফোন করে জেনে নাওনা। কেন? বা উনি যে খাবেন এখানে বলে গেছেন। মা তো জানেনইনা, তার কি পছন্দ। ও তাই বল, তাই মিনতি আমায় ফোন করে আসতে বলেছে। বাঙালী মানুষ কি আর খাবেন, মাছের ঝোল ভাত, বড় জোর সাথে মাংস। তা যাইই খাকনা কেন, মিনতি যাই দেবে তাইই খাবে। এতে আবার জানবার কি আছে? প্রান্তিক কোথায়? আছে কোথাও।

নীলাঞ্জনা বললেন, তুই নাকি আজ কাকুর ওখানে যাবি? প্রান্তিক যাচ্ছে? তুমি চলনা মা। কি যে বলিস সেলিনা? তোর মাথাটা একদম খারপ হয়ে গেছে। ও মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল, আমারও তাই মনে হয়।

বেলা ৯টা নাগদ এলেন প্রতীমবাবু। নিজে ড্রাইভ করে। আজ আর বাইরে থেকে ডাকলেন না। আস্তে আস্তে এসে বেল বাজালেন। নীলাঞ্জনা দরজা খুলে প্রতীমবাবুকে দেখে যেন কিছু জানেন না এমনি অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি? হ্যাঁ, আমি, একটু দেরি

হয়ে গেল। কেন কোথাও আটকে পড়েছিলেন? না। তবে? আসলে আমি আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। অবাক হয়ে নীলাঞ্জনা বললেন, আমার ওখানে? খুব কি প্রয়োজন? প্রয়োজন কিছু নেই। তারপর নিজেই জানতে চাইলেন আচ্ছা প্রয়োজন ছাড়া কি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে নেই? আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি কিন্তু তা বলিনি। সে আমি জানি, আসলে আপনার মেয়েকে আমি কয়েকদিন কাছে রাখতে চাই। যদি আপনার অমত থাকে। মেয়ে আমার হতে পারে। কিন্তু ওর গার্জিয়ানতো এখন মিনতি ও মত দিয়েছে তো। হ্যাঁ, গতকাল সেটা উনি দিয়েছেন। তাহলে? তাহলেও আপনিতো ওর মা? কথা বলতে বলতে ওরা সিড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। নীলাঞ্জনা বললেন, আসলে আপনি এখনো আমাদের একজন হয়ে উঠতে পারেন নি। কি করে বুঝলেন? যদি পারতেন, তা হলে এত শিষ্টাচারের ভিতর দিয়ে এগোতেন না। অধিকার এভাবে পাওয়া যায় না মিঃ চৌধুরী। কেউ অধিকার দেয় না। অধিকার অর্জন করে নিতে হয়। আজ যদি আমি বলি, না ও যাবেনা। আপনি নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবেন না। না তা কি করে যাই। যদি ওকে না নিয়ে যান, ওর মনের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন? ওতো ওর কাকুর কাছে যাওয়ার জন্য সেই সকাল থেকে সেজে গুজে বসে আছে। তা হলে আমার কি করণীয় বলুন। শুধু একটু জোর খাঁটাতে বলেছি। আর কিছু না। তারপরে বললেন শুধু অর্থের জোরটাই জোর নয়, মনের জোরটাও দরকার। আর তার জন্য দরকার ভালবাসার অধিকার বোধ। এরপর প্রতীমবাবুকে উপরের ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললেন, যান, আপনি, মেয়ের সঙ্গে গল্প করুন আমি আসছি।

নীলাঞ্জনা রান্না ঘরে গেলে মিনতি সেন বললেন, কি রাঁধি বলত। রান্নার অভ্যেস একদম নেই, আগে মা করতো। তারপর জবার মা। তারপর কালে ভদ্রে রান্না ঘরে এলেও যাকে রান্না বলে তা কোন দিন করিনি। তাহলে জবার মাকেই বল না রান্নাটা করে দেবে। কিন্তু ওর কাকু যে আমার হাতে রান্না খাবেন বলেছেন, কি করি বলত। কি আর করবে, খেতে যখন চেয়েছেন যা পার তাই কর, যদি খেতে না পারেন। হেসে ফেলে নীলাঞ্জনা বললেন, পারবে মিনতি পারবে। ভালবাসার আকর্ষণে পারা যায় না এমন কিছু নেই। তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। ঠাট্টা নয় ভাই, এমনতো নয় যে, তোমার হাতের রান্না তিনি আগে খান নি। সেদিন অসুস্থ মানুষটাকে তো তুমিই খাইয়েছিলে, তা যখন খাওয়া গেছে আজো যাবে চিন্তা করো না। বরং তমি চা বা কফি দিয়ে এস, আমি দেখছি।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে প্রতীমবাবু বললেন, তাহলে মিস্ সেন এবারে আমাকে উঠতে হবে। সেলিনা তার আগেই সেজে গুজে প্রস্তুত। আমাকে বলল, তুমি যাবে না? না, আমি কি করে যাব বল? আমি একা যাব? তাইতো কথা হয়েছে। না কখনো হয়নি, এ তোমার অজুহাত মাত্র তা হলে আমিও যাব না। ছেলেমানুষি করো না। সবাই কি ভাববে? কিছু ভাববে না, তোমাকে যেতেই হবে। গিয়ে কি করব, কালতো তোমরা অশ্রুর ওখানে যাবে। তুমিও যাবে। কি যে গোঁয়ারতুমি কর।

নীলাঞ্জনা পিসি এগিয়ে এসে বল্লেন, প্রান্তিক তুমিও যাওনা ওর সাথে। মিনতি সেনও বল্লেন যা প্রান্তিক। বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হয় তুমি এখন কাকুর সঙ্গে চলে যাও। আমি

রাতে যাবো। ঠিক আছে, বলে সেলিনা আস্তে আস্তে নেমে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত সেলিনার নাছোড় বান্দা পনে আমাকেও আসতে হয় অশ্রুদের এখানে। প্রতীম বাবু কাউকে না জানিয়ে এখানে এসেছেন। উঠেছেন সত্যভুষণবাবু যে কোযার্টারে থাকেন সেখানে। সেলিনা বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে না কাকু ? কেন মা আমিতো কাছেই আছি। যে দু তিন দিন থাকব রোজ তোমাদের কাছে আসবো। অশ্রুকে বলবে, আমি ওর ওখানেই খাব, তা হলেতো তোমার আর কোন অভিমান থাকবে না। বেশ, কিন্তু এখন তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে? না মা, আমি কোয়ার্টারে গিয়ে জামা কাপড় বদলে আসি, ততক্ষণ তোমাদের চা বা কফি হয়ে যাবে। আমি এসে খাবো।

গেট খুলে আমাদের ঢুকতে দেখে সীতা চিৎকার করে বলে ওঠে দিদিমনি, দাদাবাবু এসেছেন। অশ্রু বুঝতে না পেরে বলে, কে এসেছেন? সেলিনা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে অশ্রুকে জড়িয়ে ধরে বলে চিনতে পাবছোনা? শুধু হাসছে সেলিনা। তাহলে, অশ্রুদিকে মনে পড়েছে তোমার? তারপর আমাকে বলল, কি হলো প্রান্তিক চুপ চাপ আছো যে। না দেখছি তোমাকে। কি দেখছো? দেখছি ভারি সুন্দর হয়েছো তুমি। তা কেমন আছ কণা? খুব ভাল। সেলিনা বলল, শুধু আমরা দুজন আসিনি অশ্রুদি, আরো একজন এসেছেন? কে? বলতো কে? কি করে বলি। এক এক করে নাম ধরে ধরে বলতে আরম্ভ কর, দেখবে ঠিক এক জায়গায় এসে মিলে যাবে। না ভাই অতটা পারবো না, তার চেয়ে বরং তুমিই বলে দাও কে এসেছেন? সেলিনা বলল, প্রতীমকাকু? কানটাকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না অশ্রুকণার। তাই পুনরাবৃত্তি করে বলল, কি যেন বললে প্রতীম ...! আমি বললাম প্রতীম চৌধুরী এসেছেন, সম্ভবত তোমাদের এখানে অফিসিয়াল কাজেই এসেছেন। কিন্তু যে ২/৩ দিন থাকবেন তোমার এখানেই খাবেন। তুমি যেন সেইভাবে ব্যবস্থা কর, তাই বলে পাঠিয়েছেন। অশ্রুকণা অবাক হয়ে বলল, তুমি বলছ কি প্রান্তিক, স্যার আমার এখানে খাবেন? কই উনিতো আগে বলেননি কিছু। উনি আসবেন একথা তো এখানকার কেউ জানে না । সেলিনা বলল, অতশত জানিনে অশ্রুদি, তোমাকে কফি করতে বলেছেন উনি এখনি আসবেন।

তাড়াহুড়ো করে ভিতরে গেল অশ্রুকণা। সীতাকে বলল, একটু স্টোরে যাতো সীতা, স্টোর বাবুকে বল, আলু, পিঁয়াজ, ডিম, ডাল দু'তিন দিনের মত দিয়ে দিতে, আর জগুকে বলে মাছ জোগাড় করা যাবে সীতা! সীতা বলল, আমি দেখছি দিদিমনি, বলে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে এলেন প্রতীমবাবু। নিজেই এলেন সঙ্গে কেউ নেই। অশ্রুকণা তাকে বাড়ীর গেট থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো। বললো স্যার, এরকম হঠাৎ চলে এলেন, এখানে কোন গণ্ডগোল? দরাজ হাসিতে প্রতীমবাবু বললেন, নারে মেয়ে না। অনেক দিন তোমার খোঁজ নেওয়া হয় না, তাই ভাবালাম, প্রান্তিক সেলিনা যখন আসছে, ওদের সঙ্গে আমিও আসি। তা কেমন আছো অশ্রু। জায়গাটা ভাল লাগছে তো। হ্যাঁ স্যার। তারপর হঠাৎই অশ্রুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কি স্যার স্যার করছ তখন থেকে। লজ্জা এবং ভাল লাগলেও সঙ্কুচিত ভাবে অশ্রুকণা বলল, তা হলে কি বলব? কেন, ওরা যা বলে তাই। ওরা কি বলে তাতো আমি জানিনা, তাছাড়া ওরা যাই বলুক, আমার মুখে তা মানাবে

কেন? দুঃখ পেলেন প্রতীমবাবু। বললেন তুমি একথা বলছ কেন অশ্রু! কথা বলতে বলতে প্রতীম বাবুকে নিয়ে অশ্রুকণা ঘরে এসে ভিতর থেকে কফি এবং সামান্য খাবার এনে সামনে রাখল। প্রতীমবাবু বললেন, আমার উত্তর কিন্তু দাওনি অশ্রু। অশ্রুকণা বলল, কি উত্তর দেব, বলুন। আপনি শুধু এই প্রতিষ্ঠানের নয়। এরকম অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। আমি সামান্য একজন কর্মী। প্রান্তিক বা সেলিনার যে অধিকারই থাকুক আপনার ওপরে আমার তা কি করে থাকবে। তাছাড়া যদি আপনি আমাকে প্রান্তিক বা সেলিনার মত একজন মনে করতেন তবে আপনি তো ওদের সঙ্গে আমার কাছে আসতেন না। তাতো আপনি করেননি। আপনি এসেছেন ওদের সঙ্গে। যে অধিকারে আপনি সেলিনা বা প্রান্তিককে বুকে তুলে নিতে পারেন, সে অধিকার তো আমার ওপর থাকতে পারে না। গলাটা ভারি হয়ে এলো, তবুও বলে চলে শুধু আজই নয়, ২/৩ মাস আগেও আপনি এসেছিলেন, এখান থেকে ২/৩ মাইল দূরে আপনাদের যে নতুন ইউনিট খুলছে সেখানে। আপনার আসার সময় হয়নি, অথচ এখানে যদি অশ্রুকণা না থেকে সেলিনা বা প্রান্তিক থাকতো, পারতেন আপনি না এসে? সুতরাং ওদের সমকক্ষতা দাবী করার অধিকার কোথায়? আমি ও সেলিনা অবাক হয়ে শুনছিলাম অশ্রুকণার কথা। হয়তো অশ্রুকণা ওর দিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু প্রতীমকাকুর অন্তরের কথা যদি জানতো, তা হলে হয়তো নিজের প্রতি নিজে লজ্জায় তাকাতে পারতোনা। অশ্রুকণা কফি তৈরির জন্য দুধ ঢালছিল। প্রতীমবাবু এক হাতে তা সরিয়ে দিয়ে অশ্রুকণাকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, সত্যি কি অশ্রু তুমি বিশ্বাস কর, আমি ওদের থেকে তোমাকে আলাদা করে দেখি। আমি তো ওদের বলিনি আমাকে কাকু বলে ডাকতে, তবু ওরা ডাকে, তুমিও তো পার ঐ ভাবে যা হোক কিছু বলে আমাকে ডাকতে। তারপর যে কথা বলেছো, এখানে প্রান্তিক বা সেলিনা থাকলে আমি আসতাম কি না। না মা আসতাম না কারণ সেদিনের আসাটা ছিল অফিশিয়াল। তাই মন চাইলেও আসা সম্ভব হতো না। আজ এসেছি তোমার কাছে, আমার সেলিনার মত আরেকটা মেয়ে অশ্রুর কাছে। আর সহ্য করতে পারল না অশ্রু। এত বড় মাপের একটা হৃদয়কে এমন ভাবে আঘাত দিল সে কেমন করে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পায়ের কাছে প্রণাম করে বলল, আমায় ক্ষমা করুণ কাকু। আমি বুঝতে পারিনি। তাকে পায়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে বললেন, দূর পাগলি, বাবার কাছে মেয়ে কোন অপরাধ করে নাকি? তারপর যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবে, অনেক দেরি হয়ে গেল রেহানা, কফিটা মিক্সড কর। অশ্রু বলল, ও থাকনা কাকু আমি করছি। কিন্তু কানে তার একটা কথা লেগে আছে সেলিনাকে প্রতীমবাবু রেহানা বলে ডাকছেন, কিন্তু কেন?

বিকেলে আমায় একা পেয়ে অশ্রুকণা জিজ্ঞাসা করল, সেলিনাকে কেন রেহানা বলে ডাকছেন প্রতীমবাবু। এর উত্তরে অনেক কথা বলতে হয়। বলতে হয় খুটিনাটি সব। কিন্তু কোন উত্তর দিতে ইচ্ছে করছেনা। প্রতীমকাকু সেলিনাকে নিয়ে বেরিয়েছেন, বলে গেছেন রাত হবে। এ সময়টুকু অশ্রুকণা আর আমি একেবারে একা। ওর হয়তো অনেক কথা বলার আছে, আমারও যে নেই, তা নয়। মাত্র এ কয়দিনেই নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

বললাম, সেতো প্রতীমকাকু বলতে পারবেন, আমি কি করে বলব? তুমি কি কিছুই জাননা, না বলতে চাওনা। বলতে চাইলেই কি সব কথা বলা যায় কণা। পারবে তুমি বলতে যা তোমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে এত দীর্ঘদিন। কেন পারবনা প্রান্তিক? তুমি যদি শুনতে চাও আমি নিশ্চয়ই বলতে পারব। শুনতে না চাইলে বুঝি তোমার বলার কিছু নেই। আছে। তবে তাই বল। থাকনা ওসব কথা। অশ্রুকণা বলল, কি যেন লুকাচ্ছো তুমি। না, কণা, লুকাবার কিছু নেই। সত্যি আমি ক্লান্ত। আমি আর পারছিনা। কি হয়েছে তোমার বলতো তুমি তো এমন ভাবে কথা বল না। সেলিনা কি তোমাকে কোন ভাবে আঘাত দিয়েছে? না কণা, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ও আমাকে আঘাত দিতে চায় না। আমার সব শূন্যতা ও একাই ভরে দিতে চায়। আর এই খানেই আমার ক্লান্তি। বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে আমি মুক্তি চেয়েছিলাম। অশ্রুকণা বলল তোমার হেঁয়ালি কথা আমি বুঝতে পারছিনা প্রান্তিক। আমি অন্য প্রসঙ্গ টেনে এনে বললাম, সত্যভূষণবাবু কেমন আছেন? অশ্রুকণা বলল, নিজের মনের ঠিকানা খুঁজছো? মানে? মানে তো অতি সহজ, সত্যভূষণবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, যে তিনি কেমন আছে, সেটা আমার জানা দরকার। কোন সম্পর্কই কি নেই? তুমি আমায় সন্দেহ করছ? এ তুমি কি বলছ? তোমাকে কেন সন্দেহ করব? তা না হলে ওর কথা জিজ্ঞাসা করে আমার কাছ থেকে তুমি কি জানতে চাইছো?। জানতে চাইছি তোমার মনের ঠিকানা। তাই বল। অর্থাৎ সত্যভূষণবাবুর যাবতীয় ব্যাপার আমি জানলে আমার মনের ঠিকানার সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে তাই না? তুমি এভাবে বলছ কেন? তিনি তো তোমার একজন হিতাকাঙ্খী না প্রান্তিক, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের হিতাকাঙ্খী। প্রয়োজন না হলে তিনি এখানে আসেন না। আর যদি উনি আসেন আমার অস্বস্তি হয়। কেন? সব কেনর উত্তর দেওয়া যায় না। তুমি এখানে এলে কেন পারবে দিতে উত্তর? তোমাকে দেখতে। আমাকে তো সেলিনার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে দেখ তুমি। দেখনা? আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমরা কেউ বোধ হয় সোজা কথা বলতে পারনা, তাইনা? সোজা কথাতো তুমি শুনতে চাওনি। তুমি যা জানতে চাইছো তা হবে না। আমার পথে আমাকে চলতে দাও। তারপর বলল, দেখবে আমি কেমন আছি বলে তার গলায় সর্বক্ষণ চেনের সঙ্গে লাগানো থাকে যে লকেটটা, তা চাপ দিয়ে খুলে ফেলে আমার সামনে মেলে ধরল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমার দেওয়া ফটোটা লকেটের মধ্যে। আমার বিস্ময় কাটবার আগেই, ও আবার লকেটটা বন্ধ করে গলায় পরে নিল। তারপর বলল, দেখলে তো আমি কেমন আছি। আমি শুধু বললাম কণা। ও বলল, থাক, এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সত্যি তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে, যদিও তোমার ক্লান্তি দূর করবার আমার কোন উপায় নেই, তবু এই সময়টুকুকে অন্তত তোমার জন্য ব্যয় করতে দাও। কি করবে তুমি। শুধু তোমার পাশে থাকবো। পাশে থাকতে থাকতে যদি অন্য কোন ইচ্ছে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ভয় নেই প্রান্তিক, আমি যা পেয়েছি, তাতে যেমন আমি নিজেও ভাসবনা, অন্যকেও ভাসাবো না। আমি বললাম, কেন তুমি জীবনটাকে এমন নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিয়ে শেষ করে দিতে চাইছো? ও বলল, নিঃসঙ্গতার খোঁটা দিচ্ছ? বলত সেলিনাকে বুকের মধ্যে নিয়ে তাকে

আদর করতে করতে তুমি নিঃসঙ্গতা অনুভব কর না? কঠিন প্রত্যাঘাত? কি উত্তর দেব এর? আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছি দেখে ও বলল, জানি এর তুমি কোন উত্তর দিতে পারবেনা। তুমিতো হেরে গেছো প্রান্তিক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে হেরে গেছো। সেলিনাকে পেয়েও তুমি পাওনি। আর ও কখনো অশ্রুকণা কখনো রেহানা এই গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। ও হয়তো জয়ী হয়েছে, কিন্তু পায়নি তোমাকে। তুমিও পাওনি ওকে। অথচ উভয়ে উভয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণের চোরাবালিতে কেবলি হাবুডুবু খাচ্ছ? বল সত্যি কিনা।

আমি আর কথা বলতে পারছিনা। গলাটা শুকিয়ে আসছে। বললাম একটু জল খাওয়াবে? হায় প্রান্তিক শুধু জলে কি মিটবে এই আবক্ষ তৃষ্ণা? আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, তা হলে এক বোতল মদ নিয়েই এসো। হেসে অশ্রুকণা বলল প্রান্তিক, মদেও মিটবেনা তোমার এ তৃষ্ণা। অংক তোমার মেলেনি। অথচ আনন্দে ভাবছো তোমার অঙ্ক বুঝি মিলে গেলো। তুমি পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের সেই লাইনগুলো জান? কোন গুলো? ওই যে যেখানে-

নকশী কাঁথার মাঠের নায়িকা বলছে,

"মন সেতো নয় কুমড়ার ফালি

যাহারে তাহারে কাটিয়া বিলানো যায়।

তোমারে যা দিছি, অপরে তা চায়

কি হবে উপায় হায়"

তাই বলছিলাম, মনটাকে কুমড়ার ফালি করতে গিয়েই যত বিপত্তি। বললাম, কবি বললেও আমি তা মানিনা। কেন? মনের উপর আমার কোন অধিকার নেই বলেই, তাকে আমার ইচ্ছে মত চালনা করতে পারিনা। ওতো বেহুলার বাসর ঘর। যতই চেষ্টা করোনা কেন, ফাঁক তার থাকবেই। সেই ফাঁককে ভরাট করতেই তুমি এখানে এসেছো? সত্যি তাই। দেবে আমার সেই ফাঁকা জায়গাটা সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে।

অশ্রুকণা অবাক হয়ে বলল, তোমার মনের নাগাল আজো পেলাম না। তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ? না কণা মোটেই ঠাট্টা নয়। যা সত্যি তাই শুধু চাইছি তোমার কাছে। না প্রান্তিক এটা সত্যি নয়। তুমিতো আমার ঠিকানা পেয়ে গেছো। হয়তো পেয়েছি কিন্তু পৌঁছাতে পারিনি। এভাবে আমায় দুর্বল করে দিও না প্রান্তিক। তা হলে তুমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছ বল? অশ্রুকণা বলল, দুর্বলতাই মানুষের ধর্ম, তার ভালবাসার আধার, তার অহংকারের ধন। যেদিন সত্যি আরো দুর্বল ছিলাম, সেদিন তুমি ফিরেও তাকাও নি। আজ এসেছো করুণা করতে। কিন্তু প্রান্তিক, আজ যদি আমি তুমি যা চাইছো, তা দিতেই চাই, তুমি নিতে পারবে তো? দিয়েই দেখনা। তারপর ওর একখানা হাত নিজের বুকের পরে রেখে বললাম, হাত দিয়ে বুঝতে পারবে এখানকার কান্নার ওজন, যদি না পার, অন্তত কান পেতে শোন কি ভাবে কাঁদছে এ মন তোমার জন্য। আমার জন্য নয়। তবে কার জন্য? ওখান কার কান্না

শুধু সেলিনার জন্য। বললাম তুমি ওকে হিংসা কর? যদি করতে পারতাম, তোমার কাছে পৌঁছাবার ঠিকানা হারিয়ে ফেলতাম। তারপর বলল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ, বিকেলের রোদ ফিকে হয়ে এসেছে, হলুদ গোলাপী আভায় আকাশে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। পারবে কি তোমার অনুরাগের আবিরে আমায় রাঙিয়ে দিতে।

ভিতরের আবেগে থর থর করে কাঁপছি আমি, আর সেই আবেগে ওকে আকর্ষণ করতে চাইলে, ও বাধা দিয়ে বলল, প্রান্তিক, কেন এই দেহটা নিয়ে টানাটানি করছ। আমাকে আলাদা করে পেতে চেওনা, তাতে আমাকেও পাবে না, সেলিনাকেও হারাবে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, জানতাম কণা, কিছুই নেই তোমার দেওয়ার। অশ্রুকণা বলল, আমার কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকলে নিশ্চয়ই তোমাকে দেওয়ার থাকতো প্রান্তিক। আমি তো মিশে আছি তোমাতে কি নেবে আলাদা করে আমার কাছ থেকে। ওই বুঝি সীতা এলো। তুমি উঠোনা আমি আসছি।

সীতা নয়, এলেন সত্যভূষণবাবু। অশ্রুকণা বললেন, আপনি? হ্যাঁ আমি। আসতে হলো। অসময়ে আসবার জন্য আমি দুঃখিত অশ্রুদেবী। বুঝলাম না। তাছাড়া আমার কোয়ার্টারে এসেছেন, এখনো সন্ধ্যা হয়নি। এতে আবার সময় অসময়ের কি আছে? সত্যভুষণবাবু শুধু বললেন, স্যার আজকে আসতে পারবেন না। তাই আপনাকে বলতে বললেন, আপনি যেন চিন্তা না করেন। অশ্রুকণা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন আসতে পারবেন না? না, আর তাই আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। ওতেই যা জানাবার জানিয়েছেন। আমাকে শুধু বলেছেন, যদি আপনারা যেতে পারেন, তা হলে যেন সকাল ৭টায় প্রস্তুত থাকেন। আমি গাড়ী নিয়ে আসবো। কোথায় যেতে হবে? সেতো জানিনা। উনি এখন আছেন কোথায়? এখান থেকে প্রায় ২৫ কিমি দূরে এক আদিবাসীদের গ্রামে। সেখানে উনি গেলেন কেন? ওনার সঙ্গে আর কে কে আছেন? আমি কিছুই জানি না অশ্রুদেবী। উনি যা বলার চিঠিতে বলেছেন, আপনি শুধু চিঠিটা পড়ে জানিয়ে দিন কাল সকালে গাড়ীর প্রয়োজন আছে কি না। অশ্রুকণা বললেন, ভিতরে আসুন।

সত্যভূষণবাবু ভিতরে এলে আমি উঠে বসলাম। উনি আমাকে দেখে বললেন প্রান্তিক বাবু যে, কবে এসেছেন? কাল খুব ভাল কথা। আছেন কেমন? ভালো। আনন্দের কথা, কিন্তু আপনাকে দেখেতো মনে হচ্ছে না আপনি খুব ভাল আছেন? কি করে বুঝলেন? দুটো চোখ লাল, মনে হচ্ছে খুব কান্নাকাটি করেছেন অথবা জ্বর এসেছে? আমি হাসতে হাসতে বললাম, এর কোনটাই নয়, সত্যি আমি ভাল আছি তা আপনি কেমন আছেন? আমি সব সময় ভালো থাকি। এটাতো ভাল থাকার লক্ষণ নয়। নয় বুঝি? তাহলে ভাল নেই। আসলে জানেন কি প্রান্তিক বাবু, আপনাদের শহরের মান দণ্ডে এখানকার ভালমন্দ থাকা না থাকা নির্ভর করে না। এখানে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া একটা শক্তি। যারা পারেন, তাদের কাছে ভাল থাকা না থাকা একই কথার এপিঠ ওপিঠ।

ততক্ষণে অশ্রুকণার চিঠিটা পড়া শেষ হয়ে গেছে। ও সামনে এসে বললেন, কাল সাতটায় প্রস্তুত থাকবো। আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি ওর কোন কথা বুঝতে পারলাম না।

শুধু অবাক হয়ে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যভূষণবাবু বললেন তা হলে উঠি অশ্রুদেবী। উঠবেন? চা বা কফি? কেন বার বার আমাকে এসব খেতে বলেন, জানেন তো এসব আমি খাইনে।

অশ্রুকণা বলল জানতাম না, তবে জেনে নিলাম। ভবিষ্যতে এ ভুল হযতো হবে না। ভবিষ্যতের কথা থাক। আপাততঃ আজ রাতে কি আপনাকে এবং প্রান্তিক বাবুকে আমি নিমন্ত্রণ করতে পারি? অশ্রুকণা একটু হেসে বললেন, হঠাৎ নিমন্ত্রণ। না এমনি! এমনি এমনি কেউ নিমন্ত্রণ কবে নাকি? ঠিক জানিনা অশ্রুদেবী আমি এমনি এমনি নিমন্ত্রণ করি কিনা। তবে অনেক দিন ভেবেছি এখানকার সকলে আমার ওখানে যান, শুধু আপনি ছাড়া। তাই মনে হ'ল আপনাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ না কবলে যাবেন না। আর সে জন্য উপলক্ষ খুঁজছিলাম। আজ হঠাৎ একটা উপলক্ষ জুটে গেছে। তাই বলছি। অশ্রুকণা বলল, উপলক্ষ ছাড়াও যদি কোন দিন বলতেন, যেতাম। তা উপলক্ষটা কি? উনি সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, আমার এক বন্ধু এসেছেন, তিনি এখানেই থাকবেন, তাই আর কি। তিনি যখন থাকবেন, তখন তো অন্য যে কোনদিন বলা যেতো। সত্যভূষণবাবু বললেন, আপনার যদি সত্যি অসুবিধা হয় তাহলে থাক। এই দেখুন, রাগ করলেন তো! না না তা হবে কেন? অশ্রুকণা বলল, আমি যাব। আব প্রান্তিক বাবু? ওকেও নিয়ে যাবো। কটায় যেতে হবে। যখন খুশী। বা যখন খুশী কোথাও যাওয়া যায় নাকি? কোন অসুবিধা নেই অশ্রুদেবী। আপনারা যতক্ষণ না যাবেন, বন্ধুকে নিয়ে আমি জেগেই থাকব। না জেগে থাকার দরকার নেই, আমরা রাত ৮টার মধ্যেই যাব। ধন্যবাদ বলে সত্যভূষণবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে বললেন, আর একটা কথা। অশ্রুও কি বলেন তা শোনার জন্য অপেক্ষায় রইল। সত্যভূষণবাবু বললেন, সীতার ছেলেটির জ্বর খুব বেড়েছে। ও আসতে পারবেনা। তাই রাতে যদি আমার ওখানে যা হোক কিছু খেয়ে নেন! অশ্রু অবাক হয়ে বললেন আপনার ওখানে? কে রান্না করবে আপনি? মিথ্যেই খোঁটা দিচ্ছেন অশ্রুদেবী, রান্না আমি খারাপ করিনা। তবু যদি আপনারা রাজী হন, তাহলে আমি এবং আমার বন্ধু ভাগাভাগি করে রান্না করবো। হাসি সজোরে চেপে রেখে অশ্রু বলল, বাড়ীতে এসে আবার রান্না ঘরে ঢুকতে হবে নাতো। সে আপনার অভিরুচি বলে, উনি চলে গেলেন।

উনি চলে গেলে বললাম, হঠাৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ, বন্ধুর আগমন, তোমাকে ওখানে খেয়ে আসার অনুরোধ সব কিছুর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি? তোমার হিংসে হচ্ছে? ভীষণ। কেন? নিঃসঙ্গতার অবকাশ থেকে এই সময়টুকুকে চুরি করার জন্য। দুঃখ পেওনা। সামান্য যে সময়টুকু চুরি হয়ে গেছে, তার থেকে বেশী সময় আমি তোমায় উপহার দেব আর সেই বেশী সময়টাকে কি করবে সেই ধন্ধেয় পড়ে না যাও। বলে হাসতে হাসতে ও আমার সামনে থেকে চলে গেলো।

ফিরে এলো মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কফি ও বিস্কুট নিয়ে। আমি বললাম তোমারটা? আমি খাব না। হঠাৎ খাবে না কেন? না সত্যভূষণবাবুর রোগ ছোয়াঁচের মত তোমাকেও স্পর্শ করেছে। সব সময় শুধু ইয়ার্কি। দাঁড়াও একটা আলাদা কাপ নিয়ে আসছি, ভাগ করে

দেবে। ভাগ করতে গেলে শুধু কফি কেন অনেক কিছু ভাগ করতে হয় জান? জানি। তবে সেটা ভাগ করে দেবে তো? দেবার ইচ্ছাতো ষোলআনা ছিল, কিন্তু সময় যে চুরি হয়ে গেছে বন্ধু! তবে দুঃখ পেওনা, যে সময়টুকু চুরি হয়ে গেছে তার থেকে অনেক গুন সময় আমি জোগাড় করে নেবো। তখন কিন্তু নিজের ভাগে কম পড়বে বলে, এড়িয়ে যেতে পারবেনা। আমি বললাম আগেতো সময়টা পাই।

কোয়ার্টারটা ফুলে ফুলে সাজানো। বাইরের রাস্তা থেকে ঘরের গেট। গোটা বাড়ী, ফুল দিয়ে সাজানো। অনেকগুলো আলো এক সঙ্গে জ্বেলে বাড়ীটাকে বড় মায়াবী করে তোলা হয়েছে। নতুন পাজামা পাঞ্জাবি পরে সত্যভূষণবাবু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরা ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখছিনা। সত্যভূষণবাবু আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, তার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের কথা। মুখে আসলেও বলতে পারছিনা, কেন বাড়ীটাকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। এক সময় অশ্রুকণা বলল, কই আপনার বন্ধুকে দেখছিনা তো। সত্যভূষণবাবু বললেন, এখনি আসবেন। আমাকে বলেছে, কফি ও টিফিনটা নিজের হাতে করে নিয়ে আসবে। আমি ও অশ্রুকণা এ ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছি।

ছিপছিপে, যেন সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে শাখা, গলায় মোটা চেনে লকেট, খোঁপায় জুই ফুলের মালা, দাতগুলো মুক্তোর মত সাদা, একটু চাপা শ্যামাঙ্গী তাতেই তার রূপে যেন দূরন্ততার হাতছানি, কফির সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকলেন। ওগুলো সামনে রেখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন অনেকটা দেরি করে দিলাম, আমি কনক, সত্যভূষনের বন্ধু, ওর কাছে থাকবো বলে জামসদেপুরের এক অনাথ আশ্রম থেকে আসছি, নমস্কার। অবাক হওয়ার পালা তখনো যায়নি আমার। রূপ যে এমন আকর্ষক এবং স্নিগ্ধ হতে পারে, ওকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। অশ্রুও প্রতি নমস্কার করে বলল, দেরির জন্য কোন দুঃখ নেই, দুঃখটা হচ্ছে, এমন একটা মধুর মুহূর্তকে ছলনার জন্য মাটি করে দেওয়াতে। কণা নিজের হাতের কঙ্কনটা খুলে ওর হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, খালি হাতে তোমাকে দেখা যায় না ভাই, তাই উপস্থিত যা অছে তাই দিয়ে তোমায় বরণ করে নিলাম, আমার ও প্রান্তিকের তরফ থেকে। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে দিদিকে অপমান করো না। অবাক শুধু কনক নয়, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সত্যভূষণবাবুও। আর আমি। ভাবছিলাম, জীবনের গ্রন্থি বোধ হয় এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ এক অদৃশ্য সূতায় বাধা পড়ে যায়। তা না হলে, কোন অনুরাগের ছোঁয়ায়, অশ্রুকণা দিতে পারে তার মহামূল্যবান কঙ্কন, কোন এক অচেনা অজানা, কনককে। কনক, বাধা না দিয়ে, কঙ্কনটাকে পরাতে দিল নিজের হাতে, তারপর অশ্রুকণাকে প্রণাম করতে গিয়ে বলল, জানতাম না দিদি, এখানে তোমার মত কেউ আমাকে বরণ করে নেবে। তাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধাকে তুমি ফিরিয়ে দিওনা। কনক প্রণাম করে উঠতেই তাকে বুকের মধ্যে জাড়িয়ে নিয়ে অশ্রুকণা বলল, এই বুঝি চিনেছো আমায়। তুমি অনাথ আশ্রমের মেয়ে বলে, তোমার দেওয়া শ্রদ্ধাকে ফিরিয়ে দেব ভাবলে কি করে। তারপর আমাকে প্রণাম করে ও বলল, আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছ না। আমার চিন্তায় বাধা পড়ল, কোথায় যেন দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছিনা। ও আমার চিন্তাকে

ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বলল, থাক দাদা, অত কষ্ট করে চেনার চেষ্টা করতে হবে না। সময় মত আমি তোমাকে বলব, আমি কে? তবু সন্দেহ যায় না। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এই মনে পড়ছে অথচ মনে না পড়ার জন্য। অশ্রুকণা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হঠাৎ সব মনে পড়ে যেতে বললাম আরে কুঁড়ি তুই? কত বছর পরে তোর সঙ্গে দেখা। সত্যি চিনতে পারিনি। কিন্তু তোর সঙ্গে অনাথ আশ্রমের কি সম্পর্ক? না প্রান্তিকদা কোন সম্পর্ক নেই। এই যে অশ্রুদি, এর সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক ছিল, কিন্তু হতে তো মুহূর্তও লাগেনি। তাই যে সমাজ আমাকে বাঁচাতে পারল না, ফিরে এলে তারা জায়গা পর্যন্ত দিল না। সেই অনাথাকে অনাথ আশ্রম ছাড়া কে জায়গা দেবে? গ্রামের সেই কেলেঙ্কারি সবই মনে পড়ে গেল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বদনামের ভাগী হয়ে গেলাম আমিও। সেই তিক্ত স্মৃতি আর মনে করতে চাইলাম না। বললাম, ঠিকই বলেছিস? আসলে আমরা সকলে এক একজন অনাথ। দয়া করে যদি কেউ আশ্রয় দেয়, তবে সেটা তো আশ্রম, তাই আমরা এক অর্থে অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা। পুরানো স্মৃতি চারণা করে লাভ নেই। সব সময়ে সামনের দিকে তাকা। অবশ্য তোকে আর কি উপদেশ দেব। অতীতকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করতে পেরেছিস বলেই তো, আজ সত্যভূষণবাবুর মত মানুষের সন্ধান পেয়েছিস। ও বলল, তুমি আমায় আর্শীবাদ কর দাদা আমি যেন কেবল মাত্র তার নর্মসহচারী না হয়ে সত্যিকারের কর্মসহচারী হতে পারি। ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, পারবি বোন, সত্যি তুই পারবি। এবার তা হলে কফিটা ঢাল, সত্যি তৃষ্ণা পেয়েছে।

প্রায় রাত ১১টা। এক গভীর আনন্দ ও বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম। অশ্রুকণা বলল কবি বলেছেন, কি যেন একটা কথা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তারপর যেন আবৃত্তির মত একটু টেনে টেনে উচ্চারণ করল

"দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"

আসলে প্রান্তিক তোমার ভাগ্যটাকে আমার ভীষণ হিংসা করতে ইচ্ছে করে। বললাম আমারও। অবাক হয়ে ও বলল তোমারও। হ্যাঁ বন্ধু হ্যাঁ। আজ পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া তো কোন পথই খুঁজে পাইনি। এমন অন্ধকে যে পথ দেখায় তাকে হিংসে না করে উপায় আছে?

অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছেনা। সত্যভূষণবাবুর বাড়ী থেকে যখন ফিরেছি, ওই অতরাতেও অশ্রুকণা গেট বন্ধ করতে করতে বলল, একটু দাঁড়াও। আমি অবাক হয়ে বললাম এতরাতে লেটার বক্স খুলছ যে। অনেকদিন খোলা হয় না। দেখি যদি কোন চিঠি পড়ে থাকে। লেটার বক্সটাও এমন যে বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই ভিতরে কিছু আছে কি না। একটা চিঠি পাওয়া গেল। উপরে প্রেরকের নাম নেই। এক দিকে শুধু অশ্রুকণার নাম ও তার ঠিকানা দেওয়া। খাম থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, কি জানি কদিন পড়ে আছে। তারপর ভিতরে ঢুকে, চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, তোমার চিঠি দেখ কে লিখেছে। তোমার খুব কৌতূহল হচ্ছে? তা একটু হচ্ছে বৈকি। তাহলে

তুমিই পড়। কৌতূহলটা নিজেই মিটিয়ে নাও। আসার পথে বলেছিল, সেলিনারা আজ আসবেনা। চিঠিতে জানিয়েছেন, কাল সকালে, এখান থেকে প্রায় ২৫ কি মি দূরে একটা আদীবাসী গ্রামে ওরা আছেন, আমাদের যেতে বলেছেন। আমি একটু কৌতুক করে বললাম, সেলিনার সাহস আছে কি বল? তা আছে বৈকি? আমি কিন্তু পারতাম না। সে তো সত্যভূষণের কথা বলতে গিয়ে তোমার চোখ মুখে স্পষ্ট হয়েছিল। তারপব বলল, আচ্ছা প্রান্তিক, এই যখন তোমার মনের অবস্থা তখন আমাকে এই গভীর জঙ্গলে রেখে, কি ভাবে নির্লিপ্ত থাক। কোথায় আব থাকি। জান কতরাত আমার ঘুম হয় না। ও মৃদু হেসে বলল, এবার নিশ্চয়ই ঘুমাতে কোন অসুবিধা হবে না। হাজার হোক কণকের বরকে নিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। বললাম সে আমি জানিনা কণা, ভাবছি তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না। ও ভয় পেয়ে গিয়ে বলল সে কি কথা। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? আমার কাছে। প্রান্তিক এ ভাবে কথা বল না। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না যায়নি, তবে যাবে। কি চাও তুমি আমার কাছে? তুমি শুধু আমার এইটুকু চাই কণা। ও বলল, আমি তো তোমারি এই সামান্য কথাটা বুঝতে চাইছো না কেন? কেন আমাকে পাগল করে দিচ্ছ? বললাম, তুমি তোমার দাবী ছাড়বে কেন? দাবীটা কি, তোমাকে নিয়ে ঘর করা, না নিত্য ঝগড়া করা। তারপর মান অভিমান অবশেষে একই জিনিষের অনুশীলন হয়তো। বললাম জানিনা কণা, যে ভাবেই তুমি ব্যাখ্যা কর না কেন, আমি কিছুতেই তোমাকে এখানে একলা রেখে থাকতে পারব না। তবে কি তোমাকে সেলিনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলছ? না। তবে? আমি সম্পূর্ণ ভাবে তোমার হতে চাই। তাহলে কি আমাকে মেনে নিতে হবে, সেলিনার মোহ তোমার কেটে গেছে? তাও বলতে পারবো না। রেগে গিয়ে বলল, কিছুই যখন বলতে পারবেনা, তাহলে কেন সে দাবীর অধিকারের বড়াই কর। শোন প্রান্তিক, অযথা রাত করে লাভ নেই। শুয়ে পড়। আমাকে ঘুমোতে হবে।

ও অন্য ঘরে চলে গেল। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম কেন আমার এমন হচ্ছে। যতই না সেলিনার কথা ভাবতে চাইছি ততবার অশ্রুকণার মুখটা ভেসে উঠছে কেন? আমি কি তবে সারা জীবন ধরে অশ্রুকণাকে চেয়েছি? চিঠিটা পড়েছিল তুলে নিলাম। নিপুণ ভাবে মুখটা কেটে নিয়ে ভিতরের চিঠিটা বের করে নিলাম। সুন্দর চিঠির প্যাড। ডান দিকে প্রেরকের ঠিকানা। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট হসপিটাল, বাকুঁড়া, পশ্চিম বাংলা। লিখেছে, অশ্রুদি, তোমার সাথে আমার পরিচয় অতি সামান্য সময়ের। সেদিন যতদূর মনে হয়, আমাকে তুমি তপতীদি বলে ডেকেছিলে। আমি তোমাকে কি ভাবে ডেকেছিলাম মনে করতে পারছিনা। পরিচয়টা ক্ষণিকের হলেও অন্তরের একটা টান ছিল। সেই অধিকারে দিদি বলেই সম্বোধন করলাম। প্রায় মাস খানেক হল আমাদের হাসপাতালে একজন পেসেন্ট ভর্ত্তি হয়েছেন। ওকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। অবিকল যেন রেহানা। কিন্তু ও বলল ওর নাম রুকসানা। তাতে আমার সন্দেহ কিছুতেই না মেটার জন্য বলি, আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনি কিছুতেই রুকসানা নন। আপনি রেহানা। আপনার বোন সেলিনা। প্রান্তিক আপনার বন্ধু, অশ্রুকণা আপনার বন্ধু। আমি তপতী। আমাদের হাসপাতালে আপনার বোন দীর্ঘদিন ভর্ত্তি হয়েছিলেন।

কিন্তু তার ওই এক কথা, না না, আমি এদের কাউকে চিনিনা, আমি রুকসানা।

প্রান্তিককে লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু জেনেছি ও সেলিনাকে বিয়ে করেছে। যাকে সে মন থেকে ভুলে গেছে কেন তার জীবনে আর এই বিপত্তি ঘটাই? নীলাঞ্জনা পিসি এবং মিনতি পিসিকেও একই কারণে বলতে পারিনি, যদি আমার ভুল হয়। তাই তোমাকে বলছি অশ্রুদি, মিনতি পিসির কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিয়েছি। একটু দেরি হয়ে গেল। যদি তাড়াতাড়ি আস, দেখা হবে। শরীরের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু রেহানার মিষ্টি মুখটা চির উজ্জ্বল। তারপর কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন। কেমন আছ? প্রান্তিক ও সেলিনা কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে? ওদের সঙ্গে যদি দেখা হয় বলো আমার কথা।

তোমাকে উপদেশ দেওয়া মানায় না অশ্রুদি। জানি অনেক কষ্টের। নিজের জীবন দিয়ে বুঝি। ওর মত ছেলেকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তবু যা তোমাকে বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। 'তপতী'।

তারিখের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখি প্রায় সাতদিন আগে লেখা চিঠি। আমার ভিতর যে কি তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল তা বোঝাবার নয়। অশ্রু খানিকটা অভিমানে আর খানিকটা নিজের অসহায়তার জন্য, ওর ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে উপুড় হয় শুয়ে আছে, আমি আস্তে আস্তে উঠে গেলাম ওর কাছে। শাড়ীর আঁচলটা খানিকটা সরে গিয়ে পিঠটাকে উন্মুক্ত করেছে। আমার আলতো হাতের স্পর্শ সেখানে রাখতেই ও বলল, না প্রান্তিক না, এভাবে তুমি আমায় ছোট করো না। আমি বললাম, কেন তুমি আমায় বুঝতে চাইছো না, ভিতরে যতই আগুন জ্বলুক, তোমাকে ছোট করব এ তুমি ভাবলে কি করে? যার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই প্রান্তিক ছাড়া. তাকেই করবে প্রান্তিক অপমান, এই বিশ্বাস নিয়ে তুমি আমার স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছো? একবার তাকাও আমার দিকে কণা। দেখ আমাকে। জানতে চাইবে না গোপন পায়ে কেন তোমার ঘরে এসেছি? না গো না এমন করে বলো না। বলেই পাশ ফিরে সে আমাকে টেনে নিলো একেবারে তার বুকের কাছে। তারপর বলল, যেভাবে ইচ্ছে সেই ভাবে গ্রহণ কর প্রান্তিক। আমিও যে পারিছি না। ওকে জোর করে তুলে বসিয়ে দিয়ে বললাম, পারতে তোমাকে হবেই কণা। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। কোথায়? এই রাত শেষে ভোরের সূর্যের দিকে। চলনা ওই ফাঁকা আকাশের নীচে। মনকে যেখানে প্রসারিত করা যায় দিক থেকে দিগন্তরে। সত্যি যাবে? হ্যাঁ যাবো। তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলার আছে কণা। চল তা হলে। তারপর বলল, একটু দাঁড়াও। আমি বসে রইলাম। ও আমার সামনে দিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেল। প্রায় আধ ঘন্টা পরে যখন বেরোল, তাকে যেন চেনা যায় না।

পরেছে সব থেকে দামী লাল বেনারসী। কানে পরেছে ঝুমকো দুল। মূল্যবান স্বর্ণালংকারে সাজিয়েছে কণ্ঠদেশ থেকে বুক, সেখান থেকে নাভি। দু হাতে বেশ কয়েকটি আংটি। সুন্দর করে বেধেছে খোঁপা, চোখে দিয়েছে কাজল। তারপর আমার কাছে এসে একটি প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলছে, পোষাকটা বদলে নাও। বললাম এই এতো রাতে এমন সাজে সেজে তুমি কোথায় যেতে চাও কণা? কৌতুকে মুখ ভরিয়ে দিয়ে বলল,

সত্যভূষণ যে সময়টুকু চুরি করে নিয়েছে তোমার কাছ থেকে, সুদে আসলে তাকে ফিরিয়ে দিতে। আমি তবুও স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছি দেখে বলল, কি হল, বদলাবেনা পোষাক? আমি বললাম, না থাক। কেন তোমার কণাকে জানতে ইচ্ছে করেনা? করে ভীষণ ভাবে করে। তবে? আমি ভয় পাচ্ছি কণা। কেন? এ আলোক যে চোখ ধাঁধানো। পথের অন্ধাকার কাটে বটে, কিন্তু সম্মুখটা হয়ে যায় আরো অন্ধকার। ও বলল, আমি তো মাত্র একটি রাতও নয় অর্দ্ধেক রাত তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। সেলিনা থাকুক তোমার চিরদিনের জন্য। মাত্রতো অর্দ্ধেকটা রাত, পারনা সেটুকুও আমাকে দিতে? বললাম, কি করতে হবে। প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, ওটা পরে এস। আমি তাই করলাম, তারপর ওর কাছে এসে বললাম চল।

বিশাল বাগানের মধ্যে যে বেদী, সেখানে এসে বসলাম আমরা। ও বসল আমার পাশে। তারপর নিজের আঙুল থেকে একটা আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বলল, কথা দাও জীবনে যত ঝড় ঝাপটা আসুক, ওটা তোমার হাত থেকে কখনো খুলবেনা। বললাম যদি মুহূর্তের অসতর্কতায় খুলে ফেলি, কি হবে? জানিনা কি হবে? কিন্তু আমার মন বলছে, সেদিন তোমার কণার মৃত্যু হবে। আমি আবেগ মথিত কণ্ঠে বললাম কণা! ও আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, নীল আকাশ যেন জোছনায় স্নান করে সূর্যের প্রতীক্ষায় আছে। তারপর বলল, আমার দানের প্রতিদান দেবে না কিছু আমায়? বললাম বোস। ও বসে রইল। আমি উঠলাম। সারা বাগান যেন ফুলের বন্যায় ভাসছে। তুলে নিলাম গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা। তারপর একটা একটা করে তার খোঁপায় গুজে দিয়ে বললাম, আর কি চাও। আজ তো আমি ভিখারিনী প্রান্তিক, যা তুমি দেবে তাই নেবো দুহাত ভরে। বললাম তাহলে এস আমার কাছে। ও এগিয়ে এলো। থর থর করে কাঁপছে ও। তৃষ্ণাব্যাকুল ওষ্ঠ প্রান্ত বারবার ছুঁয়ে যেতে চাইছে ওকে। কিন্তু সবই ব্যর্থ, পারলামনা। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে, দুহাত দিয়ে ও আমাকে তুলে নিল তার বুকের মধ্যে। আর আমার মনে হতে লাগল, রেহানাই যেন দুই পাশে বেঁধে নিয়েছে আমাকে। আমি অস্পষ্ট উচ্চারণে বলতে লাগলাম কেন এমন করে পালিয়ে গেলে? কার প্রতি অভিমান করে? একবারও ভাবলেনা আমার কি হবে? আমি কি করব? নিজেকে মহান করতে গিয়ে আমাকে এত ছোট করলে কেন? আজো নিজের পরিচয় দিতে এত ভয়? মিথ্যা পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে আজো কি তোমার শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ হয় নি? কি চেয়েছিলে তুমি আমার কাছে? আমাকে নিয়ে যদি পথ চলতে না পারবে কেন তবে মিথ্যে আশ্বাসে বুক ভরিয়ে দিয়েছিলে? তুমি তো বলেছিলে আবার আসবে। এই কি তোমার আসা? তোমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে আমার মা, একবার দেখবে না তাকে? এত অভিমান?

অশ্রুকণা বলল, প্রান্তিক এসব কি বলছ? আমি যেন তার কথা শুনতে পাইনি। নিজের মনেই বলে চলেছি, আসলে তুমি কোন দিন আমাকে চাওনি, মিথ্যেই তোমার প্রেমকে বড় করে দেখেছে অশ্রুকণা, সেলিনা এমনকি তপতীও। তারপরও বলে চলেছি, রেহানা, এখনো কি তোমার পথ চলা শেষ হয়নি? এখনো কি মনে কর অশ্রু ও সেলিনার পরীক্ষা

দেওয়া শেষ হয় নি? একদিন মনে হতো তুমি দেবী, আজ তোমাকে অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না রেহানা। ভেবেছিলে রুকসানা নামের মেয়েটাকে কেউ চিনবে না। কিন্তু তোমকে চিনতে কারো বাকী নেই। কি লাভ হলো? ডালিম তোমার জন্য এ পৃথিবী থেকে চলে গেল। তোমারি জন্যে সেলিনা আজ বিকার গ্রস্থ। আর তোমারি জন্যে আজ অশ্রুকণা রিক্ত নিঃস্ব। যে তার সর্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিতে পেরেছিল, দেখেছো তার মন? যার করুণায় নিজেকে তুমি গরবিনী মনে কর, দেখে যাও, শুধু একবার দেখে যাও তার ভিখারিনী রূপ। কি পেয়েছে সে দেখবেনা? হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে আজো তুমি মিথ্যে করে বলে যাও তুমি রেহানা নও, তুমি রুকসানা। দাঁড়াও রুকসানা পালিয়ে যেওনা। আমি আসছি। তপতীকে ফাঁকি দিতে পারলেও, আমাকে দিতে পারবেনা।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে অশ্রুকণা বলল, কি আবোল তাবোল বলছ? কোথায় রেহানা? কে বা রুকসানা? কার কথা বলছ তুমি?

আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমাকে তার কোলের উপরে টেনে নিয়ে অপলক তাকিয়ে আছে অশ্রুকণা। বললাম কি বলছ কণা? কে রুকসানা? বললাম আমার জীবনের অভিশাপ। মানে? মানে তুমি বোঝনা কণা? কে আমার জীবনটাকে এমনি তিলে তিলে ধ্বংস করে দিয়েছে? কে আমাকে মৃত্যুর কিনারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এখনো বলছে তোমার পরীক্ষা শেষ হয় নি। কে? ওই রাক্ষসী রুকসানা। ওর হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচাও কণা। ও আমার সেলিনাকেও ধ্বংস করে দিতে চায়। তারপর অশ্রুকণার হাত দুটো ধরে কাকুতি করে বললাম, তুমি আমায় বাঁচাও কণা। বাঁচাও সেলিনাকে। না হলে ওর গরল নিশ্বাসে ও যে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। চোখে জল এস গেল অশ্রুকণার। টপটপ করে শিশির ফোটার মত তা গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুকণার দুই কপোল বেয়ে। ভিতরে যতটা আবেগ সবটা উজাড় করে দিয়ে ও বলতে লাগলো। তোমার কি হয়েছে প্রান্তিক আমায় বল না লক্ষ্মীটি। তোমার এ অবস্থা যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি বললাম আমি কি পারছি তোমাকে এমন ভাবে দেখতে? গ্রামের এক সাধারণ অতি সাধারণকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছো ভাবতেও পারছনা তুমি, তাইনা কণা? একদিন তুমি রেহানার শান্ত প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলে। যেটুকু দ্বিধাছিল, তাও একদিন সেলিনাকে দিয়ে মনে করলে ঋণমুক্ত হলে বুঝি? পারলে কি? ও দৃপ্ত কণ্ঠে বলল কে বলেছে পারিনি? হাসলাম আমি। তারপর বললাম, যদি পারতে তবে তোমার নিঃসঙ্গ অনুভূতি কেন এমন করে আমায় নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে? আসলে যা তুমি দিতে চেয়েছিলে, নেওয়ার যোগ্যতা না থাকায় তাই তোমার বুকের মধ্যে দ্বিগুন হয়ে ফিরে এসেছে। এতকষ্ট কেমন করে সইবে কণা। ও বলল, তোমার জন্য কোন কষ্টই আমার কষ্ট বলে মনে হয় না। তাইতো তোমায় হাসি মুখে তুলে দিতে পেরেছি কখনো রেহানাকে, কখনো বা সেলিনাকে। আমি বললাম আমি কি জড় পদার্থ যে এই ভাবে তুলে দেওয়া যায়?

ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় গায়ে কাঁপুনি দিচ্ছে। এই লাল মাটির দেশে শেষ রাতটা বেশ ঠান্ডা। বললাম, কণা চল ঘরে। ও বলল তাই চল, তারপর ও ওর খোপা থেকে

একটা একটা করে ফুল যা আমি পরম যত্নে পরিয়ে দিয়েছিলাম তা খুলে খুলে প্রতিটি ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আর ছড়াতে ছড়াতে ঘরে এলো। আমি বললাম, মনে পড়ে কণা, একদিন তোমার জন্য যে ফুল কিনেছিলাম তোমার অবহেলায় তা আমি বাইরের রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম, আজ কি তবে তার শোধ নিলে? ও শুধু বলল, জীবনে কোন কিছু কি শোধ করা যায় প্রান্তিক? যায় না। তুমি বোস। আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে আসছি। কফি? এই এত রাতে? রাত বেশী নেই। তারপর ঠাট্টা করে বলল, সত্যভূষণের চুরি করা সময় কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম প্রান্তিক? হ্যাঁ দিয়েছিলে, অনেকগুণ বেশী ফিরিয়ে দিয়েছিলে। তাহলে? আমি হাসিমুখে বললাম, তা হলে কি? কিছু না, বলে ও চলে গেল। খানিক পরে ধূমায়িত কফি নিয়ে এসে রাখল আমার সামনে। বললাম তোমারটা? ও বলল, একটা অনুরোধ রাখবে আমার? বল? আমাকে ভুলে যেতে পার না? পারি। তা হলে তাই যাও না? যাব।

ও কি আঘাত পেল? না হলে অমন চুপ হয়ে গেল কেন? বললাম কি হলো? দেখছিলাম তোমার ব্যথার অতলান্ত সাগর। ঠিক আছে, আমি আর রান্না ঘরে যেতে পারব না, তোমার অর্দ্ধেক খাওয়া শেষ হলে, বাকীটা আমায় দিও। তারপর বলল রেহনার কথা কি বলছিলে, আর রুকসানা বা কে? আমি বললাম ওরা দুজনেই একজন। কালকে রাতে যে চিঠিটা আমায় দিয়েছিলে তা নিশ্চয়ই পড়ে দেখনি? না। আমি বললাম ওটা তপতীর চিঠি। তপতীদি? হ্যাঁ, কি লিখেছে তপতীদি? আমি বললাম, ও লিখেছে বাঁকুড়া জেনারেল হাসপাতালে রুকসানা নামে একটি মেয়ে ভর্ত্তি আছে ও ঠিক রেহানার মত। তাই তোমাকে যেতে লিখেছে। ঠিক বলছ? হ্যাঁ কণা ঠিক বলছি। তারপর বললাম এই রেহানাই একদিন রুকসানার নাম নিয়ে ডালিমের সঙ্গে দেখা করে। তাকে বলে তুমি ভাল হয়ে ফিরে এস আমি তোমাকে বাঁচার পথ দেখাব। আশ্চর্য হয়ে অশ্রুকণা বলে, তারপর? সাতদিন সময় নেয় ডালিম। কিন্তু যে দিন সেই সাতদিন আসে যাওয়ার কথা ডালিমের কাছে, সেদিন সকালেই সে আত্মহত্যা করে। সত্যি বলছ তো তুমি। ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, সব সত্যি কণা। ও জানতে চাইল রেহানা এসেছিল সাতদিন পরে? হয়তো এসেছিল, কিন্তু ডালিমতো তার আগে নিজের ঠিকানায় পৌঁছিয়ে গেছে। দেখা আর হয়নি। তুমি জানলে কি করে? সেটা জানতে গিয়েই তো জীবনের সব এলোমেলো হয়ে গেল। ও গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, বলা যাবে না সে কাহিনী? সংক্ষেপে ওকে সব খুলে বললাম। মোসলেউদ্দীন সাহেব, মনোয়ারা বেগম। কেন সেলিনাকে হাতে নোয়া, সিঁথিতে সিঁদুর পরতে হয়েছিল সব। তারপর প্রতীমকাকুর কথা, হাওড়া স্টেশনের সেই ঘটনা, গ্রামের বাড়ী থেকে বাবার আগমন, সেলিনা কেন রেহানা হতে চায়, তার মাতৃত্বের কথা, কোনটাই বাকী না রেখে এক এক করে সব খুলে বললাম। ও শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠলো। সব শুনে গম্ভীর হয়ে উঠে গেল ও। তারপর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, তা হলে সেলিনাকে তুমি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছো? এ প্রশ্ন কেন কণা। আমার মন বলছে তুমি একটা জিনিষ এড়িয়ে গেছো। কি? তুমি নিজেই যে তাকে সিঁদুরের অধিকার দিয়েছ একথা

তুমি একবারও বলনি। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম দাঁড়াও। ও ব্যাকুল হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম আসছি। ফিরে এলাম একটু পরে সেভ করার একটা ব্লেড নিয়ে মুহূর্তে একটা আঙুলের উপর জোরে চেপে ধরতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। ও ভয় পেয়ে বলল, একি করলে প্রান্তিক এত রক্ত। আমি হাসছি, বললাম কাছে এগিয়ে এস কণা। ও কাছে এগিয়ে এলে আমি ওকে এক হাতে নিজের কাছে টেনে সেই রক্তে ওর সিঁথি রাঙিয়ে দিলাম। ও বলল একি করলে তুমি প্রান্তিক। বললাম, যে অধিকার দিতে আমি পথে পথে ঘুরেছি, আমার রক্তে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম। আমার মৃত্যুতে সেলিনার সিঁথির সিঁদুর হয়তো মুছে যাবে। কিন্তু এ রক্তের দাগ তো মুছবেনা কোন দিন। কোনদিন তোমাকে আর হারাবার ভয় থাকবেনা। জীবন যুদ্ধে বারবার হেরে গেছি। অন্তত একবার যে জয়ী হতে পেরেছি, এটা কি কম বড় প্রাপ্তি? ও বলল, তোমার কাছে যা প্রাপ্তি, আমার কাছে তা পূর্ণতা, সেকি তুমি বোঝ প্রান্তিক? আজ যে বাঁধনে বাঁধলে, প্রভাত সূর্যের আলোকে যখন অন্ধকার কেটে যাবে, ক্ষণিকের আবেগ বলে, তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবে না তো? প্রভাত সূর্যকে সাক্ষী রেখেই তো অলক্তরাগে বেঁধে দিলাম এই বন্ধন হীন গ্রন্থি। ও বলল, তা হলে আমি এখন কি করব? তোমার পথের ঠিকানা তুমি নিজেই খুঁজে পাবে একদিন কণা। এবার আমার মুক্তি।

ও বলল, একটু দাঁড়াও প্রান্তিক। আমি ওর কথা শুনে দাঁড়ালেও তার শাড়ীর আঁচলটা গলায় জড়িয়ে আমায় প্রণাম করল। আমি ওকে তুলে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললাম, আর কোন অভিমান নেইতো কণা? আছে। এখনো অভিমান। হ্যাঁ, আমার এ অভিমান কোন দিন যাবে না প্রান্তিক। আজ যা তুমি আমায় দিলে বিনিময়ে তোমায় কি দেব বল? বললাম যা তুমি দেবে তাই নেবো দুহাত ভরে। যদি কোন শূন্যতা থাকে, পূর্ণ করে নেবো তোমার সে দানে। তাহলে কথা দাও, জীবনে কোন দিন কোন ভাবে তুমি সেলিনাকে অবহেলা করবেনা, ও তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর প্রাপ্য মর্য্যাদা থেকে তুমি ওকে কোনদিন বঞ্চিত করবে না। হতভাগীকে আদর করতে করতে কোন দিন তোমার কণার মুখটি ভেসে উঠবে না। বল প্রান্তিক কথা দাও। বললাম, এ বড় কঠিন শাস্তি কণা। ও বলল, আমার সিঁথির রক্ত থেকেও কঠিন? বেশ কথা দিলাম। স্ত্রীর মর্য্যাদা থেকে কোন দিন তাকে বঞ্চিত করব না। আরেকটা কথা, যতই আমাকে দেখতে ইচ্ছে করুক, সেলিনাকে না নিয়ে কোনদিন তুমি আসবে না আমার কাছে। আমি প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, কণা! জানিগো কষ্ট হবে তোমার। কিন্তু তোমার নিঃসঙ্গতায় আমার যে কি কষ্ট হয় তাকি একবারও বুঝবেনা। বেশ তাই হবে। রাগ করলে ? না। শোন প্রান্তিক, সেলিনা তোমাকে পেয়েছে তার তীব্র চাওয়ার মধ্যে দিয়ে। আমি তোমাকে পেয়েছি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে। সে তোমার স্ত্রী হয়েও প্রতি মুহূর্তে তোমাকে হারাবার ভয় নিয়ে বেঁচে থাকবে। আমি জানব তুমি আমার কখনো হারাবার নয়। তুমি আমার মনোরাজ্যের অধীশ্বর। আর আমি? তোমার মানসী প্রেমিকা। আমাকে ভুলে যাওয়ার যেমন তোমার কোন উপায় নেই, তেমনি আমার ও উপায় নেই নতুন পথ খুঁজে নেওয়ার। তারপর বলল ওই দেখ পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, এখনি আলোর

ঝরণা ধারায় ভেসে যাবে সমস্ত বনভূমি। আমার সিঁথির মত লাল ওই সূর্যকে সাক্ষী রেখে তুমি আমায় অন্তত একবারের মত তোমার বুকে টেনে নাও। আমি ওকে নিজের বুকের ওপরে টেনে নিয়ে বললাম কণা। আমি তোমারি শুধু তোমারি। ও বলল, নাগো, তোমার যে মনটা কেউ দেখতে পায় না, সকলের অগোচরে একা পথ চলে সেই মনটা শুধু আমার, আর জাগতিক সুখ-দুঃখ মান-অভিমান ভরা যে জীবন সে শুধু সেলিনার। এবার আমায় ছাড়। সাতটায় সত্যভূষণ গাড়ী নিয়ে আসবে। তার আগে প্রস্তুত হতে হবে। আর তাকে বলতে হবে, আমাদের যাওয়ার ঠিকানা একটু বদলে নিয়েছি আমরা। মানে? প্রান্তিক আমাদের পথের শেষ প্রতীমবাবু ও সেলিনার গতরাতের ঠিকানা নয়। আমরা যাব তপতীদির কাছে। আমি বললম কণা। হ্যাঁ প্রান্তিক। রেহানাকে বলতে চাই, সকলের ভাল করতে গিয়ে তুমিতো কারো ভাল করতে পারলে না। হেরে গেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এখনো সময় আছে, এস আমার সাথে। এস রেহানা আমরা পূর্ণতা ভাগ করে নিই আধা আধি করে। সেলিনাকে মুক্তি দাও। ওকে বাঁচার অধিকার দাও। আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হল কণা, তোমার তুলনা শুধু তুমিই।

সকাল সাতটা। সত্যভূষণের বন্দোবস্তে গাড়ী হর্ণ দিয়ে চলেছে। অশ্রুকণা তার আটপৌরে সাজে বেরিয়ে এসেছে। আর পাঁচটা সাধারণ দিন থেকে আজ যেন আলাদ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবু পিয়াসী মন চেয়েছিল, অন্তত কাল রাতের পোষাকে চলুক সে আমার সাথে। ব্যতিক্রমের মধ্যে উজ্জ্বল বক্তে রাঙানো লাল সিঁথি। যেন বিজয়িনীর আত্ম প্রকাশ। সত্যভূষণ শুধু একবার ওর দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে নিলেন। যখন আমাদের গাড়ীটা ওর কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে কনক এসে দাড়ালো সামনে। আমি বললাম, কিছু বলবি কুঁড়ি। বলল না, কি আর বলব, তারপর জানতে চাইল, আবার কবে আসবে প্রান্তিকদা। হেসে বললাম আমিতো এখান থেকে এখনো যাইনি। এখানেই তো ফিরে আসবেন প্রতীম কাকু ও সেলিনা। কনক অবাক হয়ে বলল, সেলিনা কে? সেলিনাকে চিনিসনা? তারপর নিজেই বললাম, তোর বৌদি? এবার যেন ওর বিস্ময়ের অবধি নেই। বলল, আর তুমি অশ্রুদি? গাড়ীটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। অশ্রু বলল, আমি ওর অতীত ও ভবিষ্যত। কুঁড়ি গাড়ীর সাথে সাথে হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল আর বর্তমান? শুধু সেলিনার বোন। গাড়ীটা হু হু করে এগিয়ে চলল। কুঁড়ির মনে হয়তো অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু কোন প্রশ্নই আর করতে পাবে না। গাড়ীটা তখন তার দৃষ্টির বাইরে।

গাড়ীটা যখন জন পদ ছেড়ে সবুজ ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, আমি বললাম, যে বিজয়িনীর বেশে তুমি চলেছো আসবার সময় ওই ঔদ্ধত ফিঁকে হয়ে যাবে নাতো। ও বলল প্রভাত সূর্যের রক্তিমাভা, আবির রাঙা গোধুলিতে পায় তার পূর্ণতা। যে রক্ত মিশে গেছে আমার শিরায় শিরায় জীবন থেকে কেমন করে মুছে যাবে তা। বললাম যে কোন বিষয়ে গর্ব থাকা ভাল, অহংকার ভাল নয়। যে অহংকারে তুমি আমায় অহংকারী করেছো গরবিনী অশ্রুকণার সাধ্য কি তাকে হেলায় হারায়। বললাম যদি ফিরতে হয় সেলিনার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে। বলব এ আমার অনুরাগের রক্তে লাল, তোমার অহংকার

দিয়ে এর বিচার করো না। আর প্রতীম কাকু? ভয় নেই প্রান্তিক, সমস্ত উত্তর যে তার জানা। ভাল, কিন্তু তপতী? দুঃখ পেওনা আমার জোরটুকুকে সে স্বাগত জানাবে। আর রেহানা। আমার পূর্ণতাকে সমান দুভাগে ভাগ করে নিতে চাই ওর সাথে, তারপর বলল আর কথা বাড়িওনা। আমার অনুভূতিটাকে আমার মতন করে উপলব্ধি করতে দাও।

তাই হোক তবে। এখান থেকে বাঁকুড়া শহর বেশী পথ নয়। পৌঁছিয়ে গেলাম এক সময়। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম, ওর ডিউটি আজ ইভিনিংএ। কোয়ার্টারে গিয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন বেলা প্রায় ১০টা। বেল দিতেই ও বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেতো একেবারে অবাক। অশ্রুকণাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ও আমার হাত ধরে ভিতরে টেনে নিতে নিতে বলল, তোমাকে আজ সত্যি মনে প্রানে চাইছিলাম। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত আনন্দ কেন তপতী। কেন এত আনন্দ জানিনা প্রান্তিক। শুধু মনে মনে ভাবছিলাম আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, তুমি, সেলিনা বা অশ্রুদি যে কোন একজন যেন আজ আসো, আমি যেন কিছুই জানিনা এমন নিরীহ ভাবে বললাম, আজ কি তোমার নবজন্ম যে, আমাদের যে কোন একজনকে চাইছিলে। ও গম্ভীর হয়ে বলল, তা বলতে পার। কিন্তু রুকসানা নামের মেয়েটি এই হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পরে মনে হয়েছিল যদি তোমাদের যে কোন একজন আসতো। আমি তাচ্ছিল্য সহকারে বললাম কোথাকার কে রুকসানা, তার জন্য আমাদের আসার এত অধীর প্রতীক্ষা কেন? নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল জানিনা, শুধু মনে হয়েছিল, ও কিছুতেই রুকসানা হতে পারে না। ও তবে কে? আমার মনে হয় ও রেহানা। কিন্তু হাজার অনুরোধেও ও তা স্বীকার করেনি। আমি বললাম, তা হলে একটা চিঠি দিয়ে জানালেনা কেন? কাকে, তোমাকে? হ্যাঁ আমাকেই লিখতে পারতে। কোন অধিকারে প্রান্তিক? রেহানা তোমার কে? ছিঃ তপতী একথা তুমি বলতে পারলে রেহানা আমার কে? ও বলল, কোনদিন ভাবিনি, রেহানাকে নিয়ে এ ভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা যায়। আজ তা হলে ভাবলে কেন? তোমার আদর্শ, তোমার মহত্ত্ব তোমার সুগভীর প্রেম ও অনুভূতি গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গেছে তাই। কি করে বুঝলে? যে দিন শুনলাম, রেহানা নয়, অশ্রুদিও নয়, তোমার ঘরে তোমার স্ত্রী হয়ে এসেছে সেলিনা, সেদিন থেকে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম হায় কি বিচিত্র এই মন আর তার ভালবাসার উত্থান পতন। বললাম তুমি কিন্তু একদিন বলেছিলে, রেহানা নয়, সেলিনাই আমাকে বেশী ভালোবাসে। তাতো অস্বীকার করি না আজো। কিন্তু তুমি? তোমার সমস্ত মন জুড়ে কি সেলিনা ছিল, না রেহানা? হয়তো ওরা দুজনেই ছিল একে অপরের পরিপূরক হয়ে, কিন্তু সে কথা থাক তপতী। তোমার বিচারে রেহানার সংবাদ জানার আমার কোন অধিকার যদি নাও থাকে, জানাতে পারতে সেলিনাকে, জানাতে পারতে অশ্রুকণাকেও, ও বলল অশ্রুদিকে তো জানিয়েছিলাম, কিন্তু কি জানি, হয়তো তোমার প্রতি অভিমানে তোমার সমস্ত সংশ্রব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। ততক্ষণে চুপি চুপি কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে অশ্রুকণা, এবার পর্দা ঠেলে এক রাশ অভিমান নিয়ে বলল, সত্যি তপতীদি, এরপর আর ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না। অবাক হয়ে বলল, তুমি অশ্রুদি? আমার চিঠি পেয়েছিলে?

আমি পাইনি, তবে ও পেয়েছিল, আর তাইতো সাত সকালে উঠে ও আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে।

সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল তপতীর। সিঁথি লাল, অথচ হাতে কোন এয়োতির চিহ্ন নেই। প্রান্তিকের সঙ্গে এসেছে একেবারে আটপৌরে একটা শাড়ী পরে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল ওর সিঁথির দিকে, বলল, বিজয়িনী তোমাকে দেখছিলাম অশ্রুদি। ও সব কথা প্রকাশ না করে বলল, নীল রক্তে আমার জন্ম তপতীদি, মৃত্যুর আগে নীল রক্ত কখনো হারতে জানেনা। দুঃখের অনুভূতি ময় কণ্ঠে তপতী বলল, হবে হয়তো। সে যাকগে তোমাদের সঙ্গে আর কেউ এসেছে? হাসতে হাসতে অশ্রু বলল, আমার একা এই যাত্রা পথটাকেও কি তুমি কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলছ? তপতী বলল, সারা জীবনইতো একা পথ চলার অঙ্গীকাব নিয়েছো, চললে না হয় এই সামান্য পথটুকু ভাগাভাগি করে? ও বলল সে আমার দ্বারা হবে না তপতীদি। তারপর ওর সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে বলল, বরং তুমি যদি বল, আমি তোমার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলে যাবো, হাটবে নাকি ওর সঙ্গে একা দীর্ঘ পথ? তপতী বলল ঠাট্টা করছ? কেন ঠাট্টা করব। কোন কিছুকে গ্রহণ করার অপেক্ষা সহ্য হয়, কিন্তু ছাড়ার অপেক্ষা একদম সহ্য হয়না। তারপর বলল হাসিমুখে ওকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে চলে যাব, বুকে বিন্দুমাত্র ব্যথা বাজবেনা, কণ্ঠ কাঁপবেনা একটুকুও। মৃদু হেসে ও বলল ভেবে দেখব, আমার নৌকায় জায়গা আছে কি না। বরং একটুখানি বোস, সকালে নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি, আগে কফি নিয়ে আসি। অশ্রুকণা বলল, তার আগে চলনা ওই রুকসানা নামের মেয়েটিকে দেখে আসি।

ও বলল, ভালই করেছ। আজ না হলে দেখা হতো না। আমার মনেও একটা ক্ষোভ থেকে যেত। উদ্বিগ্ন হয়ে অশ্রুকণা বলল, কেন? ওর আজ ছুটি হয়ে গেছে। ছুটির পরে ও কোথায় যাবে? এখানে থেকে প্রায় ৫০ কিমি দুরে এক আদিবাসী গ্রামে। ওদের মধ্যেই কাজ করেন উনি। ওদের কোন ঠিকানা আছে? নিশ্চয়ই আছে। দিতে পারবে আমায়? দেব। তার আগে আমি কফি আনছি খেয়ে চল রুকসানাকে দেখে আসবে। তাই হোক বলে চুপ করে গেল অশ্রুকণা।

বাঁকুড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমাজের পক্ষ থেকে, ওকে এখানে ভর্ত্তি করা হয়েছে। কাল ওদের ওখান থেকে কেউ আসবে বলে জানিয়েছে। এই বেলা চল রুকসানা সত্যি রেহানা কিনা পরখ করে দেখা যাক।

কফিটা খেয়ে বললাম চল তা হলে। তপতী, আমি ও অশ্রুকণা। কেবিনের দরজাটা বাইরে থেকে ভেজানো। তপতী জেনে নিয়েছে ভিতরে কেউ আছে কি না, যদিও এটা ভিজিটিং আওয়ার নয়। তপতী বলল, প্রান্তিক তুমি যাও। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। তাই হোক, বলে আমি ভেজানো দরজায় টোকা মারলাম। ভিতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, খোলা আছে। দরজাটা একটু খানি ফাঁক করে দেখে নিলাম ভিতরের মানুষটাকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওই গ্রীবা দেশ, কোমর থেকে নীচে নামা এক গোছা কালো চুল, তার শাড়ী পরার ভঙ্গিমা, হাত দুটো কেমন করে

রাখে সেই স্মৃতি সব কিছু একাকার হয়ে মুহূর্তে আমায় জানিয়ে দিল রুকসানার আসল পরিচয়। তপতী ভুল করে নি, মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে রেহানা। সুর করে আবৃত্তি করলাম -

একদিন এই ফাকা পথ দিয়ে

এসেছিনু তব দ্বারে।

মুগ্ধ নয়নে দেখেছিনু তোমা

গোপন অন্ধকারে।

ও তড়িতে ফিরে বলল কে আপনি? আমি হেসে ফেলে বললাম

চিনবে আমায় কেমন করে

হারিয়ে গেছে মন

সে মন আমি ফিরিয়ে দেব

এই করেছি পণ।

ও রেগে বলল, আপনি বেরিয়ে যান। এ ভাবে আপনাকে কে প্রবেশাধিকার দিয়েছে? একথা বলেই সিস্টার সিস্টাব করে ডেকে উঠলো। একটা কেলেংকারী হয়ে যেতে পারে ভেবে তপতী এগিয়ে এল। বলল, কি হয়েছে বলুন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, একে কে এখানে পাঠিয়েছে, তাছাড়া এটাতো ভিজিটিং আওয়ারও নয়। আমি হতবাক হয়ে ভাবছি, তবে কি আমার ভুল? অশ্রুকণা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, রেহানা চিনতে পারছিসনা আমায়? তাকিয়ে দেখ আমি অশ্রুকণা, আর কাকে তুই বেরিয়ে যেতে বলছিস? প্রান্তিককে? যে তোর স্বপ্নকে পূরণ করেছে, তোর ত্যাগকে মহিমান্বিত করেছে, সেলিনাকে গ্রহণ করেছে ও জীবন সঙ্গিনী হিসাবে। একদিনতো এই জন্যই কাউকে না জানিয়ে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলি। চেয়েছিলি ডালিম যেন তোর একান্ত আদরের সেলিনার কোন ক্ষতি না করে, আর সেই আদরের ধনকে চেয়েছিলি, তোর একান্ত আপন ও গোপন প্রান্তিকের হাতে তুলে দিতে। তুই কেন বিশ্বাস করতে পারলিনা, যে তোর ভালবাসার আবদারকে ও ফিরিয়ে দিতে পারে না। একদিনতো তোরই জন্য আমিও ওর জীবন থেকে সরে যেতে চেয়েছিলাম, পেরেছি কি? তুইও চেয়েছিলি সেলিনার জন্য ওর জীবন থেকে সরে যেতে। কিন্তু পারিসনি তাইতো এই মিথ্যে পরিচয়। আসলে তুই, আমি, আমরা পরাজিত। কিন্তু সব পরাজয় পরাজয় নয়। বাবা মা তার শিশু সন্তানের কাছে বার বার হারার অভিনয় করেন, কখনো বা সত্যি হেরে যান, সে হারার মধ্যে কোনও অগৌরব নেই। হয়তো ডালিমকে পথ দেখাতে চেয়ে তুই তার মঙ্গলই করেছিস্, কিন্তু নিজেকে এভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে কিসের সন্ধান পাবি তুই? তুই মিনতি পিসিকে বলেছিস্ তাকে একবার মা বলে ডাকতে তোর ভীষণ ইচ্ছে। জানিস কি, তোর সেই ঋণের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে প্রান্তিক মিনতি সেনের ছেলে হয়ে তোরই ঋণ শোধ করে চলেছে। কি করে ভুলে গেলি তাকে, কি করে ভুলে গেলি, প্রান্তিকের গ্রামে গিয়ে তার বাবাকে বাবা বলে ডেকে তোর সেই আবদার। মেয়ে বলে মেনেছেন ভবিষ্যতে অস্বীকার করবেন না তো?

কিন্তু তোর জীবনে এসবের কোন মূল্য নেই। তোর কাছে তোর নিজের অভিমানটাই বড়। বারবার চিঠিতে লিখে গেছিস তোকে যেন না খোঁজা হয়, নিজেই আবার তুই আসবি। এত করেও তোর পরীক্ষা নেওয়া শেষ হ'লনা রেহানা? জানিস্ তুই, সেলিনার কি ক্ষতি করেছিস ? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রেহানা অশ্রুকণার চোখের দিকে। অশ্রুকণা বলে চলেছে, বুঝতে পারবিনা রেহানা নিজের অজান্তে কতবড় ক্ষতি করেছিস ওর, তোর এই পালিয়ে বেড়ানোতে, তুই না ভাল করেছিস প্রান্তিকের না ভাল করলি সেলিনার। ছিঃ এই কি তোর ভালবাসা? ডালিমকে বলেছিস প্রান্তিক তোর গুরু, আর এই তোর গুরুদক্ষিণা?

ও নীরবে সব শুনলো, তারপর শান্তভাবে বলল, এত কথা জেনে আমার কি লাভ? তাছাড়া আপনারা কে? কেন আমাকে এত কথা শোনাচ্ছেন! কেন আমাকে রেহানা বলে ভুল করছেন। আমিতো বলেছি আমি রেহানা নই, আমি রুকসানা। অশ্রুকণা আর থাকতে পারল না বলল তুই রেহানা নোস? না - না - না! অশ্রুর চোখের ইঙ্গিতে আমি ও তপতী বেরিয়ে এলাম, অশ্রুকণা বলল, তুই যে রেহানা নোস তার কোন প্রমান আছে তোর কাছে? ও বলল, আমি যে রেহানা তার কি কোন প্রমান আছে? অশ্রুকণা চকিতে তার শাড়ীর আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত পিঠে হাত দিয়ে বলল, এই সেই জরুল, এই যে তার নীচে যে আঘাতের দাগ, যা শয়তানদের অত্যাচারে এখনো জাজ্বল্যমান, এসব কি রেহানার প্রমান নয়? আরো প্রমান চাস? না - না চাইনে বলে দু হাতে চোখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। অশ্রুকণা তাকে কোন রকমের সান্ত্বনা না দিয়ে নীরবে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, তুমি যাও প্রান্তিক। ওকে রাজী করাও, ওকে আমার ওখানে নিয়ে যাব।

তপতী ও অশ্রুকণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ভিতরে গিয়ে ওর পাশে বসে, পরম মমতায় ওর চুল গুলোকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ওর উন্মুক্ত পিঠে হাত রাখলাম। ও আরো জোরে শব্দহীন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর শরীরের ওঠানামায় ওর কান্নার গভীরতা অনুভব করতে পারছি। বুঝতে পারছি কান্না ওর ভীষণ দরকার। আর ওর কান্নার স্পর্শ যেন, ছোঁয়াচে রোগের মত আমাকে বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে? খানিক পরে ডাকলাম, রেহানা? ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। নিজের শাড়ির আঁচলে মুছে নিল চোখের জল। তারপর বলল, ওই নামে আমায় ডেকোনা প্রান্তিক। রেহানার মৃত্যু হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে রেহানার জন্মান্তর। আমি রুকসানা। বললাম, মিনতি সেনকে দেখতে ইচ্ছে করে না? না। নীলাঞ্জনা পিসিকে? না। তোমার মা আফরোজ বেগমকে। বলেছিতো না - না - না। কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না। তবে মিথ্যে বলবনা প্রান্তিক, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে একজনকে। কে? ও বলল, তোমার বাবা, গ্রামের সেই শান্তসৌম্য মানুষটিকে, যিনি আমাকে মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাকে কথা দিয়েছিলাম, মেয়ে বলে ডেকেছেন, পরে অস্বীকার করবেন নাতো! একবার শুধু একবার তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তারপর আবার চলে যাবো আমার নিজের কর্মক্ষেত্র আদিবাসীদের মধ্যে। খুব ভাল কথা। জীবনের কর্ম যজ্ঞ সবার জন্যেতো এক নয়। তুমি যে এই ক্ষুদ্র সংসারের জন্যে নও, তা সেদিনই

জানতে পেরেছিলাম, যেদিন তুমি তোমার ভালবাসাকে রূপান্তরিত করে প্রেমিককে বানিয়েছিলে গুরু। কেন আমাকে এমন করে মাটি থেকে ছিন্ন করে ছুড়ে দিলে ধরা ছোঁয়ার বাইরে? হয়তো বৃহতের আহ্বান শুনেছো তুমি, তাই ক্ষুদ্রকে বিসর্জন দিতে তোমার বুকটা কাঁপল না একবারও। এত নির্মম আর নিষ্ঠুর যে, অতীতের যা কিছু সব ভুলে যেতে চাইছো, ভুলে যেতে চাইছো প্রান্তিকের ভালবাসা পর্যন্ত।

ও বলল, তুমি চুপকর প্রান্তিক! আমি বললাম কেন চুপ করবো? অসহায় আদিবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণের যদি অধিকার থাকে, তার অতীতকে কাঁদাবার তবে আমার কেন অধিকার থাকবেনা, আঘাতে আঘাতে তোমাকে সেই অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তা আর হয়না প্রান্তিক। আমি যে নিবেদিত আদিবাসীদের মঙ্গল কামনায়। সেখান থেকে আমাকে আর ফিরে আসতে বলো না। বললাম, বেশ ডাকব না, কিন্তু যে সেলিনার জন্য তুমি এত করলে একবার দেখবেনা, বধূরূপে তাকে কেমন লাগছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার দুটি চোখ। বলল এসেছে তোমার সাথে? এসেছে, তবে এই হাসপাতালে নয়। কোথায়? অশ্রুর ওখানে। তারপর বললাম, চলনা রেহানা, আর একবার আমরা সবাই সবাইকে চিনে নিই। ও বলল তা আর হয় না প্রান্তিক। জীবনে যা পেয়েছি তা আর নতুন করে পেতে চাইনে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তুমি সেলিনাকে গ্রহণ করেছো এ যে আমার কি আনন্দ তা তোমাকে বোঝাবার নয়। আমি বললাম, তোমার আনন্দটাই সব নয় রেহানা। তোমার স্মৃতি তাকে কি করম বিকার গ্রস্থ করে দিয়েছে, কি চেয়েছিলে আর কি হয়েছে সেই অভিশাপকে দেখবেনা? ও আতঙ্কিত হয়ে বলল, কি বলছ প্রান্তিক! আমি যা বলছি তাইতো তোমাকে নিজের চোখে দেখে আসতে বলছি। তুমি ভাবতে পারবেনা, রেহানা হওয়ার জন্য সেলিনার সেই অক্লান্ত প্রয়াস। সে নিজের জীবন থেকে সেলিনা নামটাই মুছে দিতে চায়। তার আবদার তাকে রেহানা নামে ডাকতে হবে। সেই দুরন্ত ছটফটে মেয়েটির কি করুন মৃত্যু তা না দেখলে তোমার পথ চলা যে শেষ হবে না। কি যেন ভাবতে লাগল ও, তারপর বলল, সেলিনাকে তোমার বাবা মেনে নিয়েছেন? হ্যাঁ, মেনে নিয়েছেন। তোমার পিসি এবং মিনতি সেন মানে আমার মা? হ্যাঁ নিয়েছেন। আর আমার জন্মদায়িনী মা আফরোজ বেগম। আমার চোখ ছল ছল করে উঠলো। বললাম তুমি বোধ হয় তোমার মায়ের সর্বশেষ সংবাদ জান না। কেন কি হয়েছে? অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো ওর বুক। আমি ধীরে ধীরে বললাম, চোখ বোজার আগে, উনি আমার হাতে সেলিনাকে দিয়ে বললেন, ও যদি স্বেচ্ছায় তোমাকে ও তোমার পিসিকে ছেড়ে না যায়, তাহলে ওর সব দায়িত্ব আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম প্রান্তিক। আমাকে ফিরিয়ে দিও না। সেলিনা এবং আমি আতঙ্কিত হয়ে বলতে চাইলাম, এ হয় না। মৃদু হেসে আফরোজ বেগম বললেন অনেক ভুল করেছি। আর করতে চাই না। না প্রান্তিক তোমার জীবনে রেহানার যে স্থান, সেখানে ওকে দিয়ে যাচ্ছিনা, ওর ভাল মন্দের দায়িত্ব শুধু তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। মা নেই? বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল রেহানা। আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম। নিয়তিকে অস্বীকার করবার শক্তি আমাদের কারো নেই। কিন্তু রেহানা, সেলিনাকে সবাই মেনে নিয়েছে কি না জানতে চেয়েছো,

কিন্তু আমি মেনে নিলাম কি না সেতো জানতে চাইলে না। মৃদু হাসল রেহানা, এ সেই হাসি, যে হাসি আমায় একদিন মুগ্ধ করে রাখতো ঘন্টার পর ঘন্টা। তারপর বলল, আমার কোন ইচ্ছেকে তো তুমি কোন দিন অস্বীকার করনি, আজই বা করবে কেন? আমিতো মনে প্রানে চেয়েছিলাম, ওকে তুমি আপন করে নাও। যত কষ্টই হোক তোমার, আমি জানি আমার এ ইচ্ছেকে তুমি অমর্য্যাদা করতে পার না। বললাম ভালো কথা। তোমাদের কারো কাছে আমি কোন রক্তমাংসের মানুষ নই। আমার কোন ইচ্ছে অনিচ্ছা থাকতে নেই। আমি একটা জড় পদার্থ মাত্র। আর সেই জড় পদার্থের অধিকার নিয়ে তোমাদের কাড়াকাড়ি। একবার ভাবলেও না রক্তমাংসের মানুষটির নিজস্ব কোন চাওয়া পাওয়া আছে কি না। মনে হল ভীষণ আঘাত পেয়েছে ও। বলল দেখ প্রান্তিক, তোমাকে আমি আমার গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছি। একদিন বলেছিলাম ডালিমকে তোমার কথা উঠতে। সবকিছুকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা, আমি পেয়েছি আমার গুরুর কাছ থেকে। সেই তুমি আজ যদি নতুন নির্দেশ দাও তাও মেনে নেবো অক্ষরে অক্ষরে। অশ্রুকণা আমাকে গুরু দক্ষিণার কথা স্মরণ করিয়ে আমার বিবেককে জাগাতে চেয়েছে। আজ তুমিও বলছো, তোমার কথা নাকি আমি একদমও ভাবিনি। সত্যি কি তাই প্রান্তিক? তুমি কি চেয়েছিলে তোমাকে নিয়ে একটা সঙ্কট তৈরি হোক, আর সেই সঙ্কটের ভিতর দিয়ে আমাদের চরম স্বার্থন্বেষী চেহারাটা কংকালের মতো বেরিয়ে আসুক। আর সেটাই যদি হয় তোমার গুরুদক্ষিণার দাবী, তাহলে বল কি করতে হবে আমায়। প্রচন্ড অভিমানে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। বললাম, না রেহানা, তোমাকে আর আমার দেনা পাওনার সাথে মেলাতে চাইনে। তোমার আপন পথে চলার অধিকার দিলাম তোমাকে। যে মহৎ প্রেম তোমাকে আজ জনারণ্যের মাঝে নিয়ে এসেছে তার থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল আমার করে পেতে চাইনে। শুধু অনুরোধ, তোমার ছায়াটুকু সরিয়ে নাও সেলিনার জীবন থেকে, শুধু ওকে সেলিনা হয়ে বাঁচতে দাও। ও বলল তাই হবে। যাব আমি অশ্রুর ওখানে। দু চোখ ভরে দেখবো তোমাদের। তারপর চলে যাবো। আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ প্রান্তিক। তাইতো নিরাকার আল্লাহ বা প্রানহীন পাষাণ মুর্তির কাছে, আমার মুক্তির আবেদন না জানিয়ে রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যেই, নিজের মুক্তি খুঁজে ফিরছি। তাদের ভালবাসার মধ্যে যে আমি তোমার ভালবাসার স্পর্শ পেতে চাই প্রান্তিক। আর স্বপ্ন দেখতে চাই, পথ প্রান্তে ক্লান্ত তোমাদের হয়তো বা কোন দিন বরণ করে নেওয়ার জন্য রেহানা অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, তাই যেন হয়। তোমার স্বপ্ন যেন সত্য ও সুন্দরের স্পর্শে চির অমলিন হয়। এবার চল আমাদের সাথে।

তপতী ও অশ্রুকণা ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে বলল, তা হলে মিথ্যে মেখলা খুলে ফেলেছিস বল। তারপর বলল, তোর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাইনে। কিন্তু রেহানা একবার আমার দিকে তাকা। আমাকে তোর কিছুই বলার নেই? আছে অশ্রু। অনেক কথাই বলার আছে। কিন্তু যে কথা বলব, সে তো ওর কথা। বরং আমার হয়ে ওই তোকে বলবে। তবু তোর মুখ দিয়ে যে কিছু শুনতে চাই। ও বলল, সেদিন যখন সকলের অগোচরে পথে নেমেছিলাম, মনে একটাই ইচ্ছে ছিল ডালিমদের ষড়যন্ত্রে যেন শেষ না হয়ে যায়

ফুলের মত দুটো জীবন। একজনের মধ্যে তীব্র আগুন, আরেকজনের দ্যোদুল্যমানতা, আমায় সংকল্পে অটল করে। মনে মনে ভাবি, তুলনাহীন এই ভালবাসাকে আমি ব্যর্থ করে দিতে পারি না। যারা ব্যর্থ করে দিতে চায় একবার তাদের মানবিকতার কাছে আবেদন জানাবো। যদি শোনে ভাল, না হলে নিজেই শাস্তি দেব। তবু কিছুতেই সেলিনার প্রেমকে ব্যর্থ হতে দেব না। আর তাই নিজের পরিচয়কে গোপন করে গিয়েছিলাম ডালিমের কাছে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে পড়ে গেল প্রান্তিকের মুখ। তার কথা। হৃদয় জয় করতে হয় ভালবাসা দিয়ে। মুহূর্তে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ডালিমকে বললাম, তোমাকে আমিই পথ দেখাবো ডালিম। ও সাতদিন সময় নিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারিনি, জীবনের অঙ্ক সহজ ভাবে মেলে না। একদিকে প্রান্তিক তার আচরণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছে নতুন পথ, আর ডালিমের মৃত্যু আমাকে দিয়েছে সত্যের সন্ধান। যে সত্যের সন্ধান আমি পেয়েছি প্রান্তিকের কাছ থেকে। আমি জানি সে সত্যের সন্ধান, এতদিনে তুইও পেয়ে গেছিস তাই নতুন করে তোকে কিছু বলার নেই অশ্রু। নিশ্চয়ই তোদের গাড়ী প্রস্তুত। অশ্রু বলল, হ্যাঁ, প্রস্তুত। তা হলে ওঠা যাক। তপতী এতক্ষণ কোন কথা না বলে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। রেহানা আস্তে আস্তে তার কাছে এসে তার দুটো হাত ধরে বলল, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই তপতীদি। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমায় ছোট করতে চাইনে। শুধু একবার অনুমতি দাও আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে। রেহানা। চোখ দুটো ওর ছল ছল করছে। রেহানা বলল, নতুন করে আর কোন কিছু বলার নেই তপতীদি। আমি আবার আসব তোমার কাছে, বার বার আসব। তোমার চোখ দিয়ে দেখব আমি নীল আকাশ সবুজ প্রান্তর আর জ্যোছনার প্লাবন। এতদিনের মিথ্যাচারকে অভিমানের আড়ালে চাপা দিয়ে আমায় তুমি দূরে সরিয়ে দিওনা তপতীদি। অশ্রু বা সেলিনাকে যা দিতে পারব না, সেই কষ্টের বোঝা তোমার পায়ে নামিয়ে রেখে আমি আমার শ্রদ্ধা জানালাম। কোনো অজুহাতে তা ফিরিয়ে দিওনা। বলে সত্যি সত্যি রেহানা তপতীর পায়ে হাত রাখতে যেতেই তপতী তাকে দুহাতে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, তোমার দেওয়া কষ্ট আমার বুকের মধ্যে নিয়ে তোমায় আমি ঋণমুক্ত করলাম রেহানা। আমার দরজা চিরদিন তোমার জন্য খোলা রইল। আমার চোখ দিয়ে এই বিরাট পৃথিবীকে তুমি আর কতটুকু দেখতে পাবে। বরং আমিই দেখব তোমার চোখ দিয়ে এই পৃথিবীকে, এইটুকু দাবীর অধিকার তুমি আমায় দাও ভাই। তাই দিলাম তপতীদি। এবার অশ্রুকে তাড়া দিয়ে বলল, চল তা হলে, ওরা এসে গেলে হয়তো আবার পথরোধ করে দাঁড়াবে। এবারও যাওয়া হবে না।

আমাদের গাড়ীটা ছেড়ে দিল। তপতী তাকিয়ে আছে যতক্ষণ দেখা যায়। যখন আমরা অশ্রুদের ওখানে পৌঁছালাম তখন দুপুরের সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। আমরা না যাওয়াতে সেলিনা ও প্রতীমবাবু ফিরে এসেছেন বেশ খানিকটা আগে। কিন্তু সব কিছু বন্ধ থাকাতে সীতা শুধু ফাঁকা বারান্দায় বসে পাহারা দিচ্ছে শূন্য খাঁ খাঁ বাড়ীটা। সেলিনা জিজ্ঞাসা করল অশ্রুদি কোথায়? তাতো জানিনা বৌদিমনি। আপনারা বসুন, আমি সত্যভূষণ বাবুকে ডেকে আনছি। প্রতীম বাবু বললেন, দরকার নেই, তুমি এখানেই থাক, আমরা ওর

ওখানে যাচ্ছি। অশ্রু এলে আমাদের সংবাদ দিও। তাই হবে বলে ও ঘাড় নাড়ল। আমরা এসে যখন শুনলাম, তখন অশ্রুকে বললাম তুমি রেহনাকে নিয়ে ঘরে যাও, আমি দেখছি।

সবে কফির কাপে ঠোঁট ছুঁইয়েছেন আমি দ্রুত ঘরে প্রবেশ করতেই কনক বলল, দাদা তুমি? এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? আমি ওর কোন কথার উত্তর না দিয়ে সেলিনাকে বললাম, সেলিনা, রেহানা এসেছে। যুগপত বিস্মিত হয়ে প্রতীমবাবু বললেন কে রেহানা? হ্যাঁ, কাকু। তাহলে চল আর দেরি নয়। সংবাদটা শুনে সেলিনা যেন নীরব হয়ে গেল। কফির কাপটাকে ও আর ঠোঁটের কাছে আনতেই পারলনা। থরথর করে কাঁপছে ও। কনক এসে ওকে ধরে বলল, বৌদি তোমার কি শরীর খারাপ করছে? প্রতীমবাবু বললেন, কি হলো মা! তারপর ওকে দুহাতে তুলে বললেন, এস তোমাকে শুইয়ে দিই। ও বলল, না কাকু, দরকার নেই চল।

কনক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, কত যেন প্রশ্ন আছে ওর। প্রতীমবাবু সেলিনাকে নিয়ে এগুতেই কনক বলল দাদা, রেহানা কে? বললাম ওর দিদি, কিন্তু বোন, এখন আর কিছু জানতে চাসনে পরে আসব।

চলে এলাম, কতদিন পরে মুখোমুখি রেহানা ও সেলিনা। দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে ভাষাহীন অপলক চোখে। তারপর এক সময় রেহানা বলল, কি রে আমাকে চিনতে পারছিস না। ও কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছে দেখে বলল, কি অপূর্ব লাগছে তোকে। আয়না আমার কাছে! তবুও স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলল, এত অভিমান! সেলিনা এবার তাকালো অশ্রুকণার দিকে! তার রক্তিম সিঁথি তাকে কি কোন নতুন সংকেত দিতে চাইছে! কিন্তু নিজেকে যথা সম্ভব সংযত রেখে বলল, কাকু, এই রেহানা, যার ভালবাসার স্রোতে আমি ভেসে ভেসে এসেছি প্রান্তিকের কাছে। এবার যার জিনিষ তার হাতে তুলে দিয়ে আমিও ছুটি চাই কাকু! প্রতীমবাবু অবাক হয়ে দেখছেন রেহানার স্নিগ্ধ রূপ, যা জোছনার স্নিগ্ধতাকেও হার মানায়। রেহানা কাছে এসে প্রণাম করে বলল, ওকে বুঝিয়ে বলুন কাকু ওর কাছ থেকে আমি কিছু নিতে আসিনি, দিতে এসেছি সর্বস্ব উজাড় করে নিজেকে রিক্ত করে ঋণমুক্ত হতে। প্রতীমবাবু বললেন, আমি জানি মা। তুমি ওকে ভুল বুঝোনা। তুমি ভাবতেও পারবেনা, কি প্রাণান্তকর প্রয়াসে, ও প্রান্তিকের কাছে শুধু রেহানা হতে চেয়েছে। যাতে প্রান্তিকের জীবনে তোমার জন্য কোন শূন্যতা না থাকে। তোমরা কথা বল। আমরা পাশের ঘরে আছি।

অশ্রু, আমি এবং প্রতীম কাকু পাশের ঘরে চলে এলাম। রেহানা বলল, একি পাগলামি করছিস সেলিনা। রেহানার শান্ত সরোবরে প্রান্তিক হয়তো স্নান করতে পারে, ভাসতে পারে না। তুই কি বুঝিসনা যে উদ্দাম ঝড় নিয়ে ওকে তুই উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাস, সেখানেই ওর মুক্তি, তোরও মুক্তি। কেন মিথ্যে নিজেকে রেহানা বানাতে চাইছিস। প্রান্তিক কেবল মুক্তি পেতে পারে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের ঊর্মিমালায়। ওর সেই মনটাকে বুঝতে না চেয়ে নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস ওকেও কষ্ট দিচ্ছিস। সেলিনা এবার বলল আমার কষ্টটাই কি সব? তুই কি বলতে চাস তোর কষ্ট আমি বুঝি না। তুই জানিসনা, আমার মাঝে ও শুধু তোকে

খোঁজে। কেমন করে আমি তাকে বোঝাবো, এভাবে সেলিনার মধ্যে রেহানাকে পাওয়া যায় না। তাই উদাস চোখে অতীত স্মৃতিচারণায় ওর মন যখন ভারি হয়ে ওঠে, সেলিনার উদ্দামতা সে মুহূর্তেও চায় না রেহানা। ও শুধু তোকে খোঁজে। আমি স্ত্রী হয়ে কি ভাবে ওর কষ্ট লাঘব করব তুই আমায় বলে দে। ওকে কাছে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে বলল। ও তোর ভুল সেলিনা। সে সময় ও তোকেই চায়। সেলিনার উদ্দাম ঝড়ে সে নিজেকে সঁপে দিতে চায়, আর তুই ভুল বুঝে অন্য কিছু হ'তে চাস বলে ওর কষ্টটা শুধু বাড়িয়ে দিস। রেহানা! হ্যাঁরে সেলিনা ঠিক তাই। আর ভুল করিসনি লক্ষ্মীটি। প্রান্তিকের রক্তের উত্তরাধিকার তোর মধ্যে বড় হচ্ছে। সেই উত্তরাধিকারের একমাত্র দাবীদার হয়ে ওর জীবনটাকে মরুভূমি করে দিসনে। জানি আমার জন্য তোর কষ্ট হয়, তাইতো তুই নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে একটু একটু করে প্রান্তিকের দিকে এগিয়ে দিয়েছিস আমাকে। আমি কি বুঝি না বলতে চাস? তারপর বলল যেখানে তোর জন্ম, তাদের কাছে তোর ওই সিঁথির সিঁদুর হয়তো খেলার অলংকার মাত্র, কিন্তু এদের কাছে এর যে কি অসীম মূল্য তা হয়তো এতদিনে জেনে গেছিস, তাই কথা দে, কোনদিন ওকে তুই আঘাত দিবিনা। সেলিনা বলল, এত কষ্ট তুই কেমন করে সইবি রেহানা। ভয় নেই সেলিনা, একদিন গুরু হিসাবে যাকে মেনে নিয়েছিলাম, আজো মানি, আমার চলার পথে ওর আর্শীবাদ আমি পেয়ে গেছি, সেলিনা এবার এসেছি তোর কাছ থেকে মুক্তি নিতে। দিবিনা আমায় মুক্তি? সেলিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল পারবো না রেহানা, কিছুতেই পারবো না তোর কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিতে। তা হলে কি চাস তুই, তোর কাছ থেকে ওকে আমায় কেড়ে নিতে বলছিস? নারে রেহানা, একদিন যেমন বুঝতেও দিইনি, আমার কষ্ট কোথায়, আজও তেমনি করে ওকে তোর জন্য রেখে দিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই। পাগল। এইজন্য বুঝি বরমাল্য দিয়ে ওকে গ্রহণ করেছিলি? ওর দেওয়া সিঁদুরে তোর সিঁথি লাল, আজ আর পালাবি কোথায়? তবু আমি পারব না রেহানা। রেহানা বলল, দেখ সেলিনা আর এই ভাবে এতগুলো জীবন নষ্ট করে দিসনা। তারপর বলল, কেন পারবিনা। ভয়টা কোথায়? আমি তোকে অভয় দিচ্ছি রেহানার অশরীরী ছায়া তোকে কোনদিন আর স্পর্শ করবেনা। দূর থেকে আমি তোদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবো। তোর অশ্রুদি থাকবে পাশে সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো। জীবনে যাতে কোন ভুল না করিস। থাকবেন নীলাঞ্জনা পিসি এবং আমার মা মিনতি সেন। অভিভাবকের মতো আছেন প্রতীম কাকু, আর সবার ওপরে রয়েছে প্রান্তিক, যে তোর যাবতীয় ভয় ও আশঙ্কা কাটিয়ে তোকে আপন করে নেওয়ার জন্য। আর একটা কথা সেলিনা, তুই সেলিনা, যে সেলিনার উদ্দাম প্রেমের কাছে ধরা দিয়েছে প্রান্তিক, রেহানার প্রেম সেখানে কোনদিনও পৌঁছাবেনা। তাই মিথ্যে আশঙ্কা ত্যাগ করে, তোর দুরন্ত ঝড়ো প্রেমে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যা, এই আমার শেষ অনুরোধ। ভুলে যাসনে তোর রক্তমাংসে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে প্রান্তিকের উত্তরাধিকার। তার কাছে তুই কি কৈফিয়ৎ দিবি?

সেলিনা বলল, কিন্তু সে আসবে কী না তারতো কোন নিশ্চয়তা নেই। বিস্মিত হয়ে, রেহানা বলল কেন? সেলিনা সেদিনের সব ঘটনা খুলে বললে, রেহানা বলল, প্রান্তিক

হয়ে, রেহানা বলল কেন? সেলিনা সেদিনের সব ঘটনা খুলে বললে, রেহানা বলল, প্রান্তিক আমায় সব কথা বললেও ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। হয়তো আমায় আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু সেলিনা সেদিন যাইই ঘটুক না কেন, সে সব ঘটেছে রেহানার অশরিরী উপস্থিতিতে। ও আঘাত তোর ও তোর সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। সে আসবেই, তাই তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য নিজেদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত কর। সব শেষে আর্শীবাদ চেয়ে নে প্রান্তিকের বাবা ও মায়ের কাছ থেকে, কারণ ওর রক্তধারাতো তাদেরই থেকে বয়ে আসছে। সেলিনা শুধু দেখছে অবাক হয়ে তার দিদি রেহানাকে। এর পর রেহানা ডাকল, অশ্রু তোরা একবার এ ঘরে আসবি? আমরা সবাই এঘরে এলে, আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, প্রান্তিক, মনের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে সেলিনাকে তুমি একান্ত করে নাও। ওর অভিমানকে গভীর মমতায় মুছিয়ে দিয়ে রেহানাকে নিষ্কলুষ কর। তোমার জীবনে রেহানাব ছায়াও যাতে না পড়ে সেই আর্শীবাদ তুমি আমায় কর প্রান্তিক। ও এই প্রথম তার মাথা নামিয়ে দিলো আমার পায়ের কাছে। বললাম তাই হবে রেহানা। এবার রেহানা এগিয়ে এসে প্রতীমবাবুকে বললেন, যে আদর্শ ও ভালবাসার অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে আপনি এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন আমাকে তার শরিক করে নেবেন কাকু? বুঝতে পারছি প্রতীম বাবুর বুকের মধ্যে যেন কি হচ্ছে। বললেন, রেহানা মা, তোমাকে পথ দেখাবার সাধ্য কোথায় আমার? শুধু তোমার চলাব পথকে আরো সুগম করার অঙ্গীকার করতে পারি মাত্র। তা হলে তাই করুন। কি করতে হবে মা। শুধু আপনার ড্রাইভার আকবরকে বলুন আমাকে যেন আমার কর্মক্ষেত্রে একটু পৌঁছিয়ে দেয়। ওরা আমার পথ চেয়ে আছে। সেলিনা, আমি ও অশ্রুকণা একসঙ্গে বলে উঠলাম রেহানা! প্রতীমবাবু বললেন, কেন বাধা দিচ্ছো! ওকে যেতে দাও। অশ্রুকণা বলল, আমাকে কিছু বলবিনা রেহানা? হ্যাঁ বলব। আমার মা মিনতি সেনকে আমার কথা বলিস, কাজ যখন শেষ হবে, যাবো তার কাছে ফিরে, ততদিন যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেন।

আকবর গাড়ী নিয়ে এল। আস্তে আস্তে রেহানা গাড়ীতে গিয়ে উঠলো! অশ্রু এগিয়ে এসে বলল আর কিছু বলবিনা। সেলিনাকে দেখিস, আর! হাসল একটু, তারপর বলল, যে সত্য রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে, মঙ্গলদীপ জ্বেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখিস ভাই। গাড়ী ছেড়ে দিল। সেলিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, দিদি, যাসনে! অনেকক্ষণ পরে আমি ওকে বললাম ঘরে চল সেলিনা। চোখের জল মুছে ও শুধু বলল হ্যাঁ, তাই চল।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-